HANDBOOK OF COMMERCIAL BENGALI

RECOMMENDED BY CALCUTTA UNIVERSITY

•

INTENDED FOR
STUDENTS OF COMMERCIAL BENGALI

•

By
SYAM SUNDAR BANERJEE,
M.A. (*Gold Medalist*)

Head of the Department of Bengali, Raja Peary Mohon College, Uttarpara : Lecturer, Vidyasagar College (Com. Dept.) & Calcutta University.

A. MUKHERJEE & CO. (PRIVATE) LTD. : : CALCUTTA

পূজনীয় অধ্যাপক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

ও

শ্রীনীরদরঞ্জন মুৎসুদ্দী

মহাশয়দের করকমলে

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

নানা কারণে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইল। ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার জন্য আমি দুঃখিত।

সরকারী হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইল। ছাপা চলিবার সময় কতকগুলি সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য হস্তগত হওয়ায় সেগুলি প্রথম খণ্ডের বা 'প্রবন্ধ' অংশের শেষে 'সংযোজন' শীর্ষক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা মূলগ্রন্থের সহিত এগুলি মিলাইয়া লইলে উপকৃত হইবে।

আমার সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীপ্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিদ্যাসাগর কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুতকালে আমাকে মূল্যবান সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী। বর্তমান সংস্করণে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রপত্রিকা হইতে নানাভাবে সাহায্য লওয়া হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১৭, তেলীপাড়া লেন,
কলিকাতা ৪।
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রবন্ধাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ, পত্রাবলী ও অর্থনৈতিক পরিভাষা

পরিশিষ্ট

প্রথম খণ্ড

প্রবন্ধাবলী

গান্ধী-অর্থনীতির ভূমিকা

(An Introduction to Gandhian Economics)

ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮২ ভাগ বা ৩০ কোটির মত লোক এই উপ-মহাদেশের ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার গ্রামে বাস করে। সংখ্যায় বিপুল হইলেও ভারতের গ্রামবাসীরা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অসহায়। তাহাদের দুঃসহ অভাবের সুযোগ লইয়া শক্তিমান বিত্তবানেরা নানাভাবে তাহাদিগকে শোষণ করিয়া থাকে। দেশবাসীর কল্যাণের জন্যই দেশের পুনর্গঠন পরিকল্পনা; সে হিসাবে ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় এদেশের অসংখ্য গ্রামবাসীর কথাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। ইহাদের লইয়াই সত্যকার দেশ।

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদের চাবি-কাঠি একটি সম্পদশালী ক্ষুদ্রাকার শ্রেণীর হাতে চলিয়া গিয়াছিল। এখনও ভারত যে অর্থনৈতিক পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর স্থান নগণ্য।* কৃষিনীতির সহায়ক কুটির শিল্পের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আঞ্চলিক পরিবেশে বড় বড় যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব হইয়াছে। মালিকত্বের মায়াবাদ সমগ্র দেশের অর্থব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জনসাধারণের নিম্নতম জীবিকার দাবীটুকুও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। দীর্ঘকালের একটানা দুর্নীতি, অবহেলা ও অব্যবস্থার জন্যই যে পরিস্থিতি এতটা শোচনীয় হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শিল্পপতিরা এদেশে যে পণ্য-উৎপাদনরীতি চালু করিয়াছেন, তাহাতে প্রয়োজন বা চাহিদা, উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্যটুকু রক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হয় নাই। মুনাফাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য, এদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়াও বিদেশে পণ্য রপ্তানী করিতে তাঁহাদের অনেকেরই সঙ্কোচ হয় না। কৃষির ও কুটির শিল্পের সাচ্ছল্যে আগে পল্লী-ভারতের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় ছিল। বৃটিশ শাসন সেই ভিত্তি চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপযোগী বিকল্প ব্যবস্থা

---

* ভারতের জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে শতকরা ৫ ভাগ লোক, এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে শতকরা ৩৩ ভাগ লোক এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে শতকরা ৬২ ভাগ লোক।

না হওয়ায় আধুনিক জীবনের বাহুল্য ভারতের দারিদ্র্য-বৃদ্ধিরই কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের জনগণের কল্যাণসাধনই ছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবন-ব্রত। সন্তোষের ভিত্তিতে পল্লীভারতের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য স্বষ্টির শুভেচ্ছা গান্ধী-অর্থনীতির গোড়ার কথা।*

বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক পণ্য-উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র, তাহার আর কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় বা মর্যাদা নাই। মালিক নিজস্বার্থে তাহার শ্রমশক্তির বাড়তি ন্যায্যমূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দেয়। গান্ধীজী দৃঢ়কণ্ঠে এই অসঙ্গত শোষণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অহিংসনীতি শুধু বিদেশী রাজশক্তির সহিত সংগ্রামেই প্রযোজ্য ছিল না, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল ভালমন্দের প্রশ্নেই তিনি এই অহিংসনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। ধনতন্ত্রবাদের আওতায় ধনিক শ্রমিকের যে অতিরিক্ত শ্রম বিনামূল্যে ভোগ করিয়া ফাঁপিয়া ওঠে, ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তি সেই শ্রমশক্তির বাড়তি মূল্যের শোষণকে তিনি কুৎসিত হিংসানীতির চরম পরিচয় বলিয়াছেন। ভারতের সনাতন জীবনাদর্শ হইতেছে জাগতিক অভাববোধকে সীমাবদ্ধ করিয়া আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশে আত্মবিকাশের চেষ্টা করা। গান্ধীজী এই জীবনাদর্শের ভিত্তিতে ভারতীয় অর্থনীতির বনিয়াদ গড়িতে চাহিয়াছেন। যে শ্রেণীর মানুষই হউক, মানুষ মাত্রেই তাঁহার চোখে সম্মানের অধিকারী। এই মানব-মর্যাদাকে কেন্দ্র করিয়া গান্ধীজীর অর্থনৈতিক আদর্শ বা পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের কায়িক পরিশ্রমকে গান্ধীজী কখনও ছোট করিয়া দেখেন নাই। গান্ধীজীর ভাষায় পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায়ও অহিংসনীতির প্রবর্তন করিতে হইবে। ইহার অর্থ, রাষ্ট্রকে এমনভাবে দেশের পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হইবে, যাহাতে পণ্য-উৎপাদন পণ্যের প্রয়োজন এবং প্রকৃত ব্যবহারের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলে, অর্থাৎ পণ্য যেন যথাসম্ভব

---

* কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩১) গান্ধীজী বলিয়াছিলেন :—

The Congress represents in its essence the dumb and semi-starved millions scattered over the length and breadth of the land in its seven lakhs of villages. Every interest which is worthy of protection has to subserve to this interest and if there is genuine and real clash, I have no hesitation in saying that Congress will sacrifice every interest for the sake of the interest of the dumb millions.

ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হয়, ইহা ব্যবসাদার বা মুনাফাখোরদের স্বার্থসাধনের উপায় হইয়া না উঠে। বর্তমানে দেখা যায়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পণ্য-প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও মানুষকে সেই পণ্য ব্যবহারে বঞ্চিত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। এমনও দেখা যায় যে, যেখানে অসংখ্য স্থানীয় শিশু দুগ্ধের অভাবে শীর্ণ হইয়া পড়ে, সেখানে বাজার চড়া রাখিবার জন্য দুগ্ধব্যবসায়ীরা সহস্র সহস্র গ্যালন দুধ নিঃসঙ্কোচে নষ্ট করিয়া ফেলে। লোভ হইতেই মানুষের প্রতি মানুষের এই মমতার অভাব জন্মায়। গান্ধীজীর মতে এই দুর্নীতি হিংসাত্মক কার্য। শিল্প যদি কেন্দ্রীভূত না হয়, যদি মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পপতির হাতেই অজস্র শিল্পপণ্য বণ্টনের অধিকার না থাকে, কৃষি ও কুটিরশিল্পের যদি সত্যকার উন্নতি হয়, অর্থাৎ এক কথায় পণ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অন্ততঃ বহুলাংশে যদি বর্তমান শোষণনীতি বিদূরিত হয়, তাহা হইলেই কাহারও কাহাকেও হিংসা করিবার কারণ স্বতঃই কমিয়া যাইবে। "থিঙ্গস্ টু কাম" গ্রন্থে মনীষী এইচ জি ওয়েলস্ বলিয়াছেন, মানুষ আর উন্নতির নামে অস্থিরতা চায় না, এখন তাহার প্রয়োজন শান্তির, প্রয়োজন বিশ্রামের। জীবনের উদ্দেশ্য হইল সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকা। ওয়েলস্ তাঁহার "দি রাইট্স্ অফ ম্যান" গ্রন্থেও যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অশান্ত জীবনের প্রতি অসংখ্য মানুষের নিদারুণ বিরাগ বর্ণনা করিয়াছেন।

গান্ধীজী-পরিকল্পিত রামরাজ্যে কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে সকলকেই অন্নসংস্থান করিতে হইবে, সকলের প্রয়োজনই যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ হইবে। নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টিবোধ অর্জন করিতে একটি সুস্থ পরিচ্ছন্ন ও শিক্ষিত মন চাই। লোভ পশুপ্রবৃত্তি, ইহা ক্রমেই বাড়িয়া যায়। ব্যক্তিজীবনের ক্ষয়কীট স্বরূপ এই লোভকে সীমাবদ্ধ করিবার জন্য গান্ধীজী কতকগুলি গ্রামকে এক একটি "একক" হিসাবে ধরিয়া লইয়া সেইসব গ্রামের পণ্য-উৎপাদন ও পণ্য-বণ্টন ব্যবস্থা এবং সমগ্রভাবে গ্রামসঙ্ঘ পরিচালনার ভার জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন। যে যন্ত্রশিল্প ধনতন্ত্রবাদের পোষক, গান্ধীজী ভারতের মত জনবহুল দেশে সমতার ভিত্তিতে সর্বজনীন কর্মসংস্থানের জন্য সেই যন্ত্রশিল্পের সঙ্কোচ সাধন করিয়া কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ কামনা করেন। গান্ধীজী বারবার বলিয়াছেন, শিল্প বা অর্থ দুই-ই মানুষের জন্য, মানুষ শিল্প অথবা

অর্থের চেয়ে অনেক বড়।* পাছে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ বা ব্যক্তি-সত্তার সম্যক অনুভূতি কমিয়া যায়, এজন্য জনগণের আর্থিক দুর্দশা বিদূরণের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখিয়াও গান্ধীজী দেশের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকার বিস্তারের প্রশ্নে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করিতেন। পল্লীভারতের জনগণের জীবনধারা সহজ ও সুন্দর রাখিতে গান্ধীজী গ্রামোন্নয়ন, কুটির-শিল্পের প্রসার, কৃষির উন্নতি প্রভৃতিকে তাঁহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করিয়া কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে, সমবায় ব্যবস্থার প্রসার সর্বদা কামনা করিতেন। ভারতের বিশেষ অবস্থায় গান্ধীজীর সর্বোদয় পরিকল্পনার গুরুত্ব আজ সর্বজন-স্বীকৃত। পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ হইতে শ্রীগুলজারিলাল নন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সর্বোদয়ের আভ্যন্তরীণ দর্শনের প্রভাবেই রচিত হইয়াছে।

ভারতে সর্বজনীন কর্মসংস্থান একটি প্রকাণ্ড জটিল সমস্যা। ভারতের গ্রামগুলিকে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে গান্ধীজী খাদি-আন্দোলনের ন্যায় কুটির শিল্পের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। অর্থকরী দিক ছাড়া স্বয়ং-সম্পূর্ণতার আদর্শের দিক হইতেও ভারতে খাদি আন্দোলনের বিপুল সার্থকতা আছে। বৃহৎ যন্ত্র মানুষের শ্রমশক্তির একাংশ নিষ্ফল করিয়া দেয় এবং ক্রমশঃ তাহাদের যন্ত্র করিয়া তোলে। এজন্য মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিতে ইহা গতিশীল হিংসার (Violence in Motion) প্রতিরূপ। গান্ধীজী চরখাকে "সক্রিয় অহিংসা" (Non-Violence in Action) আখ্যা দিয়াছেন। সম্প্রসারিত কুটির শিল্পে কেন্দ্রীভূত বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প অপেক্ষা বেশি লোকের কর্মসংস্থান হইবেই। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া বা ক্যানাডার মত যে সব জনবিরল দেশে বেকারদের কর্মসংস্থানের সমস্যা নাই, সেখানে যন্ত্রশিল্পের প্রসার গান্ধীজীও অপছন্দ করেন নাই (হরিজন, ১৬-১-১৯৩৪)। গান্ধীজী বলিয়াছেন, বেকার

* এসম্পর্কে ইন্দোর কংগ্রেসের (জানুয়ারী, ১৯৫৭) সভাপতির (শ্রী ইউ এন ডেবর) ভাষণের নিম্নলিখিত অংশটি প্রণিধানযোগ্য :—

"We have also to be clear that we do not think in terms of mere material prosperity. The human being is not simply a mass of matter. There is an essence in him and this essence of human existence should count far more with the human community. Socialism, in India, should therefore, lean more on the side of Gandhiji's conception of Sarvodaya, even if we cannot fully reach up to Gandhiji's conception of the new socio-economic order."

সমস্যার সমাধান ও চাষীদের সচ্ছলতা সম্পাদনের জন্য কুটিরশিল্পের ব্যাপক প্রসার বহু ব্যয় ও আয়োজন সাপেক্ষ, কাজেই ইহার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকে লইতে হইবে।

মোটের উপর, গ্রামবাসীদের স্বার্থরক্ষার ভিত্তির উপর গান্ধীজীর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত। ভারতের গ্রামগুলির অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা গান্ধীজীকে অবিরাম ব্যথিত করিয়াছে। গান্ধীজী বিশ্বাস করিতেন, গ্রামবাসীদের বা গ্রামের অবস্থা এতটা খারাপ হইবার কোন কারণ নাই, সুযোগের অভাবে তাহাদের সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না। "গঠনমূলক পরিকল্পনা" (Constructive Programme) গ্রন্থে গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্তমানে শ্রমশক্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তির যে বিচ্ছেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, গ্রামের অপরিচ্ছন্নতা তাহার অনিবার্য ফল।* তাঁহার মতে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য যদি গ্রামের লোক হইতেন (এইরূপ হওয়াই আদর্শের দিক দিয়া স্বাভাবিক ছিল) এবং তাঁহারা গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন, গ্রামের অবস্থা কখনই বর্তমানের মত এতটা শোচনীয় হইত না।

কেহ কেহ অর্থনীতির দিক হইতে শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে সংগঠিত শ্রমিকসঙ্ঘের অহিতকারী হিসাবে গান্ধীজীর সমালোচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত কম্যুনিস্ট লেখক রজনী পামি দত্ত এই দৃষ্টকোণ হইতেই তাঁহার "আজিকার ভারত" (India to-day) গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে গান্ধীজীর নিন্দা করিয়াছেন। গান্ধীজীর জীবনাদর্শ, গান্ধীজীর প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সাময়িকভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগও যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই কিন্তু গান্ধীজীর ন্যায় দীনবন্ধু সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্যের অযৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। গান্ধীজী দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, বন্ধু ছিলেন শোষিত জনসাধারণের।† কথায় কাজে বা জীবনযাপন-প্রণালীতে গান্ধীজী কখনও তাঁহার অসহায়

* 'Divorce between intelligence and labour has resulted in criminal negligence of the villages. And, so, instead of having graceful hamlets dotting the land, we have dung-heaps.'

† "জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি" গ্রন্থে অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন লিখিয়াছেন :—'গান্ধীজীর নিজের ভাষায় তাঁহার স্বরাজের ব্যাখ্যা দিতেছি :

Swaraj for me means freedom for the meanest of our countrymen. I am not interested in freeing India merely from British yoke. I am bent upon freeing India from any yoke whatsoever., I have no desire to exchange "king log for king stork."

দেশবাসীকে পরিত্যাগ করেন নাই। তবে গান্ধীজী বৈবর্তনিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিতেন এবং ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া দেশে সত্যকার কৃষাণ-মজদুর-প্রজারাজের তথা রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তাঁহাকে কখনও দেশের সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আকস্মিক বিপ্লব আনয়নের জন্য উত্তেজিত হইতে দেখা যায় নাই। ধনীদের সম্পদ সঞ্চয়ের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধনীরা শোষণ বন্ধ না করিলে একদিন সর্বহারা শোষিতের দল ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিবে। স্বাধীন ভারতে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ একটি দিনের জন্যও স্থায়ী হইবে না, ইহাই ছিল গান্ধীজীর স্বপ্ন। অবশ্য দেশের আর্থিক সঙ্গতির বিবেচনায় গান্ধীজী দেশবাসীকে অভাববোধ সীমাবদ্ধ করিবারও পরামর্শ দিয়াছেন।

"স্টেটসম্যান" পত্রিকার ১৫-৮-৫১ তারিখের স্বাধীনতা-দিবস সংখ্যায় লিখিত একটি প্রবন্ধে "ক্যাপিটেল" সম্পাদক মিঃ জিওফ্রে টাইসন্ স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেকের মত তিনিও আগে গান্ধীজীর অর্থনীতিকে মধ্যযুগীয় বা সেকেলে বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, গান্ধীজীর ভাবধারা দার্শনিক হইতে পারে কিন্তু ধনবিজ্ঞানের দিক হইতে ইহার বাস্তব-মূল্য কম। কিন্তু পরে তাঁহার সেই ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। ভারতের বিশেষ পরিবেশে এবং সীমাবদ্ধ সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক জটিলতাশূন্য ও সরল জীবনযাত্রা-কেন্দ্রিক এই অর্থনীতি সত্যই মূল্যবান। *

* গান্ধীজীর সম্পর্কে মার্কিন মনীষী রিচার্ড গ্রেগের নিম্নোক্ত মন্তব্যও এই সূত্রে প্রণিধান-যোগ্য :—

"Gandhiji's proposal does not discard machinery or science. It brings simple machinery to a now unused reservoir of man-power—the unemployed. It chooses particular machines because they are adopted to the economic and social circumstances of the mass of people and also because the use of that particular type of machinery will not create too difficult additional social and economic problems at a time when difficulties are already very great." (Richard B. Gregg—Gandhiji as a Social Scientist and Social Inventor—Mahatma Gandhi, edited by Dr. S. Radhakrishnan.)

ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা

(Economic Condition of the Masses in India)

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ হইলেও পরাধীনতা-অভিশপ্ত অনুন্নত এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ তাহার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে উল্লেখ-যোগ্য সাহায্য করে নাই। পাট বা চায়ের মত কোন কোন বড় শিল্প এদেশে গড়িয়া উঠিলেও সাধারণ ভারতবাসী সীমাহীন দুঃখদুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে।

ভারতে প্রয়োজনের অনুপাতে আশানুরূপ শিল্পপ্রসার হয় নাই। কৃষিজীবী দেশ হিসাবে কৃষি-ব্যবস্থার যেটুকু উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক ছিল, নানা কারণে তাহা হইতেও ভারতবর্ষ বঞ্চিত হইয়াছে। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে কৃষিকার্য চালাইয়া জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ইটালী, ডেনমার্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পৃথিবীর বহু দেশ উৎপাদন অনেক বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। ভারতীয় কৃষক কিন্তু এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই পুরাতন ও অবৈজ্ঞানিক কৃষি-ব্যবস্থা আঁকড়াইয়া আছে। ভারতে জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে বলিয়া কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকও ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ স্বাভাবিক নিয়মে জমির উৎপাদনের হার অনেক স্থলেই ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইতেছে। শিল্প-বাণিজ্যের লক্ষণীয় প্রসার ঘটিলে কৃষির উপর এই চাপ কমিতে পারিত। এই ভাবে ভারতে খাদ্যের ঘাটতি বাড়িতেছে এবং কৃষি-কেন্দ্রিক জাতীয় অর্থনীতির অবনতি ঘটিয়াছে। পুরাতন ও ভারগ্রস্ত কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার বিপদ অনুধাবন করিয়াই ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনায় জাতীয় অর্থনীতিকে অপেক্ষাকৃত শিল্প বাণিজ্যমুখী করিবার প্রয়াস দেখা যায়।

ভারতের ন্যায় এতখানি অসম-ধনবণ্টন পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। একদিকে একদল অর্থবান ব্যক্তি (ইঁহাদের মধ্যে প্রাক্তন দেশীয় নৃপতি বা বড় জমিদার, বড় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা আছেন) কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের মালিক, অন্যদিকে অসংখ্য দেশবাসী শুধু দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াটাকেই জীবনের চরম সৌভাগ্য মনে করে। কৃষিজীবী এই দেশের কোন অঞ্চলে কোন কারণে একবার অজন্মা বা বন্যা হইলে তো বহুলোক অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেই, স্বাভাবিক সময়েও ভারতে প্রতি

বৎসরই কিছু কিছু লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনশনে-অর্ধাশনে ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হওয়া ভারতের দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ ঘটনা।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ ভি কে আর ভি রাও ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দের বৃটিশ ভারতের জাতীয় আয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৬৫ টাকার বেশি হইবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মাথা-পিছু আয়ের হিসাবে ধনী দরিদ্র সকলকে একইভাবে ধরা হয় বলিয়া হিসাবের আয়ের চেয়ে দরিদ্র জনসাধারণের প্রকৃত আয় অনেক কম হইয়া থাকে। দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণকে মোট লোকসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে অঙ্ক দাঁড়ায়, তাহাই মাথাপিছু আয়। এক্ষেত্রে উপরি-উক্ত হিসাবে হায়দরা-বাদের নিজাম, তিনশত টাকা বেতনের একজন কেরাণী এবং প্রায় নিঃস্ব একজন ভিখারী সকলেরই মাথাপিছু আয় ৬৫ টাকা।

ডাঃ রাওয়ের এই ৬৫ টাকার হিসাব বোম্বাই পরিকল্পনায় (১৯৪৪) গৃহীত হইয়াছিল, কাজেই ইহার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। গড়পড়তা আয়ের এই অঙ্ক যে ভারতবাসীর শোচনীয় দীনতার পরিচায়ক, তাহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী হিসাবে ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় দাঁড়ায় ৬৭ টাকা (জাতীয় আয় ১৯৩৪ কোটি টাকা)। ইহার পর যুদ্ধের ফলে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং ভারতবাসীর মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক কিছুটা বাড়িলেও জীবনযাত্রার ব্যয় চতুর্গুণ হওয়ায় এই আয় বৃদ্ধিতে সত্যকার বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পণ্যমূল্যের হিসাবে দেখা যায় ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ২৪৬·৩ টাকা (জাতীয় আয় ৮,৮৫০ কোটি টাকা)। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মাথাপিছু বার্ষিক আয় ও জাতীয় আয় যথাক্রমে ২৭৩·৬ টাকা ও ১০৪৮০ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের আশা অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় ও ভারতের জাতীয় আয় যথাক্রমে ৩৩১ টাকা ও ১৩৪৮০ টাকা হইবে।*

* পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের নিম্নোদ্ধৃত হিসাব (১৯৫৭-৫৮) দেখিলেই বুঝা যাইবে ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয়ঃ—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৯৬৮০ টাকা, সুইজারল্যাণ্ড—৫৭৯৬ টাকা, নরওয়ে—৬১৫০ টাকা, নিউজিল্যাণ্ড—৫৫৭০ টাকা, ব্রিটেন—৪৫২০ টাকা, ভারত—২৮৪ টাকা।

ভারতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার বর্ধিত ব্যয় মিটাইতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসীর দুর্ভোগের সীমা নাই। সাধারণ ভারতবাসীর যে সামান্য আয়, তাহাতে শুধুমাত্র জীবন-ধারণের উপযোগী অন্নসংগ্রহ করাও কঠিন। স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা বলেন, একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ ভারতবাসীর শরীর রক্ষার জন্য দৈনিক ২৬০০ ক্যালোরী খাদ্য-প্রাণযুক্ত খাদ্য আবশ্যক।* এই খাদ্য আহারোপযোগী করিয়া তুলিতে তরকারীর খোসা, ভাতের ফ্যান প্রভৃতিতে ২০০ ক্যালোরীর মত খাদ্যপ্রাণযুক্ত খাদ্য নষ্ট হয়। দৈনিক এই ২৮০০ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য সারা বৎসর কিনিতে হইলে বর্তমান বাজারে বৎসরে অন্ততঃ ২৬০ টাকা লাগার কথা। প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই দাম এখন বেশি, তাছাড়া যুদ্ধের ফলে সাধারণ ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মানও কিছুটা বাড়িয়াছে। কাজেই ভারতবাসী এখন আর শরীররক্ষার উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা ভারতবাসী বর্তমানে মাথাপিছু দৈনিক যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহাতে বড় জোর ১৬০০ ক্যালোরী অনুসারে খাদ্যপ্রাণ মিলিতে পারে। কাজেই টাকার অঙ্কে আয় বাড়িলেও ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে একান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫১'৩ ভাগ (৪৮৯০ কোটি টাকা) কৃষি হইতে আসিয়াছিল। এখন ক্রমেই ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রসার হইতেছে বলিয়া মোট জাতীয় আয়ের শতকরা হার হিসাবে কৃষি হইতে আয় কিছুটা কমিলেও এখনও ভারতে কৃষি হইতে লব্ধ আয় মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৫ ভাগের মত হইবে। প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে এ দেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক। পরোক্ষভাবে আরও শতকরা ৯।১০ জন লোক কৃষির উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করে। কাজেই ভারতের যে কোন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির স্থান বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ।† ভারতের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত এবং লোকবাহুল্যের চাপে অত্যধিক

* বোম্বাই পরিকল্পনার হিসাব অনুসারে নিম্নলিখিত খাদ্যসমূহে সমগ্রভাগে ২৬০০ ক্যালোরী খাদ্যপ্রাণ আছে :—খাদ্যশস্য—১৬ আউন্স; ডাল—৩ আউন্স; চিনি—২ আউন্স; দুধ—৮ আউন্স; তৈল জাতীয় পদার্থ—১'৫ আউন্স; শাকসব্জি—৬ আউন্স; মাছ, মাংস ও ডিম—২'৩ আউন্স; ফল—২ আউন্স।

† কৃষি হইতে ভারতীয় অর্থনীতিকে শিল্পের উপর অধিকতর নির্ভরশীল করিতে পারিলে নিঃসন্দেহে নবযুগের প্রবর্তন হয়, কিন্তু তাহা সম্ভব হইলেও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কাজেই বর্তমানে কৃষির উন্নতির দিকে জোর না দিয়া উপায় নাই।

ভারগ্রস্ত। বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ তো হয়ই না, সমবায় পদ্ধতি প্রসারিত না হওয়ায় কৃষিকার্য পরিচালনার ব্যাপারে এবং পণ্য বাজারজাত করণের সময় কৃষিজীবিরা বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করে। ফলে বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহারা অনশনে অর্ধাশনে কাটাইতে বাধ্য হয়। ভারতে মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ১·৯৭ একর ; ইহার মধ্যে আবার কৃষি জমির পরিমাণ মাথাপিছু ·৬৯ একর। জীবিকার সচ্ছলতার প্রশ্নে মাথাপিছু জমির এই স্বল্পতা অকিঞ্চিৎকর। এছাড়া বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সমস্যা আছে। কাজেই কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি অবিলম্বে না হইলে ভারতে সত্যকার আর্থিক উন্নতি হইয়াছে বলা চলে না।

ভারতে কৃষিজীবির আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, কুটির-শিল্পীদের অবস্থাও তদ্রূপ। সমবায় আন্দোলনের প্রসার হয় নাই বলিয়া এদেশে চাষী ও কুটির-শিল্পী উভয়েই অসহায় ভাবে জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইতেছে। ইহাদের তুলনায় অবশ্য সঙ্ঘবদ্ধ যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা কিছুটা ভাল, কিন্তু ইহাদের জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলা দেখা যায় খুবই কম ক্ষেত্রে। এই-জন্য ইহাদের সচ্ছলতার প্রত্যক্ষ রূপ নাই। তাছাড়া শিল্পাঞ্চলে জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় অধিক বলিয়াও তাহাদের অসুবিধা হয়। অবশ্য তবু ইহারই মধ্যে শ্রমিকসঙ্ঘগুলির দৌলতে এবং নিম্নতম মজুরী আইন (Minimum Wages Act, 1948) বা ন্যায্য মজুরী আইনের (Fair Wages Act, 1950) ন্যায় আইনের সাহায্যে ইহাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে।

সব কিছুর সামগ্রিক বিবেচনায় ভারতে বেকারদের পর মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া-দের অবস্থাই সবচেয়ে করুণ বলিয়া মনে হয়। ইহাদের বহিরঙ্গ মর্যাদা রক্ষা করিবার দায় আছে। এবং সেজন্য কিছু খরচ করিতে ইহারা বাধ্য হয়। ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্যও তাহাদের ব্যয় হয় যথেষ্ট। আয়ের তুলনায় অনিবার্য ব্যয়ের আধিক্যের জন্য কায়ক্লেশে সংসার চালাইতে তাহাদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। "ক্যাপিটেল" পত্রিকার হিসাবে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কলিকাতার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-ব্যয়ের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০৩। তারপর আজ পর্যন্ত এই হিসাবে পরিস্থিতির মোটেই উন্নতি হয় নাই।*

* সহরবাসীর অধিকাংশই মধ্যবিত্ত এবং ইহাদের অবস্থার শোচনীয়তা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'ন্যাশনাল ইনকাম ইউনিট স্যাম্পেল সার্ভে' (National Income Unit

১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৫১ হাজার টন খাদ্যশস্য (ডালসমেত ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টন) উৎপন্ন হইয়াছে। এই বৎসর লোকসংখ্যা ৩৮ কোটি ৭৫ লক্ষ ধরিলে মাথাপিছু এ বৎসর প্রায় ৩০০ পাউণ্ড খাদ্যশস্য পড়িয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও ভারতবাসীর দারিদ্র্য কম ছিল না, কিন্তু এই বৎসর মাথাপিছু পড়িয়াছিল ৩১৮'৮ পাউণ্ড খাদ্যশস্য। ইহা হইতেই ভারতে খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাব বুঝা যাইবে। ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ডাল বাদে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টন। সেই হিসাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি লক্ষণীয়। কিন্তু ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ভারতে ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ লোক বৃদ্ধি ঘটায় খাদ্যশস্যের অভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমিতেছে না। অবিরাম লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অদূর ভবিষ্যতে ভারতের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আশা করিতে সাহস হয় না। ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার হয় নাই, এখনও মোট জনসংখ্যার হিসাবে শতকরা ৪ জন লোকও এদেশে সমবায় সমিতির সদস্য নয়, ভারতের মত কৃষিজীবী দেশের হিসাবে এই সংখ্যা শতকরা ৫০ জন হওয়া উচিত। ভারতীয় কৃষিজীবীদের ঋণের পরিমাণ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০০ কোটি টাকা ছিল, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে ১,৮০০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। কৃষকদের প্রতিবৎসর কৃষিকার্য পরিচালনার জন্য ৫০০ কোটি টাকার মত ঋণের আবশ্যক হয়। ভারতে শতকরা ৮২ ভাগের মত লোক গ্রামে বাস করে, ইহাদের এক-পঞ্চমাংশও ঋণমুক্ত নয়।

অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়,—এই তিনটি মানুষের নিম্নতম প্রয়োজন। অন্নের কথা আলোচিত হইল, এবার বস্ত্র ও বাসস্থানের কথা। এই দুইদিক হইতেও ভারতবাসীর অবস্থা শোচনীয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে কলে ৫৩৭ কোটি গজ ও তাঁতে ১৭০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। এছাড়া ৬০ লক্ষ গজ

Sample Survey) অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া দেখিয়াছেন যে ভারতের সহরগুলিতে শতকরা ৫০ ভাগ গৃহস্থের মাসিক আয় ১০০ টাকার বেশি নয় এবং মাসিক ৩০০ টাকার বেশি আয়-বিশিষ্ট গৃহস্থের সংখ্যা এই সহরগুলিতে শতকরা মাত্র ১০ ভাগ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হইতে পরিকল্পনা কমিশনের নিকট যে প্রাথমিক স্মারকলিপি পেশ করা হয়, তাহাতে বলা হয় যে, কলিকাতা মহানগরীর শতকরা ৬৬ ভাগ উপার্জনকারীর মাসিক আয় ১০০ টাকার মধ্যে এবং শতকরা ৩৬ ভাগ মাসে ৩০ টাকার বেশি উপার্জন করিতে পারে না। কলিকাতার মত শিল্প-বাণিজ্য-সমৃদ্ধ সহরে বেকারী ও অর্ধবেকারীর চাপ এইরূপ ভয়াবহ হইলে সারা দেশের অসহায় অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমদানী ও ৮৫ লক্ষ গজ রপ্তানী ধরিলেও এ বৎসর দেশবাসীর মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ ১৬·৫ গজের বেশি হয় না। ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের চাহিদা ধরিলে ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ মাথাপিছু বৎসরে ১২ গজের বেশি কাপড় ব্যবহার করিতে পায় না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ ২০ গজের মত দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা বাস্তবিকই অপ্রচুর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে বৎসরে মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৪ গজ ও ৩৫ গজ।

গৃহসমস্যার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভারতে অন্ততঃ ২৮ কোটি লোকের বাসস্থান প্রয়োজনের হিসাবে যথেষ্ট নয়।* ভারতে ১ কোটি লোকের থাকিবার কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই (ইহারা ভাড়াটিয়াও নয়) এবং অন্ততঃ ৪ কোটি লোক এমন জায়গায় বাস করে যাহা মনুষ্যবাসের উপযুক্ত নয়। ভারতের গৃহসমস্যা এরূপ সাংঘাতিক বলিয়াই বোম্বাই পরিকল্পনায় মোট ১০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে গৃহনির্মাণ খাতে ২,২০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল। ইহা পরিকল্পনার কৃষিখাতে নির্ধারিত অর্থের প্রায় দ্বিগুণ এবং শিল্পখাতে নির্ধারিত অর্থের প্রায় অর্ধেক। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ খাতে ৪৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে ১২০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ভারত সরকারের গৃহনির্মাণ উপদেষ্টা শ্রী সি বি প্যাটেলের মতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সহর এলাকায় ২৫ লক্ষ গৃহের অভাব ছিল এবং এই সংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৫৭ লক্ষে পৌঁছাইবে। ভারতের গ্রামাঞ্চলের সাড়ে পাঁচ কোটি বাসগৃহের মধ্যে পাঁচ কোটি বাড়ীরই সংস্কারের বা পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন আছে। ভারতের গৃহনির্মাণ সমস্যার আপেক্ষিক সমাধানের উদ্দেশ্যে বর্তমানে রুরকীর কেন্দ্রীয় গৃহ-গবেষণা পরিষদের (The Central Building Research Institute, Roorkey) মত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। ভারতের প্রচণ্ড গৃহসমস্যা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ এখন মধ্যবিত্ত ও স্বল্প আয়ের গৃহস্থদের গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ দিবার

* ভারতের সহরগুলিতে গৃহসমস্যা অবিরাম লোকবৃদ্ধির জন্য ক্রমেই মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে ভারতে প্রতি শতকরা ১ ভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবে সহরে লোক বাড়িতেছে শতকরা ২·৪ ভাগ।

ব্যবস্থা করিয়াছেন। এছাড়া গৃহনির্মাণ শরণার্থী-পুনর্বাসনের অন্যতম অঙ্গ। শিল্প-শ্রমিকদের বাসগৃহ-সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার বর্তমানে কারখানা কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল দিক হইতেই 'ভারতীয় জনসাধারণ দুর্গত জীবন যাপন করিতেছে। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সম্ভাবনার হিসাবে তাহাদের এই দীর্ঘস্থায়ী দুর্দশার কোন সঙ্গত কারণ নাই। পরাধীনতার আমলে বিদেশী শাসন-কর্তৃপক্ষের একটানা অবহেলার জন্যই ভারতবাসীর অবস্থা এত অসহায়। এখন ভারত স্বাধীন হইয়াছে, জাতীয় সরকার জনগণের দুঃখমোচনের ত্রুটি করিবেন না, ইহাই সকলে আশা করে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ. আশ্রয়প্রার্থী-পুনর্বাসন, সমাজ উন্নয়ন, শ্রমিক-কল্যাণ, খনি উন্নয়ন প্রভৃতি বহুবিধ কার্যসূচীসহ ভারত সরকার ভারতের বিরাট পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন।* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার যে উন্নতি সূচিত হয়, তাহা দ্বিতীয় ও পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে অধিকতর রূপায়িত হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশা করেন। সরকারী সূত্র ছাড়া বেসরকারী সূত্রেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনের আগ্রহ দেখা যাইতেছে। যদিও কর্ম-সংস্থান সমস্যার জটিলতা ভারতের উন্নয়ন-সাফল্যের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক, তথাপি সমগ্র দেশে ক্রমশঃ পরিকল্পনামুখী মনোভাবের প্রসার ঘটিতেছে বলিয়া অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি আশা করা যায়।

* এসম্পর্কে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

ভারতের লোকসংখ্যা সমস্যা

(The Problem of Population in India)

ভারতের লোকসংখ্যা অবিরাম বৃদ্ধি পাইতেছে।* ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ২০ কোটি ৬২ লক্ষ লোক ছিল, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা হয় ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে অখণ্ড ভারতবর্ষের সর্বশেষ আদমসুমারীতে লোকসংখ্যা ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষে পৌছায়। ইহার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী শুধু ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৯ হাজার দাঁড়ায়। ইহার মধ্যে আবার আসামের উপজাতি অঞ্চলের কিয়দংশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের হিসাব নাই। এই দুই হিসাবের ৪৯ লক্ষ ৭০ হাজার লোক যুক্ত হইলে ভারতের ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ। এই সময় পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪২ হাজার। বিশেষজ্ঞদের মতে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৬৯ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে লোকসংখ্যা হিসাবে চীনের (৫৫ কোটি) পরই ভারতের (৩৮ কোটি ৪০ লক্ষ) স্থান। এই বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া ও জাপানের লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ, ৫ কোটি ১২ লক্ষ, ২২ কোটি ও ৯ কোটি। অস্ট্রেলিয়ার ভূমিসম্পদ সুবিশাল, এই মহাদেশোপম দেশে এক কোটিরও কম লোকের বাস।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমাবদ্ধ বলিয়া লোকসংখ্যা ভারতের পক্ষে ভারস্বরূপ। সুযোগ-সুবিধা পাইলে ও যথাযথ ব্যবহৃত হইলে এই বিরাট জনশক্তি ভারতকে অনায়াসেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করিতে পারিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতে শ্রমশক্তির যে বিরাট অপচয় হয়, জাপান, জার্মানী, ব্রিটেন প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশের লোক তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। ভারতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইলে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি সমস্যা বলিয়াই মনে হইত না।

---

* ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ—এই ১০ বৎসরে যেখানে ভারতে ৭০ লক্ষ লোক (২৮ কোটি ৭৩ লক্ষ হইতে ২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ) বাড়িয়াছিল, ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ এই ১০ বৎসরে সেখানে ভারতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ভয়াবহ লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার এখনও চলিতেছে। ইহা মনীষী Aldous Huxley কথিত "Planetary overcrowding"-এর চিত্রই মনে করাইয়া দেয়। হাক্স্‌লির মতে বিস্ময়কর প্রতিরোধক কিছু না ঘটিলে আগামী ৩০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবার আশঙ্কা আছে।

এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সুবিপুল। শিল্পপ্রসারে এই সম্পদের সদ্ব্যবহার হয় না বলিয়াই ভারতে লোকসংখ্যা এক শোচনীয় সমস্যারূপে প্রতিভাত হয়। ভারতে শতকরা ৮২ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। কৃষিই গ্রামবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। অথচ ভারতীয় কৃষির অবস্থা এমন যে, যাহারা ইহার উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করিতেছে, তাহাদের পোষণ করাই ইহার পক্ষে অসম্ভব, নূতন লোকের চাপ বহন করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটিয়া প্রাচীন রীতির পরিবর্তন হইলে তবু অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইতে পারিত।

আর্থিক সমস্যার জন্যই ভারতের বর্তমান অবস্থাকে লোকসংখ্যার বাহুল্য বা অতিবৃদ্ধি বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা প্রকৃতই অতিবৃদ্ধি কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, কোন দেশের লোকসংখ্যা যতই বাড়ুক, সে-দেশের আহরণযোগ্য সম্পদের হিসাবে যে পর্যন্ত তাহা সাচ্ছল্যসূচক সর্বোচ্চ পরিমাণ পণ্য-উৎপাদন সীমা ছাড়াইয়া না যায়, ততক্ষণ তাহাকে বাঞ্ছনীয় সর্বাধিক লোকসংখ্যা (optimum population) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। লোকসংখ্যা ইহার চেয়ে বাড়িয়া গেলেই তাহাকে অতিবৃদ্ধি বলিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতের লোকসংখ্যা বর্তমানে যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে মাথাপিছু প্রয়োজন ও উৎপাদনের কথা একসঙ্গে চিন্তা করা নিরর্থক। ইহার উপর দেশবাসীদের মধ্যে ধনবণ্টনজনিত বিস্ময়কর বৈষম্য বর্তমান। কাজেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ লোকের দৈন্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ—এই দশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা যেক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৩ ভাগ, সেখানে খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৮ ভাগ। কাজেই ভারতের জনসংখ্যার বাহুল্য (over-population) স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

কিন্তু এই স্বীকৃতিই শেষ কথা নয়। আগেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের লোকসংখ্যা-সমস্যা লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যা নয়, কর্মসংস্থানের সমস্যা। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উতকামণ্ডে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির অর্থনৈতিক কমিশনের (Economic Commission of Asia and Far Eastern Countries) সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের কৃষি-শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনার বিবেচনায় এদেশের জনসংখ্যাকে অত্যধিক বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক কানান বলিয়াছেন, নিছক জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিপদের চিহ্ন নয়। মানুষ দুইটি হাত লইয়া জন্মায় বলিয়া তাহারা শুধু খাবার খায়ই না, খাদ্য উৎপাদনও করে। অধ্যাপক কানানের যুগে ইউরোপীয় দেশগুলিতে শিল্প-বাণিজ্যের অবিরাম প্রসার হইতেছিল বলিয়া কাজকর্ম সেযুগে সুলভ ছিল এবং সে হিসাবে তাঁহার এইরূপ মন্তব্যের দায়িত্বও বিশেষ ছিল না। তবু সমগ্রভাবে শক্তিসম্পদের দিক দিয়া তাঁহার উক্তির নিঃসন্দেহে কিছুটা মূল্য আছে। বাস্তবিক আর্থিক পুনর্গঠন সম্ভব হইলে ভারতের ন্যায় বিশাল প্রাকৃতিক-সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশে ৪০।৪৫ কোটি লোকসংখ্যাকে কিছুতেই লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি বলা চলে না। ভারতে প্রতি বর্গমাইলে ৩১২ জনের মত লোক বাস করে; পক্ষান্তরে প্রতি বর্গমাইলে বেলজিয়ামে ৭১০, ইংলণ্ডে ৭০৩, জাপানে ৫৭৯ ও জার্মাণীতে ৫০৬ জন লোক বাস করিয়া থাকে। এসব দেশ সার্বজনীন কর্মসংস্থান করিতে পারিয়াছে বলিয়াই কেহ বলে না যে এগুলিতে লোকসংখ্যার বাহুল্য ঘটিয়াছে।*

পাকিস্তান হইতে এক কোটির মত শরণার্থী সমাগমের ফলে ভারতে সম্প্রতি কিছুটা লোকবৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে ভারতে অবিরাম লোকবৃদ্ধির মূল কারণ এদেশে মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহারের আধিক্য। প্রতি হাজার জনে এদেশে বৎসরে গড়ে ২৭ জন জন্মায় আর ১২ জন মারা যায়। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাইবার যে প্রচেষ্টা সম্প্রতি চলিতেছে, তাহাতে মৃত্যুর হার আরও কমিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। (নবজাতকের মৃত্যু হইতে না দিবার ব্যাপক আয়োজন হইলেও ভারতে এখন সমগ্রভাবে লোকসংখ্যা হ্রাসের যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহারই উপায় হিসাবে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় জন্মনিয়ন্ত্রণ, শিশুবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর আন্দোলন নানা সমাজে চলিতেছে। অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথুসের জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতির যাঁহারা সমর্থক, তাঁহারা বর্তমান অবস্থায় ভারতে এই শ্রেণীর আন্দোলন অনিবার্য বলিয়া মনে করেন।) ম্যালথুস বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ কোন দেশে অন্নসংস্থানের সীমা দ্বারা

* সাধারণ ভারতবাসীর খাদ্যের দুরবস্থা সম্পর্কে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ডাঃ জে সি ঘোষ বলিয়াছেন :—

The food of the Indian population who are the "hungriest in the world in terms of calories did not exceed 2000 as against normal adult's requirements of 3000. The protein content of high biological value in their food was 5 grams as against normal requirement of 40 grams.'

সে দেশের জনসংখ্যার সীমা নির্ধারিত হইয়া থাকে এবং আনুপাতিক সম্পদবৃদ্ধি না ঘটিয়া জনসংখ্যা এই সীমা অতিক্রম করিলে ন্যায় অন্যায় যে কোন ভাবে জন-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া লোকসংখ্যা ও অন্নসংস্থানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।

ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থসদস্য স্যার জেরেমী রেইসম্যান ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতবাসীকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধিবিধান অবলম্বনের এবং ভারত সরকারকে এই উদ্দেশ্যে ক্লিনিক স্থাপনে উদ্যোগী হইবার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, লোকবাহুল্য কমাইতে না পারিলে ভারতে বড় কোন পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে না।* স্যার জেরেমীর পরামর্শের আবেদন অনস্বীকার্য। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকারও লোকবাহুল্য কমাইবার জন্য ভারতের সর্বত্র ক্লিনিক স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এজন্য ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ হইয়াছে ৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে পশ্চিম বাংলায় ৩৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯৮টি পরিবার-পরিকল্পনা সংক্রান্ত ক্লিনিক (Family Clinic) খুলিবার কথা আছে। পরিবার পরিকল্পনায় জনসাধারণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বর্তমানে সর্বভারতীয় সম্মেলনাদি হইতেছে। এরূপ সম্মেলনাদিতে যে কিছুটা সুফল ফলিতেছে তাহা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীমতী ডি রামা রাওয়ের সভানেত্রীত্বে কলিকাতায় পরিবার পরিকল্পনার সর্বভারতীয় সম্মেলনে (All-India Conference on Family Planning) জনসাধারণের মধ্যে এসম্পর্কে লক্ষণীয় ঔৎসুক্য দৃষ্টে অনুমান করা যায়।

অবশ্য আগেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের লোকসমস্যা কর্মসংস্থানের সমস্যা এবং এই সম্ভাবনাময় দেশে আশানুরূপ কর্মসুযোগ সৃষ্টি হইলে লোকবাহুল্য-সমস্যার এমনিই অনেকটা সমাধান হইতে পারে। জনসাধারণ অধিকতর শিক্ষিত হইয়া উঠিলে তাহারা এসম্পর্কে নিজেরাও কিছুটা সাবধান

* ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ 'আন্তর্জাতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্মেলনে' (International Conference on Planned Parenthood), বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জুলিয়ান হাক্সলি বলেন যে, ভারতে লোকসংখ্যা সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের উদ্ভব হইবে।

হইবে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ—এই ৫০ বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, ভারতে (ব্রহ্মদেশ ছাড়া) এই সময় লোকসংখ্যা যখন শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়িয়াছে, তখন ব্রিটেনে বাড়িয়াছে শতকরা ৫০ ভাগ, জাপানে শতকরা ৭৪ ভাগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ১৮৬ ভাগ, অস্ট্রেলিয়ায় শতকরা ১৬৬ ভাগ এবং নিউজিল্যাণ্ডে শতকরা ১৭২ ভাগ। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারত ব্যতীত বাকী দেশগুলিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কর্মসংস্থান হইয়াছে বলিয়াই এসব দেশে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ভারতের মত সমস্যা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ভারতে যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা

(Post-War Unemployment Problem in India)

ভারতে বেকার সমস্যা ক্রমেই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন বেকারেরা ছাড়া প্রতি বৎসর এদেশে ২০ লক্ষের মত লোক উপার্জনের বয়সে পৌঁছাইতেছে এবং কাজ না পাইলেই বেকার হইতেছে। ইহার উপর যাহাদের জীবনধারণের ব্যয়ের তুলনায় আয় কম বা যাহারা পূর্ণ পরিশ্রমে পূর্ণ পারিশ্রমিক লাভে সমর্থ নয়, সেইরূপ অর্ধ বা ছদ্ম বেকারও এখানে অসংখ্য। সব জড়াইয়া ভারতে বেকার-সংখ্যা কত তাহা ঠিক বলা যায় না, সরকারী ও বেসরকারী হিসাবসমূহের মধ্যে এবিষয়ে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা-কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে, এই পরিকল্পনার আমলে ভারতে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। এই সংখ্যা তাঁহারা নিম্নলিখিতভাবে নিরূপণ করিয়াছেন:— শহরাঞ্চলের আগের বেকার ২৫ লক্ষ + শহরাঞ্চলে নূতন কর্মপ্রার্থী ৩৮ লক্ষ + গ্রামাঞ্চলে আগের বেকার ২৮ লক্ষ + গ্রামাঞ্চলে নূতন কর্মপ্রার্থী ৬২ লক্ষ। অর্ধ বেকার বা ছদ্ম বেকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও বেসরকারী হিসাবে ভারতের বেকারের সংখ্যা সরকারী সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি। অধিকাংশ বেসরকারী হিসাবেই ভারতে ৩ কোটি হইতে ৪ কোটি বেকার বর্তমান। সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া ভারতে বেকারের সংখ্যা সাত কোটি বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

যে দেশের কৃষি লোক-বাহুল্যের চাপে ভারগ্রস্ত, অথচ যে দেশ শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ, সেখানেই সাধারণতঃ বেকারসমস্যা প্রবল হইয়া উঠে। ভারত কৃষিজীবী দেশ, শিল্পবাণিজ্য প্রসারিত হয় নাই বলিয়া এদেশে বহুলোক বেকার জীবন যাপনে বাধ্য হয়। ভারতে বৎসরে ৪০ লক্ষের মত লোক বাড়িতেছে, অথচ প্রয়োজনের তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইতেছে কম। ইহার ফলে ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যক ভারতবাসীকে কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিতে হইলেও চাষের কাজে সকলের শ্রমের প্রয়োজন হইতেছে না। ইহার উপর কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির অভাবে চাষের জমির বা কৃষিপণ্যের পরিমাণও বাড়িতেছে না কাজেই এদেশের সাধারণ আর্থিক দুর্গতি বাড়িয়াই চলিয়াছে।

নিতান্ত সাময়িকভাবে হইলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের বহুপুরাতন বেকার-সমস্যার কিছুটা সমাধান হইয়াছিল। যুদ্ধ উপলক্ষে সামরিক বাহিনীর বিপুল সম্প্রসারণ হয়, বহু নূতন সরকারী বিভাগ খোলা হয়, সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্ম যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। তাছাড়া সামরিক প্রয়োজনে পথঘাট নির্মাণ, পণ্য সরবরাহ ইত্যাদি কাজে অসংখ্য সাধারণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ইহাদের অনেকেই গ্রামাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। এইভাবে যুদ্ধের মধ্যে প্রায় ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়।

যুদ্ধের পরে অনিবার্যভাবেই কিছু লোক ছাঁটাই হইয়াছে এবং বহুক্ষেত্রে শ্রমসঙ্ঘের আন্দোলনের ফলে ছাঁটাই বন্ধ থাকিলেও উদ্বৃত্ত লোকগুলির জন্য দীর্ঘকাল নূতন লোকনিয়োগ স্থগিত থাকে। ইহার উপর পাকিস্তান হইতে নিঃস্ব যে হতভাগ্যের দল আসিয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই কর্ম-সংস্থানে বিলম্ব চলে না। এদিকে যুদ্ধোত্তরকালে নানা অসুবিধায় শিল্প-বাণিজ্যের আশানুরূপ প্রসার হইতেছে না। সুতরাং বেকারসমস্যা ক্রমে ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতে বেকারসমস্যার রূপ কত সাংঘাতিক, তাহা বেকারসমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির (Employment Exchanges) হিসাবদৃষ্টে অনুমিত হইবে। এই কেন্দ্রগুলি (তখন ইহাদের সংখ্যা ছিল ১৭২) হইতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এগারো মাসে মোট ১,৭৯,২০৬ জনের কাজ যোগান হইয়াছিল, কিন্তু ঐ নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে কেন্দ্রসমূহের রেজেষ্টারী

বহিতে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৬,০৫৮,৭১।* বলা বাহুল্য, অপেক্ষাকৃত যোগ্য লোকেরাই এসব কেন্দ্রে নাম রেজেষ্ট্রি করে, দেশের অশিক্ষিত অসহায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ অধিবাসী এসব কর্মসংস্থান কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগই করিতে পারে না। কাজেই যোগ্যতর ব্যক্তিদের যখন এই অবস্থা, সাধারণ শ্রেণীর বেকারদের শোচনীয় অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। বেকার থাকিলে মানুষ নিজের কর্মশক্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরাও অসহায়তার সুযোগ লইয়া তাহাদের নিজস্বার্থে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারে। ইহাতে দেশে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। আপন কর্মশক্তি নিয়োগের পথ সন্ধানে ব্যর্থকাম ব্যক্তিকেই বেকার বলে। উপার্জন উপযোগী লোকের উপর গড়ে তিন জনের মত নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং এদেশে প্রতিটি বেকার বাড়িয়া যাওয়ার অর্থ প্রায় চারজন লোকের জীবনধারণ অনিশ্চিত হইয়া যাওয়া। যাহারা উপযুক্ত কাজ পায় নাই, সেই সব অর্ধবেকারের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা আংশিকভাবে দেখা দেয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যা সমাধানে সরকারী বে-সরকারী যে কোন আন্তরিক প্রয়াসেরই এখন নিজস্ব মূল্য আছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিসংস্কার এবং শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ ও সেই সঙ্গে কর্মীদের কারিগরি শিক্ষার বিশেষ সুবিধাদান,—অর্থাৎ কর্মসংস্থানে নূতন নূতন পথ খুলিয়া দিবার জন্য এখন সর্ববিধ চেষ্টা করিতে হইবে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জসমূহের রিপোর্টেই দেখা যায় ভারতে কেরাণী বা সাধারণ

---

* **ভারতের কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির পরিসংখ্যান**

সময়	এই সময় অন্তে কেন্দ্রের সংখ্যা	এই সময়ের রেজেষ্ট্রিকৃত সংখ্যা	কর্মসংস্থান সংখ্যা
১৯৫০	১২৩	১২,১০,৩৫৮	৩,৩১,১৯৩
১৯৫১	১২৬	১৩,৭৫,৩৫১	৪,১৬,৮৫৮
১৯৫২	১৩১	১৪,৭৬,৬৯৯	৩,৫৭,৮২৮
১৯৫৩	১২৬	১৪,০৮,৮০০	১,৮৫,৪৪৩
১৯৫৪	১২৮	১৪,৬৫,৪৯৭	১,৬২,৪৫১
১৯৫৫	১৩৬	১৫,৮৪,০২৪	১,৬৯,৭৪০
১৯৫৬	১৪৩	১৬,৬৯,৮৯৫	১,৮৯,৮৫৫
১৯৫৭ (১১ মাসের হিসাব)	১৭২	১৬,০৫,৮৭১	১,৭৭,২০৬

শ্রমিকের অপ্রাচুর্য না থাকিলেও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত বা বিশেষ ধরণের কাজের উপযুক্ত লোকের অভাব আছে। শুধু ভারতই নয়, সারা পৃথিবীই এখন বেকার সমস্যার চাপে অল্পবিস্তর বিপন্ন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (I. L. O.) ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ ডেভিড্ মস্ পৃথিবীর সমস্ত দেশের শাসনকর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে লিখিত এক বিবৃতিতে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, সব দেশেই অদূর ভবিষ্যতে বেকার-সমস্যা ব্যাপক হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া সকলেরই উচিত সময় থাকিতে সতর্ক হইয়া অর্থ নৈতিক উন্নতিমূলক পরিকল্পনা সত্বর কার্যকরী করা। অন্য দেশের সাহায্য পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু বর্তমান সঙ্কটকালে বিদেশী-সাহায্য-নিরপেক্ষভাবেই ভারতকে আত্মনির্ভরশীল হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশের বেকার সমস্যার সমাধান শাসনকর্তৃপক্ষের কৃতিত্বের অনুপূরক, সে হিসাবে ভারত সরকারের জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রবল প্রতিবন্ধক এই বেকার সমস্যার সমাধানে যত্নপর হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী মূল পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান নীতি সাধারণ ভাবে স্থান পায় এবং আশা করা হয় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হইবে। ইহার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আগ্রায় মিলিত হইয়া দেশের বেকার সমস্যার বৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বেকার সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ ও দ্রুত সমাধানের কার্যকরী উপায় উদ্ভাবনের উপর বিশেষ জোর দেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এমন মতও প্রকাশ করেন যে, যে সকল রাজ্যে বেকার সমস্যা তীব্রতর, প্রয়োজন হইলে সেগুলিকে অর্থসাহায্য দিয়াও সমস্যার চাপ কমাইতে হইবে। অতঃপর এ সম্পর্কে রাজ্যসরকারসমূহের পরামর্শ নেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজ্যসরকার অনেক প্রস্তাব পাঠান। পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যসরকারসমূহের ৩১৩টি প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিতে মোট ৭৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। প্রধানতঃ বেকার সমস্যা হ্রাসের উদ্দেশ্যেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পুনর্বিবেচিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

দুঃখের বিষয়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান আশাপ্রদ হয় নাই। যে দেশে বৎসরে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোক কাজের বয়সে পৌঁছায়, সেই

বেকার-সমস্যাক্লিষ্ট দেশে পাঁচ বৎসরে মাত্র এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান মোটেই যথেষ্ট নয়, তদুপরি সরকারীভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আশাকৃত ১ কোটির স্থলে প্রকৃত কর্মসংস্থান হইয়াছে মাত্র ৪৫ লক্ষ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সরকারী হিসাবেই কাজের প্রয়োজন ১ কোটি ৫৩ লক্ষের (এ হিসাব প্রকৃত সংখ্যার কম বলিয়া অনেকের ধারণা), অবস্থা দেখিয়া মনে হয় মূলধন আত্যন্তিক হইবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বড় জোর ৭৫ লক্ষ লোকের জন্য নূতন কর্মসংস্থান হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিকল্পনা কমিশন তাঁহাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় এই ৫ বৎসরে ৯৫ লক্ষ ৩ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের এই নৈরাশ্যজনক দিক দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত এই দেশে গভীর হতাশার সৃষ্টি করিয়াছে এবং চতুর্দিক হইতেই দাবী উঠিয়াছে পরিকল্পনাক্ষেত্রে কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হউক। যে সব পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান স্বল্পমেয়াদী, সেখানে কাজ ফুরাইয়া ছাঁটাইয়ের বিড়ম্বনা বন্ধ করিতে উদ্বৃত্ত লোকগুলিকে অন্য কোন কাজ দিবার পরিকল্পনা বর্তমানেই করিতে হইবে বলিয়াও দাবী করা হইতেছে।

ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ বর্তমান অবস্থায় বেকারত্ব হ্রাসে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছেন। অবশ্য এই বিরাট সমস্যার যথাসত্বর সমাধান হইলে তাঁহাদেরই যে সর্বাধিক আনন্দিত হইবার কথা, তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই ভারত সরকার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ দ্বারা কর্মসংস্থানের চেষ্টার গুরুত্ব দিয়া এক্সচেঞ্জ-ব্যবস্থা স্থায়ী করিয়াছেন। এক্সচেঞ্জগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনা হইতে স্থানীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজ্যসরকারসমূহের হাতে দেওয়াও এই নীতিরই পরিপূরক। রেল ও ডাকবিভাগ ছাড়া অন্য সরকারী বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শূন্যপদ বর্তমানে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ পূরণ করা হইতেছে। আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এইভাবে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সাহায্য লইতে স্বীকৃত করা সরকারের নীতি। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইতেছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে ভারতের এইরূপ কেন্দ্রের (এক্সচেঞ্জের) সংখ্যা ছিল ৪৩, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহা যথাক্রমে ১৭২ ও ২৫২ হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা ২৬৯ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধকালে সংগৃহীত উদ্বৃত্ত লোকদের ছাঁটাই সম্পর্কে ভারতে উদারনীতি অনুসৃত হইয়াছে। স্বর্গত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বরাষ্ট্রসচিব থাকার সময় এসম্পর্কে যে সরকারী নীতি ঘোষিত হইযাছিল, তাহার মূল ধারাগুলি নিম্নরূপ :—

(১) পুনরাদেশ পর্যন্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কোন শূন্যপদে লোক লওয়া হইবে না। (২) কোন শূন্যপদে লোকনিয়োগ প্রয়োজন হইলে তাহাতে বাহির হইতে নূতন লোক লওয়া হইবে না। (৩) ছাঁটাই করা লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া রাখা হইবে এবং সুযোগ মিলিবামাত্র তাহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করা হইবে। (৪) ছাঁটাই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার সময় কৃতিত্ব ও কতদিন চাকুরী হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা হইবে। (৫) যুদ্ধের সময় কাহাকেও যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি না দিয়াই নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে স্থায়ী-ভাবে বহাল থাকিবার যোগ্যতা না থাকিবার ক্ষেত্রে তাহাকে প্রথমে নিম্নতর বেতন পর্যায়ে (Lower grade) নামাইয়া দেওয়া হইবে। (৬) উদ্বাস্তু সরকারী কর্মচারী ও তপশিলী চাকুরিয়াদের স্বার্থ বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে।

ভারতের প্রাক্তন অর্থসচিব ও ভারতীয় কর তদন্ত কমিশনের (Taxation Enquiry Commission) সভাপতি ডাঃ জন মাথাই বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাসের জন্য নিম্নলিখিত বিধিব্যবস্থাগুলি প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছিলেন :—

(১) ইনজিনিয়ারিং ও অনুরূপ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে উদ্বৃত্ত নিয়োগ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত ত্বরান্বিত করিতে হইবে। (২) রেলপথ, দেশরক্ষা এবং উৎপাদন বিভাগকে আগামী কয়েক বৎসর ইনজিনিয়ারিং সংক্রান্ত ও অন্যান্য সাধারণ যন্ত্রপাতি ভারত হইতে ক্রয় করিবার কর্মতালিকা গ্রহণ করিতে হইবে। (৩) বৈদেশিক বিনিময়ের প্রশ্ন না থাকিলে আমদানী দ্রব্যের উপর যথাসম্ভব উচ্চহারে শুল্ক বসাইতে হইবে। (৪) যাহাতে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থ নিয়োজিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৫) শিল্পসমূহ যাহাতে অধিকসংখ্যক লোককে কাজ দিতে পারে, তজ্জন্য আর্থিক বিধিনিষেধ যথাসম্ভব শিথিল করিতে হইবে। (৬) ছাঁটাইয়ের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বেকার জীবনের লাঞ্ছনা এবং বেকারের উপর-নির্ভরশীলদের অসহায়তার বিবেচনায় কেহ কেহ ভারতে বেকার ভাতা প্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ

করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দেশ সমৃদ্ধ হইলে এবং বেকারের সংখ্যা কম হইলে এই ভাতা প্রদানের নীতি সত্যই ভাল, কিন্তু বর্তমানে ভারতের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রবর্তনের আর্থিক দায় বহন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে।

মোটের উপর, আগে অবস্থা যাহাই হউক, এখন জনসাধারণের চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরীলাভের সুযোগ-সুবিধা সর্বজনীন হওয়া দরকার। এজন্য সমগ্রভাবে এদেশে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করিতে হইবে। ভারতীয় অর্থনীতির কৃষি হইতে শিল্পের দিকে ঝুঁকিবার যে প্রবণতা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখা গিয়াছে, তাহা যত দ্রুততর হইবে, ততই বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের উপর জোর না দিয়া এখনও পর্যন্ত ইহাকে মূলধন-আত্যন্তিক রাখা হইয়াছে বলিয়া নীতির পরিবর্তন না ঘটিলে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তৃতীয় বা তৎপরবর্তী পরিকল্পনার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। বলা নিষ্প্রয়োজন, বেকারের কাজ পাওয়া এমনই এক সমস্যা যে, তজ্জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত দীর্ঘ অপেক্ষা করা খুবই কষ্টকর। দেশের স্থায়ী আর্থিক ভবিষ্যৎ গঠনের দিকে অধিক নজর দিয়া পরিকল্পনা কমিশন যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন,* তাহার মূল্য অস্বীকার্য নয়, তবে প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভয়াবহ বেকার সমস্যার লক্ষণীয় সমাধান না হইলে দেশবাসীর কাছে পরিকল্পনার গৌরব বহুলাংশে ম্লান হইয়া যায়।

ভারতে বেকার সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে শেষ কথা হইতেছে, এই জনবাহুল্য-কণ্টকিত দেশে যে কোন উপায়ে নূতন নূতন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করিতেই হইবে। এই সঙ্গে শ্রমশক্তির বাড়তি মূল্যের শোষণ বা প্রান্তীয় মুনাফাভোগের যে ধনতান্ত্রিক নীতি বর্তমানে এদেশে চলিতেছে, তাহার সংস্কার না হইলে সকলের অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থার আশা সত্যই সুদূরপরাহত। পরিকল্পনা

* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলনীতিতে বলা হইয়াছে :—

"The principal objective of the Second Five Year Plan is to secure a more rapid growth of national economy and to increase a country's productive potential in a way that will make possible accelerated development in the succeeding plan periods. Immediate needs have to be met, but it is essential to think in terms of the more long range dividends that a big and bold programme of development has to offer . . . The Second Five Year Plan has to increase the flow of goods and services available and also to carry forward the process of institutional change."

এরূপ বলিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে কর্মসংস্থান যতটা সম্ভব স্থায়ী হয়। স্থায়িত্ববিহীন কর্মসংস্থান সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খলা কমাইতে পারে, কিন্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে স্থায়িত্বের প্রশ্ন উপেক্ষা করা চলে না। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এদেশে নূতন মূলধন সৃষ্টির ব্যাপক পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাও একই সঙ্গে করিতে হইবে।

ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি
(India's Food Position)

ভারতে শতকরা ৮০ জনের মত লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে (প্রত্যক্ষভাবে শতকরা ৭০ জনের মত) জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে, কিন্তু এদেশের কৃষি-ব্যবস্থা জাতীয় গুরুত্বের হিসাবে মোটেই উন্নত নয়। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য পরিচালিত হয় না বলিয়া এদেশে শস্য উৎপাদনের তুলনামূলক হার অনেক কম। শ্রীমান নারায়ণ অগ্রবাল তাঁহার "দি গান্ধীয়ান প্ল্যান" গ্রন্থে (পৃঃ ৬২) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতি একর জমিতে উৎপাদনের নিম্নলিখিত হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিসাবটি পুরাতন হইলেও অবস্থা প্রায় একইরূপ আছে বলিয়া ইহা হইতেই ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির শোচনীয়তা মোটামুটি উপলব্ধি করা যাইবে :—

প্রতি একর জমিতে উৎপাদন
(পাউণ্ড হিসাবে)

দেশ	ধান	গম	ইক্ষু	তুলা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২,১৮৫	৮১২	৪৩,২৭০	২৬৮
জাপান	৩,৪৪৪	১,৭১৩	৪৭,৫৩৪	১৯৬
মিশর	২,৯১৮	১,৯১৮	৭০,৩০২	৫৩৫
চীন	২,৪৩৩	৯৮৯	—	২০৪
ভারত	১,২৪০	৬৬০	৩৪,৯৪৪	৮৯

পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পূর্বে অখণ্ড ভারতবর্ষেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও প্রয়োজনে সামঞ্জস্য ছিল না এবং শেষ দিকে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টন উৎপাদন করিয়াও ভারতবর্ষকে বৎসরে ১৫ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত। প্রকৃতপক্ষে ভারতে সামগ্রিক খাদ্যাভাব না হইলে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ৩৫ লক্ষ লোকক্ষয়কারী মন্বন্তর অতখানি ভয়াবহ হইতে

পারিত না। পাকিস্তান হওয়ার পর ১ কোটি ২০ লক্ষ টন উৎপাদন পাকিস্তানে চলিয়া গেলে ভারতের ঘাটতি হয় ৩০ লক্ষ টনের মত। ইহার পর প্রায় ১ কোটি শরণার্থী পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে এবং ভারতে স্বাভাবিক ভাবে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক বাড়িতেছে। কাজেই ভারতের অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকারকে খাদ্যশস্য সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে যে খাদ্যশস্য নীতি নির্ধারণ কমিটি (Food-grains Policy Committee) গঠিত হয়, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত রিপোর্টে সেই কমিটি ভারতে বৎসরে ৪৫ লক্ষ টন খাদ্য-ঘাটতির কথা বলিয়াছিলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান অত্যধিক অভাবের চাপে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির শোচনীয়তা দূর হয় নাই। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই শাসন-কর্তৃপক্ষ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবসান ঘটান। তারপর অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মূল্য এবং যোগানের অবস্থা এখনও যেরূপ, তাহাতে মনে হয়, সর্বজনীন করিতে পারিলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এদেশে স্থায়ী হইলেই ভাল হয়।*

ভারতে খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাবের জন্য যুদ্ধের সময় হইতে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া যাওয়ায় প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার মূলপণ্য ও ভোগ্যপণ্য আমদানির যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছে। ইহার উপর বিদেশী খাদ্যশস্য এ দেশবাসীকে বিক্রয় করিতে সরকারকে লোকসান দিতে হইয়াছে অনেক টাকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে খাদ্যসম্পর্কে সাহায্য বাবদ ২০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা দেন। খাদ্যবরাদ্দ প্রথা প্রচলিত হইবার পর ভারত সরকার বিদেশ হইতে নিম্নোক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করেন :—১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টন; ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯ লক্ষ টন; ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১ লক্ষ টন; ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ লক্ষ

---

* অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সুবিধা দেশের সকলেরই পাওয়া দরকার। ভারতের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় অসহায় দরিদ্র গ্রামবাসীর তুলনায় সহরের লোক অধিকতর উপকৃত হইয়াছে বলিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতে অনুসৃত বরাদ্দ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

টন ; ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ লক্ষ টন : ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩৭ লক্ষ টন , ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ লক্ষ টন ; ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ লক্ষ টন * ; ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ লক্ষ টন ; ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০ লক্ষ টন ; ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৮ লক্ষ টন ; ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ লক্ষ টন এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ লক্ষ টন। ভারতে ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ১৬২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৫ লক্ষ ৮২ হাজার টন (চাউল ৭·৪ লক্ষ টন) এবং ১২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩১ লক্ষ ৭৩ হাজার টন (চাউল ৩·৯ লক্ষ টন) খাদ্যশস্য আমদানী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেই বর্তমানে ভারতের খাদ্যসঙ্কট কমাইবার উদ্দেশ্যে সর্বাধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হইতেছে। খাদ্যশস্য আমদানি বৃদ্ধি করিলে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক বৈদেশিক পণ্য আমদানির অসুবিধা ঘটিতে পারে, এইজন্য সুদের অধিকতর দায়িত্ব লইয়াও ভারতসরকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণের হিসাবে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানির চেষ্টা করিতেছেন। ভারত সরকার ভারতে একটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার গঠনের সংকল্প করিয়াছেন। খাদ্যশস্য লইয়া মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীরা যাহাতে সঙ্কট সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য ভারত সরকার খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।† সারা দেশে খাদ্য-বণ্টনে সমতা আনিবার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ ন্যায্যমূল্যের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। সরকার যাহাতে বাজার হইতে গড় মূল্যে (average price) খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের (Essential Commodities Act) সংশোধন করা হইয়াছে। ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার

---

* ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ লক্ষ ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে ভারতকে ২১৬ কোটি টাকা মূল্যস্বরূপ দিতে হইয়াছিল। এত বিদেশী মুদ্রা খাদ্যক্রয়ে চলিয়া গেলে ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনে অসুবিধা হওয়াই স্বাভাবিক।

† ভারতে খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ লক্ষ্ণৌতে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"...... it had become necessary because no Government could tolerate certain people gambling and creating hardships for the masses by increasing and decreasing prices of commodities at their sweet will."

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীঅশোক মেটার অধিনায়কত্বে উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন একটি কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) নিয়োগ করেন। এই কমিটি নানা গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসহ বলেন যে, সেচের কর ব্যয়ের ভিত্তিতে না করিয়া জনকল্যাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত এবং খাদ্যশস্যের মজুত যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো দরকার। মেটা-কমিটি বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার আমদানীর উপরও গুরুত্ব দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দেশে যাহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, তজ্জন্য ভারত সরকার কংগ্রেসের ভূমিসংস্কারের তথা যৌথ খামারের নাগপুর প্রস্তাব (জানুয়ারী, ১৯৫৯) মানিয়া লইয়াছেন।

শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে খাদ্যাভাব চলিতেছে। ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কিছুটা আশ্বাসজনক মনে হইয়াছিল (সরকারী মতে এই পরিকল্পনাকালে প্রকৃত উৎপাদন বাড়িয়াছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টন, লক্ষ্য ছিল ৭৬ লক্ষ টন), কিন্তু তাহা যে স্থায়ী হয় নাই, বর্তমান বাজারের অবস্থা দেখিয়াই তাহা অনুমান করা যায়। ভারতবাসীর মাথাপিছু অপ্রচুর খাদ্যহারের হিসাবও এই প্রসঙ্গে ধর্তব্য। দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা স্বাভাবিক হইলে ভারতের খাদ্যাভাব অবশ্যই তীব্রতর হইত।

সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের সময় হইতেই খাদ্যশস্যের অভাব চলিতেছে বলিয়া কোন দেশের পক্ষেই বিদেশ হইতে ন্যায্য মূল্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যসংগ্রহ সম্ভব নয়। তবু বাংলার ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর আমদানির দ্বারা এদেশের খাদ্যসমস্যা কমাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে খাদ্যমিশন পাঠান তাহাতে লক্ষণীয় ফল হয়। ভারতের সঙ্কটকালে আন্তর্জাতিক গম সংস্থা (Internationl Wheat Council) ভারতকে-যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এখন অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে আসিয়াছে, এসময় ভারতের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও সমাজ উন্নয়নের হিসাবে শুধু সরকারী খাতেই ৫৬৮ কোটি টাকা (কৃষি খাতে ৩৪১ কোটি টাকা) ধরা হইয়াছে এবং আশা করা হইয়াছে যে, ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় এই পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদন ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি

পাইয়া ৮ কোটি ৪ লক্ষ টনে পৌঁছাইবে। এই আশা যাহাতে কার্যকরী হয়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা দরকার। অবশ্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত যদি দেশের লোকসংখ্যা অবিরাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। সে জন্য ভারতে এখন জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক চেষ্টার আবশ্যকতা আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সহিত যত বেশি পরিমাণ পতিত বা অকর্ষিত জমিতে চাষ হয় ততই মঙ্গল। আশার কথা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য জোর দেওয়ার কথা বর্তমানে বিশেষভাবে চিন্তা করা হইতেছে। ভারতে কীটপতঙ্গের উৎপাতে বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য নষ্ট হয়, একটু সাবধানতার সহিত চেষ্টা করিয়া এই অপচয়ের কিছুটা অবশ্যই বন্ধ করা দরকার।

মোটের উপর অবস্থা অস্বস্তিজনক হইলেও উপযুক্ত চেষ্টা ও আগ্রহ দেখা গেলে ভারতের খাদ্যসঙ্কট বিদূরিত হইতে পারে বলিয়া বহু বিশেষজ্ঞ মত-প্রকাশ করিয়াছেন।* জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে এখন খাদ্য আমদানি কমাইয়া যন্ত্রাদি ও প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানিতে ভারতের সীমাবদ্ধ বৈদেশিক তহবিল নিয়োগ করিতে হইবে। কাজেই সরকারী ও বে-সরকারী উভয় দিক হইতেই দেশের খাদ্যপরিস্থিতির উন্নতি সাধনে যে কোন প্রচেষ্টা এখন মূল্যবান।

* দিল্লীতে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক খাদ্যসচিব সম্মেলনে তৎকালীন খাদ্যসদস্য শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

I have no doubt that, with determined effort backed by adequate financial support and organisational efficiency, India can before long free itself from anxiety in regard to food. But to enable India to achieve this result, agriculture must be allowed to come into its own and receive the priority it deserves on our nation's plans. Agricultural wealth is the basis of our industrial activity and national prosperity.

ভারতে পণ্যমূল্য

(General Price Level in India)

যুদ্ধের মধ্যে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি বন্ধ হওয়ায় এবং বাজারের পরিমিত পণ্যের উপর চাহিদার চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে প্রায় সকল প্রকার পণ্যেরই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ডিসেম্বর মাসে ভারতে পণ্যসাধারণের মূল্য সেপ্টেম্বরের তুলনায় শতকরা ৩৬ ভাগের মত বাড়িয়া যায়। এই পণ্যমূল্যবৃদ্ধি অবশ্য অপ্রত্যাশিত যুদ্ধের আতঙ্কে হইয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যেই বাজারের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া আসে। এই স্বাভাবিক ভাব সারা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বজায় ছিল।

ভারত এখনও যে পণ্যমূল্যবৃদ্ধির চাপে বিপন্ন, তাহা সুরু হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার বিবরণী অনুসারে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের পাইকারী মূল্যের সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে এই সময় ইহা ১০৯'৭ হয়। ইহার পর হইতে এই সূচকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪২৪'২ হয়।

১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মূল্যহারের সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিয়া বর্তমানে যে সরকারী হিসাব করা হইতেছে, তাহাতে দেখা যায় এ হিসাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের মূল্য বাড়িয়াছে নিম্নরূপ :—আগষ্ট, ১৯৫৭—১১৩'১ ; ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮—১০৪'১ ; আগষ্ট, ১৯৫৮—১১৬'৩।

যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ভারত-সরকার যদি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কঠোরতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ পণ্যমূল্য এরূপ আয়ত্তাতীতভাবে বাড়িতে পারিত না। যুদ্ধের মধ্যে ভারত সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে অবহেলা করিয়া বাজারে প্রতিযোগী পণ্যক্রেতার ন্যায় আবির্ভূত হন। সরকারের নীতি লক্ষ্য করিয়া ব্যবসাদাররা মুনাফা লুটিবার এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িয়া দেয় নাই। ফলে যোগান ও চাহিদার অসামঞ্জস্যের জন্য পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি যা হইবার হইয়াছে, তাছাড়া মুনাফাবাজ ব্যবসাদারদের জুলুমে ও চোরাকারবারের চাপে মূল্যরেখা আরও উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ভারত-সরকার ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর হইতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরস্পর ছয়টি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন আহ্বান করেন, কিন্তু ইহার ফলে স্থায়ী উপকার বলিতে গেলে কিছুই হয় নাই। সরকারের এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ এই যে,

যাঁহাদের হাতে পণ্যনিয়ন্ত্রণের ভার ছিল, তাঁহাদের যোগ্যতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই এবং পণ্যাদির মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষিত হয় নাই। তাছাড়া পণ্য যোগান ব্যবস্থা নিশ্চিত না করিয়াই সরকারী কর্তৃপক্ষ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার ফলে বাজারে প্রভূত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল।*

যাহা হউক, যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধজনিত দুঃখদুর্দশা ভোগ করা তবু কতকটা স্বাভাবিক, কিন্তু যুদ্ধ থামিবার পরেও বৎসরের পর বৎসর দেশবাসীর পণ্যাভাব ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধিজনিত দুর্দশা ভোগ নিঃসন্দেহে দুঃখের। যুদ্ধ থামিবার পর সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখনও অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশৃঙ্খলা, কোরিয়ার যুদ্ধ, শরণার্থী সমাগম, সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ঘাটতি ব্যয়,—নানা-কারণে পণ্যের বাজারের উপর চাপ আর কমিতেছে না। খাদ্য মানুষের প্রধানতম প্রয়োজনীয় বস্তু, খাদ্যমূল্যের মানের উপর দেশের পণ্যসাধারণের মূল্যমান অনেকটা নির্ভরশীল। ভারতে খাদ্যমূল্য এখনও যুদ্ধের আগের তুলনায় চতুর্গুণ রহিয়াছে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যহারের সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ থামিবার সময় ইহা ২৪৪ হয়। যুদ্ধাবসানে কমিবার পরিবর্তে অন্যান্য পণ্যের মত খাদ্যদ্রব্যের সূচকসংখ্যা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪০৬ হইয়াছিল।

শিল্পের কাঁচা মাল ও শিল্পজাত পণ্যের অবস্থাও এইরূপ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পাইকারী মূল্যের সূচকসংখ্যা উভয়ক্ষেত্রেই ১০০ ধরিলে ইহাদের মূল্যহার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যথাক্রমে ৫১৪ ও ৩৮৪ দাঁড়ায়। একবৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই মূল্যহার ছিল যথাক্রমে ৪৬৪ ও ৩৭৫।

---

* এ সম্পর্কে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের তৎকালীন বাণিজ্যসদস্য নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় নিম্ন লিখিত যে পরামর্শ দেন, ভারত সরকার সে সম্পর্কে আশানুরূপ অবহিতি দেখাইলে পরিস্থিতি অবশ্যই কিছুটা উন্নতি হইত :—

"It is clear that so long as the controlling authority does not control the supply of commodities and their distribution and it is not in a position to sell in the market large quantities through recognised trade agencies at the controlled rates, the legal maximum cannot be made effective over a large range of the market. Control over supplies and distribution are, therefore, essential and vital corrolaries to effective price control."

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সূচকসংখ্যার ভিত্তি ধরিয়া মূল্যহার স্থিরী-করণ প্রায় অর্থহীন হইয়া উঠায় ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিয়া বর্তমানে ভারত-সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তর বিভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণ করিতেছেন। এই হিসাবেও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হার কিরূপ ক্রমবর্ধমান তাহা নিম্নের সংখ্যাগুলি হইতে বুঝা যাইবে :—

(১৯৫২-৫৩=১০০)

	ডিসেম্বর, ১৯৫৭	ডিসেম্বর, ১৯৫৮
খাদ্যশস্য	১০৪	১১৩
যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য	১০৮	১০৮
সর্ববিধ নিত্যব্যবহার্য পণ্য	১০৭	১১১

ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার হিসাবে পণ্যমূল্যের উপরোক্ত সংখ্যাগুলি এমনিই আতঙ্কজনক, তাহার উপর ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কর্তৃক সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংগৃহীত বলিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বত্র ইহা স্থানীয় হিসাবে বাস্তব নয়। কতকগুলি অঞ্চলে দর ইহার তুলনায় কম, আবার কতকগুলি অঞ্চলে আনুপাতিকভাবেই বেশি। তাছাড়া সরকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যতালিকা বা পাইকারী দর হিসাবে সূচকসংখ্যা নির্ধারণ করেন। জনসাধারণ খুচরা দ্রব্যাদি কেনে, বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদিগকে পাইকারী মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যই দিতে হয়। এদেশে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জিনিসপত্র সংগ্রহ করা কয়জন লোকের পক্ষে সম্ভব? মুনাফাবাজদের উৎপাতে ও সরকারী উদাসীনতায় এদেশে পণ্যাদি নিয়ন্ত্রিত হইলেই অনেকক্ষেত্রে বহুপরিমাণ পণ্য কালোবাজারে অন্তর্হিত হয়। এ হিসাবে নিয়ন্ত্রিত মূল্য ধরিয়া সূচকসংখ্যা নির্ধারণ করিলে জনগণের সাধারণ ক্রয়মূল্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কেমন করিয়া হইবে? সুতরাং উপরের সূচকসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া দেশবাসীর দুর্দশা সম্পর্কে যতটা অনুমান করা সম্ভব, এদেশের সাধারণ লোকের দুর্দশা তাহার চেয়ে বেশি।

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, অনেকে যুদ্ধোত্তর শ্রমিক বিশৃঙ্খলা, আন্তর্জাতিক অনিশ্চিত অবস্থা, শরণার্থী সমস্যা, পাক-ভারত হৃদ্যতার অভাব, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তজ্জনিত ঘাটতি ব্যয়ের চাপ ও মুদ্রাস্ফীতি,—এইরূপ কয়েকটি কারণের উপর ভারতের পণ্যাভাব তথা পণ্যমূল্যবৃদ্ধির দায়িত্ব চাপাইয়া দিতে চাহেন। অবশ্য এসব যে পণ্যবাজারে শান্ত আবহাওয়া ফিরিয়া আসিবার

পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তি এই নিদারুণ অবস্থার জন্য অবশ্যই বহুলাংশে দায়ী।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের সহিত পণ্যমূল্যহ্রাসের সম্পর্ক আছে। ভারতে মুদ্রাস্ফীতি কমাইবার জন্য সময়ে যথেষ্ট চেষ্টা হয় নাই। দরিদ্রদের আর্থিক সুবিধা দিবার ব্যবস্থা এদেশে কদাচিৎ হইয়াছে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের লক্ষণীয় প্রসার হইলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হইত এবং পণ্যসচ্ছলতায় পণ্যমূল্য অবশ্যই কমিয়া যাইত। এই সঙ্গে বিদেশ হইতে খাদ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্য অধিক পরিমাণে আমদানী করিতে পারিলে অবস্থার উন্নতি হইত। সারা দেশে সর্বজনীন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কঠোরভাবে চালু হইলেও এদিক হইতে বহু সাফল্যের আশা ছিল।* আয়কর তদন্ত কমিশন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে ১২১ কোটি টাকার আয়করযোগ্য গোপন আয়ের হিসাব ধরিয়াছেন, এছাড়া কত ফাঁকি ধরা পড়ে নাই কে জানে! ভারত সরকারকে করনীতি সম্পর্কিত উপদেশ দানের জন্য ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমন্ত্রিত বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডাঃ নিকোলাস ক্যালডারও ভারতে বিপুল কর ফাঁকির কথা বলিয়াছেন। কঠোরতার সহিত এই আয়কর আদায়ের কাজ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সুরু হইলে ইতিমধ্যে মুদ্রাসঙ্কোচনের তথা পণ্যমূল্যহ্রাসের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। ভারত সরকার পণ্যমূল্য স্থিরীকরণের জন্য পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (Commodity Prices Board) গঠন করিয়া এবং শুল্ক নির্ধারণ ন্যায়সঙ্গত করিতে ট্যারিফ বোর্ডের সম্প্রসারণ করিয়া লক্ষণীয় সুফল পাইয়াছিলেন। এইসঙ্গে সরকার যদি ব্যবসায়ীদের বা ফাটকাবাজদের কঠোরভাবে সংযত করিতে এবং পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার যথাসম্ভব উন্নতিসাধন করিয়া বণ্টন-ব্যবস্থার সমতারক্ষা করিতে পারিতেন সাধারণ ভারতবাসীর অবস্থা তাহা হইলে অবশ্যই এতটা শোচনীয় হইতে পারিত না।

ভারতে নানা প্রয়োজনীয় জিনিসের দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা অবশ্যই আতঙ্কের কথা। মূল্যবৃদ্ধির এই প্রবণতা ভারতের সরকারী

* বোম্বাইয়ে 'দাদাভাই নৌরোজী ট্রাষ্ট ফাণ্ড লেকচারার' রূপে ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ ২৬।২।৫৭ তারিখে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা-প্রাসঙ্গিক ভাষণে মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের আর্থিক অবস্থার সুপরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য একটি স্থায়ী উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে।

কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা জনসাধারণের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এসম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ এক বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মুনাফা-শিকারীদের খুশীমত মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসের ফাটকাবাজী এবং তজ্জন্য জনগণের দুর্গতি সরকার সহ্য করিবেন না। বিবিধ প্রয়োজনীয় পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্যহার বাঁধিয়া দিয়াও সরকারী কর্তৃপক্ষ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেছেন।

সরকারের তরফ হইতে পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধকল্পে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'অত্যাবশ্যক পণ্য আইন' (The Essential Commodities Act, 1957) প্রবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আইনাদির সাফল্য সরকারী কঠোরতা এবং জনগণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।

ভারতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

(Control-System in India)

যুদ্ধ বা অন্য কোন কারণে দেশে যখন চরম পণ্যাভাব বা পণ্যবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং সেই অভাব বা বিশৃঙ্খলা অল্পকালের মধ্যে বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, শাসনকর্তৃপক্ষ তখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করিয়া থাকেন।* এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা দেশের সংগ্রহযোগ্য পণ্য সমহারে ন্যায্যমূল্যে দেশবাসীর মধ্যে বণ্টন করা হয়। পণ্যমূল্য সাধারণতঃ যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল, এজন্য চাহিদা বেশি ও যোগান কম হইলে পণ্যাদির মূল্যরেখা আপনা হইতেই উপরে উঠিয়া যায়। ইহার উপর উঠতি বাজারের সুযোগ লইয়া ব্যবসাদারগণ পণ্য আটকাইয়া কৃত্রিম উপায়ে অভাব আরও তীব্র করিয়া তোলে। এইভাবে পণ্যবাজারে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহার চাপে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র দেশবাসী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে। যাহারা ব্যবসাদার শ্রেণীর অর্থবান লোক তাহাদের কথা ধর্তব্য নয়, তাহারা চড়া বাজারের আপন পণ্য বিক্রয় করিয়া অভাবিত মুনাফা লুটে এবং অন্যান্য পণ্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করিতে তাহাদের কিছুই যায় আসে না। সাধারণ ধনীদের কথাও স্বতন্ত্র, দেশব্যাপী দারুণ দুর্দিনে আরামে দিন কাটাইবার জন্য সঞ্চিত বিত্তের একাংশ খরচ করিতে তাহাদের কাতর না হইবার কথা। এই অবস্থায় বাজারে যেটুকু পণ্যসামগ্রী পাওয়া যায়, বিত্তশালী ব্যক্তিরা যে কোন মূল্যে তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া পণ্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্য জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় এবং তাহারা অত্যন্ত অসহায় হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া খাদ্যের অবস্থা এইরূপ হইলে দেশে বহুলোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়।

---

* ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের সর্বভারতীয় খাদ্য সম্মেলনে (All India Food Drive Conference) ভারতে খাদ্যমূল্য বিশেষ করিয়া চাউলের মূল্য নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা চলে। ইহার পূর্বেই ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে যোগানের অভাবের জন্য পেট্রোল, লৌহ ও ইস্পাত, সংবাদপত্রের কাগজ, দেশলাই, কেরোসিন ও ঔষধপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণনীতির প্রয়োগ সুরু হয়। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চিনি, চা, রবার চামড়া, কাগজ প্রভৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সূতী বস্ত্র ও তুলাজাত সূতা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরের পর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কলিকাতা ও সহরতলীতে খাদ্যবরাদ্দ প্রথা চালু হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের ক্রম-বিনিয়ন্ত্রণ নীতি ঘোষিত হয় এবং চিনি বিনিয়ন্ত্রণের পর এবং তৎপরে সিমেণ্টের মত অত্যাবশ্যক পণ্য কাপড় বিনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। খাদ্যশস্য বিনিয়ন্ত্রিত হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। এখনও লৌহ ও ইস্পাত, কিছু কিছু ঔষধপত্র প্রভৃতির উপর একধরণের নিয়ন্ত্রণ চালু আছে।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার মহামন্বন্তর খাদ্যযোগানের স্বল্পতার জন্য হইলেও সরকার, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বিত্তবান শ্রেণীর যে কোন মূল্যে খাদ্যসংগ্রহের তৎপরতা এজন্য কম দায়ী নয়।

দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের রক্ষাই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। আগেই বলা হইয়াছে এই ব্যবস্থার দুইটি দিক,—প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলকে সমহারে পণ্য সরবরাহ এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ। জনসাধারণ যে দর দিতে পারে, পণ্যাভাবজনিত অস্বাভাবিক অবস্থায় দর তদপেক্ষা উপরে উঠিয়া যায়। এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ সরকারী অর্থসাহায্য দিয়াও অত্যাবশ্যক পণ্যাদির মূল্য সাধারণ দেশবাসীর আয়ত্তের মধ্যে নামাইয়া আনিতে পারেন। এই সময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হয়। এইভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখিতে ও পণ্যমূল্য কমাইবার জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে, এমন কি যুদ্ধোত্তরকালেও এইভাবে অর্থব্যয় করিয়া ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্র-পরিচালকগণ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন। যুদ্ধের ফলে খাদ্য-সঙ্কট দেখা দেওয়ায় ভারতের মত দরিদ্র দেশের শাসনকর্তৃপক্ষও কেবলমাত্র বিদেশ হইতে আমদানীকৃত খাদ্যের মূল্য জনসাধারণের মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে বৎসরে গড়ে ২০ কোটি টাকার মত ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সার্থকতা সুপরিচালনার উপর নির্ভর করে। কর্তৃপক্ষ যদি দৃঢ়তার সহিত কর্তব্যপালন করিতে না পারেন, অর্থাৎ পণ্যাদি নিয়ন্ত্রিত হইবার পর যদি জনসাধারণ সমহারে ও আয়ত্তাধীন মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থা দেশের পক্ষে আশানুরূপ কল্যাণকর হয় না। মূল্য নিয়ন্ত্রণের পর পণ্য যোগানে অব্যবস্থার ফলও মারাত্মক। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুঃসাহসী উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীর দল দেশে চোরাকারবার চালাইতে থাকে। চোরাবাজারে গোপনে চলাচলের জন্য কিছু পণ্য নষ্ট হয়ই এবং দেশের সাধারণ পণ্যাভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষতি কম নয়। অনেক সময় কর্তৃপক্ষ পণ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া লোককে দরকার মত 'পারমিট' বা 'পণ্যসংগ্রহের ছাড়পত্র' দিবার ব্যবস্থা করেন। নীতি হিসাবে ইহা মন্দ নয়, কিন্তু পরিচালনা দুর্নীতি-মূলক বা ত্রুটিপূর্ণ হইলে জনসাধারণের দুঃখকষ্ট বাড়িয়া যায়। এক্ষেত্রেও

চোরাকারবারের আশঙ্কা আছে। যাহারা অতি সাধারণ লোক অথচ যাহাদের লইয়া দেশ, তাহাদের তদ্বির-তল্লাস করিবার মত জ্ঞান বা সময় নাই এবং সুপারিশ সংগ্রহ করিবার সুযোগও তাহাদের কম। এই অবস্থায় দেশে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও ইহাদিগকে পণ্যাভাবে অসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

যুদ্ধ থামিবার পরও ভারতে পণ্যাভাব চলিতে থাকে এবং কর্তৃপক্ষ বহুক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখেন। তবে মোটের উপর ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ নীতি আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ইহার কারণস্বরূপ পরিচালনা ব্যবস্থার ত্রুটির কথাই সর্বাগ্রে মনে হয়। ভারতের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণনীতি সমভাবে চালু হয় নাই এবং রেশনহীন এলাকার লোক অনিবার্যভাবে চড়াবাজারের চাপে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রেশন এলাকাতেও পণ্য সরবরাহ এত কমহারে হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা প্রয়োজন মিটিতে পারে না। গুণের দিক হইতেও পণ্যাদি অনেক সময় সন্তোষজনক হয় নাই। অবস্থার সুযোগ লইয়া অসাধু ব্যবসায়ীরা রেশন-অঞ্চলেও চোরাকারবার চালাইয়াছে। তবু ইহারই মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিছুটা ভাল চলিয়াছে, কিন্তু সিমেণ্ট, কাগজ, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি যে সব পণ্যসংগ্রহে 'পারমিট' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলির ব্যাপারে সাধারণ দেশবাসীকে বহুক্ষেত্রেই অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। চিনি, কাপড়, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্যও ভারতে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের সর্বত্র সরবরাহ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় নাই বলিয়া এবং মাথাপিছু বা পরিবারপিছু সরবরাহের পরিমাণ একান্ত নগণ্য বলিয়া রেশন এলাকার অধিবাসীদের পর্যন্ত এই সব পণ্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১১ কোটি লোক খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুবিধা পাইয়াছে।* সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে মনে হয়, সরকারী কর্তৃপক্ষ পণ্যবণ্টন ব্যবস্থার শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে যেভাবে অসমর্থ হইয়াছেন, ঠিক সেইভাবেই তাঁহারা পণ্য-উৎপাদনকারীদের ও ব্যবসাদারদের আয়ত্তে রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সরকারী হিসাব অপেক্ষা দেশে পণ্য উৎপাদন অবশ্যই বেশি হইয়াছে, তা না হইলে এত চোরাকারবারের মাল কোথা হইতে আসিল? সময় মত চোরাকারবারীদের

* ইহাদের মধ্যে সরকারী খাদ্যবরাদ্দ ব্যবস্থা অনুযায়ী পুরা সুবিধা পায় শতকরা মাত্র ৩২ ভাগ, বাকী লোক আংশিক সুবিধা পায়।

কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হইলে অবস্থা সম্ভবতঃ এতটা শোচনীয় হইত না। অনেকে এই ব্যাপারে দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের কার্যাবলীরও তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে ভারতে নিয়ন্ত্রণনীতি রহিতের একটি জোর আন্দোলন চলে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তিও এই আন্দোলনের সমর্থন করিয়া নিয়ন্ত্রণনীতি রহিতের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। জনগণের, বিশেষ করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুবিধাবিহীন ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগের (পল্লীবাসীদের) দুঃসহ দুঃখ মহাত্মাজীকে এত বিচলিত করে যে, তিনি জেদী কর্তৃপক্ষের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতে মন্তব্য করেন,—"যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্পর্কে সবকিছু জানেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের কোলাহলের মধ্যে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার দাবী চাপা পড়িয়া যাইতেছে।" অবশ্য এই মন্তব্য করার পর গান্ধীজী পণ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত সরকারের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারে তাঁহাদের ইতস্ততঃ করিবার যৌক্তিকতাও স্বীকার করিয়াছেন। নিয়ন্ত্রণনীতি রহিত হইলে সমগ্র পণ্যবাজার অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে চলিয়া গিয়া মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য করিয়া তুলিবে, এ-ব্যাপারে ইহাই ছিল ভারত সরকারের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা। গান্ধীজী মানুষের মনের দুয়ারে আঘাত দিয়া সাফল্যলাভে বরাবরই বিশ্বাসী। এক্ষেত্রেও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তিনি দিল্লীতে এক প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় ব্যবসায়ী, উৎপাদক ও দালালদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাইয়া বলেন যে, তাঁহারা সরকারের আশঙ্কা দূর করুন, সরকারকে তাঁহারা এই আশ্বাস দিন যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে দাম ফাঁপিয়া যাইবে না, বরং চোরাকারবার ও দুর্নীতি দূর হইবে।

যাহা হউক, ভারত সরকার নানাদিক বিবেচনা করিয়া গান্ধীজীর সমর্থন এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির (A. I. C. C.) ও খাদ্যশস্য নীতি নির্ধারক কমিটির (Food-grains Policy Committee) অনুমোদন সত্ত্বেও উপরোক্ত আন্দোলনকারীদের দাবী অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে রাজী হন নাই। তবে তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, ধীরে ধীরে পণ্যাদির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা রহিত করাই হইবে অতঃপর তাঁহাদের নীতি। প্রথমে চিনি, সিমেণ্ট, লৌহ, কাগজ ইত্যাদি ভোগ্যপণ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া

লইয়া ভারত সরকার সর্বশেষে খাদ্যশস্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া স্থির করেন।* এই বিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুকূলে জনমত অধিক হইলেও কেহ কেহ ইহার ফলে নিয়ন্ত্রণমুক্ত পণ্যের অভাবিত মূল্যবৃদ্ধি ও তজ্জনিত বাজারের বিশৃঙ্খলার উপরও বিশেষ জোর দেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে বোম্বাই কমার্স এসোসিয়েশনের সভায় এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারত সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডেরই ভূতপূর্ব সদস্য এবং বোম্বাই সরবরাহ দপ্তরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রী এ, ডি, গোরওয়ালার নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :—"নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করাই অভিপ্রেত হইলে খাদ্যদ্রব্য সহ সব জিনিসেরই নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হউক। কিন্তু অত্যাবশ্যক জিনিসের দর যাহাতে সাধারণ লোকের নাগালের বাহিরে চলিয়া না যায়, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা উচিত। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তৈলবীজের এবং ডিসেম্বর মাসে চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তৈলবীজের দর লাফে লাফে চড়িয়া যায় এবং চিনির দর এত উঁচুতে উঠে যে প্রকাশ্য বাজার হইতে চিনি প্রায় উধাও হইয়া যায়। এজন্য সরকার পুনরায় চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ন্ত্রণ চালু থাকিলে বাংলার দুর্ভিক্ষে অবশ্যই কম লোক মরিত। সম্প্রতি গুজরাটে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে খাদ্যশস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল বলিয়া একজনও অনশনে মরিয়াছে কিনা সন্দেহ।"

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে, অতঃপর ক্রমে ক্রমে পণ্যাদির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল হইবে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর বেশিদিন নিয়ন্ত্রণ চালু থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, এইজন্য ভারত সরকারের বিনিয়ন্ত্রণ-নীতির ঘোষণা দেশে উদ্বেগের পরিবর্তে স্বস্তি আনিয়াছিল। খোলা বাজারে পণ্যবিক্রয়ের অবাধ প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে সহায়তা করিবে বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন। তবে এই সময়ও কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতে প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের যে অবস্থা,

* পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার যে বিশেষজ্ঞ বোর্ড (Commodity Prices Board) নিযুক্ত করেন, তাঁহারা সুস্পষ্ট অভিমত জানান যে, অন্ততঃ পক্ষে চাউল, গম, বাজরা, ডাল প্রভৃতি খাদ্যশস্য, চিনি ও গুড়, তৈলবীজ ও খইল, কেরোসিন, জ্বালানী কাঠ, কয়লা এবং লৌহ, ইস্পাত ও সিমেন্টের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা রহিতের পূর্বে দেশের সচ্ছলতা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। তাঁহারা 'আরও' বলেন যে, খাদ্যশস্যের বরাদ্দ সর্বজনীন করা এবং মাথাপিছু দৈনিক বরাদ্দ ১২ আউন্সের স্থলে ১৬ আউন্সে বাড়ানো নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা রহিত করার চেয়ে ঢের বেশি কল্যাণকর।

তাহাতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল হইবার ফল সর্বাংশে ভাল হইবে না। বিশেষতঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য পণ্য-বাজারে শৃঙ্খলা ও সমতা অত্যাবশ্যক, কাজেই পণ্যবাজারের উপর সরকারের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা ভাল।* বর্তমানে পণ্যবাজারের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব চলিতেছে বলিয়াও এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

ভারতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির চাপ অব্যাহত থাকার জন্য ভারতসরকার নিরুপায় হইয়া মুনাফাবাজী দমন করিতে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ব্যবস্থা করেন। অত্যাবশ্যক পণ্যাদির সর্বোচ্চ মূল্যও এই উদ্দেশ্যেই অনেকক্ষেত্রে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু না করিয়াও সরকারী কর্তৃপক্ষ এই কারণেই ন্যায্যমূল্যের অধিকসংখ্যক দোকান খুলিয়া জনসাধারণকে খাদ্যশস্য সরবরাহের চেষ্টা করেন। কয়লা প্রভৃতি পণ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই চালু আছে। লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ অথচ প্রয়োজন অপরিসীম, সে ক্ষেত্রে এখনও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ আছে।

অবশ্য, জনসাধারণের সহযোগিতা থাকিলে এবং সরকার দুষ্কৃতকারীদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিলে বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিনিয়ন্ত্রণের ফল জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না বলিয়াই মনে হয়। পণ্যবাজারে চাহিদা ও যোগানে সামঞ্জস্য রক্ষাও এই হিসাবে বিশেষ দরকার। এজন্য পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির এবং সুবিধামত বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

* এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে দাদাভাই নৌরজী ট্রাষ্ট বক্তৃতার বক্তারূপে ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ এদেশে পণ্যের যোগান ও চাহিদার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য একটি স্থায়ী নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান (Controlling Organisation) গঠনের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতে পল্লী উন্নয়ন

(Rural Reconstruction in India)

স্বাধীনতালাভের পর ভারত ক্রমশঃই সকল দিক হইতে আধুনিক যুগের উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়বহুল বহু পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের সুনাম ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, শতকরা ৮২ ভাগ লোক যে দেশে পল্লীবাসী, সেখানে দেশের উন্নতির যে কোন পরিকল্পনায় পল্লী অঞ্চলের উন্নতির প্রশ্ন সর্বাগ্রে বিবেচ্য। পল্লীভারতের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিলে জনগণের শ্রীবৃদ্ধির সহিত সমগ্রভাবে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে।

পশ্চাৎপদ কৃষিজীবনের দুঃসহ দারিদ্র্যে ভারতের গ্রামবাসী জীবন্মৃত। ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার হয় নাই বলিয়া পল্লীভারত এখনও সহর এলাকা হইতে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষার নিদারুণ অভাব ভারতের কোটি কোটি পল্লীবাসীর জীবনধারণ নিরর্থক করিয়া তুলিয়াছে। অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে ও স্বাস্থ্যহীনতায় পল্লীভারতের জীবনীশক্তি ক্ষীয়মাণ। আর্থিক অবনতির সহিত ভারতের পল্লীজীবনে নানা সামাজিক অবনতিও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। দিল্লী, বোম্বাই বা কলিকাতার ভোগ-ঐশ্বর্যের আলোকচ্ছটায় ভারতের যে আভিজাত্যই ফুটিয়া উঠুক, প্রতিভাশালী জননায়ক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক বা শিল্পপতিদের আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া বিশ্বসভায় ভারতের সম্মান যতই বাড়িয়া যাক, পল্লীর অগণ্য নগণ্যের স্তিমিত প্রাণশক্তি পুনরায় উদ্দীপিত না হইলে অথবা পল্লীভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন না হইলে সেই সাফল্যের আনন্দ ম্লান মনে হইবেই।

ভারতের ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার গ্রামের ৩০ কোটি অধিবাসীর দুর্গতি দূর করিতে ব্যাপক ও বলিষ্ঠ একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই সঙ্গে যাঁহাদের হাতে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার, ভারতের উন্নতি-অবনতির সহিত পল্লীভারতের প্রকৃত সম্পর্ক উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে অবশ্যই সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। বলিতে গেলে, এতদিন বিদেশী শাসনকর্তৃপক্ষ পল্লীভারত সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন বলিয়াই সুদখোর মহাজনের অত্যাচারে, মহামারী ও

স্বাস্থ্যহীনতার প্রকোপে এবং অজ্ঞতা বা অশিক্ষার অভিশাপে কৃষিজীবী পল্লী-বাসীর আর্থিক, মানসিক, সামাজিক অবস্থা ক্রমেই হীনতর হইয়া পড়িয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সমবায় নীতির সাহায্যে কৃষিকার্যে সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ প্রভৃতির দ্বারা বেকার ও অল্প-আয় বিশিষ্ট কৃষিজীবী পরিবারের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি,—প্রধানতঃ এই সবই পল্লীসংগঠনের উপায়। পল্লীভারতে কুসংস্কার, দলাদলি প্রভৃতির কারণ শিক্ষার অভাব। সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সে হিসাবে পল্লী অঞ্চলে শিশুদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং বয়স্কদের শিক্ষার জন্য নৈশবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইলেও গ্রামবাসীর জ্ঞানবৃদ্ধির নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা আছে। বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষাদানের সঙ্গে কিছু কিছু বৃত্তি বা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অশিক্ষা দূরীভূত হইবে এবং গ্রামবাসীদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অপেক্ষাকৃত উন্নত হইবে। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষক, প্রকৃতপক্ষে চাষের কাজ হয় বৎসরে মাত্র কয়েক মাস, বাকী সময়টা ক্ষেতে দ্বিতীয় ফসল বুনিয়া অথবা, শিক্ষা ও ব্যবস্থা থাকিলে যে কোন কুটিরশিল্পের সাহায্যে অতিরিক্ত কিছু উপার্জন করিয়া তাহারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হইতে পারে।

পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষাও বড় সমস্যা। অধিকাংশ পল্লীতেই পানীয় জলের ভাল ব্যবস্থা নাই। মজা নদী, পুকুর বা ডোবা ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক রোগের উৎস। জেলা বোর্ড অথবা ইউনিয়ন বোর্ড মারফৎ এখনকার তুলনায় আরও ব্যাপকভাবে গ্রামে গ্রামে মজা পুষ্করিণী প্রভৃতির সংস্কার করিয়া এবং নলকূপ বসাইয়া পানীয় জলের ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামের লোক যাহাতে গৃহসংলগ্ন জমি, পুকুর, রাস্তা প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতে বাধ্য হয় এবং যাহাতে আগাছা, জঙ্গল প্রভৃতি জমিয়া উঠিতে না পারে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা দরকার। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি হইলে রোগের প্রসার এমনিই কমিয়া যাইবে। তাছাড়া এই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, গ্রামবাসীদের বিনাখরচে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণের সুবিধা প্রভৃতি ব্যবস্থাও সরকারকে করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন

ও উপায় সম্পর্কে প্রচার-কার্য চালাইলেও যথেষ্ট সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। জনকল্যাণ সমিতির কর্মচারীদের দিয়া ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতাদির ও প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী বিতরণের বন্দোবস্ত হওয়া দরকার।

গ্রাম্য কৃষক ও শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে হইলে তাহাদের বৃত্তির উৎকর্ষসাধন আগে করিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এজন্য গ্রামাঞ্চলে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি মূলধন সমন্বিত বহুসংখ্যক সমবায় সমিতি গড়িয়া তোলা আবশ্যক। বর্তমানে গ্রামবাসীদের শতকরা ৪ জনেরও কম সমবায় সমিতির সদস্য, সকলকে না হইলেও শতকরা অন্তত ৫০ জন গ্রামবাসীকে সমবায় সমিতির সদস্য করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। ঋণভারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত গ্রামবাসীদের ঋণমুক্তির ব্যবস্থা দ্রুততর না হইলে নূতন বলিষ্ঠ জীবনপথে নামিয়া আসা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পল্লীবাসীর ঋণ বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ন্যায় আইনের সাহায্যে কমাইবার বা বাতিল করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সমবায় ব্যাঙ্ক, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতির প্রসার করিয়া গ্রামবাসীকে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্পসুদে ও দীর্ঘমেয়াদে ধার দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কৃষির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি প্রচারের এবং সফলতার হিসাবে কৃষকদের পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। ভারতে যে ৯ কোটি একরের বেশি অনাবাদী কর্ষণযোগ্য জমি আছে, সেগুলির উন্নতিসাধন করিয়া দরিদ্র কৃষিজীবীদের মধ্যে বণ্টন করিতে পারিলেও বহু পল্লীবাসীর এবং সমগ্রভাবে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়। এ ছাড়া সমবায় সমিতিগুলিকে গ্রাম্য শিল্পীদের দৈনন্দিন কাজে এবং পণ্য বাজারজাত করিবার ও প্রয়োজনীয় ঋণসংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করিতে হইবে। কৃষিজীবী যাহাতে অবসর সময়ে শিল্পকর্ম দ্বারা কিছু বাড়তি উপার্জন করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে। এইরূপ সমবায় সমিতি হইতেই কৃষিপণ্য মরশুম হিসাবে বাজারজাত করিবার সুবিধার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ধর্মগোলা স্থাপিত হওয়া দরকার। কৃষক বা শিল্পী যদি পণ্য উৎপাদন করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সমবায় সমিতি বা অন্য কোন অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে সেই পণ্য জমা দিয়া কিছু টাকা পায়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে সুবিধামত পণ্য বাজারজাত করিতে যে বিলম্ব হইবে, তজ্জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতে পারিবে। এইভাবে পণ্য সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে এবং দালাল প্রভৃতি

মধ্যস্বদের শোষণ বন্ধ হইবে। এই ধরণের কোন সুপরিকল্পিত উপায়ে গ্রামবাসীদের আয় বাড়াইতে না পারিলে ভারতের পল্লীসংগঠন নীতির সাফল্য কিছুতেই আশা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯৫৯) গৃহীত যৌথ খামার নীতির সাফল্যের সম্ভাব্যতাও উল্লেখযোগ্য। শুধু সমবায় সমিতি বা অনুরূপ সরকার-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নয়, বে-সরকারী জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানাদিও পল্লীবাসীকে বাড়তি উপার্জনে প্রভূত সাহায্য করিতে পারে। দারিদ্র্যই সকল অবনতির মূল, ভারতের পল্লীবাসীর দারিদ্র্য বিদূরিত হইলে তাহারা নিজ চেষ্টাতেই ক্রমে শিক্ষায়, পরিচ্ছন্নতায় ও স্বাস্থ্য-সম্পদে বড় হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কৃষক ও সাধারণ গ্রামবাসীর উন্নতিসাধনের জন্য গ্রাম অঞ্চলে পাঠাগার বা শিল্পকেন্দ্র স্থাপন, যাত্রাগান ও কথকতার ব্যবস্থা, ম্যাজিকলণ্ঠন বা ছায়াচিত্র-যোগে আনন্দ তথা শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমবায় সমিতি ও সরকারী কৃষিক্ষেত্রগুলির মারফৎ সরকারী কৃষিবিভাগ এসব ব্যবস্থা সহজেই করিতে পারেন। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ যত বাড়িবে, স্বাস্থ্য ও শিল্পের দিক হইতে গ্রামবাসীদের ততই সমুন্নতির সম্ভাবনা।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অবহেলিত গ্রামাঞ্চলের লক্ষণীয় উন্নতি সূচিত হইয়াছে। পরিকল্পনায় গ্রাম অঞ্চলে যে সব সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে, ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে যাহারা সাহায্য করিবে তাহাদের জন্য এবং প্রতিষ্ঠানগতভাবে সাহায্যের হিসাবে পরিকল্পনায় পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন খাতে যে ৩৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল সমাজ উন্নয়ন খাতে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন খাতের মোট ৫৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ২০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক পল্লী অঞ্চলে ঋণদান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৪০০ শাখা স্থাপনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা যায় যে, সমাজ-উন্নয়ন তথা গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামবাসীরাও আশাপ্রদভাবে সাড়া দিয়াছে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতের কার্যকারিতায় সরকার যাহা করিয়াছেন, জনসাধারণের সর্ববিধ দানের হিসাব পরিমাণে তাহার অর্ধাংশের বেশি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১

লক্ষ ২৩ হাজার গ্রামের ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ অধিবাসী সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সুবিধা পাইয়াছিল, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে এই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রাম ও গ্রামবাসীর সংখ্যা যথাক্রমে তিন লক্ষ ও ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ হইয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষ অনুমান করিতেছেন। ভারতের সমস্ত গ্রামের অধিবাসীকে এই খাতের আওতায় আনাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতের পক্ষে নূতন জিনিস, এই পরিকল্পনায় গ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রার উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা আছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে নিম্নলিখিত উন্নতি আশা করা হইয়াছে :—(১) সমবায় কৃষিব্যবস্থা সমেত সমবায় কার্যক্রমের প্রসার ; (২) গ্রামোন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীল পঞ্চায়েত প্রথার উন্নয়ন ; (৩) জমির একত্রীকরণ ; (৪) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার [দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পৃথকভাবে 'গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প' খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার ভিতর আছে তাঁতশিল্পের জন্য ৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, খাদিশিল্পের জন্য ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, গ্রাম্য-শিল্পসমূহের জন্য ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, হস্তশিল্পের (Handicrafts) জন্য ৯ কোটি টাকা, এবং অন্যান্য ছোটখাট শিল্পের জন্য ৬১ কোটি টাকা।] ; (৫) গ্রাম্য-সমাজের দুর্বলতর অংশ, বিশেষ করিয়া ছোটখাট চাষী, ভূমিহীন কৃষক, কৃষি-মজুর ও কারিগরদের সাহায্যার্থে কার্যসূচী নির্ধারণ ; (৬) নারী ও যুবকদের মধ্যে অধিকতর কাজ চালাইবার ব্যবস্থা ; (৭) উপজাতীয় এলাকায় অধিকতর কাজ চালাইবার ব্যবস্থা। জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন সব গ্রাম্য এলাকায় স্থানীয় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। মোটের উপর কৃষি, সমাজ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তা, কুটিরশিল্প প্রভৃতি খাতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে অর্থ ব্যয়িত হইবে, তাহার বড় একটা অংশ গ্রামোন্নয়নে লাগিবে। ইহাতে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানও হইবে অনেক লোকের।*

অবশ্য ভারতের ন্যায় বহু-সমস্যা-পীড়িত পশ্চাৎপদ দেশে পল্লীসংগঠন খুবই জটিল ও বিরাট কাজ। সরকারের সহিত দেশবাসীকেও এখানে সাধ্যমত

* ভারতে কুটিরশিল্পসমূহে প্রায় ২ কোটি লোকের জীবিকা-সংস্থান হইয়া থাকে। একমাত্র তাঁতশিল্পের সহিতই ৫০ লক্ষ লোক যুক্ত আছে। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় শুধু খাদি এবং ধান মাড়াই, চামড়া পরিশোধন, গুড় ও তৈল উৎপাদন ইত্যাদি গ্রাম্য শিল্পে মোট ২১ লক্ষ ১৮ হাজার লোক কোন না কোন প্রকার কাজ পাইয়াছিল।

অংশগ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় শুধু সরকারী চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় সফলতা লাভ করিতে পারে না। পল্লীভারত ভারতের সনাতন জীবনাদর্শের প্রতীক, ভারতের পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পল্লীজীবনের মানবিক মূল্যবোধও সবসময়ে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।*

* পল্লীভারতের নিম্নরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণতার ছবি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :—

"The village communities are little republics, having nearly everything they want within themselves and almost independent of any foreign relations. They seem to last where nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds revolution, but the village communities remain the same. The union of village communities, each one forming a separate little state in itself, has, I conceive, contributed more than any other cause to the preservation of the people of India through all the revolutions and changes which they have suffered and is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence."

—Sir Charles Metcalfe (1832).

জনমত গঠন ও প্রকাশের উপায়

(Instruments for the Formation and Expression of Public Opinion)

পৃথিবীতে গণতন্ত্রের যুগ আসিয়াছে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে জনগণের অধিকার ক্রমেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। এ সময় সব দেশেই জনসাধারণকে ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হইতে হইবে। রাষ্ট্রনিয়ামকগণ জনগণের প্রতিনিধি, নির্বাচনের সময় নির্বাচন-প্রার্থীদের গুণাগুণ যাচাই করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের থাকা চাই। তাছাড়া রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিতেছে বলিয়া জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও বিচক্ষণতা প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এ সময় জনসাধারণকে মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করিতে হইবে, সুবিবেচক ও দূরদর্শী হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই সব গুণ কোন দেশেই সাধারণ দেশবাসীর প্রথম হইতে থাকে না, যুগের প্রয়োজনে এবং জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের চেষ্টায় গুণাবলী তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যে দেশে জনমত যত দুর্বল, আজকাল সেই দেশেই স্বার্থবাদীদের পারস্পরিক ক্ষমতা-লোলুপতাজনিত কলহ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা তত বেশি দেখা যায়। জনসাধারণ যে ক্ষমতা হাতে পাইয়াছে, তাহারা যদি সেই ক্ষমতা রক্ষার উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে এই ক্ষমতা লাভ তাহাদের কল্যাণের কারণ না হইয়া ধ্বংসেরই কারণ হইবে। এইজন্যই দেশপ্রেমিক জননেতারা নানা উপায়ে জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও চিন্তাশীল করিয়া তুলিতে চান এবং জনমত যাহাতে ন্যায়ের উপর ভিত্তি করিয়া বলিষ্ঠভাবে গঠিত ও প্রকাশিত হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করেন। জনগণের মননশীলতাই জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

যে যে উপায়ে সচরাচর জনমত গঠিত ও অভিব্যক্ত হইতে পারে, সেগুলি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল:—

(১) **সংবাদপত্র**—জনমত গঠনের ও প্রকাশের সর্বাধুনিক এবং সর্বপ্রধান না হইলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হইতেছে সংবাদপত্র।* সংবাদপত্রে দেশী বিদেশী নানাপ্রকার সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাছাড়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে বহুবিধ

* সংবাদপত্র সম্পর্কে মনীষী Karel Capek বলিয়াছেন—

'With every morning edition of the papers the world is born anew into a wilderness where innumerable surprises, dangers and epic events are lurking about.'

সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এইভাবে সংবাদপত্রের পাঠক-পাঠিকারা শুধু যে দেশদেশান্তরের নানাপ্রকার সংবাদই জানিতে পারে তাহা নয়, বিশেষ বিশেষ সংবাদ ও সেই সংবাদের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়া তাহারা সে সম্বন্ধে নিজ মতামত স্থির করিতে পারে। তাছাড়া সংবাদপত্রের 'চিঠি-পত্র' স্তম্ভে জনসাধারণ নিজেদের অভিমত বিবৃত করিয়া নানা সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে পারে এবং সেই সব চিঠি সংবাদপত্রের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার হাতে পৌঁছাইয়া পত্রলেখকের অভিমতের গুরুত্ব সৃষ্টি করে। সংবাদপত্রের সাময়িকীর পাতায় নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাহিরের লোকের প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হয়।

সব দেশেই সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যার উদ্ভব হইযাছে এবং সেইসব সমস্যার চাপে শুধু রাষ্ট্র বা জাতীয় জীবন জড়াইয়া পড়িতেছে না, ব্যক্তিজীবনও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। রাজনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার ঘটনা জানিতে আগ্রহশীল হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ইহার উপর জনসাধারণের অধিকাংশ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অসমর্থ বলিয়া এবং প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনের গণ্ডিতে সারাদিন কাটিয়া যাওয়ায় চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না বলিয়া তাহারা সংবাদপত্রের সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়াই সমস্যা সম্পর্কে নিজেদের মোটামুটি একটা মতামত স্থির করিয়া ফেলে। বিজ্ঞাপনের দৌলতে আজকাল মালিকেরা খুব সস্তায় সংবাদ-পত্র বিক্রয় করিতে পারেন, তাছাড়া সংবাদপত্র চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার জন্য ইহাতে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ে আলোচনা থাকে। এই সব কারণেও জনসাধারণ সংবাদপত্র পাঠ করে এবং আপনা হইতেই জনমত গঠিত হয়। দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী অনেকগুলি সংবাদ-পত্র একসঙ্গে চালু থাকে বলিয়া পাঠক ইচ্ছা করিলে সমস্যা-বিশেষের উপর সকল দলের আলোচনা পাঠ করিয়া মত স্থির করিতে পারে।

ভারতবর্ষে শিক্ষিত লোকের একান্ত অভাব, তাই গ্রামাঞ্চলে সংবাদপত্রের চাহিদা খুবই কম। অবশ্য গতি ধীর হইলেও এদেশে ক্রমেই সংবাদপত্র অধিক-তর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।* কোন বিশেষ বিষয়ে সংবাদপত্র মারফৎ

* দেশের প্রতি হাজার জন অধিবাসীর হিসাবে সংবাদপত্র ব্যবহারের সংখ্যা ব্রিটেনে—৫৭০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—৩৩১, জাপানে—৪০০ এবং ভারতে মাত্র ৮। এমনকি মিশর ও তুরস্কেও এই সংখ্যা যথাক্রমে ২৪ ও ৩২।

আন্দোলন ভারতে এখন সাফল্যলাভ করিতেছে। রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডারে সাধারণ দেশবাসীর নিকট হইতে কয়েক লক্ষ টাকা চাঁদা আসা এইরূপ সাফল্যের অন্যতম প্রমাণ। আশা করা যায়, ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা যত প্রসার লাভ করিবে, জনমত গঠন ও প্রকাশের উপায় হিসাবে সংবাদপত্রের গুরুত্বও ততই বাড়িয়া যাইবে।

(২) **বেতার যন্ত্র**—সংবাদপত্রের পরই জনমত গঠনের উপায় হিসাবে বেতার যন্ত্রের স্থান। আধুনিক পৃথিবীতে বেতার যন্ত্র বা রেডিও ছাড়া টেলিভিসনও দ্রুত জনপ্রিয় হইতেছে। বেতার মারফৎ একটিমাত্র লোক ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে সবার অলক্ষ্যে বক্তব্য পৌঁছাইয়া দিতে পারে। রাষ্ট্রের অনুমোদন থাকিলে তো কথাই নাই, না থাকিলেও বেতার বৃহত্তর ব্যাপারে জনমত গঠনের চমৎকার উপায়। গত যুদ্ধের সময় পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কীর্তিকলাপ বেতার মারুফতেই সেন্সর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া এদেশে প্রচারিত হইয়াছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রপরিচালকদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় যে বেতার যন্ত্র, তাহা ভারতে আগষ্ট আন্দোলনের সময় এবং জার্মান কবলিত ফ্রান্সে গত যুদ্ধের সময় প্রমাণিত হইয়াছে। দেশের আইনসম্মত বেতার প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ রাষ্ট্রনায়কদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীন জনমত গঠনে এইগুলি তত বেশী সাহায্য করিতে পারে না, তবু আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং রাজনৈতিক সংবাদাদি রেডিও দ্বারা যে ভাবে পরিবেশিত হয়, তাহাতেও জনমত গঠনের প্রভূত সুবিধা হয়। বেতারযন্ত্র মারফৎ অবশ্য জনমত প্রকাশের তেমন সুযোগ নাই।

ভারতে এখনও টেলিভিসন যন্ত্র প্রচলিত হয় নাই, রেডিও যন্ত্রের প্রচলনও খুবই কম। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গৃহে ব্যবহৃত রেডিওর (domestic receiver sets) সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪৮ হাজার, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধি পাইয়া এই সংখ্যা ১২ লক্ষ ৯২ হাজারে উঠিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের সহিত ভারতে রেডিওর প্রসার আশা করা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতে টেলিভিসন চালু হইবার কথা আছে।

(৩) **সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রাগান, কথকতা ইত্যাদি**—সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রাগান বা কথকতার সাহায্যে জনসাধারণের মন সমস্যাদির প্রতি আকর্ষণ করা খুবই সহজ এবং এই ভাবে সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে যে বলিষ্ঠ

জনমত গড়িয়া উঠে, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। আমাদের দেশে অবশ্য মুনাফার লোভে মালিকেরা অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর রস পরিবেশন করিয়া থিয়েটার, সিনেমা বা যাত্রাদল চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে এইসব উপায়ে বহুবার এদেশে শক্তিশালী জনমত গঠিত হইয়াছে। 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনীত হইবার পরই জনমতের চাপে বাংলায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের অবসান ঘটে। মুকুন্দ দাসের যাত্রাগানে পল্লীবাংলায় দেশাত্ম-বোধের ব্যাপক উদ্বোধন ঘটিয়াছে। আধুনিক যুগের নবান্ন, রমা, কারাগার, নতুন ইহুদি, ভাবীকাল, উদয়ের পথে, দো বিঘা জমিন, এক দিন রাত্রে প্রভৃতি নাটক ও ছায়াচিত্র দেশবাসীকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করিয়া তুলিয়াছে। সরকারী প্রচারবিভাগের ছায়াচিত্রগুলিও সাম্প্রতিক কালে জন-সাধারণকে নানা বিষয়ে সজ্ঞান করিয়া জনমত গঠনে সাফল্যলাভ করিয়াছে।

(৪) **সভা**—জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে বা সোজাসুজি তাহাদিগকে সমস্যা বুঝাইয়া দিতে জনসভাই উৎকৃষ্ট উপায়। অবশ্য জনসভায় যে জনমত গঠিত হয়, তাহা অধিকাংশ সময় বিষয়বস্তুর একদিক আলোচনার ফলে হয় বলিয়া তাহার দায়িত্ব বা মূল্য সাধারণতঃ তেমন বেশি নয়, তবে জরুরী সমস্যার ক্ষেত্রে এই ভাবে গঠিত জনমতের গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করিয়া বিপ্লবাদির সময় জনমত গঠনে সভা আহ্বান বিশেষ সাফল্যজনক উপায়। জনসভায় শ্রোতারা প্রশ্ন তুলিবার সুযোগ পায় বলিয়া জনমত প্রকাশের উপায় হিসাবেও সভার মূল্য আছে।

(৫) **পুস্তক, সাময়িক পত্র ও প্রচারপত্র**—সংবাদপত্র বা জনসভার ন্যায় ব্যাপক উপায় না হইলেও জনমত গঠনের ব্যাপারে পুস্তক, সাময়িক পত্র বা প্রচারপত্রের মূল্য কম নয়। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মহলে, যেখানে একমুখী আলোচনা বিশেষ ফলপ্রদ নয়, এই শ্রেণীর জনমত গঠনের উপায় অধিকতর সাফল্য লাভ করে। যুদ্ধ বা কোন গণ্ডগোলের সময় দেশের উপর বিমান হইতে প্রচারপত্র বিলি করিয়া জনমত-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। তথ্যবহুল প্রবন্ধাদিতে বা সুলিখিত উপন্যাসাদিতে যে সব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা থাকে, পাঠক-সাধারণ তৎপ্রতি আগ্রহশীল না হইয়া পারে না। কার্ল মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌সের রচনা পাঠ এবং প্রচারের দ্বারাই সারা পৃথিবীতে মার্ক্‌স্‌পন্থী দল গড়িয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া বাংলার

সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যত বলিষ্ঠ জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে, ততখানি আর কোন উপায়ে হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

(৬) **সমিতি গঠন**—জনসভার মত বহু শ্রোতার সমাগম না হইলেও সমিতিগুলির অধিবেশনে যে কয়জন সদস্য উপস্থিত থাকে, তাহাদের মধ্যে আলোচ্য বিষয় লইয়া সর্বাঙ্গীণ আলোচনা সম্ভব হয় এবং এইরূপ আলোচনার শেষে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে যে অভিমত গড়িয়া উঠে, প্রকাশ্য জনসভায় গঠিত অভিমতের মত তাহা উত্তেজনাপ্রসূত বা একদেশদর্শী নয়। এই সব সদস্য পরে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া সমস্যার সর্বতোমুখী আলোচনার দ্বারা সার্থক জনমত গঠন করিতে পারে। ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়া কংগ্রেস শাখাসমিতিসমূহের সদস্য-কর্মীরা এইভাবেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। সংবাদপত্র যেখানে রাজদণ্ডের ভয়ে মূক, প্রকাশ্য সভার অধিবেশন যেখানে বে-আইনী, সেখানে এইরূপ সমিতিই নিঃসন্দেহে জনমত গঠনের ও প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়।

এছাড়া বিদ্যায়তন, প্রাচীরপত্র, বিধান পরিষদ, রাস্তার জমায়েতে বক্তৃতা (street corner meeting) প্রভৃতি দ্বারা জনমত গঠিত হইয়া থাকে।

ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের উপর এদেশের সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় প্রথার প্রভাব

(The Influence of Social and Religious Institutions in India on the Economic Life of the People)

অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারতবর্ষ যে তাহার অধিবাসিবৃন্দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, ইহা সত্যই দুঃখের কথা। ভারতবাসীর এই দুর্গতি চিরকাল ছিল না; একদা বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও অর্থনীতির দিক হইতে বিরাট সমৃদ্ধি ভারতবর্ষকে বিশ্ববরেণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। বিদেশী শাসনের বেড়াজালে জড়াইয়া পড়িয়া ভারতবাসী দীর্ঘ দুই শত বৎসর আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়াই আজ তাহার এই শোচনীয় অবস্থা।

বর্তমানে বহুদিক হইতে ভারতবাসীর অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অতীতের গতিশীল জীবনপ্রবাহের সংহতি ও আনন্দ বজায় রাখিবার জন্য ভারতবর্ষের লোক যে সব সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, একান্ত বিকৃত অবস্থায় তাহাদের অধিকাংশই আজও টিকিয়া আছে। এই সব প্রথার অধিকাংশই যে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের দীনতা আরও বাড়াইয়া দিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সব দেশে সব সময়েই সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় প্রথা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় পরিবর্তনশীল অবস্থা অস্বীকার করিয়া সেগুলি কোন দেশেই এত বেশি দিন জনসাধারণের দুর্গতিবৃদ্ধির কারণ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মানুষ বড়, বিধান মানুষের চেয়ে বড় নয়। একদিন ভারতবর্ষে প্রচলিত পরিস্থিতির বিবেচনায় মানুষেরই মঙ্গলের জন্য যে সব সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কিত প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইবার পরও সেগুলির টিকিয়া থাকার কোন অর্থ হয় না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক এখনও অশিক্ষিত, বহু পুরাতন প্রচলিত রীতিনীতির উপর নির্ভর করা এবং সেগুলিকে আদর্শ করিয়া তদনুসারে

নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন গঠনের চেষ্টা করা এই সব লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্য তাহাদের দুঃখদুর্দশাও বহুক্ষেত্রে বাড়িয়া যায়।

ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনে যে সব সামাজিক প্রথা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তন্মধ্যে বর্ণবিভাগ ও যৌথ পারিবারিকতা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আগে ভারতের অধিবাসিগণকে ব্রাহ্মণ (পুরোহিত, অধ্যাপক ইত্যাদি), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা, রক্ষী ইত্যাদি), বৈশ্য (ব্যবসায়ী বা বণিক) এবং শূদ্র (সেবক)—এই চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল। স্বভাবতঃই শ্রেণী হিসাবে ইহাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হইয়াছিল এবং পুরুষানুক্রমে সেই নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রকে মানিয়া লইয়া ইহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া একরূপ সুখেস্বচ্ছন্দেই জীবনযাপন করিত। এইভাবে তাঁতির ছেলে তাঁতিই হইত, কুম্ভকার হইতে চাহিত না। পৈতৃক বৃত্তিতে শিশুকাল হইতে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা-লাভ করিত বলিয়া ইহারা নিজ পেশায় কুশলতাও অর্জন করিত। এখন অবশ্য সে যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে যন্ত্রশিল্প ও ইহার আনুষঙ্গিক নানা বিচিত্র সুখদুঃখ আমদানী হইয়া এদেশে বর্ণবিভাগ তথা কর্মবিভাগের সুযোগ সুবিধা একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাও বাড়িয়াছে, জীবিকা সংস্থানের চেষ্টায় এখন মানুষকে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। এক কথায়, 'এখন যে যোগ্য জীবনসংগ্রামে তাহারই জয়ী হইবার সম্ভাবনা। এই অবস্থায় কর্মবিভাগ যখন অপ্রয়োজনীয় হইয়া বাতিল হইয়া গিয়াছে, তখন বর্ণবিভাগের ভুঁয়ো আভিজাত্যের প্রতি মমতা থাকা নিরর্থক। আজ ভারতবাসীকে একথা মানিয়া লইতেই হইবে যে, যোগ্যতার উপর বৃত্তি নির্ধারণের দিন আসিয়াছে, জন্ম এক্ষেত্রে আকস্মিক ব্যাপারমাত্র। এ সময় যে ব্রাহ্মণের ছেলের শিল্পদক্ষতা আছে অথচ বিদ্যার্জনের মত মেধা নাই, তাহাকে শিল্পী হইতে না দিয়া অধ্যাপক করিবার চেষ্টা হইলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং এইভাবে শক্তির অপচয়ে সমগ্র সমাজের পরম ক্ষতি হইবে।

যৌথ পরিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত বলিয়া একান্নবর্তী পরিবারের অনেকে পরশ্রমজীবী হইয়া গায়ে হাওয়া লাগাইয়া বেড়ায় এবং অনেকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া বিশাল পরিবারের অন্নসংস্থান ও নিজেদের জীবনী-শক্তির ক্ষয় করে। ইহাতে বহু শ্রমশক্তি অকেজোভাবে নষ্ট হয় এবং অনেকখানি শক্তি অতিব্যবহারের ফলে অসময়ে জীর্ণ হইয়া পড়ে।

এই শ্রমসম্পদ-হানি দারুণ সামাজিক ক্ষতি বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান জীবন-সংগ্রামের যুগে মানুষকে উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে হইবে। ব্যক্তিগতভাবে দেশবাসীর সঞ্চয়ক্ষমতা যদি বাড়ে, তবেই সেই সঞ্চিত অর্থ শিল্পাদিতে নিয়োজিত হইয়া জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে। যৌথ পারিবারিকতা এই সম্পদ সৃষ্টির পথে অন্তরায়। এই ব্যবস্থায় দুঃস্থ বা অসহায়দের অবশ্য অনেক উপকার হয়, এদিক হইতে এই প্রথা বিলুপ্ত হইলে অসুবিধা হইবে। তবে দেশে আর্থিক সাচ্ছল্য বাড়িলে এবং বার্ধক্য বীমার মত জনকল্যাণমূলক বীমা ব্যবস্থা প্রসারিত হইলে এই অসুবিধা বহুলাংশে দূরীভূত হইতে পারে। তাছাড়া ভারতবর্ষ রাষ্ট্র হিসাবে শক্তিমান ও সচ্ছল হইলে দুঃস্থদের দায়িত্ব বহুলাংশে এদেশের সরকারই গ্রহণ করিতে পারিবেন। সর্বোপরি যৌথ পারিবারিকতা কমিয়া গেলেও শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন ও সচ্ছল ভারতবাসী দুঃস্থ বা বিপন্ন আত্মীয়ের সাহায্যে অগ্রসর হইবে না, একথা মনে করিবারই বা কি কারণ আছে?

ভারতবর্ষে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন এই ধরণের আর একটি সামাজিক প্রথা। এই আইন অনুসারে সম্পত্তির অধিকারীর মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হয়। এইভাবে খণ্ডিত হওয়ায় সম্পত্তির মুনাফা অবশ্যই কমিয়া যায়। একটি বড জমি চাষ করিতে যে খরচ হয় ও যে পরিমাণ ফসল জন্মায়, সেই জমি টুকরা টুকরা করিয়া চাষ করিলে খরচ তো তদপেক্ষা অনেক বেশি হয়ই, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও কমিয়া যায়। তাছাড়া এইভাবে ভাগাভাগি হওয়ার ফলে অংশীদারদের মধ্যে নানা মতদ্বৈধ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদিতে বহু অর্থের অপব্যয় হয়। এই ব্যবস্থার ফলে অনেকের জীবিকা সংস্থানের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু একজনের হাতে সম্পদ থাকিলে উদ্বৃত্ত মুনাফায় নূতন সম্পদ সৃষ্টির যে সুযোগ থাকিত, এক্ষেত্রে তাহা আর থাকে না।

পিতৃদায়, মাতৃদায়, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি ধর্মসম্পর্কিত ও সামাজিক প্রথার নীতিগত মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রচলিত বিধানানুসারে এদেশে এগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া নানা উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় এবং ব্রাহ্মণ, আত্মীয় ও বন্ধুদের ভোজন করাইতে হয়। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের

লোকের পক্ষে এইভাবে ব্যয় বহন করা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার এবং ভারতীয় কৃষিজীবী বা গ্রামবাসীদের ঋণের অঙ্ক যে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে, এইরূপ অযৌক্তিক ব্যয় বহনও তাহার অন্যতম কারণ।

ভারতে ধর্ম্মসম্পর্কিত নানা পূজা, পর্ব ও ব্রত প্রচলিত আছে। এই সব উৎসব অনুষ্ঠানে দেশবাসীর বহু অর্থব্যয় হয়। অতীতকালের স্বাচ্ছল্যের প্রতীক এই সব পূজা পার্বণ এই সমস্যাসঙ্কুল যুগে প্রচলিত থাকিলে ইহাদের আর্থিক দায়িত্ব বহনে দরিদ্র ভারতবাসীর দারিদ্র্য আরও বাড়িয়া যাইবে। পূজা পার্বণে ভক্তিই প্রধান উপকরণ, অর্থব্যয়ের আড়ম্বর নহে,—এদেশের জনসাধারণকে আজ একথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার দিন আসিয়াছে।*

অবশ্য এখন ঠিক আগের অবস্থা নাই। এখন ভারত স্বাধীন হইয়াছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে ক্রমেই অধিকতর মর্যাদা লাভ করিতেছে। এই রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায় যে, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কিত প্রথাসমূহের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব হইতে অতঃপর ভারতের অর্থনৈতিক জীবন ক্রমেই মুক্তি পাইবে।

* ভারতে বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক এবং ধর্মসংক্রান্ত উৎসবে বৎসরে ৭০০ কোটি টাকার মত ব্যয় হয়। পার্লামেণ্টের কংগ্রেসদল কর্তৃক গঠিত পরিকল্পনা সমিতির মতে ইহা হইতে ২৫০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা বাঁচানো দরকার। এজন্য তাঁহারা এইসব অনুষ্ঠানের ব্যয়বাহুল্যের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা বলিয়াছেন। বলাবাহুল্য, এই অপচয় বন্ধ হইলে উদ্বৃত্ত অর্থে বহু জনকল্যাণ সাধিত হইবে

ভারতের কৃষি-সম্পদ

(India's Agricultural Crops)

কৃষি-ভারতবাসীর প্রধানতম উপজীবিকা। এদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে। ভারত শিল্পে আশানুরূপ অগ্রসর নয় বলিয়াই কৃষির উপর এদেশবাসীর নির্ভরশীলতা এত বেশি। মৎস্যচাষ ও অরণ্যসম্পদ সমেত কৃষি হইতে ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ পাওয়া যায়।

ভারতের মোট ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমির মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ৩২ কোটি একরের মত, ইহার মধ্যে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ একরের মত জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল ফলিয়া থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের কর্ষণযোগ্য আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি একর। বলা বাহুল্য, পতিত জমির উদ্ধার হইলে ভারতীয় কৃষির অনেক উন্নতি হইবে : সাধারণভাবে ভারতে আবাদের অযোগ্য জমির পরিমাণ ৬ কোটি একরের মত। এ ছাড়া এদেশে ২ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গমাইল বনভূমি আছে। ভারতের কৃষিব্যবস্থা পুরাতন এবং অত্যধিক ভারগ্রস্ত, সমগ্রভাবে ইহা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরিচালিত হইলে সর্বপ্রকার চাষেরই সুবিধা হইবে এবং সকলপ্রকার ফসলের উৎপাদনই কিছু কিছু বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমানে কৃষিজীবিদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ১$\frac{১}{২}$ একরের কম। ভারতের মোট কৃষিভূমির শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগে ডাল সহ খাদ্যশস্যের চাষ হয়।

১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন। পরিকল্পনা কমিশন প্রথমে হিসাব করিয়াছিলেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই উৎপাদন ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টনে পৌঁছাইবে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে রাজ্য-কৃষিমন্ত্রীদের মুসৌরী সম্মেলনে এই লক্ষ্য পুনর্বিবেচিত হইয়া ৮ কোটি ৪ লক্ষ টন অনুমিত হইয়াছে।*

* এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত তণ্ডুল জাতীয় শস্য মিলাইয়া উৎপাদন যেখানে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ টন হয়, ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে এই উৎপাদন ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টন হইয়াছে।

ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

ধান্য

ভারতীয় খাদ্যশস্যসমূহের মধ্যে চাউল প্রধান। অধিকাংশ এশিয়াবাসীই চাউলভোজী। আগে ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অংশের লোক কম ভাত খাইত, এখন ভারতের সর্বত্র ভাত খাওয়া বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সব রাজ্যেই ধান চাষ বাড়াইবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ভারতের আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগে ধান-চাষ হয়। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ৭ কোটি ৬২ লক্ষ একরের মত জমিতে ২ কোটি ৮২ লক্ষ টনের মত চাউল উৎপন্ন হয় কিন্তু নানাকারণে ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ফলন ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানে ২ কোটি ৪০ লক্ষ একরের কাছাকাছি জমিতে ৮৫ লক্ষ টনের মত চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চাউল ভারতের প্রধান খাদ্য হইলেও ভারত চাউলের দিক হইতে আত্মনির্ভরশীল নয়। সম্প্রতি উৎপাদনের কিছুটা উন্নতি হইলেও অবিরাম লোকবৃদ্ধির ফলে এই সমস্যা এখনও জটিল হইয়াই আছে। অখণ্ড ভারতে ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এক ব্রহ্মদেশ হইতেই ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চাউল আমদানী হয়। এ ছাড়া এই বৎসর অন্যান্য দেশ হইতে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য ছিল ৩ কোটি টাকার বেশি। অবশ্য এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এই বৎসর ভারতবর্ষ হইতে আরব, সিংহল প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশে দেড় লক্ষ টনের মত (মূল্য ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা) রপ্তানী হয়। পূর্ববাংলার উর্বর এবং সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সেচসমৃদ্ধ বহু পরিমাণ জমি পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ায় কৃষির হিসাবে ভারত নিঃসন্দেহে অসুবিধায় পড়িয়াছে। অবশ্য অভাবের চাপে ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দৌলতে বর্তমানে ভারতে কৃষিব্যবস্থায় উন্নতি সাধিত হইয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে এবং ফলে খাদ্যের দিক হইতে পরমুখাপেক্ষিতাও আজকাল কতকটা কমিয়াছে। তবু ভারতে এখনও খাদ্যশস্যের ঘাটতি যথেষ্ট বলিয়া ভারত-সরকার ব্রহ্মদেশ, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে চাউল এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে গম আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন (ভারতের খাদ্যপরিস্থিতি শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ধানচাষে ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার ফলনই সর্বাধিক, তবে পৃথিবীর উন্নত ধান্যোৎপাদনকারী দেশগুলির হিসাবে ইহা অকিঞ্চিৎকর। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রতি একর জমিতে যেখানে গড়ে ১১৭৩ পাউণ্ড ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে চীন, মিশর, ইটালী ও জাপানে উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৪৬৮৯, ৪৬৩৮, ৪৫৪৯ ও ৪২৯১ পাউণ্ড।

গম

পশ্চিম বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ ছাড়া ভারতের প্রায় সব রাজ্যের লোকই প্রধানতঃ গমজাত দ্রব্যাদি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। পশ্চিম বাংলার গমের প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান হইলেও চাষ এখানে অপেক্ষাকৃত কম হয় বলিয়া গমের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অভাব অত্যধিক। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৩ কোটি ২৯ লক্ষ একর জমিতে ৯৩ লক্ষ ১৪ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গমের উৎপাদন চাউলের মতই লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায় (৯৩ লক্ষ ১৪ হাজার টন হইতে ৭৬ লক্ষ ৫৪ হাজার লক্ষ টন)। গম উৎপাদনের দিক হইতে পাকিস্তানকে ভারতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বলা চলে। পাকিস্তানের জনসংখ্যা ভারতের এক-পঞ্চমাংশ, অথচ ভারতে যেখানে বৎসরে গড়ে ৮৫ লক্ষ টনের মত গম উৎপন্ন হয় সেখানে পাকিস্তানে হয় ৩৩ লক্ষ টন। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলেই অধিক গম জন্মায়, ইহার মধ্যে পূর্বপাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের স্থান সর্বাগ্রে। ধানের মত গম উৎপাদনের দিক দিয়াও ভারত হল্যাণ্ড, জার্মানী, জাপান, মিশর, বেলজিয়াম, ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

সাম্প্রতিক কালে খাদ্যাভাবের জন্য বিদেশ হইতে ভারতে যে খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই গম। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে আমদানীকৃত ৪৭,২৩,৭২৯ টন খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউল ছিল ৭,৪৮,৫৫০ টন এবং গম ছিল ২৯,৬৯,০১৭ টন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে ৩৫ লক্ষ ৮২ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে তাহার মধ্যে চাউল ও গমের পরিমাণ যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টন ও ২৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টন।

গম অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জমির ফসল। পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম বা মাদ্রাজের মত যে সব জায়গায় বেশি বৃষ্টি হয়, সেখানকার আর্দ্র মাটিতে গমের তুলনায় ধান চাষই ভাল হয়।

জোয়ার, বাজরা ও রাগী

মাদ্রাজ, পূর্বপাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যের দরিদ্র অধিবাসীরা প্রধানতঃ জোয়ার ও বাজরা খাইয়া জীবনধারণ করে। পশ্চিম বাংলায় এই দুই প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না বলিলেই হয় এবং বাংলার সহিত জোয়ার বা বাজরার পরিচয় খুব কম। গমের ন্যায় জোয়ারও শুষ্ক জমিতেই উৎপন্ন হয়, তবে ইহাদের জন্য গমের জমির মত জলসেচের প্রয়োজন হয় না। রাগীও এই শ্রেণীর ফসল। মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, মধ্যভারত, উত্তরপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র, বোম্বাই, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতিতেই প্রধানতঃ জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। মহীশূর রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ রাগী উৎপন্ন হয়। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৪ কোটি ১৩ লক্ষ একর জমিতে ৭২ লক্ষ ৪৯ হাজার টন জোয়ার, ২ কোটি ৭৫ লক্ষ একর জমিতে ২৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টন বাজরা এবং ৫৬ লক্ষ ৭৪ হাজার একর জমিতে ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার টন রাগী উৎপন্ন হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতের মত অন্নাভাবগ্রস্ত দেশে এই ধরণের ফসলের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ইহাদের ব্যবহারও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

যব

হাল্কা ধরণের খাদ্যশস্য হিসাবে যব পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদৃত এবং ইহা হইতে রোগীর পথ্য বার্লি এবং বিয়ার নামক মদ্য জাতীয় পানীয় প্রস্তুত হয়। উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর অববাহিকা অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে যবের চাষ হইয়া থাকে। পৃথিবীতে ৮ কোটি ২৫ লক্ষ একরের মত জমিতে ৪ কোটি টনের কিছু বেশি যব জন্মায়। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৮৬ লক্ষ একর জমিতে যব জন্মায় ২৮ লক্ষ ২৭ হাজার টন। পৃথিবীর যব উৎপাদক দেশ-সমূহের মধ্যে ভারতের স্থান তৃতীয়। যব উৎপাদনের সুবিধা আছে বলিয়া ভারতে 'মল্‌ট' বা 'বিয়ার' শিল্প সহজেই সম্প্রসারিত হইতে পারে।

ভুট্টা

খাদ্যশস্য হিসাবে ভারতে ভুট্টা ক্রমেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। পশুখাদ্য হিসাবেও ইহার গুরুত্ব আছে। ভারতে প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর ভুট্টার চাষ হইয়া থাকে। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৯২ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে ৩০ লক্ষ ২৯ হাজার টন ভুট্টা জন্মিয়াছিল।

ডাল

ভারতে ছোলা, মুগ, অড়হর, মসুর, খেসারী প্রভৃতি নানাপ্রকার ডালের চাষ হইয়া থাকে। এইসব ডালের জন্য ভারতে ৫ কোটি একরের বেশি জমিতে চাষ হয়। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ একর জমিতে ১ কোটি ১২ লক্ষ টন ডাল উৎপন্ন হয়। একমাত্র উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ডালের চাষ হয় ১ কোটি ২২ লক্ষ একরের মত জমিতে। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে ৬২ লক্ষ ৬৪ হাজার টন ছোলা উৎপন্ন হইয়াছে।*

ইক্ষু

ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হয় কিন্তু তণ্ডুল-জাতীয় খাদ্যশস্যের ন্যায় এদেশে ইক্ষু উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ আবশ্যকতা আছে। ভারতে ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫০ লক্ষ ১৯ হাজার একর জমিতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে; ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চিনি উৎপন্ন হয় ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। এ ছাড়া এই বছরে ২½ লক্ষ টন খান্দসারি উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতে উৎপাদিত গুড়ের পরিমাণ বৎসরে ৫০ লক্ষ টনের মত।

ভারতের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ ইক্ষুর চাষ হয় উত্তরপ্রদেশে (শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ) এবং ইহার পরই বিহারের স্থান। জাভা, কিউবা, হাওয়াই দ্বীপ প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতে ইক্ষু উৎপাদনের হার খুবই কম। ভারতে প্রতি একর জমিতে যেখানে মাত্র ১২ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়, জাভায় সেখানে হয় ৫৫ টন। পাকিস্তানে ইক্ষু চাষের জমির ও উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৭ লক্ষ একর ও ২ কোটি টনের মত।

পাট

পাট ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানীযোগ্য অর্থকরী ফসল এবং অখণ্ড অবস্থায়

---

* ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হিসাব (কোটি টন)

	১৯৪৯-৫০	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
চাউল	২·৩২	২·৭৮	২·৪৮	২·৭১	২·৮৩
গম	৬৩	·৭৯	·৮৯	·৮৬	০·৯৩
অপরাপর তণ্ডুল-জাতীয় শস্য	১·৬৫	২·২৩	২·২৬	১·৯১	২·০১
মোট ডাইল	০·৮০	১·০৪	১·০৫	১·০৮	১·১৪

একরূপ বিনা আয়াসেই ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক পাটের বাজার দখল করিয়াছিল। পৃথিবীর শতকরা ৯৬ ভাগ পাট তখন এইদেশে উৎপন্ন হইত। বর্তমানে পাকিস্তানে পৃথিবীর মোট পাটের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ (বৎসরে ৬০ লক্ষ গাঁইট্—প্রতি গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড বা পাঁচ মণের মত) পাট জন্মায়।

অখণ্ড ভারতবর্ষের সেরা পাটচাষের জমি পাকিস্তানে পড়িয়াছে। বর্তমান ভারতে পাটের চাষ হয় প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে এবং ইহার পর বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশের স্থান। পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন পাটের গুণের দিক দিয়া আরও উন্নতিসাধনের প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাটকলগুলি ভারতে পড়ে কিন্তু পাটের অধিকাংশ জমি চলিয়া যায় পাকিস্তানে। পাটকলগুলির তীব্র চাহিদা মিটাইতে প্রয়োজনের তাগিদে ভারতের পাট চাষ লক্ষণীয় দ্রুততার সহিত সম্প্রসারিত হইয়াছে। ভারতবিভাগের অব্যবহিত পরে ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৭ লক্ষ একর জমিতে ১৪ লক্ষ গাঁইট পাট জন্মায়, এই বৎসর পাকিস্তানে ২১ লক্ষ একর জমিতে ৬২ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১৯ লক্ষ ৫১ হাজার একর জমিতে পাটচাষ হয় এবং ফসল জন্মায় ৪৬ লক্ষ ৭৮ হাজার গাঁইট। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১৯ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে ৪২ লক্ষ ৮৮ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়। নানা কারণে ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জমি এবং উৎপাদন দুইই কমিয়া যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ৫৪ হাজার একর এবং ৪০ লক্ষ ৮৮ হাজার গাঁইট হইয়াছিল। তারপর অবশ্য উৎপাদনে পুনরায় লক্ষণীয় উন্নতি দেখা দিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনার আমলে পাট উৎপাদনের লক্ষ্য প্রথমে ৫০ লক্ষ গাঁইট করা হইয়াছিল, ইহা পরে ৫৫·৪ লক্ষ গাঁইটে তুলিবার কথা বলা হইয়াছে।

মোটের উপর পাকিস্তানের কাঁচা পাটের উপর অত্যধিকমাত্রায় নির্ভরশীল না থাকিয়া ভারত যে ক্রমে এহিসাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার পথে চলিয়াছে, ইহা আশার কথা। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, পাকিস্তান প্রথম হইতে ভারতের কলগুলির প্রয়োজনীয় পাট বিনাবাধায় নিয়মিতভাবে যোগাইয়া আসিলে এবং এই যোগানের স্থায়িত্বের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি থাকিলে ভারতে এত পাটচাষ বাড়াইবার কোন প্রয়োজন হইত না। ভারতে খাদ্যশস্যের দারুণ অভাব; পাটচাষ বাড়িবার ফলে ধান্যাদি খাদ্যশস্যের চাষের কিছুটা ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী পাকিস্তানের সহিত ভারতের

যে ৩ বৎসরের জন্য বাণিজ্যচুক্তি হইয়াছে, তাহাতে ভারতের পাকিস্তানকে কয়লা, সিমেণ্ট প্রভৃতি ৪৫টি পণ্য দিবার প্রতিশ্রুতির বিপরীতে পাকিস্তান ভারতকে কাঁচা পাট, চামড়া, ইত্যাদি ১৮টি পণ্য যোগাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। অবশ্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য পাক-ভারত বাণিজ্যসম্পর্কের স্বাভাবিকতা সব সময় আশানুযায়ী রক্ষিত হইতেছে না।

ভারত হইতে বিপুল পরিমাণ পাট ও পাটজাত দ্রব্য প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হয় এবং ব্রিটেন ভারতীয় পাটের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। পাট হইতে মালপত্র বহনের শক্ত থলে প্রভৃতি তৈয়ারী হয় বলিয়া ভারতীয় পাটের বিশ্বব্যাপী চাহিদা আছে। মাঞ্চুকোর কেনাফ শণ, ফিলিপাইনের ম্যানিলা শণ, জাভার রোসেনা শণ পাটের অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী। বর্তমানে কাগজের বা কাপড়ের ব্যাগও পাটের থলের সহিত কিছুটা প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন পাট হইতে কাপড়, টেলিগ্রাফের তার জড়াইবার স্থতা, তেরপল, ক্যাম্বিস, কারপেট, জুটেক্স নামক এ্যালু-মিনিয়াম অপেক্ষা হালকা, কঠিন ও ভারসহ একপ্রকার পদার্থ প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে এবং আশা করা যায় ক্রমশঃ পাটজাত যৌগিক পণ্যের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে যথাক্রমে ১২৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার ও ১১২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

ভারতে পাটচাষ আরও বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বর্তমান পাটচাষের রাজ্য ছাড়া মাদ্রাজ, কেরালা, প্রভৃতি রাজ্যেও পাটচাষের জমি সম্পর্কে আশাপ্রদ পরীক্ষা চলিতেছে।

চা

ভারত হইতে যে সকল ফসল বিদেশে রপ্তানী হয়, তন্মধ্যে পাটের পরেই চায়ের স্থান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ চা রপ্তানী করিয়া গড়ে ৩০ কোটি টাকা আয় করিত। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ৩২ কোটি ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হয়, এই চায়ের মূল্য ছিল ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৬২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় এবং ইহার মধ্যে ৪৪ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী

হয়। ইহার মূল্য ৯০ কোটি টাকার মত। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৭০ কোটি ৮৮ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন হইয়াছিল ৬৭ কোটি ৮৯ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪৪ কোটি ২৬ লক্ষ পাউণ্ড চা ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়, ইহার মূল্য ছিল ১২৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানীকৃত ভারতীয় চায়ের পরিমাণ ও মূল্য দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫০ কোটি ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৩৫ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা।

ভারতে চা বাগানের সংখ্যা চার হাজারের কিছু বেশি এবং চা চাষ হয় ৭ লক্ষ ৮০ হাজার একরের মত জমিতে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ (৫৫% ও ২৫%) চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দুই রাজ্যের পরে মাদ্রাজ ও কেরালার স্থান।

ভারতের চা বাগান এবং সমগ্রভাবে চা ব্যবসায়ের উপর এখনও ব্রিটিশ বণিকদের অধিকার অত্যধিক। কলিকাতার চায়ের নীলাম বাজারের সাতটি পরিচালক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের। ভারতীয় চা বাগান-গুলিতে ১০ লক্ষের মত শ্রমিক কাজ করে এবং আসামের বাগানগুলিতে নিয়োজিত শ্রমিকসংখ্যা ইহার অর্ধেক। পশ্চিম বাংলার চা বাগানে ২ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। ভারতের চা বাগানগুলিতে ১১৩ কোটি টাকার মত মূলধন নিয়োজিত আছে।

বিদেশে ভারতীয় চায়ের বাজার আরও সম্প্রসারিত হইতে পারে, তবে এজন্য চা চাষের ও চা প্যাকিং ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন।

পৃথিবীর মধ্যে চীনে সর্বাধিক পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়, চীনের পর ভারতের স্থান। ভারতীয় চা পৃথিবীর মোট প্রয়োজনের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মিটাইয়া থাকে।

পাকিস্তানে ৮০ হাজার একর জমিতে ৬ কোটি পাউণ্ডের কিছু বেশি পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়। উন্নত ধরণের পাকিস্তানী চা বাগানগুলির অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত।

তুলা

পৃথিবীতে তুলা উৎপাদনের দিক হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই ভারতের স্থান। অবশ্য যে সূক্ষ্ম তুলা হইতে ঢাকাই মসলিন তৈয়ারী হইত, সেই শ্রেণীর তুলা এখন আর এদেশে উৎপন্ন হয় না। ভারতে ১৯৫৬-৫৭

খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ হয় এবং তুলা উৎপন্ন হয় ৪৭ লক্ষ ৩৫ হাজার গাঁইট (প্রতি গাঁইট ৩৯২ পাউণ্ড)। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৪৽ লক্ষ গাঁইট তুলা জন্মিয়াছিল। সংশোধিত হিসাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে ৬৫ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হওয়ার কথা।

বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান,—ভারতের মধ্যে প্রধানতঃ এই সব রাজ্যেই তুলার চাষ হয়। দক্ষিণ ভারতেই তুলার চাষ অধিকতর ব্যাপক।

পাকিস্তানে ৩৫ লক্ষ একরের মত জমিতে প্রায় ১৩ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হয়।

ভারতের তুলা গুণে হীন বলিয়া সূক্ষ্মবস্ত্র তৈয়ারী করিতে ভারতীয় মিল মালিকেরা কেনিয়া, মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে উন্নত ধরণের তুলা আমদানী করেন। ভারতীয় তুলার একাংশ ব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি দেশে রপ্তানীও হয়। ১৯৫৫, ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিদেশ হইতে যথাক্রমে ৫৩ কোটি ৫০ লক্ষ, ৫৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ও ৪৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার কাঁচা তুলা আমদানী করে এবং বিদেশে রপ্তানী করে যথাক্রমে ২৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার, ১৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার ও ১৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার কাঁচা তুলা। ভারতে এখন উন্নত ধরণের তুলার চাষ বাড়াইবার জন্য নানা পরীক্ষা কার্য চলিতেছে এবং কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি (Central Cotton Committee) এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভারতে বিদেশী তুলার আমদানী স্বাভাবিকভাবেই কমিয়া যাইবে।

বিবিধ

এছাড়া ভারতে তামাক, কফি, নানাবিধ তৈলবীজ, রবার, নীল, সিঙ্কোনা, আফিং (সরকার নিয়ন্ত্রিত), আলু, নানাপ্রকার শাকসব্জি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

তামাক

ভারতীয় তামাক ব্রিটেনাদি নানাদেশে রপ্তানী হয়, আবার ধূমপানের দ্রব্যাদি তৈয়ারীর জন্য ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে কিছু

তামাক আমদানীও করে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে যথাক্রমে ১৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং ১৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের তামাক বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতে ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তামাকের চাষ হয় ১০ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে এবং ফসল ফলে ৩ লক্ষ ৬ হাজার টন।

কফি

প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতেই (মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, কুর্গ ও মাদ্রাজ) কফির চাষ হয় এবং ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ হয় মহীশূর রাজ্যে। ভারতীয় কফির প্রায় অর্ধেক বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। ভারতে যাহাতে কফি অধিকতর জনপ্রিয় হয়, তজ্জন্য "ইণ্ডিয়ান কফি সেস কমিটি" চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে কফির চাষ হয় এবং কফি উৎপন্ন হয় ৪২ হাজার ৪ শত টন। এই বৎসর ভারত হইতে ১৫২২৮ টন কফি বিদেশে রপ্তানী হয়।

তৈলবীজ

তৈলবীজ বলিতে সরিষা, বাদাম, তিসি, তিল, রেড়ি প্রভৃতি বুঝায়। ভারতে ৫৫ লক্ষ একরের কিছু বেশি জমিতে সরিষা ও রাইয়ের চাষ হয় এবং ফসল পাওয়া যায় ৯ লক্ষ টনের কিছু বেশি। ভারতে চীনাবাদাম এক মূল্যবান কৃষিসম্পদ এবং 'বনস্পতি'র চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চীনাবাদামের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে ১ কোটি ৩১ লক্ষ একর জমিতে ৪০ লক্ষ ৮৬ হাজার টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। ভারত হইতে কিছু পরিমাণ চীনাবাদাম ও চীনাবাদাম তৈল ক্যানাডায় ও ইয়োরোপের নানাদেশে রপ্তানী হয়। প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, অন্ধ্র, হায়দরাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে এবং বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে চীনাবাদামের চাষ হয়। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে রেড়ির চাষ হয় ১৪ লক্ষ একর জমিতে এবং ফসল পাওয়া যায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার টন। ভারতে তিসির ও তিলের জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮ লক্ষ ও ৫৪ লক্ষ একরের মত এবং বৎসরে ফসল জন্মায় যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন ও ৫ লক্ষ টনের মত। ভারতে ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে সরিষার চাষ হয় এবং সরিষা জন্মে ১০ লক্ষ ১৭ হাজার টন। এছাড়া ভারতে নারিকেল হইতে প্রচুর তৈল পাওয়া যায় এবং সাধারণ তৈল হিসাবে ব্যবহার ছাড়া সাবান ও বনস্পতি তৈয়ারীতে নারিকেল তেলের চাহিদা যথেষ্ট।

রবার

ভারতে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একরের মত জমিতে রবারের চাষ হয় এবং বৎসরে রবার জন্মায় ২৪ হাজার টনের কাছাকাছি। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ২৩, ৪৪৪ টন রবার উৎপন্ন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনের তুলনায় ইহা একান্ত অপ্রচুর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবার এশিয়ার সম্পদ এবং তিনটি প্রধান রবার উৎপাদনকারী দেশ মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও সিংহলে বাৎসরিক রবার উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন, ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন ও ৯০ হাজার টনের মত। মাদ্রাজ, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কিছু রবার চাষ হইলেও কেরালা রাজ্যেই অধিকাংশ ভারতীয় রবার জন্মায়। সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের হিসাবে ভারতে রবার উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগেরও কম।

ভারতীয় কৃষির পিছাইয়া থাকিবার কারণ

(The Drawbacks of Indian Agriculture)

ভারতের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের বেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল, কাজেই এদেশে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের প্রয়োজন লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। ভারতীয় কৃষি-পদ্ধতি মোটেই আধুনিক নয়, এজন্য অন্য দেশের তুলনায় ভারতে ফসল উৎপাদনের হার খুবই কম। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'ফার্টিলাইজার নিউজে'র হিসাবে ভারতে যেখানে প্রতি একর জমিতে ১১৭৩ পাউণ্ড ধান উৎপন্ন হয়, চীনে, ইটালীতে, মিশরে ও জাপানে সেখানে উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৪৬৮৯, ৪৫৪৯, ৪৬৩৮, ও ৪২৯১ পাউণ্ড। ভারতে প্রতি একর জমিতে যেখানে গম উৎপন্ন হয় ৯৪০ পাউণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, মিশর ও ফ্রান্সে সেখানে জন্মায় যথাক্রমে ৩৫০৫, ৩৩০৯, ২৭৮৭, ১৮৮৯ এবং ১৮৯৭ পাউণ্ড। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখ বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, এই বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা ব্যবস্থার প্রসার এবং হাতে কলমে কাজ শিখিবার সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। কটকে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সমিতির সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলনে (১৯৫৬) সভাপতি অধ্যাপক ডি. জি. কার্ভেও সরকারী পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পকে সমান গুরুত্বদানের উপর জোর দিয়াছেন। উভয়ই এদেশে আবশ্যকীয় এবং এদেশে উভয়েরই প্রসারিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলিয়া অধ্যাপক কার্ভে পরিকল্পনায় এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার কথা বলেন এবং তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন যে, ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে কৃষিখাতে মোট বরাদ্দের শতকরা ১৫ ভাগ ধরা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেস্থলে শতকরা ১২ ভাগ ধরা হওয়ায় কৃষিপণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়াস ব্যাহত হইবে।

ভারতের কৃষিজীবী সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু দরিদ্র নয়, অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও অসহায়। নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের উন্নতি করা ইহাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে দেশবাসীর বৃহত্তর অংশকে মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার দিবার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের সচেষ্ট হওয়া দরকার। দুঃখের

বিষয়, ইংরেজ আমলে সরকার এদিক হইতে একান্ত উদাসীন ছিলেন। জাতীয় সরকারের আমলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইলেও ভারতীয় কৃষির সমস্যার জটিলতা ও গভীরতা এখনও বহুলাংশে বর্তমান।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিনীতির সহিত ভারতীয় কৃষিজীবীর পরিচয় নাই বলিলেই চলে। স্বাভাবিক নিয়ম নীতি অনুসারে ভারতের বহু-কর্ষিত কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, অথচ কৃষক পরিবারের লোকসংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থা মারাত্মক। ভারতে যদি আশানুরূপ শিল্পপ্রসার হইত, তাহা হইলেও কৃষির উপর নির্ভরশীল বাড়তি জনসংখ্যার একাংশের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা থাকিত। সমবায় আন্দোলনও এদেশে মোটেই প্রসারিত হয় নাই। ভারতীয় কৃষক সরকারী কৃষি-সম্পর্কিত গবেষণাগার বা সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে কার্যকরী সাহায্য অতি অল্পই পাইয়াছে। এক কথায় সরকারী উদাসীনতা ও কৃষকদের নিজেদের উৎসাহের অভাবে ভারতীয় কৃষি এখন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভারতীয় কৃষির পিছাইয়া থাকিবার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—সব সমস্যা লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে। এছাড়া কৃষকদের আত্মচেতনার অভাব, অশিক্ষা ও দায়িত্বহীনতাও ভারতীয় কৃষির পশ্চাৎপদ থাকিবার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই।

জমি—ভারতের মোট জমির পরিমাণ ৭১ কোটি ৯৭ লক্ষ একর, ইহার মধ্যে ৩২ কোটি একরের মত জমিতে চাষ হয়। ভারতে যে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ একর অনাবাদী জমি আছে, তাহার অধিকাংশতেই চাষ হইতে পারে। এছাড়া ভারতে আরও ৫ কোটি ৯০ লক্ষ একরের মত জমি আছে, যাহা আপাততঃ চাষের একেবারে অযোগ্য বলিয়া মনে হইলেও, বিশেষজ্ঞদের ধারণা, চেষ্টা করিলে তাহাও কিছুটা আবাদী জমিতে পরিণত করা যায়। জলসেচ সমস্যা ভারতীয় কৃষির এক বৃহৎ সমস্যা। তবে আশার কথা এই যে, এতকাল ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর থাকিলেও সম্প্রতি বিভিন্ন নদনদী পরিকল্পনায় এবং কর্তৃপক্ষের অবহিতির ফলে ভারতে সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইতেছে। বর্তমানে যে সেচ পরিকল্পনাগুলির কাজ হইতেছে সেগুলি কার্যকরী হইলে ভারতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা

হইবে। এছাড়া ১২২টি সেচ পরিকল্পনার জরিপাদি চলিতেছে, সেগুলিতেও বহু পরিমাণ জমি উপকৃত হইবে। অনুমান করা হইয়াছে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর সেচ-সুবিধাপ্রাপ্ত জমির হিসাবে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে বা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে সেচ-সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ একর। খাল কাটিয়া বা নদনদীর সংস্কার করিয়া সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করিলে শুধু ফসল উৎপাদনের দিক হইতেই সুবিধা হয় না, জমি সকল দিক হইতেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং জনবসতি বাড়িয়া যায়। পণ্য চলাচলের সুবিধার জন্য জলপথের প্রসারও এক্ষেত্রে ধর্তব্য। পাঞ্জাবের 'লোয়ার চেনাব ক্যানাল' এ হিসাবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই খালের জলে লায়ালপুর কলোনীর ২০ লক্ষ একরের বেশি জমিতে চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। খালটি খনিত হইবার পূর্বে এ অঞ্চলে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে দশ জনেরও কম লোক বাস করিত, এখন প্রতি বর্গ-মাইলে গড়পড়তা লোকসংখ্যা তিনশতেরও অধিক।

সার সমস্যা ভারতীয় কৃষির অপর প্রধান সমস্যা। প্রাকৃতিক নিয়মে জমির যে উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়, বৈজ্ঞানিক সারের সাহায্যে জমির সেই অবনতি বহুলাংশে রোধ করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ভারতীয় কৃষক কিন্তু এ খবর রাখে না। এ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, সোডিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি রাসায়নিক সারের পরিবর্তে তাহারা তাহাদের চির পরিচিত গোময় ইত্যাদি সারের সাহায্যে চাষ করিয়া থাকে।*

কীটপতঙ্গের অত্যাচারে ভারতে বহু পরিমাণ ফসল প্রতি বৎসর নষ্ট হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে এই অপচয় বহুলাংশে নিবারণ করা যায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত।

তাছাড়া ভারতীয় চাষীরা গরীব বলিয়া এবং সমবায় নীতি এদেশে আশানুরূপ কার্যকরী হয় নাই বলিয়া তাহাদের পক্ষে যথাসময় ভাল বীজধান সংগ্রহ করা, বীজের যথাযথ সংরক্ষণ, ভালভাবে জমি তৈয়ারী করা, যথাসময়ে ফসল কাটা প্রভৃতি দরকারী কাজ ঠিক মত করা সম্ভব হয় না। এইরূপ নানা কারণে ভারতীয় জমি মোটামুটি উন্নত ধরণের হইলেও এখানে ফসল উৎপাদনের হার

* জাপান কৃষির হিসাবে ভারতের তুলনায় অনেক উন্নত। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদ্রায়তন জাপান যেখানে নাইট্রোজেন সার ও সালফেট সার ব্যবহার করে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৭১ হাজার টন ও ৩ লক্ষ ৮২ হাজার টন, বিপুলায়তন ভারত সেখানে মাত্র ৮২ হাজার ও ১৪ হাজার টন ব্যবহার করিয়াছে।

অত্যন্ত কম। ভারতের কৃষিক্ষেত্র-সমূহের অধিকাংশেই একাধিকবার একই ফসল অথবা ভিন্নপ্রকার ফসল ফলাইবার ব্যবস্থা নাই। মিশ্র বা যৌগিক কৃষিপদ্ধতিতে (Mixed farming) জমির এবং চাষীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি যে একসঙ্গে হয়, সে সংবাদও ভারতীয় কৃষকের অজানা। বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু মনে করেন যে উপরোক্ত অসুবিধাগুলির দূরীকরণ খুব বেশি কঠিন নয়।

জমির খণ্ডতাও ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের গুরুতর সমস্যা সন্দেহ নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে এদেশের জমি এমনিই বহুভাগে বিভক্ত হয়, আইনগত সীমানা-রেখা ইত্যাদির জন্য সেই খণ্ডিত ক্ষুদ্রাকার জমিগুলি আয়তনে আরও ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। বড় জমিতে একসঙ্গে চাষে যে খরচ হয়, খণ্ডিত জমিতে পৃথকভাবে চাষের খরচ সে তুলনায় অনেক বেশি। কৃষকদিগকে সমবায়নীতির উপকারিতা বুঝাইয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে খণ্ডিত জমিগুলি একত্রীভূত করিয়া যৌথ-প্রথায় চাষ করিবার ব্যবস্থা হইলে ব্যয়হ্রাস ও উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য কৃষকেরা অনেক লাভবান হইতে পারে। সুবিধামত যৌথ-খামার ব্যবস্থার প্রবর্তন ছাড়া কৃষিজীবী গ্রামবাসীদের মুখ চাহিয়া ব্যাপকভাবে এদেশের জমির পুনর্বণ্টন আবশ্যক। বলা বাহুল্য, ভারতে জমিদারী প্রথা বাতিলের পর কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাব (১৯৫৯) অনুযায়ী যৌথ খামার ও সেবা সমবায়ের যে নীতি প্রবর্তিত হইতেছে, তাহাতে এদিক হইতে বিশেষ সুফল আশা করা যায়।

ভারতের ভূমি ক্ষয় (Soil-erosion) একটা বড় সমস্যা। এই ক্ষয় প্রধানতঃ জমির উপরকার আস্তরণ ধুইয়া যাইবার জন্য হয়। বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে ক্ষয় নিবারণ করা আবশ্যক। জমিতে যাহাতে লবণাক্ত জল না ঢোকে তজ্জন্য সম্ভাবনাসম্পন্ন এলাকাগুলি রক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

শ্রম—ভারতীয় ক্ষেতমজুরদের মজুরীর হার আপাতদৃষ্টিতে সুলভ মনে হইলেও এইসব মজুরের কর্মশক্তির পরিমাণ কৃষির দিক হইতে সমৃদ্ধ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মজুরদের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া ভারতীয় কৃষক আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষিনীতির খোঁজখবর না রাখিয়া জীর্ণ লাঙ্গল ও শীর্ণ বলদে কৃষিকার্য চালায়। কলের লাঙ্গল, বীজ বপন ও শস্য কর্তনের যন্ত্র ইত্যাদি ট্র্যাক্টর শ্রেণীর যন্ত্রাদি তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এদিক হইতে দেখিলে ভারতীয় কৃষিকর্মীর পারিশ্রমিকের হার সুলভ মনে করিবার কোন

কারণ নাই। কৃষকশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার না হইলে তাহারা যে সহজে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য চালাইয়া শ্রমশক্তির অপচয় বন্ধ করিতে পারিবে এ আশা কম। তবে এ সব ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলেও কৃষকদের সত্যকার আর্থিক সাচ্ছল্য সৃষ্টির জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল অতিরিক্ত লোকসংখ্যাকে শিল্পাদিতে নিয়োগ করিতে হইবে।

কৃষিকর্মের সহিত গো-মহিষাদির সম্পর্ক নিবিড়। এদেশে গবাদি পশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা হয় না বলিলেই চলে। এই অবহেলা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর সন্দেহ নাই।

মূলধন—ভারতীয় কৃষকদের স্থায়ী দারিদ্র্যের জন্য ভারতের কৃষিকার্যে মূলধনের যোগান একটি স্থায়ী সমস্যা। অর্থাভাবে ভাল বীজধান সংগ্রহ করা, যথেষ্ট উন্নত ধরণের সার প্রয়োগে ও কর্মঠ বলদের সাহায্যে ভালভাবে জমি তৈয়ারী করা, শস্যাদি সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করা, যথাকালে শস্য কাটিয়া ঘরে তোলা ও মরশুম বুঝিয়া বাজারজাত করা প্রভৃতি কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষের সময় অর্থাভাবে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যদিও বা কখনও কোনক্রমে চাষটা চালাইয়া দেয়, অভাবের তাড়নায় অপেক্ষা করিতে পারে না বলিয়া নরম বাজারে শস্য ছাড়িয়া দেওয়ায় তাহাদের প্রচুর লোকসান হয়। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা ভারতীয় কৃষির বৎসরে যখন অন্ততঃ ৮০০ কোটি টাকা মূলধন প্রয়োজন, তখন সর্বসাকুল্যে সংগৃহীত হয় বড় জোর ৫০০ কোটি টাকা। এইভাবে বিপুল পরিমাণে মূলধন ঘাটতির ফলে ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থায় আশানুরূপ লাভ হইতেছে না। ইহার উপর শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যান্য নানা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্ম সংক্রান্ত কারণে গ্রাম্য মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করে বলিয়া কৃষকেরা চাষের কাজে প্রায়ই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না। এই ভাবে অনেক জমিও তুচ্ছ কারণে হাতছাড়া হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতে এই ভাবেই ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের একটি বিরাট শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। যতদিন এদেশে সমবায় আন্দোলন সুপ্রসারিত না হইতেছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি-ঋণদান বিভাগ, কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক বা সমবায় কৃষিঋণদান সমিতিগুলি যতদিন কৃষকদের কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাইবার ভার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিবে, ততদিন দুঃস্থ ও ঋণগ্রস্ত ভারতীয় কৃষকের পক্ষে ভালভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভব। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য

যে সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে যে ৪০০ শাখা স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেছে এবং সমবায় আন্দোলন প্রসারে ও কৃষি বিভাগ ও কৃষিনীতি সংস্কারে সরকারী কর্তৃপক্ষ যেভাবে অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহাতে এই সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অনেকটা দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সংগঠন—কৃষিব্যবস্থার উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করা সরকারী কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। তবে একথাও ঠিক যে শুধু সরকার সচেষ্ট হইলেই চলিবে না, কৃষকদেরও নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। বাস্তবিক, এদিক হইতে ভারতীয় কৃষকের আগ্রহের অভাব বিস্ময়কর। সম্ভবতঃ বংশানুক্রমে দুঃসহ অর্থাভাব ও ক্রমবর্ধমান ঋণভারের চাপ কৃষিজীবীকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ করিয়া তোলে বলিয়াই সে তাহার জমির উন্নতি ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির জন্য আশানুরূপ চেষ্টা করে না বা করিবার উৎসাহ বোধ করে না। তাছাড়া দায়িত্ব অত্যধিক বলিয়াও ভারতীয় কৃষক অপরিচিত নূতন বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করিবার ঝুঁকি লইতে সাহস করে না। গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের ও সমবায় আন্দোলনের প্রসার* প্রভৃতির দ্বারা কৃষকশ্রেণীর একটু আর্থিক সাচ্ছল্য সৃষ্টি করিতে পারিলে কৃষিব্যবস্থার সংস্কারে তাহাদের আগ্রহও সহজেই আশা করা যায়। গান্ধীজী প্রবর্তিত চরকা আন্দোলনেরও অন্যতম উদ্দেশ্য হইল এইভাবে সাধারণ ভারতবাসীকে অপেক্ষাকৃত আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা।

আমাদের দেশে কৃষকেরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অসঙ্ঘবদ্ধ। অশিক্ষার গ্লানি দূর করিয়া ইহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা যেমন সরকার ও নেতৃবৃন্দের কর্তব্য, তেমনি কৃষিসম্পর্কিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি কৃষকদিগকে জানাইয়া দেওয়ার দায়িত্বও তাঁহাদিগকেই লইতে হইবে। কৃষির উন্নতির জন্য শুধুমাত্র এদেশের দরিদ্র অশিক্ষিত কৃষকদের শুভবুদ্ধি ও কর্মোৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই।

কৃষকদের প্রয়োজনের সময় বীজধান ধার দেওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদে ও অল্প সুদে তাহাদিগকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি তাহাদের

* জাপানের কৃষিনীতির উন্নতির মূলে আছে সে দেশের প্রসারিত সমবায় ব্যবস্থা। জাপানে শতকরা ৯৫ জন কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য। সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদের প্রয়োজনীয় মূলধন যোগায় এবং তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের শতকরা ৯৫ ভাগ ফসল বাজারজাত করিবার ভার লয়।

উৎপন্ন পণ্য সর্বাধিক দরে বাজার-জাত করিবার ব্যবস্থা করাও দরকার। সমবায় নীতির প্রসারের উপর অথবা সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণের উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে। ভারতীয় কৃষক কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম কখনও পায় না। ক্রেতা যেক্ষেত্রে ফসলের জন্য এক টাকা দেয়, চাষী প্রকৃতপক্ষে পায় মাত্র ৫২ নয়া পয়সা। কৃষকেরা যাহাতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের সুবিধা পায়, সেজন্য বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকারের আশু কর্তব্য। কৃষকদের অবসর সময়ে কুটির শিল্পে অংশ গ্রহণ করিয়া কিছু আয়ের সুযোগ হইলে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে। এ দায়িত্ব সমবায় সমিতিগুলি গ্রহণ করিতে পারে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারী প্রথা বিলোপের ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষকদের শোষণমুক্ত ও সচ্ছল করিতে হইলে এদেশের প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার সংস্কার অত্যাবশ্যক সন্দেহ নাই।

মোট কথা, দেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসীর জীবিকা কৃষির উপর নির্ভর-শীল, কাজেই ভারতে কৃষি-উন্নতির যে কোন পরিকল্পনার নিজস্ব গুরুত্ব আছে। শিক্ষার প্রসার খুব দ্রুত না হইলেও ভারতীয় কৃষকেরা আজকাল ক্রমে সজাগ, সচেতন ও অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের কর্মনিষ্ঠাও এখন সকলেই স্বীকার করেন। এ সময় সরকার ও দায়িত্বশীল দেশবাসীর কল্যাণ-সাধনের সক্রিয় যে কোন চেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সরকারও বর্তমানে এদিক হইতে লক্ষণীয় আগ্রহ দেখাইতেছেন। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Project) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা (National Extension Service) চালু হইবার এবং কৃষিনীতির সংস্কৃত হইবার ফলে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার অগ্রগতির সূচনা হইয়াছে সন্দেহ নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ হইতে "ফেডারেল ক্রপ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন" যেমন সে দেশের শস্যবীমার ভার লইয়াছেন, ভারত সরকারের কৃষিদপ্তর হইতে এদেশে অনুরূপ শস্যবীমা প্রবর্তনের চেষ্টা কার্যকরী হইলেও ভারতীয় কৃষকদের অনেক সুবিধা হয়। কৃষকদের কৃতিত্ব অনুযায়ী সরকার হইতে পুরস্কারাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাতে কৃষকেরা নিঃসন্দেহে অনেক উৎসাহ পাইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচসহ কৃষিপরিকল্পনায় ৭৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই দুই খাতে ১০৫৪

কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ অন্তে ডাল ও ছোলা সহ ভারতে অতিরিক্ত ৭৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া পরিকল্পনায় আশা করা হইয়াছিল; সরকারী হিসাবে ইহা আরও বাড়িয়া ১ কোটি ১০ লক্ষ টন হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংশোধিত হিসাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আরও দেড় কোটি টন বাড়িয়া মোট ৮ কোটি ৪ লক্ষ টন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনার আশানুযায়ী সার্থকতা ভারতীয় কৃষির ত্রুটিসমূহ বহুলাংশে বিদূরিত করিবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ ভোয়েলকার ভারত সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এদেশের কৃষির উন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান পরামর্শ দিয়াছিলেন। সমস্যা এখনও প্রায় একইরূপ আছে বলিয়া ডাঃ ভোয়েলকারের সুপারিশ সমূহের মূল্য আজও কমে নাই। তাঁহার কয়েকটি সুপারিশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১) কৃষকদিগের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও কৃষিশিক্ষার প্রসার এবং প্রাদেশিক ভাষায় কৃষিসংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা; (২) প্রয়োজন মত অঞ্চল বিশেষে জলসেচের জন্য খাল ইত্যাদি খনন; (৩) কূপ খনন ও কৃষিসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কৃষিবিভাগীয় নীতির সম্প্রসারণ; (৪) প্রত্যেক জেলায় সেচব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কে তদন্তের জন্য কৃষিবিভাগীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন; (৫) গো-মহিষাদির খাদ্য ও জ্বালানি কাঠ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা, খাল ও রেললাইনের ধারে ধারে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, গাছ ও লতাগুল্মাদির চাষ বাড়ানো; (৬) নূতন শস্য, কৃষিপদ্ধতি, সার প্রভৃতি সম্বন্ধে রাসায়নিক বিজ্ঞানাদির সাহায্যে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালানো; (৭) সরকারী গবেষণাগারে নূতন যন্ত্রপাতি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং পরীক্ষিত উচ্চশ্রেণীর যন্ত্রপাতির সহিত কৃষকদের সক্রিয় পরিচয় ঘটানো, (৮) সরকারী গোলাবাড়ী হইতে কৃষকদিগের বীজধান ধার দেওয়া; (৯) সরকারী গোলাবাড়ীতে উচ্চশ্রেণীর ষাঁড় রাখা এবং উন্নতধরণের গবাদি পশু প্রজননের সুবিধা করিয়া দেওয়া।

বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর সময় ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে নিযুক্ত রাজকীয় (Royal) কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে (১৯২৮) চাষের গরু হইতে সুরু করিয়া সেচব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, পথঘাটের সমস্যা, কৃষিঋণ, গ্রামাঞ্চলের

কুটির শিল্প, উদ্যানশিল্প, প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু মূল্যবান পরামর্শ দেন। এই কমিশনের সুপারিশেই সারাদেশেই কৃষি গবেষণার ব্যবস্থায় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য 'ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ' নামক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। কমিশন দালাল শ্রেণীর মুনাফাখোরদের কবল হইতে কৃষকদিগকে বাঁচাইবার জন্য সরকারকে রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধনের, কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের এবং দেশের সর্বত্র ওজন বা মানের সমতা সাধনের উপদেশ দেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের সভাপতিত্বে ভারতীয় রাজ্যসমূহের কৃষিসচিবদের যে সম্মেলন হয়, তাহাতে এদেশের কৃষিব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি এখনও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—(১) খণ্ডবিখণ্ড জমিগুলিকে একত্রিত করিয়া অথবা যৌথ ইউনিট গঠন করিয়া চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (২) খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বে-সরকারী সহযোগিতা অত্যাবশ্যক বলিয়া সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে সমবায় সমিতি, পঞ্চায়েৎ এবং অন্যান্য গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। যেখানে এই প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করিতে ও সেগুলিকে ব্যবহার করিতে হইবে; (৩) কৃষি তথ্যাদি সঠিকভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; (৪) প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে বীজ-উৎপাদন ও বণ্টনের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৫) বনাঞ্চলগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষা করিতে হইবে; (৬) খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেক প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।

ভারতের জাতীয় শাসন কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ভারতীয় কৃষির ত্রুটিসমূহ দূর করিয়া উহার উন্নতির জন্য যে আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহা অতীতের হিসাবে নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। এই উদ্দেশ্যে আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (যাহার ব্যয়বরাদ্দ দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিগুণ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে) কৃষিখাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ বরাদ্দ হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। কৃষিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ ব্যাপারে তাঁহারা এখন উৎসাহী হইয়াছেন। জমিদারী প্রথা বিলোপের পর অতিরিক্ত জমি কৃষকদের মধ্যে

বিলি করিবার ব্যাপারে, সমগ্রভাবে ভূমিব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসে এবং কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাব (জানুয়ারী, ১৯৫৯) অনুযায়ী সেবা সমবায় ও যৌথ-খামার-নীতিতে কৃষিকার্য প্রবর্তনে তাঁহারা সক্রিয় উৎসাহ দেখাইতেছেন। ভারতের কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ভারতসরকার কৃষির উন্নতিসাধন করিয়া কৃষিপণ্যের উৎপাদন এমনভাবে বাড়াইতে চান যাহাতে অন্তর্দেশীয় অভাব মিটিয়াও বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপযোগী ফসল উদ্বৃত্ত হয়।*

*"The Union Government is determined to increase agricultural production not only for home consumption but also for the purpose of exports in order to earn foreign exchange."

ভারতের কৃষিঋণ

(Agricultural Indebtedness in India)

ভারতের প্রকৃত পরিচয় তাহার গ্রাম, সহর নয়। গ্রামে ভারতের শতকরা ৮২ ভাগ লোক বাস করে এবং গ্রামবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। কাজেই কৃষিজীবীদের আর্থিক অবস্থাই ভারতবাসীর সত্যকার আর্থিক অবস্থা। এই অবস্থা কিন্তু এত হীন যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে অথবা পরোক্ষ-ভাবে কৃষিকর্মের উপর নির্ভর করে, সব জড়াইয়া ভারতের এইরূপ শতকরা প্রায় ৮০ জন লোককে কৃষিজীবী বলা যায়। এই বিরাট জনসংখ্যা অর্থাভাবে ও অস্বাস্থ্যে জীবন্মৃত। অভাবের তাড়নায় জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের উৎসাহ তাহারা অনুভব করে না। এই সব কৃষিজীবী আকণ্ঠ ঋণভারে নিমজ্জিত।* ভারতে পুত্র উত্তরাধিকারীরূপে পিতার ঋণ পায় এবং সারাজীবন পিতার দেনার সহিত নিজের দেনা বাড়াইয়া মৃত্যুকালে পর্বতপ্রমাণ ঋণভার সন্তানের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া যায়। ভারতীয় কৃষকের এই বংশানুক্রমে ঋণভারের সমস্যাই বলিতে গেলে পল্লীভারতের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় সমস্যা। বলা বাহুল্য, যে পর্যন্ত ভারতের কৃষিজীবী সম্প্রদায় পিতৃপিতামহের ঋণভারের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে স্বীয় পরিবারের ভরণপোষণের পূর্ণ সুযোগ না পাইবে, সে পর্যন্ত ভারতের সত্যকার উন্নতি হইতেই পারে না।

গ্রাম্য মহাজনেরা ধার দেওয়া টাকার উপর অস্বাভাবিক হারে সুদ আদায় না করিলে কৃষকদের অবস্থা কখনই এতটা শোচনীয় হইত না। প্রয়োজনের হিসাবে ভারতের গ্রামে সমবায় বা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মোটেই প্রসার হয় নাই। মহাজনেরা সুদখোর হইলেও টাকার দরকার হইলে তাহাদের নিকট না গেলে উপায় নাই। মহাজনেরাও সব সময়ে কৃষককে ঋণজালে জড়াইয়া ফেলিতে উৎসুক। এক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে কৃষককে গ্রাম্য মহাজনের কবলে পড়িতেই হইবে। ছোট বড় মিলাইয়া ভারতে প্রায় ৫ লক্ষ মহাজন আছে।

---

* ভারতের চাষীরা যে অত্যধিক ঋণগ্রস্ত ইহার কারণস্বরূপ অনেকে তাহাদের আলস্য ও কলহপ্রিয়তা এবং মামলাপ্রিয়তার উল্লেখ করেন। কিন্তু ওয়াদিয়া এবং মার্চেন্টের (Our Economic Problems, Ch. XII) মত অনেকে আবার বলেন যে, আলস্য ও কলহপ্রিয়তা নয়, মুনাফাহীন বা স্বল্প মুনাফার কৃষিকর্মই ভারতীয় কৃষকের দারিদ্র্য তথা ঋণের কারণ।

সরকারী হিসাবেই প্রকাশ, ভারতীয় কৃষিজীবী যে টাকা ধার করে তাহার শতকরা ৬৯·৭ ভাগ যোগায় ভারতীয় মহাজনেরা এবং ব্যক্তিগত ঋণদানসূত্রে যোগান হয় শতকরা ১৭ ভাগ। সরকারী প্রয়াস, সমবায় সমিতি ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের দ্বারা এই প্রয়োজনের শতকরা ৭·৩ ভাগ মাত্র মিটান হইয়া থাকে।*

বিভিন্ন সময়ে ভারতের গ্রাম্য-ঋণের পরিমাণ নিম্নোক্তরূপে অনুমিত হইয়াছে :—

দক্ষিণভারত প্রজা কমিশন —১৮৭৫—মাথাপিছু ৩৭১ টাকা
স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলেগান —১৯১১—৩০০ কোটি টাকা
এম এল ডার্লিং —১৯২৪—৬০০ কোটি টাকা
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি —১৯২৯—৯০০ কোটি টাকা
ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় —১৯৩৫—১,২০০ কোটি টাকা
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগ—১৯৩৭—১,৮০০ কোটি টাকা
ই. ভি. এস. মানিয়াম —১৯৩৮—১,৮০০ কোটি টাকা

যুদ্ধের সময় চাষীদের অবস্থা কৃষি-পণ্যাদির মূল্যবৃদ্ধির ফলে অনেকটা ভাল হয়। এজন্য গ্রাম্য ঋণের সমষ্টিগত পরিমাণ কিছুটা কমিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। ডাঃ নারায়ণ স্বামী নাইডু মাদ্রাজ প্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইয়া অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সরাইয়া কমিটিরও (১৯৪৪) ইহাই ধারণা। তবে এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ মনে করেন যে, রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য কিনিতে সুরু করায় এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্যের দর ক্রমশঃ বাড়িতে থাকায় চাষীদের সচ্ছলতা স্থায়ী হয় নাই। যুদ্ধের সময় গ্রামাঞ্চলে আধুনিক জীবনযাত্রার রীতি প্রসারলাভ করায় জীবনযাত্রার মান বাড়িয়া কৃষকদের ব্যয়ের অঙ্কও বাড়াইয়া দিয়াছে।

সুদখোর মহাজনদের শোষণ হইতে অসহায় দরিদ্র কৃষিজীবী গ্রামবাসীদের বাঁচাইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি আইন প্রণীত হয়। ইহাদের মধ্যে

* গ্রাম্যঋণ অনুসন্ধান কমিটি (All India Rural Credit Survey Committee, (1954) তাঁহাদের রিপোর্টে গ্রাম্যঋণ সূত্রের মোট পরিমাণের নিম্নরূপ আনুপাতিক শতকরা হার অনুমান করিয়াছেন :—পেশাদার মহাজনগণ—৪৪·৮, কৃষিজীবী মহাজন—২৪·৯, আত্মীয় স্বজন—১৪·২, ব্যবসায়িগণ ও তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গ—৫·৫, সরকার—৩·৩, সমবায় সমিতি-সমূহ—৩·১, জমিদারগণ—১·৩, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ—০·৯, অন্যান্য—১·৮ = ১০০।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় চাষীখাতক আইন (Bengal Agricultural Debtors' Act of 1935), ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মাদ্রাজ কৃষিজীবী ঋণমুক্ত আইন (Madras Agriculturists' Relief Act of 1938) ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বোম্বাই কৃষিখাতক আইন (Bombay Agricultural Debtors' Act of 1939), ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের যুক্তপ্রদেশ কৃষিঋণমুক্তি আইন (U. P. Agricultural Debt Redemption Act of 1939) ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যপ্রদেশ ঋণমুক্তি আইন (C. P. Relief of Indebtedness Act of 1939) প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং সুবিধা বৃদ্ধির অনুপূরক হিসাবে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক বা স্টেট্ ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। এছাড়া সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করিয়া কৃষি ঋণদান সহজ করিতে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধিত করিয়া জাতীয় কৃষি-ঋণদান তহবিল (National Agricultural Credit Fund) এবং জাতীয় কৃষি-ঋণ স্থিতীকরণ তহবিল (National Agricultural Credit Stabilisation Fund) গঠন করা হইয়াছে।

ভারতীয় কৃষকদের বিরাট ঋণভার জমিয়া উঠিবার কতকগুলি কারণ আছে এবং সেইগুলি বিদূরিত করিতে না পারিলে কৃষকদের তথা ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য কোন কালেই প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

কৃষকদের অপরিসীম দারিদ্র্যই তাহাদের দুর্গতির সবচেয়ে বড় কারণ। জমির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যার বাহুল্য, অবৈজ্ঞানিক কৃষিরীতি, কৃষিপণ্য বাজার জাত করিবার অসুবিধা, মধ্যবর্তী দালাল ও ফড়িয়াদের শোষণ, কৃষি-জীবীদের অভাবের সুযোগ লইয়া পাইকারদের মুনাফাবৃত্তি, গ্রাম্য মহাজনদের শোষণ, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনে অপব্যয়, মামলামোকর্দমা-প্রিয়তা, চাষের গবাদি পশুর অভাব, চাষীদের স্বাস্থ্যহীনতা,—এইরূপ নানা ছোট বড় কারণে ভারতের গ্রামবাসী তথা কৃষিজীবী ক্রমবর্ধমান দুর্দশা ভোগ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের অবস্থার সত্যকার উন্নতি করিতে হইলে সমবায় ব্যবস্থার প্রসার, বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, দ্বিতীয় আয়ের পথ হিসাবে সমবায় সমিতি মারফৎ কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ, শস্যবীমা, বৃথা অপব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য, গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার প্রসার, সরকারী সহযোগিতা ও সহানুভূতি,—ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। আইনের

সাহায্যে ও সরকারী অর্থসাহায্যে বর্তমান ঋণভার হইতে তাহাদের মুক্তি দিয়া দায়িত্বমুক্ত ভাবে নূতন জীবনযাত্রার সুযোগ দিলে ভারতীয় কৃষক নিঃসন্দেহে অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এখন জমিদারী বিলোপাদির সাহায্যে ভূমিপ্রথার সংস্কার সাধনের চেষ্টা চলিতেছে, ইহার ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের জমির উপর অধিকার জন্মাইলে তাহাদের আয়বৃদ্ধিরও আশাআছে।

পূর্বোল্লিখিত গ্রাম্যঋণ অনুসন্ধান কমিটির (All India Rural Credit Survey Committee, 1954) সুপারিশ অনুযায়ী চাষীদের তথা গ্রামের অধিবাসীদের ঋণদায় কমাইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয়করণের পর রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক) গ্রাম অঞ্চলে ৪০০টি শাখা প্রতিষ্ঠার সংকল্প কার্যে পরিণত করিতেছে। সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে ভালভাবে কাজ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতার স্মারক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনায় ১০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় কৃষিঋণ তহবিল খোলা হইয়াছে। আশা করা যায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই তহবিলের মূলধনের পরিমাণ বর্ধিত হইয়া ৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত স্যার ম্যালকম ডার্লিংয়ের রিপোর্টে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বিশেষ বিবেচনার পরই করা উচিত বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে এবং এই রিপোর্টে আরও বলা হইযাছে যে, সমবায় আন্দোলনের সহিত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ না হওয়াই ভাল।

চাষীদের আর্থিক সচ্ছলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিপণ্য কর্পোরেশন আইন [Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act, 1956] প্রবর্তিত হইয়াছে এবং এই আইনের বলে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ বোর্ড (National Co-operative Development and Warehousing Board) এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় গুদামজাতকরণ সংসদ (Central Warehousing Corporation) নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এছাড়া সমবায় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে সরকার যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল (National Co-operative Development Fund) নামে একটি সংস্থা গঠনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

দামোদর উন্নয়ন পরিকল্পনা

(The Damodar Valley Project)

বিহারের পালামৌ জেলার খামারপাত জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন হইয়া দামোদর নদ পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার ৩০ মাইল দক্ষিণে হুগলী নদীর সহিত মিশিয়াছে। দামোদর উপত্যকার ৮,৫০০ বর্গমাইল এলাকা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। বিশেষজ্ঞগণের অনুমান, ভারতের কয়লা সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ ও লৌহমাক্ষিকের শতকরা ৯৪ ভাগ এই অঞ্চলে সঞ্চিত আছে। এছাড়া ম্যাংগানিজ, কিয়ানাইট, ক্রোমাইট, এ্যাসবেস্টস্‌, চূণা পাথর প্রভৃতি খনিজও এখানে যথেষ্ট।

দামোদরের নদীগর্ভ ভরাট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বারবার দামোদরে ভয়াবহ বন্যা হইত। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ বন্যার কথা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। এইসব বন্যায় বর্ধমান ও হুগলী জেলার খুবই ক্ষতি হইত। হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার দামোদরের তীরভূমি ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল।

অবিরাম দুর্ভাগ্য হইতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহকে বাঁচাইবার জন্য এবং সেচব্যবস্থা এবং নদীপথের দিক হইতে সম্ভাবনাপূর্ণ দামোদরের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী নদীও দামোদরের মতই ক্ষতিকর ছিল, মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারসমূহের সহযোগিতায় টেনেসী নদী নিয়ন্ত্রণে সফলকাম হন। দামোদর উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনায় 'টেনেসী উন্নয়ন পরিকল্পনা' বিশেষভাবে অনুসরণ করা হইয়াছিল। টেনেসী উপত্যকা পরিকল্পনার প্রজেক্ট ইনজিনিয়ার মিঃ ডব্লিউ এল ভুরডুইন স্বয়ং এ বিষয়ে ভারতসরকারকে সাহায্য করেন। স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতীয় পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান* গঠন করিয়া উহার উপর পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ভার দেন।

* 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন' আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান। ইহার সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের' আইনের ৪৮ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে যে, কর্পোরেশন স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকারী হইলেও নীতির ব্যাপারে ভারত সরকার ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবেন। নীতির প্রশ্নে কর্পোরেশনের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের মতদ্বৈধ ঘটিলে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

দামোদর পরিকল্পনায় চারটি বড় বড় বাঁধ (Dam) নির্মিত হইয়াছে। এই বাঁধগুলির নাম (১) পাঁচেট হিল, (২) কোনার, (৩) মাইথন ও (৪) তিলাইয়া। প্রথম তিনটি বাঁধের সঙ্গে ১,৫০,০০০ কিলোওয়াট জল-বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এছাড়া তিলাইয়া বাঁধের নিকট বোকারোতে এবং দুর্গাপুরে মোট ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের উপযুক্ত থারমাল পাওয়ার স্টেশন (নিম্নশ্রেণীর কয়লা পুড়াইয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা) নির্মিত হইয়াছে। দুর্গাপুরে সেচ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য একটি বিরাট জলাধার (Barrage) তৈয়ারী হইয়াছে। এই জলাধার হইতে অনেকগুলি খালে জল সরবরাহ হইবে। ১৫৫০ মাইল আয়তন সম্পন্ন এই খালগুলির মধ্যে ৮৫ মাইল নৌচলাচলের উপযুক্ত হইবে এবং ইহার সাহায্যে কলিকাতা ও কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হইবে। দামোদর পরিকল্পনায় মোট ১১ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে। এই পরিকল্পনায় যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইতেছে তাহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক রেলপথের প্রসার ব্যতীত যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্পে বৈদ্যুতিক শক্তির যোগান দেওয়া হইবে। ইহাতে কয়লা ও অভ্রখনি এলাকার উন্নতি হইবার কথা।

দামোদর পরিকল্পনার সফলতার সহিত বিহারের হাজারিবাগ ও বরাকর অঞ্চলের এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতি ও চলাচল ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কারণ এই পরিকল্পনায় শুধু দামোদর নদের সংস্কারের কথাই নাই, বরাকর, কোনার, বোকারো, বেহুলা, কুন্তী, সরস্বতী, বাঁকা প্রভৃতি দামোদরের হাজামজা শাখানদীগুলিরও একটা ব্যবস্থা হইবে। শুধু ইহাই নয়, পরিকল্পনা মত সত্যই যদি দামোদর নদ হইতে ১,১০০ কিউসেক (প্রতি সেকেণ্ডে ঘনফুট) পরিমিত জল নিয়ত হুগলী নদীতে প্রবাহিত হয়, হুগলী নদীর মুখের অগভীরতা সমস্যার সমাধান হইয়া কলিকাতা বন্দরে বৃহদাকার জাহাজ চলাচলের জন্য বাৎসরিক দশলক্ষ টাকা ব্যয়ের বহুলাংশ বাঁচিয়া যাইবে। এইভাবে দামোদর পরিকল্পনার ফলে কলিকাতা পরোক্ষ ভাবে বিশেষ লাভবান হইবে। এই পরিকল্পনার জন্যই কলিকাতার সহিত আসানসোলের জলপথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা দুই পর্যায়ে কার্যকরী হইতেছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ একরূপ শেষ হইয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে এই পর্যায়ের

বাঁধগুলি হইল তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঁচেট হিল। বোকারো তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (Thermal Power Station) এবং দুর্গাপুরে বৃহৎ জলাধার (ব্যারেজ) প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আয়ার বাঁধের ন্যায় বাকী কাজ দ্বিতীয় পর্যায়ের।

দামোদর পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিক শক্তি, সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মিলাইয়া মোট ১০৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র পরিকল্পনার জন্য প্রথমে ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল ৫৫ কোটি টাকা।* আশা করা হইয়াছে, দামোদর পরিকল্পনার ফলে মোট ১৩ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে † এবং অতিরিক্ত খাদ্যশস্য জন্মাইবে বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টন। ইহার মূল্য অন্ততঃ ৩০ কোটি টাকা। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তিও পাওয়া যাইবে। এই শক্তির সাহায্যে দামোদর অঞ্চলে শিল্পপ্রসার, বিশেষ করিয়া কুটির শিল্পের প্রসার হইবে এবং পরিবহন ব্যবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি হইবে। কয়লা শিল্পের দিক হইতে দামোদর পরিকল্পনা বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে সন্দেহ নাই। দামোদর পরিকল্পনা শেষ করিতে ১০৫ কোটি টাকার বেশি অর্থাৎ প্রাথমিক অনুমানের দ্বিগুণ খরচ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিলিত ভাবে বহন করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ পরিকল্পনার দ্বারা সর্বাধিক উপকৃত হইতেছে বলিয়া এই রাজ্য মোট ব্যয়ের শতকরা ৫৮ ভাগের মত বহন করিতেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের দামোদর পরিকল্পনার মোট ১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনে দামোদর পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশ্বব্যাঙ্ক এই পরিকল্পনার জন্য ভারতকে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ঋণ দিয়াছেন। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাঁহাদের আইনের ৪৮০ ও ৬৬৫ সংখ্যক ধারা (P. L. 480 and 665) অনুযায়ী ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চের

---

* এই ৫৫ কোটি টাকার মধ্যে ১৫ কোটি টাকা বন্যা প্রতিরোধের জন্য, ২৮ কোটি টাকা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ও ১৩ কোটি টাকা সেচের জন্য ধরা হইয়াছিল।

† দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দামোদর পরিকল্পনার দ্বারা ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার একর জমি জলসেচের সুবিধা পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

এক চুক্তিতে ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদনের উন্নতিসূচক দামোদর পরিকল্পনার জন্য ১১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ বরাদ্দ করিয়াছেন।*

দামোদর পরিকল্পনার মত বহুমুখী ব্যাপক পরিকল্পনায় অর্থব্যয় প্রচুর হইবেই, কিন্তু তবু দেশের আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় কাজের ক্ষতি না করিয়া খরচ যথাসম্ভব কম করা উচিত। এ ছাড়া অপচয় যাহাতে না হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। দামোদর পরিকল্পনায়, অনেকের ধারণা, অর্থের অপচয় হইতেছে। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন তদন্ত কমিটিও (রাও কমিটি) এই অপচয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্টে (এপ্রিল, ১৯৫৪) শুধু কোনার বাঁধেই ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা অপব্যয় হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

---

* এই চুক্তিতে নিম্নলিখিত ১৪টি নদনদী পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোট ১০০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছে :

রিহান্দ—৮ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা, শরাবতী—৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, চম্বল—১৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, হিরাকুঁদ—৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা, দামোদর—১১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, মাহী—২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, কাক্রয়াপার—৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা, নাগার্জুনসাগর—৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা, কোশী—৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ভদ্রা—৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, তুঙ্গভদ্রা—৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা, মহানদী—৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, কুন্দা—৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ও কয়না—১১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা।

ভারতের শক্তিসম্পদ ও তাহাদের ব্যবহার

(Power Resources and their Utilisation in India)

যন্ত্রশিল্পের প্রসার ব্যতীত ভারতের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি অসম্ভব এবং এই শিল্পপ্রসারের জন্য বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিসম্পদ কাজে লাগান দরকার। ভারতের কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্যও প্রচুর শক্তিসম্পদের প্রয়োজন।

মানুষের শ্রমশক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে গবাদি পশুর শ্রমশক্তির গুরুত্ব ভারতবর্ষে কম নয়। গবাদি পশুই ভারতের কৃষিকর্মের প্রধান অবলম্বন। ভারতে রেলপথ ও জলপথ প্রয়োজনের তুলনায় প্রসারিত হয় নাই বলিয়া অন্তর্দেশীয় পণ্য চলাচল ব্যবস্থায় গরু, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি পশু বিশেষ অংশ-গ্রহণ করিয়া থাকে।

অবশ্য শক্তিসম্পদ বলিতে প্রধানতঃ কয়লা, তৈল বা পেট্রোল, কাষ্ঠ, জল-শক্তি, সুরাসার, বায়ু ইত্যাদিই বুঝায়। এই সব শক্তিসম্পদ ভারতে প্রচুর, কিন্তু ব্যবস্থার অভাবে ইহাদের ব্যবহার হয় যৎসামান্য। ভারতের কৃষি, শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থা প্রসারিত ও সমুন্নত হইলে শক্তিসম্পদের ব্যবহার অবশ্যই বাড়িয়া যাইবে।

কয়লা—রেলগাড়ী প্রভৃতি যানবাহন ও কলকারখানা চালাইতে এবং উত্তাপ সৃষ্টি করিতে কয়লা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রচুর কয়লাসম্পদ ব্রিটেনের শিল্পোন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতে যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা আছে, কিন্তু উত্তোলন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য এই শক্তিসম্পদ পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। ভারতে এখন যে কয়লা উত্তোলিত হয়, শক্তিসম্পদ হিসাবে তাহার বড় একটি অংশ গুণে নিকৃষ্ট। ভারতীয় কয়লার শতকরা ৩১ ভাগ রেল ইঞ্জিন চালাইতে, ৮ ভাগ জাহাজ চালাইতে, ২০ ভাগ ধাতু নিষ্কাশনে এবং ২৮ ভাগ শিল্পে লাগে। নিকৃষ্ট ধরণের কয়লা হইতে দামোদর পরিকল্পনার বোকারো বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টন কয়লা খনি হইতে উত্তোলিত হয়।

স্যার লুই ফারমার প্রমুখ কোন কোন খনিবিদ্যাবিশারদ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে সঞ্চিত কয়লা সম্পদ আর বেশি দিন চলিবে না।

ভারতে মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৮ হাজার কোটি টন বলিয়া অনুমিত হইলেও ইহার ¼ অংশ খুব নীচে অবস্থিত বলিয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। ভারতে উচ্চশ্রেণীর কয়লার পরিমাণ ৫০০ কোটি টনের বেশি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রয়োজনীয় খনিজ হিসাবে কয়লার অপচয় বন্ধের জন্য সর্ববিধ চেষ্টা হওয়া উচিত। ব্রিটেনের মত ভারতের কয়লাখনিগুলির জাতীয়করণ হইলে এদিক হইতে যথেষ্ট সুফল আশা করা যায়।

পেট্রোলিয়াম—শক্তিসম্পদ হিসাবে পেট্রোলিয়াম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর এ হিসাবে ভারতবর্ষ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পাকিস্তান গঠিত হইবার পর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মদেশে বৎসরে গড়ে ২১ কোটি ৩০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল পাওয়া যায়, পাকিস্তানে পাওয়া যায ১ কোটি ৯০ লক্ষ গ্যালনের বেশি। ভারতে বৎসরে ৪ লক্ষ টনের মত পেট্রোল পাওয়া গেলেও ভারতের প্রয়োজন ৭০ লক্ষ টনের। ভারত বাধ্য হইয়া ব্রহ্মদেশ, পারস্য, সৌদী আরব, সুমাত্রা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল ও কেরোসিন তৈল আমদানী করে। ভারতের উৎপন্ন পেট্রোলের অধিকাংশই আসামের ডিগবয় অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ভারতে নূতন নূতন তৈলখনি আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। আসামেই পেট্রোলের কয়েকটি নূতন কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্যত্রও পেট্রোল কূপ আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। বিকল্প হিসাবে কয়লা হইতে কৃত্রিম পেট্রোল এবং ঝোলাগুড় হইতে সুরাসার উৎপাদন ব্যবস্থা ভারতে সাফল্য লাভ করিতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। ভারতে খনিজ তৈল শোধনের জন্য বোম্বাইয়ে ট্রম্বেতে দুইটি ও বিশাখাপত্তনে একটি তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। আসামের গৌহাটি অঞ্চলে অনুরূপ একটি তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠার কথা চলিতেছে।

ভারতের পেট্রোল উৎপাদন বা পরিশোধন ব্যবস্থায় বিদেশী মালিকানা অত্যধিক। স্বাধীন ভারতের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে এত বেশি বিদেশী কর্তৃত্ব অনেকে অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন।

কাষ্ঠ—ভারতে অরণ্যের পরিমাণ ২ লক্ষ ৮১ হাজার বর্গ মাইলের মত। এই অরণ্য সাধারণতঃ অবহেলিত হইয়া থাকে। অরণ্যের ক্ষতি না করিয়া

বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইহা হইতে প্রচুর কাষ্ঠ সংগ্রহ করা যায়। উত্তাপ সৃষ্টির হিসাবে কাষ্ঠ মূল্যবান শক্তিসম্পদ। অবশ্য অরণ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার বহুলাংশে পথঘাট ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির উপর নির্ভর করে।

বৈদ্যুতিক শক্তি—ভারতের জলশক্তি সুবিপুল। এদেশে অসংখ্য নদনদী জলপ্রপাত প্রভৃতি হইতে প্রচুর পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেই শক্তিসম্পদ যথাযথ ব্যবহৃত হইলে কলকারখানায়, গৃহস্থালীর প্রয়োজনে, যানবাহন চালনায় অথবা কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহীশূরের কাবেরী নদীর উপর শিবসমুদ্রম্ বাঁধ হইতে প্রাপ্ত জলবিদ্যুতের কথা ধরা যাক। এই বৈদ্যুতিক শক্তি ৯০ মাইল দূরবর্তী কোলার স্বর্ণখনিসমূহে বিতরিত হইয়া খনি চালু রাখে। এ পর্যন্ত ভারতে যে কয়টি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে মহীশূরে কাবেরী নদীর উপর শিবসমুদ্রম কেন্দ্র, কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর উপর শ্রীনগর কেন্দ্র, হায়দারাবাদে তুঙ্গভদ্রা কেন্দ্র, মাদ্রাজে পাপনাশন, মেত্তুর ও পাইকারা কেন্দ্র এবং বোম্বাইয়ের পশ্চিমঘাট পর্বতে টাটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সঙ্গে দামোদর, হীরাকুঁদ, ভাকরা-নাঙ্গল প্রভৃতি সাম্প্রতিক নদনদী-পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখনও ভারতের অধিকাংশ স্থলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয় বাষ্পশক্তি কেন্দ্রসমূহ হইতে। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তাঁহাদের চারিটি কেন্দ্র বা পাওয়ার ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিয়া কলিকাতার শিল্পাঞ্চল ও বাসগৃহসমূহে বিতরণ করে।

১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে সরকারী বেসরকারী মিলাইয়া ৪৬৮টি প্রতিষ্ঠান মারফৎ ভারতে মোট ৩২ লক্ষ'২৩ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। ইহার ভিতর বাষ্পবিদ্যুৎ (Steam Power) ছিল ১৭ লক্ষ ৬৩ হাজার কিলোওয়াট এবং ডিজেল ও জলবিদ্যুৎ (Diesel and Hydroelectric) ছিল যথাক্রমে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার কিলোওয়াট ও ১২ লক্ষ ১৪ হাজার কিলোওয়াট। এছাড়া এখন বিভিন্ন নদনদী পরিকল্পনায় ও নানা ভাবে এদেশে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতে শুধু জলবিদ্যুৎই বৎসরে ৬০ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। সুখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জে এইচ ভাবা ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে ভারতে

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১ কোটি ২০ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে, ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ কিলোওয়াট হইবে আণবিক শক্তি (Nuclear Side) হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের ও জীবনযাত্রার মানের দিক হইতে ভারতবাসীর অনগ্রসরতা নিম্নের মাথাপিছু বার্ষিক বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারের হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে-(কিলোওয়াট)—ক্যানাডা—৪,৫৪৮ ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—২,৯০৪ : ব্রিটেন—১,৫৩৪ ; জার্মানী—১,৩৭১ ; বেলজিয়াম—১,২০৩ ; হল্যাণ্ড—৯৯৮ ; জাপান—৬৭৭ ; ভারত—২০ ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে 'সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি' খাতে ধরা হইয়াছিল ৬৬১ কোটি টাকা বা মোট ব্যয়বরাদ্দের শতকরা ২৮·১ ভাগ। ইহার মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন খাতে ধরা হয় ২৬০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি' খাতে ৯১৩ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে (মোট ব্যয়বরাদ্দের শতকরা ১৯ ভাগ)। ইহার মধ্যে শুধু 'বৈদ্যুতিক শক্তি' খাতে ধরা হইয়াছে ৪২৭ কোটি টাকা। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতে ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল ২৩ লক্ষ কিলোওয়াটের। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ১৩ লক্ষ অতিরিক্ত কিলোওয়াট উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন আরও বাড়িয়া মোট ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াট হইবে এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৫০ ৫১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় সাড়ে তিনগুণ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

সরকারী "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা" হইতে ভারতের কয়েকটি বড নদনদী পরিকল্পনা ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পরিসংখ্যান নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পরিকল্পনার নাম	মোট খরচ (লক্ষ টাকায়)	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খরচ (লক্ষ টাকায়)	বৈদ্যুতিক শক্তি (হাজার কিলোওয়াট) কার্যশেষে	দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে
১। তুঙ্গভদ্রা	*৬,০৩৬	৭৯৫	৪৫	৪৫
২। ভাক্‌রা-নাঙ্গল	*১৯,৩৫৫	২,৭৬৯	৫৯৪	৫৪৬
৩। হীরাকুঁদ (১ম পর্যায়)	*৮৭৫০	৮০৩	১২৩	১২৩
৪। দামোদর পরিকল্পনা	*১০,৫৩৮	১,০৬৩	২৫৪	১০০
৫। চম্বল (১ম পর্যায়)	*৪,৮০৩	১,২৬২	৬৯	৬৯
চম্বল (২য় পর্যায়)	*১,৮০৭	৫০০	১০৭	২৩
৬। রিহান্দ (উত্তর প্রদেশ)	৪,৬২৬	২,৬০০	৩০০	১৫০
৭। কয়না (বোম্বাই)	৩,৮২৮	২,৯০০	২৪০	২৪০
৮। কুন্দা (মাদ্রাজ)	৩,৫৪৪	২,৩০০	১৮০	১৮০
৯। হীরাকুঁদ (২য় পর্যায়)	১,৪৩২	১,১৮৮	১০৯	১০৯
১০। যমুনা	*১,৯৫৯	৫৭০	২০১	১৭
১১। দুর্গাপুর থারমাল স্টেশন	১৪৫৪	১৪৫৪	১৫০	১৫০

* সেচ ব্যবস্থার খরচও এই মোট খরচের অন্তর্ভুক্ত।

বায়ুশক্তি—হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বায়ুচালিত অনেক কলকারখানা আছে। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলেও কিছু কিছু এই শ্রেণীর কারখানা দেখা যায়। কোথাও কোথাও বায়ুর গতির সাহায্যে কৃষকেরা তুষ প্রভৃতি ঝাড়িয়া শস্য পরিষ্কার করিয়া লয়। অবশ্য আধুনিক যুগে পেট্রোল, বৈদ্যুতিক শক্তি ও কয়লার ব্যবহার বাড়িয়াছে বলিয়া সব দেশেই বায়ুচালিত কারখানা বা 'উইণ্ড মিল' কমিয়া গিয়াছে, তবে ভারতে কয়লা ও পেট্রোলের যে অবস্থা, তাহাতে এখানে বায়ুশক্তি কাজে লাগাইবার দিকে সরকার এবং দেশবাসীর এখনও নজর দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

সুরাসার—ভারতে এখনও সুরাসার শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। চিনিশিল্পের উপজাত পণ্য হিসাবে ব্যাপক সুরাসার উৎপাদন সম্ভব। সুরাসার সম্পর্কে ভারতে নির্ভরযোগ্য গবেষণা হওয়া দরকার।

ভারতে সমবায় আন্দোলন

(Co-operative Movement in India)

সমবায় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল একতা ও সমতার ভিত্তিতে সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দকে নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেওয়া। দরিদ্র কৃষিজীবী ও কারিগর শ্রেণীর মধ্যেই অধিকাংশক্ষেত্রে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে। সে হিসাবে ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে সমবায় আন্দোলন যত প্রসারিত হয় ততই মঙ্গল। ব্যবসায়িক সাধনার সহিত জনকল্যাণের আদর্শ একাঙ্গীভূত হইয়া এই আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করিয়াছে।*

ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড অভাবের সুযোগ লইয়া গ্রাম্য মহাজনের দল বরাবর তাহাদিগকে শোষণ করিয়া আসিয়াছে। ইহাদের সুদের হার অত্যধিক এবং গ্রাম্য সমাজের উপর ইহাদের প্রভাব অসামান্য। অল্প সুদে ঋণ যোগাইয়া অসহায় কৃষকদিগকে এইরূপ মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতে সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হয়।

ভারতীয় কৃষকদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিজ নিজ কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে এসম্বন্ধে মত প্রকাশে আহ্বান করেন। ইতিমধ্যে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হয়। মাদ্রাজ সরকারের কর্মচারী স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এসম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধানে বিশেষ মনোযোগী হন এবং ইউরোপ হইতে ফিরিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে তিনি জার্মানীর রাইফিসেন সমিতির (Raiffeisen Society) আদর্শে এদেশের কৃষকদের অল্প সুদে ঋণদানের জন্য জমিবন্ধকী ও কৃষিঋণদাতা

* ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তর হইতে প্রকাশিত 'গ্রাম্য-জীবনে সমবায়' (Co-operative in Rural life) শীর্ষক পুস্তিকায় সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে :—

"A Co-operative Society is an association of economically weak persons who voluntarily associating on the basis of equal rights and equal responsibility, transfer to an understanding one or several of their economic functions, corresponding to one or several of the economic needs, which are common to them all, but which each of them is unable fully to satisfy by his own individual efforts, and manage and use such undertakings in mutual collaboration to their common material and moral advantage."

ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। বলিতে গেলে স্যার ফ্রেডারিকের পরামর্শেই ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তন হয়। ভারত সরকার এদেশে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এডওয়ার্ড ল'র নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম সমবায় ঋণদান সমিতি আইন (Co-operative Credit Societies Act of 1904) প্রবর্তিত হয়।

ইহার পর সমবায়ের গুরুত্ব দেশবাসী উপলব্ধি করিতে থাকে এবং সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারিত করিতে আইন সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারগণ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া এসম্পর্কে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেন। তাঁহাদের এই প্রস্তাব অনুসারে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের সমবায় ঋণদান সমিতি আইনের স্থলে আরও ব্যাপক ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের সমবায় সমিতি আইন (Co-operative Societies Act of 1912) প্রবর্তিত হয়। আগের আইনের কার্যকারিতা মূলতঃ গ্রামাঞ্চলে পল্লী সমিতি ও সহরাঞ্চলে পৌর সমিতিতে সদস্যদের ঋণদানে সীমাবদ্ধ থাকিত, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নূতন আইনে স্বাস্থ্য, বীমা, শিক্ষা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, পল্লীউন্নয়ন, বীজধান ধার দেওয়ার ও জলসেচের বন্দোবস্ত প্রভৃতি নানা প্রকার জনকল্যাণমূলক কার্যের দায়িত্ব সহ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা হইল। এই আইনে কতকগুলি প্রাথমিক সমিতি লইয়া ইউনিয়ন গঠন করিবার এবং কেন্দ্রীয় সমিতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইল। আগেকার গ্রাম্য ও সহঁরাঞ্চলের সমিতির স্থলে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের আইনে সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ও অসীম দায়যুক্ত এই দুইপ্রকার সমিতিতে সমবায় সমিতিগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে স্থাপিত হইল একটি করিয়া প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক এবং এই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের এলাকায় কতকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থসাহায্য করিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার সমবায় সমিতির ঋণদান নীতির উন্নতি সাধনের জন্য স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলেগানের অধিনায়কত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ম্যাকলেগান কমিটি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের রিপোর্ট দেন। ভারতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে এই রিপোর্টের গুরুত্ব যথেষ্ট। ম্যাকলেগান কমিটির রিপোর্টে নির্দিষ্ট সময়ে সমিতির ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বনের এবং সমিতির পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ

কমাইয়া সদস্যদের অধিকার যথাসম্ভব বাড়াইয়া দিবার নির্দেশ ছিল। যে সব সমিতি সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্যের প্রতিকূলতা করিবে, সেগুলি উঠাইয়া দিবার জন্য ম্যাকলেগান কমিটি পরামর্শ দিলেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হইবার পর প্রাদেশিক সরকারসমূহের হাতে সমবায় ব্যবস্থা পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার পড়ে এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের সমবায় সমিতি আইন অতঃপর প্রাদেশিক সরকারসমূহ নিজেদের সুবিধামত সংস্কার করিয়া লইবার অধিকারী হন। স্থানীয় প্রয়োজনের হিসাবে স্থানীয় অভিজ্ঞতার মূল্য যথেষ্ট, কাজেই এই নূতন ব্যবস্থা আন্দোলন প্রসারের পক্ষে খুবই অনুকূল হইল। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে বোম্বাই সরকার ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, মাদ্রাজ সরকার ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে, বিহার ও উড়িষ্যা সরকার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং বাংলা সরকার ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সমবায় আইন সংশোধন করিয়াছেন।

এদেশে সমবায় আন্দোলনের আশানুরূপ প্রসার না হওয়ায় ভারত সরকার এ সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি সর্বভারতীয় সমবায় পরিকল্পনা কমিটি (সরাইয়া কমিটি) নিযুক্ত করেন। এই কমিটি একটি শাখা কমিটির (গ্যাডগিল কমিটি) সহযোগে সমবায় আন্দোলনের নানাবিধ সমস্যার আলোচনা করিয়া সমাধানের কয়েকটি পথ নির্দেশ করেন। সরাইয়া কমিটি বিশেষভাবে সমবায় আন্দোলনে সরকারী সাহায্যের উপর জোর দিয়া সুপারিশ করেন যে, ১০ বৎসরের মেয়াদে এই আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। গ্যাডগিল কমিটি কৃষিঋণের জন্য সরকারকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান (Agricultural Credit Corporation) গঠনের পরামর্শ দেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইলেও প্রয়োজন বা গুরুত্ব হিসাবে ভারতে সমবায় আন্দোলন যে এখনও আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই একথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ, সরকারী যোগাযোগের বা সুষ্ঠু প্রচারকার্যের অভাবে কৃষক ও দরিদ্র গ্রাম্যশিল্পীরা এখনও সমবায় আন্দোলনের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই এবং এই জন্য যথেষ্টসংখ্যক লোক এখনও সমবায় সমিতিসমূহের সভ্য হয় নাই। যাহা হউক, ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও সমবায় সমিতি-গুলি ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

ভারতের সমবায় সমিতিসমূহ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমিতি, প্রাথমিক সমিতি,—এই কয় ধারায় বিভক্ত। প্রাথমিক সমিতিগুলি আবার কৃষি-সমিতি ও অকৃষি-সমিতি এই দুই অংশে বিভক্ত। কৃষি-সমিতি এবং অকৃষি-সমিতি দুই ভাগেরই ঋণদান সমিতি এবং অ-ঋণদান সমিতি (ঋণদান ব্যতীত সদস্যদের কল্যাণমূলক অন্য কাজ) এই দুই শাখা আছে।

সমবায় সমিতির সদস্যদের ভর্তির ফি, শেয়ার বিক্রয়ের টাকা, সভ্য এবং বাহিরের লোকের আমানতী অর্থ, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ঋণ ইত্যাদি দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করে। সমবায় সমিতির হিসাবপত্র যাহাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়, সাধারণতঃ সরকারের সেদিকে দৃষ্টি থাকে।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাম্যঋণ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পরামর্শদানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ। এই কমিটি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা (১) সমবায় আন্দোলনের সর্বস্তরে অধিকতর সরকারী অংশগ্রহণ; (২) সমবায় সমিতির ঋণদান ব্যবস্থার সহিত অপর আর্থিক কার্যাবলীর, বিশেষ করিয়া বাজারজাতকরণের ও পণ্যের শ্রেণী-বিন্যাসের ব্যবস্থা; (৩) প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির উন্নয়ন; এবং (৪) সমবায় কর্মিমণ্ডলীর শিক্ষাদান ব্যবস্থার উপর জোর দিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া আইন শোধিত হইয়াছে এবং জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী কৃষি ঋণ তহবিল [National Agricultural Credit (Long-term Operations Fund)]; এবং জাতীয় কৃষি-ঋণ স্থিতিকরণ তহবিল [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund)] গঠিত হইয়াছে।

এছাড়া সমবায় ব্যবস্থার এবং গ্রাম্যঋণদান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পার্লামেণ্টের এক আইন বলে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া) ভারতের গ্রামাঞ্চলে ৪০০টি শাখা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত স্থাপিত এইরূপ শাখার সংখ্যা ১৫৭টি।

গ্রাম্য-অর্থনীতির উন্নয়নকল্পে ভারত সরকার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে একটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম সংসদ (National Co-operative Development and Warehousing Board) গঠন

করিয়াছেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট হইতে কার্যকরী কৃষি-পণ্য (উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ) সংস্থা আইন [Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act] অনুসারে এই সংসদ গঠিত হয়। এই আইন অনুসারেই ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ হইতে ভারতে একটি কেন্দ্রীয় গুদামঘর সংসদ (Central Warehousing Corporation) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের ১৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা মূলধন সহ ২৮,৪৮০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি ছিল এবং ইহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ২৯ হাজার। সমবায় আন্দোলন প্রসারের ফলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নোক্ত সরকারী বিবরণী হইতেই বুঝা যাইবে :—

	১৯৫১-৫২	১৯৫৬-৫৭
মোট সমবায় সমিতি—	১,৮৫,৬৫০	২,৪৪,৭৬৯
প্রাথমিক সমিতিসমূহের সংখ্যা—	১,৮২,২২৭	২,৪০,৬০৪
প্রাথমিক সমিতিসমূহের সদস্য সংখ্যা—	১,৩৭,৯১,৬৮৭	১,৯৩,৭৩,৩৪৯
সমবায় সমিতিসমূহের কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকায়)	৩,০৬,৩৪	৫,৬৭,৬৭
সমবায় সমিতিসমূহের মুনাফা (লক্ষ টাকায়)	৫,২৯,৯৬	৮,৫৮,৩৮
প্রাথমিক সমিতিগুলির প্রদত্ত ঋণ (লক্ষ টাকায়)	৯৭,৯৫	১৭৩,১৬
প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণ (লক্ষ টাকায়)	১,৩০	২,০৫
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ন	৫,০৯	৪,৫১
ঐ মূলধন (লক্ষ টাকায়)	৬০,১১	১,১০,২৬
ঐ ঋণদান (লক্ষ টাকায়)	১,০৫,৬৪	১,০০,৮০
ঐ সদস্য সংখ্যা	২,৩১,৩১৮	৩,১০,৫৫৫
কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক	৬	১২
ঐ সদস্য সংখ্যা	৩৪,৫৭৯	১,১৬,৫৬১
ঐ ঋণদান (লক্ষ টাকায়)	২,৫১	৩,৮০
ঐ কার্যকরী মূলধন „	১০,১৭	২১,৩২
রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক	১৬	২৩
ঐ সদস্য সংখ্যা	২৩,২৭২	৩৩,৪৪০
ঐ ঋণদান (লক্ষ টাকায়)	৫৫,২৭	১২,৩৭১
ঐ কার্যকরী মূলধন „	৩৬,৭২	৭৯,৫৪

১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৬৫০টি পরিদর্শক ইউনিয়ন (supervising unions) সমবায় সমিতিগুলির কাজ দেখে। ইহাদের অধীনে ৩৩,০১,৫১০ জন সদস্যসহ ৩১, ১৩৬টি সমিতি ছিল। এই সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন ছিল ১২১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা।

১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ২,২৫৮টি সমবায় সমিতি দেউলিয়া হয়, এই বৎসরের গোড়ায় এইরূপ দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৩,৩৭২।

১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪টি অগ্নি ও সাধারণ বীমা সমবায় সমিতি ৩৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অগ্নিবীমা, ৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকার গৃহ ও গুদাম বীমা, ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার কাপড়ের কল বীমা এবং ৬ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার কারখানা বীমার কাজ করে। এই বৎসর ২টি সমবায় মোটর গাড়ী বীমা সমিতি ১৮৯২ টি নূতন ব মাপত্র প্রদান করিয়াছিল।

আগেই বলা হইয়াছে ভারতে সমবায় আন্দোলন আশানুরূপ প্রসারলাভ করে নাই। ভারত পল্লীময় দরিদ্র দেশ, এরূপ দেশেই জনসাধারণকে শোষণমুক্ত ও সচ্ছল করিতে সমবায় আন্দোলন দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হওয়া দরকার।* এদেশে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ লোক প্রাথমিক সমিতির সদস্য। নরওয়ে ইউরোপের দেশ, সমৃদ্ধির হিসাবে নরওয়ের সহিত ভারতের তুলনাই চলে না। নরওয়ের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি প্রাথমিক সমিতির সদস্য। সমবায় আন্দোলনের দিক হইতে বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভারতের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রসর। দেশবিভাগের পূর্বে পাঞ্জাব এই আন্দোলনে সর্বপ্রথম ছিল। বঙ্গবিভাগের পূর্বে বাংলার স্থান ছিল চতুর্থ। পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য বর্তমানে সমবায় আন্দোলনে লক্ষণীয় অগ্রগতি লাভ করিতেছে।

সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্য ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া নিম্নরূপ মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন:—

(১) সমিতিগুলির মজুত তহবিল বাড়াইতে হইবে;

(২) ঋণদানে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে;

(৩) প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলিকে সর্বার্থসাধক (Multi-purpose)

* ভারতে কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Agriculture, 1926) এ সম্পর্কে বলিয়াছেন:—

"If Co-operation fails then will fail the best hope of rural India."

সমিতিতে রূপান্তরিত করিয়া কৃষিজীবীদের সমস্ত প্রয়োজনের খোঁজখবর রাখিতে হইবে;

(৪) সমবায় বিক্রয় প্রথার উন্নয়ন আবশ্যক। প্রাথমিক পণ্য বিক্রয় সমিতিগুলিকে কেন্দ্রীয় পণ্য বিক্রয় সমিতিসমূহের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে;

(৫) সমবায় সমিতিগুলিতে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কর্মিমণ্ডলীর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চীনদেশ সম্প্রতি সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতিলাভ করিয়াছে। চীনের কৃষি সংক্রান্ত সমবায় আন্দোলনের স্বরূপ বুঝিবার জন্য শ্রী আর কে পাতিলের নেতৃত্বে ভারতের এক সরকারী মিশন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে চীনে গিয়াছিলেন। এই মিশনের রিপোর্টে প্রত্যেকটি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের (National Extension Bloc) সঙ্গে এক একটি হিসাবে অবিলম্বে ১,০০০টি সমবায় সংস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হইয়াছে।*

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় উন্নতিতে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থাননির্দেশ করা হইয়াছে। বিশেষ-করিয়া কৃষিপণ্য এবং কুটিরশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করিবার ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলির সহায়তার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতের সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০ লক্ষের স্থলে ১ কোটি†৫০ লক্ষ হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন।

* ভারতে বৎসরে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ প্রয়োজন। সমবায় সমিতিগুলি মারফৎ ইহার শতকরা মাত্র তিনভাগের মত' যোগান হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় কৃষি-দপ্তর আশা করিয়াছেন যে, সমবায়ের প্রসারের ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ইহা শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ হইবে।

† জাতীয় জীবনে সমবায়ের এই গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইন্দোরের ৬২তম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীইউ এন ঢেবরের নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধানযোগ্য :—

One of the most urgent needs is to reform our co-operative department. If India is to evolve into a Co-operative Socialist Commonwealth, this limb of the State machinery must not only be better equipped but must be placed on the footing of a missionary organisation. It is this department which can produce a feeling of wholesale relief to our teeming millions at the lowest level in India who look to Government for help at every stage in their productive effort and it is there we have not yet been able to make a mark.

এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে কৃষিকর্মে সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্য ভারত সরকার লক্ষণীয় আগ্রহ দেখাইতেছেন। কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাব (জানুয়ারী ১৯৫৯) গ্রহণ করিয়া তাঁহারা এখন সমবায়ের ভিত্তিতে সেবা সমবায় ও যৌথ খামার প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।*

জনসাধারণের অশিক্ষা, প্রচার কার্যের ত্রুটি, পরিচালনা ব্যবস্থার দৈন্য ও মূলধনের অভাব ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার লাভের পথে প্রবল অন্তরায়। যাঁহারা সমবায় সমিতি পরিচালনা করিবেন, তাঁহাদিগকে সমবায় নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রাদেশিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ভারতের সমস্ত রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমতাসাধনের জন্য এদেশে শক্তিশালী কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। এখনও ভারতে এই আন্দোলন মোটামুটি আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ, সারা দেশে জালের মত এই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন প্রসারিত হয় নাই। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে স্টকহোলম্ আন্তর্জাতিক সমবায় সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় সমবায় আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য সাধনের জন্য সর্বত্র একই নিয়মে সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

* এই সমবায়ভিত্তিক-খামার প্রথা মহাত্মা গান্ধীর সমর্থন লাভ করিয়াছিল। তিনি হরিজন পত্রিকায় (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২) লিখিয়াছিলেন :—

'I firmly believe that we shall not derive the full benefits of agriculture until we take to co-operative farming. Does it not stand to reason that it is far better for a hundred families in a village to cultivate their lands collectively and divide the income therefrom than to divide the land anyhow into a hundred portions?'

ভারতের খনিজ সম্পদ

(Mineral Resources of India)

ভারতে খনিজাদি প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। এদেশে শিল্পপ্রসার ঘটিলে এবং এই বিপুল কাঁচামাল যথাযথ ব্যবহৃত হইলে ভারত এতদিন অনায়াসে পৃথিবীর একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইতে পারিত। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১২৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকার বিবিধ প্রকার খনিজ সম্পদ উত্তোলিত হয়।

ভারতের খনিজ সম্পদ নানাপ্রকার। শুধু বর্তমান যুগে নয়, প্রাচীনকালেও এ হিসাবে ভারতবর্ষ বিখ্যাত ছিল।* ভারতের শিল্প-সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য নিযুক্ত শিল্প-কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে (১৯১৮) প্রধান প্রধান শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের খনিজ-স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা স্বীকার করেন। ভারতের বর্তমান খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধানাদি ব্যাপকভাবে চলিতেছে এবং খনি-বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাদান ব্যাপারে ভারত লক্ষণীয়ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। ভারত সরকারের ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতিতে সর্বভারতীয় স্বার্থের নিরিখে খনিজ সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে।

খনিজের দিক হইতে ভারত যেমন সমৃদ্ধ, পাকিস্তানের অবস্থা তদনুরূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে পেট্রোল, জিপসাম, ক্রোমাইট ইত্যাদি অল্পসংখ্যক খনিজই পাকিস্তানে পাওয়া যায়। পাকিস্তানের কয়লার পরিমাণ অতি সামান্য এবং এই কয়লা নিম্নশ্রেণীর।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়লা খনি সমেত ভারতীয় খনিগুলিতে ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার জন লোক নিযুক্ত ছিল।

ভারতের প্রধান কয়েকটি খনিজের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল:—

কয়লা—কয়লা ভারতের সর্বপ্রধান খনিজ। কয়লা-সম্পদ শিল্পসমৃদ্ধির

* গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, মিঃ 'ভি বল্'-এর 'ইকনমিক্ জিওলজি অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের মুখবন্ধে মেগাস্থিনিসের এ সম্পর্কে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে:—

"Were India wholly isolated from the rest of the world, or were her mineral productions protected from competition, there cannot be the least doubt that she would be able, from within her own boundaries, to supply very nearly all the requirements, in so far as the mineral world is concerned, of a highly civilized community."

অনুপূরক। ব্রিটেনের মত ভারতের কয়লা সম্পদ শিল্পপ্রসারে ব্যবহৃত হয় নাই। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টন কয়লা পাওয়া যায়। ভারতীয় কয়লার শতকরা ৩১ ভাগ রেল ইঞ্জিনের জন্য, শতকরা ২৮ ভাগ শিল্পে এবং শতকরা ৫ ভাগ গৃহস্থালীর প্রয়োজনে লাগে।

'জিওলজিক্যাল সারভে অফ ইণ্ডিয়া'র ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের এক হিসাব অনুসারে (পাকিস্তান সহ) ভারতবর্ষের ভূগর্ভে এক হাজার ফুটের মধ্যেই ২,০০০ কোটি টন কয়লা সঞ্চিত আছে। ভারতের মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৮,০০০ কোটি টন বলিয়া বর্তমানে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। কয়লার দিক হইতে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান নবম। ভারতে মোট কয়লাখনির সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

ভারতের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে এবং বিহারের ঝরিয়া অঞ্চলে সর্বাধিক পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হয়। এ ছাড়া আসাম, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ কয়লা আছে।

ভারতের কয়লাখনি সংক্রান্ত কাজে ২ লক্ষের মত লোক নিয়োজিত আছে। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমান ভারতের কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে) বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটি টনে উঠিবে।

কয়লা হইতে আলকাতরা, পিচ, ন্যাপথলিন, বিস্ফোরক সামগ্রী, স্যাকারিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। প্রচুর কয়লা সম্পদ থাকার জন্য ভারতে এই সব শিল্পের উন্নতি স্বাভাবিক। কয়লা হইতে তৈল উৎপাদনেরও সুযোগ আছে। তবে এ পর্যন্ত এই দিক হইতে আশানুরূপ চেষ্টা না হওয়ায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয় নাই।

লৌহ—ভারতের খনিজ সম্পদ হিসাবে কয়লার পরেই লৌহের স্থান। পশ্চিম বাংলার বরাকর, বিহারের সিংভূম ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে এবং মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, কাশ্মীর ও মাদ্রাজের কয়েকটি স্থানে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। পাকিস্তান লৌহ সম্পদের দিক হইতে একেবারে দরিদ্র।

বিশেষজ্ঞগণের মতে ভারতের লৌহমাক্ষিক পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় আকরিক লৌহের শতকরা ৬০ ভাগের মত ধাতব লৌহ। বলা নিষ্প্রয়োজন, কয়লা ও লৌহ সম্পদ কাজে লাগাইয়া ভারতে শিল্প-প্রসারের চেষ্টা হইলে ভারত এতদিন এক বিরাট শক্তিশালী দেশে পরিণত হইতে পারিত।

সুনিয়ন্ত্রিত হইলে ভারতের লৌহসম্পদ শুধু ভারতের নয়, ভারতের প্রতিবেশী দেশ-সমূহেরও লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা মিটাইতে পারিত।

ভারতের মোট আকরিক লৌহের পরিমাণ ২,১০০ কোটি টন বলিয়া অনুমান করা হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৫৮ লক্ষ ২৪ হাজার টন আকরিক লৌহ উত্তোলিত হয়।* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই পরিমাণ ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

পেট্রোলিয়াম—আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের শক্তিরক্ষার দিক হইতে পেট্রোলিয়াম সম্পদের গুরুত্ব অসাধারণ। ভারতের আয়তন বা প্রয়োজনের তুলনায় এদেশে শতকরা ১০ ভাগ পেট্রোলিয়ামও পাওয়া যায় না, তবে ভারতে এখন যেটুকু পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়, উত্তোলন ব্যবস্থার উন্নতি হইলে তাহা কিছুটা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কেরোসিন তৈল সম্পর্কেও একই কথা। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে (আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, কচ্ছ এবং পাঞ্জাবে) ভবিষ্যতে নূতন পেট্রোলখনি আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত সরকার পশ্চিম বঙ্গে তৈল অনুসন্ধানের জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম্ কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হইবার পর তৈল সম্পদের দিক হইতে ভারতবর্ষ দুর্বল হইয়া পড়ে, ভারত বিভাগের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও পশ্চিম পাঞ্জাবের তৈল অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে তৈল খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

ভারতে বৎসরে ঊর্ধ্বপক্ষে ৪ লক্ষ টন পেট্রোল খনি হইতে উত্তোলিত হয়, ইহা সারা পৃথিবীর বাৎসরিক পেট্রোল উত্তোলনের হিসাবে (৬৩ কোটি টন) অতি সামান্য। আসামের লখিমপুর জেলার ডিগবয় অঞ্চলে ভারতীয় পেট্রোলের প্রায় সবটাই পাওয়া যায়। আসামের নাহোরকাটিয়া, হুগরীজান এবং মোরান তৈলখনিসমূহে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন সুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পেট্রোল-খনি সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা কার্য চলিতেছে। পেট্রোলের অভাবের জন্য ভারতের শাসন-কর্তৃপক্ষ কয়লা হইতে তৈল নিষ্কাশনের এবং সুরাসার উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টন পেট্রোলের প্রয়োজন।

* এ সম্পর্কে ভারতের লৌহ ও ইস্পাতশিল্প সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভারতে পেট্রোল শিল্পে বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ২৪৪ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে ২১৪ কোটি টাকা বিদেশী মূলধন।

বোম্বাইয়ের ট্রম্বেতে দুইটি এবং বিশাখাপত্তনে একটি তৈল পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতীয় পেট্রোল ব্যবসার বিশেষ সুবিধা হইতেছে। আসামে এবং বিহারে আর দুইটি তৈলশোধনাগার প্রতিষ্ঠার কথা চলিতেছে। ভারতে বৎসরে প্রায় ৩২ কোটি টাকার (৬ কোটি গ্যালন) পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ তৈল ইরাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

ম্যাঙ্গানিজ—উচ্চস্তরের ইস্পাত, রাসায়নিক পণ্যাদি (Heavy Chemicals), বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও কাঁচ তৈয়ারী করিতে ম্যাঙ্গানিজ অত্যাবশ্যক উপাদান। ভারতে এই মূল্যবান ধাতু প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হইলেও (ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনের দিক হইতে পৃথিবীতে ভারতের স্থান সোভিয়েট রাশিয়ার পরেই) দেশীয় শিল্পের অভাবে এদেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। ব্রিটেন ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের অর্ধেকের বেশী মধ্যপ্রদেশে পাওয়া যায়। ভারতের আকরিক ম্যাঙ্গানিজের শতকরা ৩০ হইতে ৬০ ভাগ ধাতব ম্যাঙ্গানিজ। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তোলনকালের হিসাবে ১৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৬ লক্ষ টন আকরিক ম্যাঙ্গানিজ ভারতের খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভারতে ২০ লক্ষ টন আকরিক ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যাইবে বলিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আশা করা হইয়াছে। পাকিস্তানে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় না।

অভ্র—অভ্র মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ। যুদ্ধের সময় ইহার আবশ্যকতা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। বৈদ্যুতিক-সরঞ্জাম শিল্পে, বিভিন্ন খনি সরঞ্জামে এবং কাগজ, রঙ ও রবার শিল্পে অভ্রের প্রয়োজন যথেষ্ট। অভ্রের হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান সর্বাগ্রে। পৃথিবীর প্রায় ৪৮ ভাগ অভ্র ভারতে পাওয়া যায়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে উত্তোলিত অভ্রের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৯ হাজার হন্দর। ইহার মূল্য ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার মত। ভারতীয় অভ্রের শতকরা ৬০ হইতে ৭০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় অভ্রের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার।

অভ্র প্রধানতঃ বিহারের কোডারমা, হাজারিবাগ, গিরিডি ও গয়া অঞ্চলে

পাওয়া যায়। অন্ধ্রের নেলোর জেলায় এবং মহীশূর ও রাজস্থানের কয়েকটি অঞ্চলেও অভ্রের খনি আছে। মধ্য প্রদেশেও সামান্য পরিমাণ অভ্র পাওয়া যায়। ভারতের খনি হইতে অভ্র উত্তোলনের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বহু অভ্র নষ্ট হয়। পাকিস্তানে অভ্রের খনি নাই।

স্বর্ণ—স্বর্ণ মূল্যবান ধাতু এবং সভ্যজগতের সর্বত্র ইহার সমাদর ও চাহিদা বর্তমান। ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় স্বর্ণসম্পদ নাই এবং যেটুকু আছে, অধিকাংশ ভারতীয় স্বর্ণখনি বিদেশীদের অধিকারভুক্ত হওয়ায়, তাহার পূর্ণ সুবিধালাভ ভারতের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ভারতের সোনার খনিগুলিতে অনেক নীচের খাদ হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে হয় এবং ইহাতে খরচ পড়ে খুব বেশি। এ পর্যন্ত পাকিস্তানে কোন স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয় নাই।

দক্ষিণ ভারতে মহীশূরের কোলার খনিতে এবং হায়দরাবাদের হাতী খনিতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে বৎসরে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ আউন্সের মত স্বর্ণ উত্তোলিত হয়, ভারতে উঠে ২ লক্ষ আউন্সের মত। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৭৯ হাজার আউন্স স্বর্ণ খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল।

মধ্যপ্রদেশ ও সিকিমের কোন কোন জায়গায় তামা প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিতভাবে সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে। বিহারের সিংভূম অঞ্চলে, কাশ্মীরের গিলগিট অঞ্চলে, পাঞ্জাবের ঝিলাম ও আটক অঞ্চলে, যুক্তপ্রদেশের গাড়োয়াল অঞ্চলে ও আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নদী-বালুকার মধ্যেও অতি অল্প পরিমাণ স্বর্ণ মিশিয়া থাকে।

ক্রোমাইট—ক্রোমাইটের হিসাবে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই সমৃদ্ধ। পাকিস্তানে বৎসরে ২৫ হাজার টনের কাছাকাছি ক্রোমাইট পাওয়া যায়। ভারতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭৮,৫৪২ টন ক্রোমাইট পাওয়া গিয়াছে। ক্রোমাইট মাক্ষিক হইতে লব্ধ ক্রোমিয়াম ইস্পাতশিল্পের বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে সর্বাধিক পরিমাণ ক্রোমাইট পাওয়া যায়, ভারতে পাওয়া যায় মহীশূর ও বিহারের সিংভূম অঞ্চলে।

তামা—ভারতে তামার জিনিসপত্র অতি প্রাচীন যুগেও ব্যবহৃত হইত। অখণ্ড ভারতের সব তামার খনি ভারতে পড়িয়াছে। বিহারের সিংভূম অঞ্চলেই সর্বাধিক পরিমাণ তামা পাওয়া যায়। এখানে ঘাটশিলার নিকট মোসাবনীতে 'ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশান লিমিটেড' একটি জগদ্বিখ্যাত

প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া বিহারের হাজারিবাগ জেলায়, যুক্তপ্রদেশের আলমোড়া ও গাড়োয়াল অঞ্চলে, রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যে, মহীশূরে এবং পশ্চিমবঙ্গেও তামা পাওয়া যায়। ভারতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন তাম্র-মাক্ষিক খনি হইতে উত্তোলিত হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিমাণ ৪ লক্ষ ১১ হাজার টন হইয়াছে। ভারতীয় তাম্র-মাক্ষিকের বা খনিজ তাম্রের শতকরা ২.৫ ভাগ ধাতব তাম্র।

উপরোক্ত খনিজ সম্পদ ব্যতীত ভারতে আরও নানাপ্রকার খনিজ অল্প-বিস্তর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বোম্বাইয়ের কতকগুলি অঞ্চলে সীসা ও দস্তা, ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগ অঞ্চলে টিন, ত্রিচিনাপল্লী জেলায় ফসফেট, কাশ্মীরে সোহাগা, মধ্যপ্রদেশের কাটনী অঞ্চলে আকরিক এ্যালুমিনিয়াম বা বক্সাইট, মাদ্রাজ রাজ্যে জিপসাম, মহীশূরে, মাদ্রাজের কুডাপ্পা ও বিহারের সিংভূম জেলায় এ্যাসবেসটস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আণবিক বোমার পক্ষে অতি মূল্যবান থোরিয়াম ধাতুর একটি খনি ত্রিবাঙ্কুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার টন ইলমেনাইট, ৯৬ হাজার টন আকরিক এ্যালুমিনিয়ম বা বক্সাইট, ১ লক্ষ ২৬ হাজার আউন্স রৌপ্য, ৯ লক্ষ ২২ হাজার টন জিপসাম, ১৮ হাজার টন কিয়ানাইট, ৭৪৬৯ টন দস্তা, ৪৮৫০ টন সীসা, ৭৯০ ক্যারেট হীরক এবং ৮১ লক্ষ ৯৪ হাজার টন চুনা পাথর পাওয়া গিয়াছিল।

ভারতের খনিজ সম্পদ বহুবিধ এবং প্রচুর হইলেও খনিগুলির পরিচালনায় নানাপ্রকার ত্রুটি বিদ্যমান। তাছাড়া কয়লা খনিগুলিতে কাজ ভাল না হওয়ায় শক্তিসম্পদের অভাবে অধিকাংশ খনির পরিচালনায়ও অসুবিধা দেখা দেয়। এদেশের রেলপথ এবং অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থা নিম্ন-শ্রেণীর বলিয়াও খনির কাজ চালাইতে অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় স্বার্থের হিসাবে খনিজ সম্পদের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকার তাঁহাদের ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষিত শিল্পনীতিতে এ সম্পর্কে লক্ষণীয় সচেতনতা দেখাইয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাধারণভাবে খনিজ উৎপাদনের লক্ষণীয় উন্নতি হইয়াছে। খনিজ সম্পদের গুণাগুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি যাহাতে সংগৃহীত হয় এবং এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয়, পরিকল্পনা কমিশন সে সম্পর্কে গভীর আগ্রহ দেখাইয়াছেন। 'জিওলজি-

কাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া', 'ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্‌স্', 'ন্যাশনাল লেবরেটরিস্' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যাহাতে খনি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যানুসন্ধান করিতে পারে, পরিকল্পনায় তজ্জন্য সুবিধা দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে খনিজ উন্নয়ন খাতে মাত্র ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেখানে এই খাতে ৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

মোটের উপর জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকারকে এখন জাতীয়করণের দ্বারা অথবা অন্য যে কোন উপায়ে এদেশের খনিগুলির পরিচালনা-ব্যবস্থা ত্রুটিশূন্য করিবার ও ইহাদের পরিচালকবর্গকে খনিজ উন্নয়নের সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, খনিজ দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইনে (১৯৪৮) নিকৃষ্ট খনিজের সদ্ব্যবহার সহ খনি ও খনিজদ্রব্যের সামগ্রিক উন্নয়নের যে সংকল্প দেখা যায়, তাহা অধিকতর কার্যকরী করিবার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের শিল্পোন্নয়নের অনুপূরকরূপে খনিজ উন্নয়নের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে :—

The emphasis on industrial development in the second Five Year Plan necessarily involves intensified programmes of mineral development.

ভারতীয় শিল্পের ক্রমোন্নতি

(The Growth of Indian Industries)

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশ এবং এদেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসার হয় নাই বলিলেই চলে। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে অবশ্য শিল্পের দিক হইতে ভারতবর্ষ এতটা পশ্চাৎপদ ছিল না। সেই সময় এদেশবাসীর অভাব মিটাইয়াও ভারতের শিল্পজাত পণ্য প্রভূত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। তখন যন্ত্রশিল্পের যুগ ছিল না, সম্প্রসারিত কুটির শিল্প ভোগ্যপণ্যের হিসাবে ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় এদেশের শাসনভার হাতে পাইয়াই ভারতে বিলাতী পণ্যের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা সুরু করিলেন এবং ভারতীয় শিল্পজীবীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চলিতে লাগিল। শাসক জাতির এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। এই সময় ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের যুগ এবং ইউরোপীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। শাসনকর্তৃপক্ষের সহানুভূতির অভাবে একদিকে যখন ভারতের কুটির শিল্প সমূলে ধ্বংস হইয়া লক্ষ লক্ষ কুশলী শিল্পীকে সপরিবারে অনশনের সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিল, অন্যদিকে তখন ইউরোপের শিল্পজাত পণ্য আমদানি হইয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিল। এই শিল্পপণ্য চড়াদরে এদেশের বাজারে বিক্রীত হইলেও ভারত হইতে যে প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল ইংলণ্ড প্রভৃতি শিল্পজীবী দেশে রপ্তানি হইতে লাগিল, তাহাদের মূল্যহার কিন্তু নানা উপায়ে রাখিয়া দেওয়া হইল একেবারে তলার দিকে। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় সম্পদের অবিরাম শোষণ চলিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অবস্থার একটু পরিবর্তন হয়। এই সময় বিদেশী বণিক সম্প্রদায় শুধু এদেশ হইতে কাঁচামাল চালান দিয়া ও আমদানিকৃত পণ্যাদি ভারতে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লুটিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, তাহারা ভারতের অসীম প্রাকৃতিক সম্পদ সস্তায় কাজে লাগাইয়া অধিকতর লাভের আশায় এদেশে কিছু কিছু কলকারখানাও স্থাপন করে। তাছাড়া এই বণিকেরা ভারতে চা, কফি, নীল, পাট প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অর্থকরী শস্যের ব্যাপক চাষ আরম্ভ করে। এই শিল্পপ্রয়াসের ফল শেষ পর্যন্ত ভারতের পক্ষে বিশেষ

কল্যাণকর হয়। এই সব প্রচেষ্টার দরুণ ভারতবাসীও এদেশে শিল্পপ্রসারের প্রেরণা লাভ করে। কৃষির উপর নির্ভরশীল বেকার বা অর্ধবেকার জনসংখ্যাকে শিল্পে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভারতের অপরিসীম দারিদ্র্য যে কমান যাইবে না, এসম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দও ক্রমে সচেতন হইয়া উঠেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিদেশীরা এদেশে চা ও কফি বাগান ছাড়া কাপড়ের কল, পাটকল, চামড়ার কারখানা প্রভৃতি স্থাপন করে এবং তাহাদের দেখাদেখি ভারতীয়দেরও এরূপ ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে কিছুটা প্রবণতা দেখা যায়। ইহার পরই লর্ড কার্জনের অবিমৃষ্যকারিতায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত যে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার পরিণতিতে ভারতে স্বদেশী শিল্পপ্রসারের প্রভূত কর্মতৎপরতা দেখা গিয়াছিল। ব্যাঙ্ক, কাপড়ের কল প্রভৃতি শিল্পব্যবসায়ে ভারতীয়গণ এই সময় স্থান করিয়া লন। এশিয়ার বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার 'টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী' (১৯০৭) এই সময়কার সার্থক জাতীয় শিল্প চেতনার উজ্জ্বল নিদর্শন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি অনেক কমিয়া যাওয়ায় এদেশে তীব্র পণ্যাভাব ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়। যন্ত্রপাতির সুবিধা থাকিলে এই সুযোগে ভারতে যথেষ্ট শিল্পপ্রসার হইতে পারিত। অবশ্য বিদেশী শাসনকর্তৃপক্ষের সহযোগিতার অভাব শিল্পোন্নতির এই সুযোগ ব্যর্থ হওয়ার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তবে এই সময় ভারতে যে সামান্য পরিমাণ শিল্প ছিল, যুদ্ধের সময় চাহিদার চাপে সেগুলি অনেকটা সম্প্রসারিত হয় এবং কিছু কিছু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প, বাংলার পাটশিল্প এবং মাদ্রাজের চর্মশিল্পের উন্নতির সহিত যুদ্ধের মধ্যে ভারতে তেল কল, কাগজের কল, সাবান ও প্রসাধন শিল্প এবং সমগ্রভাবে কুটিরশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে। ভারতে কয়লা, লৌহ, অভ্র প্রভৃতি খনির মালিকেরাও এই সুযোগে প্রভূত লাভবান হন।

যুদ্ধের সময় ভারতে শিল্পপণ্যের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং এদেশে শিল্পোন্নতির পরামর্শদানের জন্য ভারতসরকার ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি শিল্প কমিশন (Industrial Commission) নিয়োগ করেন। কমিশন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে রিপোর্ট দেন তাহাতে ভারতীয় শিল্পের প্রসার সম্পর্কে বহু মূল্যবান উপদেশ ছিল। কমিশন বিশেষ করিয়া ভারত সরকারকে ভারতীয় শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কাজ হইল

না। যুদ্ধ থামিবার পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন সংস্কারের সুযোগে সহানুভূতি-হীন ভারত সরকার শিল্পোন্নতির দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারসমূহের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন।

যাহা হউক, যুদ্ধের সময়কার দেশীয় শিল্পপণ্যের তেজী বাজার যুদ্ধ থামিবার পরও দু'তিন বৎসর বজায় থাকে। ইহার পর আবার ভারতের পণ্যবাজারে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হয়। সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিমান বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত হইতে ভারতীয় শিশু শিল্পগুলিকে বাঁচাইবার জন্য এই সময় ভারতে প্রবল আন্দোলন চলে এবং আন্দোলনের ফলে এ সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিশন (Indian Fiscal Commission) নিয়োগ করেন। এই কমিশন বৈদেশিক প্রতিযোগিতার তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় শিল্পাদিতে প্রয়োজনমত সংরক্ষণ (Protection) সুবিধা দিবার সুপারিশ করেন। কমিশনের সুপারিশে সংরক্ষণ সুবিধা লাভের উপযুক্ত শিল্প ও সংরক্ষণ সুবিধার হার স্থিরীকরণের জন্য একটি শুল্ক-নির্ধারক সংসদ (Tariff Board) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংসদের অনুমোদনক্রমে ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, দেশলাই শিল্প প্রভৃতি নানাপ্রকার ছোটবড় শিল্প সংরক্ষণ সুবিধা লাভ করে এবং বলিতে গেলে এইরূপ বাড়তি সুবিধা লাভের জন্যই অনেকগুলি ভারতীয় শিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ও ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক মন্দার চাপ অতিক্রম করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অর্থনৈতিক মন্দা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সুরু হইয়া সারা জগতে দ্রুত সঞ্চারিত হয়। এই মন্দার চাপে ভারতের শিল্পোন্নতির প্রয়াস প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক ব্যবসা মন্দার ফলে শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যাদির মূল্য সবদেশেই অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায়। এ অবস্থায় কৃষি-প্রধান ভারতে পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকিয়া থাকাই কঠিন হইয়া উঠে, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িবার কথা তো ভাবাই চলে না। ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এদেশেও এই মন্দাভাব সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়া আসিবার পর ভারতীয় শিল্প-নায়কগণ যখন এ দেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার নূতন ব্যাপক প্রয়াস সুরু করিলেন, ঠিক সেই সময় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।

যুদ্ধের মধ্যে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির সম্ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল বলিয়া ভারতবাসীর শিল্পোৎসাহ আবার কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ এবার যুদ্ধ হইয়াছে একেবারে ভারত-সীমান্তে। বিদেশী পণ্যের আমদানি প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় এবার আরও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ায় এই দুঃসময়ে যুদ্ধ চালাইবার দায়ে ভারত সরকার প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ও সমরপণ্য সংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সরকারী বে-সরকারী প্রচণ্ড চাহিদার ফলে যুদ্ধের মধ্যে ভারতের প্রায় সকল প্রকার শিল্প-পণ্যের মূল্যই অত্যধিক বাড়িয়া যায় এবং পণ্যসামগ্রী লইয়া ভীষণ চোরা-কারবার চলিতে থাকে। নিজেদের পণ্যগত অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পাদির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ব্যাপারে কিছু কিছু উৎসাহ দেখান ও সুবিধা দেন। তবে, আগেই বলা হইয়াছে, এই সময় যন্ত্রপাতি আমদানি অসম্ভব ছিল বলিয়া সরকার ও দেশ-বাসীর আগ্রহ সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যুদ্ধকালীন শিল্পপ্রসারের সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তবে যুদ্ধের আগে ভারতে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যুদ্ধের সময় চাহিদার চাপে সেগুলি সাধারণ উৎপাদনহারের অনেক বেশি পণ্য উৎপাদন করিয়াছে। বস্ত্রশিল্প, কাগজশিল্প, সিমেণ্টশিল্প, লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, সমরপণ্য উৎপাদনের কারখানা প্রভৃতিতে এই সময় একরূপ দিন-রাত কাজ হইয়াছে। যে যন্ত্রপাতি লইয়া ভারতের ১৭টি কাগজকল ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯,০০০ টন কাগজ উৎপাদন করিয়াছে, সেইগুলির দ্বারাই যুদ্ধের মধ্যে ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন ৯৩,৫০০ টনে পৌঁছিয়াছিল। যুদ্ধের মধ্যে কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন ৩৮০ কোটি গজ হইতে ৪৭০ কোটি গজে পৌঁছায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৭,৫০,০০০ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদনের পরিমাণ ১১,২৫,০০০ টনে উঠিয়াছিল। এ্যালুমিনিয়াম, রং ও বার্ণিশ, সিগারেট, কাঁচ, প্লাইউড, প্লাষ্টিক, সাইকেল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, নানাপ্রকার ঔষধ, ব্লিচিং পাউডার, সালফিউরিক এ্যাসিড প্রভৃতি বিবিধ রাসায়নিক পণ্য, বিবিধ প্রকার প্রসাধন দ্রব্য, বহুবিধ সমরসরঞ্জাম ইত্যাদির বহুসংখ্যক কলকারখানা যুদ্ধের মধ্যে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হইয়াছে। মোটের উপর যুদ্ধের আগের তুলনায় যুদ্ধের মধ্যে

ভারতে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেশী শিল্পপ্রসার হইয়াছে।* ইহা ব্যতীত যুদ্ধের পরবর্তীকালীন শিল্পীয় চেতনার সুযোগেই এদেশে চিত্তরঞ্জন লোকো-মোটিভ ফ্যাক্টরী, সিন্দ্রির ফার্টিলাইজার (রাসায়নিক সার) ফ্যাক্টরী, সুপারফসফেট ফ্যাক্টরী, ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইন্‌ডাসট্রি, ইন্‌টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী, কেব্‌ল্ ফ্যাক্টরী, ভিলাই, রৌরকেল্লা ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, মধ্যভারতে নিউজপ্রিণ্ট (NEPA) কারখানা, পেনিসিলিন কারখানা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত সরকার এখন বিদেশীদের সহযোগিতায় ভারতীয়দিগকে শিল্পপ্রসারের সুযোগ দিতেছেন, ইহার ফলে সেন-র‍্যালে কোম্পানীর সাইকেল কারখানার মত অনেক প্রয়োজনীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ভারতে গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী-বেসরকারী প্রয়াসের ফলে ভারতে লক্ষণীয় শিল্পোন্নতি আশা করা যায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতীয় শিল্পপরিস্থিতির যেরূপ লক্ষণীয় উন্নতি হইয়াছে এবং সারাদেশে বর্তমানে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে যেরূপ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ভারতের শিল্পভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়া চলে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিল্পের গড়পড়তা উৎপাদন ১০০ ধরিলে সমগ্রভাবে এই সূচকসংখ্যা ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৩ হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ও ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের হিসাবে এই সূচকসংখ্যা যথাক্রমে ১৩৭·৩ এবং ১৪২·৭ হইয়াছে। পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের সূচকসংখ্যা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১০০ ধরিলে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহা দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ :—

তুলাজাত বস্ত্র—১০৯·৭, তুলাজাত সূতা—১২৭·৫, পাটজাতদ্রব্য—১২০·৫ চিনি—১৮৫·৫, কাগজ—১৫৯·৩, সিগারেট—১৩৫, কয়লা—১২৬·৮, ইস্পাত—১২৫·১, হ্যারিকেন লণ্ঠন—১০৯·৩, ডিজেল ইঞ্জিন—২২৯·৬, রাসায়নিক পণ্য—১৮১·৩, সাবান—১৩৩·৮, দিয়াশলাই—১০০·১, মোটরগাড়ী—১৪৩·৪, রবার-

* অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যন্ত্রপাতি সংগ্রহের দ্বারা ভারতে যে সব নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে অথবা পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া যেটুকু প্রসার হইয়াছে তাহাই ভারতের প্রকৃত শিল্পোন্নতি। একই কারখানায় অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়া যে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার ফল সবদিক হইতে নিশ্চয় কল্যাণকর নয়, কারণ এ ভাবে কাজ হইয়া যন্ত্রপাতিও আনুপাতিকভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সমস্যা ভারতের পক্ষে এক কঠিন সমস্যা।

জাত দ্রব্যাদি—১৬৫'৫, টায়ার—১৭০'১, সিমেণ্ট—১৭৫'৩, লৌহমাক্ষিক—১২৬'৩; সর্বসমেত—১৩৭'৩।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সরকারী সূত্র ছাড়া বেসরকারী সূত্রে নূতন শিল্পে ৩৪০ কোটি টাকা এবং পুরাতন শিল্পসংস্কারে ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী এবং বেসরকারী সূত্রে (Public and Private Sector) যন্ত্রশিল্প ও খনি খাতে যথাক্রমে ৬৯০ কোটি টাকা ও ৫৭৫ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে বর্তমানে শিল্পোন্নয়নের এমন এক ধারা অনুসরণ করা হইতেছে যাহাতে অত্যধিক ভারগ্রস্ত কৃষিকেন্দ্রিকতা হইতে মুক্ত হইয়া ভারত অগ্রগতিসম্পন্ন দেশগুলির সমপর্যায়ে শিল্পসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। দীর্ঘকালের কৃষি-মুখিতা হইতে ভারতীয় অর্থনীতিকে শিল্পমুখী করিয়া তোলা যে সময় ও সাধনা সাপেক্ষ, তাহা বলাই বাহুল্য।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতে বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিতেছে। এই বৃদ্ধি নিম্নের হিসাব হইতে উপলব্ধি করা যাইবেঃ—

শিল্প	১৯৫৫	১৯৫৭
তুলাজাত সূতিবস্ত্র (লক্ষ গজ)	৫০,৯৪০	৫৩,১৭৪
তুলাজাত সূতা (লক্ষ পাউণ্ড)	১৬,৩০৮	১৭,৮০১
পাটজাত দ্রব্য (হাজার টন)	১,০২৭	১,০৩০
চিনি (হাজার টন)	১,৫৯৫	২,০৩৯
কাগজ ও কাগজের বোর্ড (হাজার টন)	১৮৫	২১০
সিগারেট (কোটি)	২,২৮৩	২,৮৮১
কয়লা (লক্ষ টন)	৩৮২	৪৩৫
ইস্পাত (হাজার টন)	১,২৬০	১,৩৪৬
ডিজেল ইঞ্জিন (সংখ্যা)	১০,২২৪	১৬,৬৪৪
সাবান (হাজার টন)	৯৯	১১২
সালফিউরিক এ্যাসিড (হাজার টন)	১৬৬	১৯৬
মোটর গাড়ী (সংখ্যা)	২৩,০৮৮	৩১,৯৩২
রবার টায়ার (হাজার)	৬,৬৩০	৮,১৪০
সিমেণ্ট (হাজার টন)	৪,৪৮৭	৫,৬০২
লৌহ মাক্ষিক (হাজার টন)	৪,২৬০	৪,৬২০

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে যন্ত্রশিল্পের কিরূপ উন্নতি আশা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নের কয়েকটি হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে :—

পণ্য	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
ইস্পাত (হাজার টন)	১৩০০	৪৩০০
ঢালাই লোহা (Pig iron) (হাজার টন)	৩৮০	৭৫০
বনস্পতি (হাজার টন)	১৭৬০	২১১৪
এ্যালুমিনিয়াম (টন)	৭৫০০	২৫০০০
রেল ইঞ্জিন	১৭৫	৪০০
মোটর গাড়ী	২৫০০০	৫৭০০০
সালফিউরিক এ্যাসিড (হাজার টন)	১৭০	৪৭০
সিমেণ্ট (হাজার টন)	৪৯৩০	১৩০০০
কাগজ (হাজার টন)	২০০	৩৫০
সাইকেল (হাজার)	৫৫০	১২৫০

ভারতের যন্ত্রশিল্প

(Manufacturing Industries of India)

(১) বস্ত্রশিল্প

ভারতের বস্ত্রশিল্প অতি প্রাচীন এবং ভারতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি সুদূর অতীতেও ইয়োরোপে ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইত। কুটির শিল্প হিসাবে ভারতীয় তাঁতশিল্প এখনও বহু ভারতবাসীর অন্নসংস্থান করে। সূক্ষ্মতার জন্যই ঢাকাই মসলিন অবিনশ্বর আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সন্নিকটে প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের "স্পিনিং এ্যাণ্ড উইভিং কোম্পানী" ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাপড়ের কল। ভারতে বিলাতী কাপড় চালাইবার জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এদেশে তাঁতীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলে এবং শুল্কহারে দুর্নীতি দেখা যায়। এই সবের জন্য সেই সময় ভারতীয় তাঁতশিল্প প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য এ দুর্দিনের অবসান হইয়াছে এবং এখন বস্ত্রশিল্প ভারতের বৃহত্তম যন্ত্রশিল্প।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫১১ এবং ইহাদের প্রায় অর্ধেক বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত। ভারতীয় কলগুলিতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১১৫ কোটি টাকা। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে টাকু ও তাঁতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ও ২ লক্ষ ১ হাজারের কিছু বেশি। ভারতের কাপড়ের কলে বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ :—১৯৪৮—৪৩২ কোটি গজ ; ১৯৫০—৩৬৭ কোটি গজ ; ১৯৫২—৪৫৭ কোটি গজ ; ১৯৫৫—৫০৯ কোটি গজ ; ১৯৫৬—৫৩১ কোটি গজ ; ১৯৫৭—৫৩২ কোটি গজ ; ১৯৫৮ (চূড়ান্ত সাপেক্ষে)—৪৯৩ কোটি গজ। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ১৭৮ কোটি ১ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হয়। এই কলগুলিতে প্রায় ৮ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে এবং কর্মরত শ্রমিকদের শতকরা ১০ ভাগের মত নারীশ্রমিক। ভারত হইতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৩ কোটি গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতে মাথাপিছু কাপড়ের ব্যবহার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬.৮ গজ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫২-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে এই পরিমাণ ছিল ১৫ গজ।

যুদ্ধের সময় অত্যধিক কাজের চাপে যে সব যন্ত্রপাতি নষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলির সংস্কার এক বিরাট সমস্যা। ভারতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বর্তমানে কিছুটা বাড়িলেও (১৯৪৬-৫০ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন যন্ত্রাদির মূল্য ৪ কোটি টাকা টাকা ছিল, ১৯৫১-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ১১ কোটি টাকায় উঠিয়াছে) যন্ত্রের অভাব এখনও মারাত্মক। ভারতে বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল স্থাপন ও বহুসংখ্যক পুরাতন কল সংস্কার করা দরকার। এদিকে সাম্প্রতিক আগ্রহও অবশ্য আশাপ্রদ।

তাঁতশিল্প ভারতের বৃহত্তম কুটির বা ক্ষুদ্রশিল্প। প্রয়োজনীয় সূতা সংগ্রহ তাঁতীদের প্রধান সমস্যা। সরকার তাঁতশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন বলিয়া বর্তমানে ভারতীয় তাঁতশিল্প উন্নতির পথে চলিয়াছে। তাঁতশিল্প শুল্ক-সুবিধা পাইয়া থাকে, তা ছাড়া রঙীন সাড়ী উৎপাদনের ব্যাপারে তাঁত শিল্প একচেটিয়া সুবিধা পাইতেছে বলা চলে। খাদির উৎপাদনও এখন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতীয় তাঁতশিল্পে বর্তমানে দেড়শ কোটি গজের কিছু বেশি কাপড় উৎপন্ন হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৫১-১৯৫৬) তাঁত ও খাদি শিল্পে (সূতী, রেশম ও পশম সহ) ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে মোট ৭৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা (খাদি ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে কল ও তাঁত জড়াইয়া কাপড়ের উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬৮৫ কোটি গজের স্থলে ৮৫০ কোটি গজ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কমিটির (Village and Small-scale Industries Committee) হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ নাগাদ তাঁতে ১৭০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইবে।

ভারতে উৎকৃষ্ট তুলার অভাবের জন্য বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি কিছুটা প্রতিরুদ্ধ হইতেছে। অবশ্য বর্তমানে ভারত যে তুলার দিক হইতে আপেক্ষিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে, তাহা আগের ১২ লক্ষ গাঁইট তুলার আমদানী এখন প্রায় অর্ধেকে নামিয়া আসা হইতেই বুঝা যায়।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের কারিগরি সম্পর্কিত উন্নতির বিশেষ চেষ্টা হওয়া দরকার। এদিক হইতে বোম্বাই অঞ্চলের "ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি" ও "আমেদাবাদ মিল্‌ওনারস্‌ এ্যাসোসিয়েশন" পরিচালিত গবেষণাগারের সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

কর ও শুল্ক বাবদ ভারত সরকার ও রাজ্যসরকারসমূহ ভারতীয় বস্ত্রশিল্প হইতে বৎসরে ৪০ কোটি টাকার মত পাইয়া থাকেন।

(২) পাটশিল্প

পাট ভারতের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল এবং ভারতের পাটশিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে যথাক্রমে ১২৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার ও ১১২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। পৃথিবীর পাটের বাজারে ভারতের প্রায় একচ্ছত্র রাজত্ব। অখণ্ড ভারতবর্ষে পৃথিবীর পাটের শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ ভারতবর্ষে জন্মিত এবং ভারতীয় পাটের শতকরা ৮৫ ভাগ জন্মিত বাংলাদেশে।

দেশ বিভাগের সময় ভারতবর্ষের সব কয়টি পাটকলই ভারতে পড়ে। বর্তমানে ভারতে পাটকলের সংখ্যা ১১২, ইহার মধ্যে ১০১টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের প্রথম পাটকল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের নিকট রিসড়াতে স্থাপিত হয়।

ভারতে পাট উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা বাড়িলেও কাঁচা পাটের দিক হইতে ভারত এখনও পাকিস্তানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মাত্র ১৪ লক্ষ গাঁইট (প্রতি গাঁইট ৪০০ পাউণ্ড) পাট উৎপন্ন হয়। ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬ লক্ষ ৯৫ হাজার গাঁইটে উঠে। ইহার পর নানা কারণে অবশ্য পাট চাষের অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে এবং ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন নামিয়া আসিয়াছে ৪০ লক্ষ ৮৮ হাজার গাঁইটে। ভারতে বৎসরে ৭০ লক্ষ গাঁইটের মত কাঁচা পাটের প্রযোজন।

ভারত সরকার বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারতীয় চটকল সমিতি (Indian Jute Mills Association) ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে এক শুভেচ্ছা মিশন পাঠান। পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়াইতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার চট ও থলের উপর রপ্তানি শুল্ক অনেক কমাইয়া দেন। তাঁহারা মনে করেন যে শুল্ক হার কমায় চট বা থলে বিদেশে অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রীত হইতে পারিবে এবং কাগজের ব্যাগ, তুলাজাত কাপড়ের ব্যাগ প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতা চালান অনেক সহজ হইবে।

পাট হইতে কাপড়, টেলিগ্রাফের তার জড়াইবার সূতা, জুটেক্স ইত্যাদি

পণ্য তৈয়ারী হইতেছে। চট ও থলে ছাড়া অন্য নানা ভাবে পাটের ব্যবহারের চেষ্টা হওয়া দরকার। কাঁচা পাটের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীলতাও অবাঞ্ছনীয়। ভারতে পাটের চাষ বাড়াইবার জন্য ভারত সরকার কেন্দ্রীয় পাট সংসদকে (Central Jute Committee) অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

ভারতীয় পাট শিল্পে আগে অব্যাহত বিদেশী প্রভাব ছিল, এখন সেই প্রভাব অবশ্য ক্রমেই কমিতেছে। পাটকল মালিকদের প্রতিষ্ঠিত "ভারতীয় চটকল সমিতি" একটি সুসজ্ঞবদ্ধ সংস্থা। ভারতীয় পাটকলগুলিতে ৩০ কোটি টাকার মত মূলধন খাটিতেছে এবং এইগুলিতে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ।

পাট প্রথম শ্রেণীর অর্থকরী ফসল হইলেও এদেশে পাট চাষীর দুবেলা অন্ন জুটে না। ইহার কারণ দরিদ্র ও অজ্ঞ পাট চাষীরা ফড়িয়া, দালাল, আড়তদার প্রভৃতির দ্বারা অবিরাম শোষিত হইতেছে। ইহাদের বাঁচাইবার জন্য কাঁচা পাটের সর্বনিম্ন দর যথাসম্ভব উঁচুতে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত এবং কাঁচা পাট যাহাতে সমবায় সমিতি মারফৎ উপযুক্ত বাজারে ন্যায্য ও সর্বোচ্চ দরে বিক্রীত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাট-চাষীদের শোচনীয় অবস্থার বিপরীতে পাটকলওয়ালারা সত্যই অবিশ্বাস্য মুনাফা লুটিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯৪১ হইতে ১৯৪৫—যুদ্ধের এই পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর গৌরীপুর, হাওড়া, খড়দহ ও কেলভিন এই চারিটি কল প্রতি সাধারণ শেয়ারের লিখিত মূল্যের উপর শতকরা যথাক্রমে ৭৭ ভাগ, ৭১ ভাগ, ৫৭ ভাগ ও ৫৪ ভাগ লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে।

পাকিস্তানের চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা অঞ্চলে কয়েকটি পাটকল ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কাঁচা পাটের প্রাচুর্যের জন্য পূর্ববঙ্গে আরও কয়েকটি পাটকল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে।

(৩) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

(Iron and Steel Industry)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নির্মিত দিল্লীর কুতবমিনারের লৌহস্তম্ভটি দেখিলেই বুঝা যায় ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রাচীন কালেও কত সমৃদ্ধ ছিল।

ভারতে আধুনিক প্রথায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৎসর কুলটিতে 'বরাকর আয়রণ কোম্পানী'

নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মনির্ভরশীল হইতে না পারায় এই কারখানাটি প্রথমে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বরাকর আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী' নামে এবং আরও দুই বৎসর পরে 'বেঙ্গল আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী' নামে হাত পাল্টাইয়া যায়। বলিতে গেলে ভারতে এই 'বেঙ্গল আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী'ই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইস্পাত তৈয়ারীর চেষ্টা করিয়াছিল। আর্থিক অসাচ্ছল্যের জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় হস্তান্তরিত হইয়া 'বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী' নামে পরিচিত হয় এবং পরে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 'ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী'র সহিত একত্রীভূত হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের এক আইন অনুসারে (Steel Companies Amalgamation Ordinance, 1952) 'স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল' 'ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড'-এর সহিত একত্রীভূত হইয়াছে। এই 'ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী' ছাড়া ভারতের আর দুইটি বড় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা হইল জামসেদপুরের 'টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী' এবং দক্ষিণ ভারতের ভদ্রাবতীতে 'মাইশোর আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস'।

ভারতে আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে নবযুগের প্রবর্তন হয় বিহারের 'সাকচী'তে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট 'টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। সিংভূম জেলার বিপুল লৌহ সম্পদ এই প্রতিষ্ঠানের দ্রুত উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। ভারতের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা টাটা কোম্পানী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ঢালাই লোহা (Pig Iron) এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্পাত উৎপাদন সুরু করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে টাটা কোম্পানী খুবই সম্প্রসারিত হয়।

ভারতের বহুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদন দরকার এবং সেজন্য অধিকতর পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন করিতেই হইবে।* টাটা কোম্পানীর বার্ষিক ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা ১৩ লক্ষ টনের স্থলে

* এসম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর লোক-সভায় বলেন :—

'We are spending a vast sum to-day over three steel plants. It is an enormous sum for India. We do it, because, if we do not do it, it means a continuous drain of foreign exchange and money being spent abroad to buy steel and buy machines and the like. Steel is important before we start at industry; it is basic want of industry.'

২০ লক্ষ টনে তুলিবার জন্য কারখানা সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং এজন্য ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুনের এক চুক্তি অনুসারে বিশ্ব ব্যাঙ্ক টাটা কোম্পানীকে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বা প্রায় ৩৬ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছেন। ভারতে সরকারী দায়িত্বে জার্মান সাহায্যে রৌরকেলা, সোভিয়েট সাহায্যে ভিলাই ও ব্রিটিশ সাহায্যে দুর্গাপুরে প্রত্যেকটি বার্ষিক দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম এরূপ তিনটি নূতন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে এবং চতুর্থ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে বিহারের বোকারোতে। সব জড়াইয়া ভারতের ইস্পাত উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ লক্ষ টনের স্থলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩ লক্ষ টনে উঠিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে এবং অনুমিত হইয়াছে যে, এই সময়ের মধ্যে কারখানার উপযোগী ঢালাই লোহার উৎপাদন ৩৮ লক্ষ টন হইতে ৭৫ লক্ষ টনে উঠিবে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৎসরে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করে।

প্রতি টন পরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদন করিতে প্রায় সাড়ে পাঁচ টন কাঁচা মাল লাগে, কাজেই ভারতে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে এদেশে যান-বাহনের স্বল্পতা স্বভাবতঃই উদ্বেগের সৃষ্টি করে। মালগাড়ীর অভাবে অন্তর্দেশীয় কয়লার যোগানের অসুবিধাও কম সমস্যা নয়।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংরক্ষণ সুবিধা (Protection) পায়। এই সুবিধার জন্যই ১৯২৯-৩১ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক মন্দা কাটাইয়া শিল্পটি বর্তমানে এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে সংরক্ষণ সুবিধা না থাকিলেও মূল শিল্প এবং দেশরক্ষা ও সাধারণ শিল্প গঠনে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে সুযোগ সুবিধাও যেরূপ দিয়া থাকেন, তেমনি ইহা যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ সরকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ করিয়াছেন। ভারতে পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারী পরিচালনায় পরিচালিত হইতে থাকিলেও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতি অনুসারে নূতন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ভারতে প্রচুর পরিমাণে উন্নত ধরণের লৌহ মাক্ষিক আছে। এজন্য ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রভূত সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া বিশ্বব্যাঙ্ক

টাটা কোম্পানীকে দুই দফায় ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ ডলার (৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার+৩ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার) এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীকে দুই দফায় ৫ কোটি ডলার (৩ কোটি ডলার+২ কোটি ডলার) ঋণ দিয়াছেন। কোন দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানবিশেষকে বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই ঋণ দান একটু অসাধারণ ঘটনা সন্দেহ নাই। অবশ্য, বলাই বাহুল্য, ঋণ দানের সুফল সম্পর্কে ভারত সরকার বিশ্বব্যাঙ্ককে পূর্বাহ্নে আশ্বস্ত করিয়াছেন।

---

(৪) সিমেণ্ট শিল্প
(Cement Industry)

বাড়ীঘর ও পথঘাট তৈয়ারীতে আজকাল সিমেণ্টের ব্যবহার খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। সিমেণ্ট দ্বারা বাড়ী বা রাস্তা তৈয়ারী করিলে তাহা স্থায়ী এবং সুদৃশ্য হয়, খরচও চুন-সুরকির তুলনায় এমন কিছু বেশি পড়ে না। তাছাড়া সিমেণ্ট ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত কম ইট লাগে। ভারতে গৃহনির্মাণ সমস্যা প্রবল, পথঘাট দ্রুত বাড়াইতে হইতেছে, বিভিন্ন পরিকল্পনার (নদনদী পরিকল্পনা সহ) কাজ চলিতেছে। কাজেই সরকারী বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রেই বর্তমানে সিমেণ্টের প্রভূত চাহিদা দেখা যায়।

ভারতের প্রথম সিমেণ্টের কারখানা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে স্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয় কারখানা স্থাপিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পোরবন্দরে। প্রথম মহাযুদ্ধে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের সিমেণ্ট শিল্প প্রভূত সম্প্রসারিত হইয়াছে। বর্তমানে সিমেণ্ট শিল্পের উন্নতির এই ধারা অব্যাহত আছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ২৬ লক্ষ ১২ হাজার টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬০ লক্ষ ৬ হাজার টন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সিমেণ্ট কারখানার সংখ্যা হইয়াছে ২৯। ভারতে বর্তমানে অন্ততঃ ১ কোটি টন সিমেণ্টের প্রয়োজন।

ভারতীয় সিমেণ্টের উৎপাদন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনে উঠিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ভারতে সিমেণ্টের চাহিদা যখন সুতীব্র এবং চুনা পাথর, জিপসাম, কয়লা প্রভৃতি সিমেণ্ট উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল যখন ভারতে

যথেষ্ট পাওয়া যায়, তখন ভারতে সিমেণ্ট শিল্পের প্রসার কঠিন নহে বলিয়াই মনে হয়।

কয়েকটি কারখানা এককভাবে পরিচালিত হইলেও ভারতের অধিকাংশ সিমেণ্ট কারখানা "এ্যাসোসিয়েটেড্ সিমেণ্ট কোম্পানী" ও "ডালমিয়া সংঘ" (Associated Cement Companies of India & Dalmia Group) এই দুই শিল্পসংঘভুক্ত। বর্তমানে ভারতীয় সিমেণ্ট কারখানাগুলিতে মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটি টাকা এবং এইগুলিতে ৩৩ হাজারের মত লোক কাজ করে।

জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মূল পণ্যের হিসাবে লৌহ ও ইস্পাত অথবা কয়লা শিল্পের মত সিমেণ্ট শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ হওয়া উচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

(৫) চিনি শিল্প

(Sugar Industry)

ভারতের উন্নতিশীল শিল্পগুলির মধ্যে চিনি শিল্পের নাম করা যাইতে পারে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সংরক্ষণ সুবিধা পাইবার পর হইতেই এই শিল্প সম্প্রসারিত হইয়াছে। চিনি উৎপাদনের দিক হইতে কিউবা সর্বাধিক সমৃদ্ধ।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে চিনির কলের সংখ্যা ছিল ৩০ এবং এই কলগুলিতে দেড় লক্ষ টনের মত চিনি উৎপন্ন হয়। এই বৎসর বিদেশ হইতে ১৬ কোটি টাকা মূল্যের ১০ লক্ষ টন চিনি আমদানী হয়। শুল্ক নির্ধারণ বোর্ডের নির্দেশে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে বিদেশী চিনির উপর হন্দর পিছু ৭ টাকা ৪ আনা হারে শুল্ক বসে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ এই শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সর্বসমেত হন্দর পিছু ৯ টাকা ১ আনা দাঁড়ায়। এইরূপ বিপুল সংরক্ষণ সুবিধা লাভ করিয়া ভারতের চিনি শিল্প দ্রুত গতিতে উন্নতিলাভ করিতে থাকে এবং কলের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িয়া চলে। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১১ লক্ষ ১০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয় এবং আমদানীর পরিমাণও হ্রাস পাইয়া এই বৎসর ১২ হাজার টনের নীচে নামিয়া আসে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে চিনি শিল্পের উপর সংরক্ষণ সুবিধা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অত্যাবশ্যক পণ্য হিসাবে চিনির

উপর যে নিয়ন্ত্রণ বসিয়াছিল, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাহারও অবসান ঘটিয়াছে।

১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১৪৬টি চিনির কলে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়। ভারত বিভাগের ফলে ১১টি চিনির কল পড়ে পাকিস্তানে। বর্তমানে ভারতে ১৭০টি চিনির কল আছে এবং ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এইগুলিতে ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। এছাড়া ভারতে বৎসরে ৪ লক্ষ টনের মত খান্দেসরী চিনি উৎপন্ন হয়। বৎসরে কিউবায় ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন, সোভিয়েট রাশিয়ায় ৩১ লক্ষ টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন, ব্রাজিলে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টন, ফ্রান্সে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন, অস্ট্রেলিয়ায় ১৩ লক্ষ টন এবং ফিলিপাইনে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশে চিনি কলের সংখ্যা সর্বাধিক, তাহার পরেই বিহারের স্থান। এই দুই রাজ্যে অবশ্য ভারতীয় ইক্ষুর শতকরা ৭৫ ভাগ জন্মায়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতে ৩৯টি নূতন চিনির কারখানা স্থাপনের কথা আছে এবং এই পরিকল্পনার শেষে ভারতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ২৩ লক্ষ টনে উঠিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

ভারতীয় চিনি শিল্পে ৬০ কোটি টাকার মত মূলধন খাটিতেছে। বিশেষজ্ঞ সহ চিনির কলগুলিতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক কাজ করে। গুড় ও চিনির মিলিত হিসাব ধরিলে উৎপাদনের দিক হইতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৬৮ লক্ষ টন গুড় উৎপন্ন হয়। ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৭১ লক্ষ টনে উঠিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ভারতীয় চিনির কলগুলিতে কয়েক বৎসরের চিনির উৎপাদন নিম্নে দেওয়া হইল: (বৎসর নভেম্বর হইতে অক্টোবর) ১৯৪৭-৪৮—১১ লক্ষ ৮৫ হাজার টন; ১৯৫০-৫১—১২ লক্ষ ২৬ হাজার টন; ১৯৫২-৫৩—১৪ লক্ষ ৭ হাজার টন; ১৯৫৪-৫৫—১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টন; ১৯৫৫-৫৬—১৮ লক্ষ ৬ শত টন; ১৯৫৬-৫৭—২০ লক্ষ ২৬ হাজার টন; ১৯৫৭-৫৮—১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টন।

ভারতবাসী মাথাপিছু বৎসরে ২৪ পাউণ্ড গুড় ও ১০ পাউণ্ড চিনি (মোট ৩৪ পাউণ্ড) ব্যবহার করে, পক্ষান্তরে ব্রিটেনে ১১২ পাউণ্ড, অস্ট্রেলিয়ায় ১১৪ পাউণ্ড, নিউজিল্যাণ্ডে ১১৫ পাউণ্ড এবং ডেনমার্কে ১২৮ পাউণ্ড চিনি মাথা-

পিছু বৎসরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিকিৎসকদের মতে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভারতে বৎসরে মাথাপিছু অন্ততঃ ৪৬ পাউণ্ড চিনি বা গুড় ব্যবহৃত হওয়া দরকার।

ভারতে চিনির কলের উৎপাদন ব্যয়ের হার অত্যধিক। অনেকেরই ধারণা, চিনির কলওয়ালাদের মুনাফাবৃত্তিও চিনিশিল্পকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইতে দিতেছে না। কলওয়ালাদের দিক হইতে চিনিশিল্পের নিম্নলিখিত অসুবিধার উল্লেখ করা হয়:—(১) ভারতে একর প্রতি কম ইক্ষু উৎপাদন; (২) ইক্ষুর চড়া দর (দশ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করিতে এক কোটি টনের বেশি ইক্ষু লাগে এবং ইহার জন্য খরচ করিতে হয় ৪৫ কোটি টাকা), (৩) ভারতীয় ইক্ষুতে গড়পড়তা কম চিনি উৎপাদন, (৪) চিনি শিল্পের অত্যধিক উৎপাদনী শুল্ক, (৫) শ্রমিক ও উৎপাদনের হিসাবে ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং (৬) উপজাত পণ্যাদি যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থার অভাব।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহার ইক্ষু চাষের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া এই দুই রাজ্যে চিনি শিল্পের আপেক্ষিক প্রসার হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা মাদ্রাজ ও বোম্বাই রাজ্যে ইক্ষুচাষের উন্নতি ও চিনি শিল্পের প্রসার হইতে পারে। এদিক হইতে বর্তমানে কিছু কিছু চেষ্টা চলিতেছে।

চিনি শিল্পের উন্নতির জন্য কানপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সুগার টেকনোলজির গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

বলা বাহুল্য, ইক্ষু উৎপাদন-ক্ষেত্রের নিকট চিনির কল স্থাপন এবং নিষ্পেষিত ইক্ষু হইতে সংবাদপত্রের কাগজ ইত্যাদি উপজাত পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা যত অধিক হইবে, চিনির উৎপাদন-মূল্য ততই হ্রাস পাইবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি (Indian Central Sugar Cane Committee) তৃতীয় পরিকল্পনায় যাহাতে বৎসরে সাদা চিনি ৩০ লক্ষ টন উৎপন্ন হয় তজ্জন্য ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ এক সুপারিশ করিয়াছেন।

(৬) কাগজ শিল্প
(Paper Industry)

কাগজ মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে কতখানি সাহায্য করিয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে

কাগজের প্রয়োজন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কাগজ শিল্পের প্রসারের সহিত সারা বিশ্বে গণশিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে।

ভোজপ্রবন্ধ, শকুন্তলা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আমরা সাধারণতঃ বৃক্ষপত্রে লিপিলিখনের কথা পাই। তালপাতায় লিখিবার রীতি আধুনিক যুগেও পল্লীভারতে প্রচলিত। প্রাচীনকালে গ্রীসে চামড়ার উপর এবং মিশরে মোমের সাহায্যে কাঠের উপর লেখা হইত।

অনেকের মতে চীনেই প্রথম কাগজ উৎপন্ন হয়, তবে কেহ কেহ মিশরকে কাগজের আদি উৎপত্তিস্থল বলেন। সম্ভবতঃ ইংরেজি 'পেপার' শব্দের সহিত মিশরের জলজ উদ্ভিদ পেপিরাসের সাদৃশ্য হইতে এই ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূচনা হইতেই কাগজের ব্যবহার সুরু হয়। মোগল যুগে ভারতে হস্তনির্মিত কাগজ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

রবার্ট নিকোলাস নামক জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে কাগজ কলের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়া কাগজ শিল্পে নবযুগের প্রবর্তন করেন। ভারতের সর্বপ্রথম কাগজের কল "রয়াল পেপার মিল" ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী নদীর তীরে বালীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে সাহিত্যরসিক মিশনারী উইলিয়াম কেরি একটি কাগজের কল স্থাপন করেন বলিয়া শোনা যায়। কাগজের কল বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে হস্তলিখিত কাগজ শিল্পের বাজার সঙ্কুচিত হইতে থাকে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলে তৈয়ারী কাগজের যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় আবার এদেশে হস্তনির্মিত কাগজ শিল্পের প্রসার ঘটে।

ভারতে কাগজ শিল্প ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংরক্ষণ সুবিধা পাইয়াছে। কাগজের প্রধান কাঁচা মাল সাবাই ঘাস ও বাঁশ প্রচুর হওয়ায় ভারতে কাগজ শিল্পের সম্ভাবনা যথেষ্ট। প্যাকিং ও র‍্যাপিং কাগজ, কাগজ প্রস্তুতের জিনিসপত্র, রাসায়নিক প্রথায় কাষ্ঠের মণ্ড মিশ্রিত কাগজ সংরক্ষণসুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়।

১৯১৫ হইতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৎসরে গড়ে ৩০ হাজার টন কাগজ (বোর্ডসহ) ভারতের কলগুলিতে উৎপন্ন হয়। সংরক্ষণ-সুবিধা লাভের পর ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯ হাজার টন। ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৯৩,৫০০ টন কাগজ উৎপন্ন হয়, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টনে পৌঁছায়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে

ভারতে ২ লক্ষ ১০ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯৪ হাজার টন। বর্তমানে ভারতে ১৯টি কাগজের কল আছে, এইগুলির উন্নয়নসহ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে আরও ২২টি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আছে এবং কাগজের মোট উৎপাদন বর্তমানের ২ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টনে উঠিবে বলিয়া আশা করা হইযাছে। বর্তমানে ভারতকে বৎসরে গড়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার টনের মত কাগজ সুইডেন, ক্যানাডা, ব্রিটেন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। শিক্ষার প্রসারের সহিত ভারতে কাগজের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের (News Print) একান্ত অভাব বলিয়া বিদেশ হইতে বৎসরে ৭০ হাজার টনের মত এই কাগজ আমদানী করিতে হয়। অত্যধিক চাহিদার জন্য ভারতে ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ১৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকার ও ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাগজ ও বোর্ড বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। ভারতে বোর্ডেরও কিছু অভাব আছে। অবশ্য এদেশে খড় হইতে বোর্ড উৎপাদন অনায়াসেই বাড়ান চলে।

ভারতের কাগজ শিল্পে প্রায় ২৮ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে এবং এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ২৪ কোটি টাকার মত।

সংরক্ষণ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও রাসায়নিক দ্রব্যাদির অভাবে ভারতের কাগজ শিল্প দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। অবশ্য যন্ত্রপাতির অভাবও নিঃসন্দেহে এই দুর্গতির অন্যতম কারণ। কাগজ তৈয়ারী করিতে কস্টিক সোডা, রঙ, গন্ধক, ফটকিরি, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য লাগে। ভারতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইলে কাগজ শিল্প অবশ্যই সমুন্নত হইবে। একটু চেষ্টা করিলে ভারতে কাগজের প্রধান উৎপাদক বাঁশ ও সাবাই ঘাসের উৎপাদন বাড়ানো যায়। দেরাদুনের অরণ্যসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণাগারে ভারতে সহজলভ্য কাগজের অন্য ভাল উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতীয় কলগুলিতে কাগজের উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ভারতে নিউজ প্রিণ্ট বা সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের একান্ত অভাব ছিল। আগে এদেশে এই কাগজের একটিও কল ছিল না, সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে নেপানগরে 'ন্যাশনাল নিউজপ্রিণ্ট এ্যাণ্ড পেপার মিলস' বা নেপা মিলস্ নামে

বৎসরে ৩০ হাজার টন উৎপাদন উপযোগী একটি সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কারখানায় ১৪ হাজার টন নিউজ প্রিন্ট উৎপন্ন হইয়াছে। এ ছাড়া হায়দরাবাদের সকর নগরে সরকারী মালিকানায় বৎসরে ৩০ হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতাসহ একটি নিউজ প্রিন্ট কারখানা স্থাপিত হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা, এ ছাড়া ভারতে আরও দুইটি ৩০ হাজার টন করিয়া নিউজ প্রিন্টিং উৎপাদনক্ষম কারখানা স্থাপন সম্ভব এবং এইভাবে এদেশের ১ লক্ষ ২০ হাজার টন নিউজ প্রিন্টের প্রয়োজন পূরণ হইতে পারে। ভারতের চিনির কলগুলিতে প্রচুর পরিমাণ আখের ছিবড়া নষ্ট হয়। এই আখের ছিবড়া হইতে প্রস্তুত সংবাদপত্রের কাগজ বাজারের চলতি ঐ শ্রেণীর কাগজের তুলনায় উন্নত ধরণের হইবে বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন বাণিজ্য-সচিব মিঃ চার্লস্ মইয়ার ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আগেই বলা হইয়াছে, শিল্প হিসাবে কাগজ শিল্পের কিছুটা উন্নতি সত্ত্বেও ভারত এখনও বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর কাগজ আমদানী করে। এই আমদানীর মূল্য ১০ কোটি টাকার উপর। প্রচণ্ড অভাবের জন্য যুদ্ধের সময় ভারত সরকার কঠোরভাবে কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেন। কাগজের এই দারুণ অভাবের কথা স্মরণ করিয়া এদেশে হস্তনির্মিত কাগজ শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সরকারের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এজন্য গ্রামাঞ্চলে অভিজ্ঞ কারিগর পাঠাইয়া মণ্ড তৈয়ারী ও কাগজ প্রস্তুত করা সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে ভারতে অনায়াসেই বহু পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হইতে পারে। উলুখড় ও খড়ের মণ্ড হইতে মোটা বোর্ড প্রস্তুত হয়, প্রচুর বালির কাগজও এইভাবে উৎপাদন করা সম্ভব বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন। কচুরিপানা হইতেও কাগজ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। আখের ছিবড়া হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ উৎপাদনের কথা আগেই বলা হইয়াছে। ভারতে কাগজ শিল্পের উন্নতিসাধনের এই সুযোগ সম্ভাবনার প্রতি সরকারী কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। বলা নিষ্প্রয়োজন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে এবং দেশের শিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষার প্রসার ঘটিলে ভারতে কাগজের ব্যবহার অনেক বাড়িয়া যাইবে। ভারতে কাগজের ব্যবহার আগে অনেক কম ছিল, বর্তমানেও ইহা কিরূপ অকিঞ্চিৎকর তাহা বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক কাগজ ব্যবহারের

নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে:—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৩০০ পাউণ্ড, ক্যানাডা—.৭৫ পাউণ্ড, ব্রিটেন—১৫০ পাউণ্ড, সুইডেন—৮৫ পাউণ্ড, জার্মানী—৭৭ পাউণ্ড, বেলজিয়াম—৫০ পাউণ্ড, অস্ট্রেলিয়া—৪৪ পাউণ্ড, ফ্রান্স—৪০ পাউণ্ড, আর্জেন্টিনা—৩১ পাউণ্ড, জাপান—১৮ পাউণ্ড, ভারত—১২ পাউণ্ড।

পাকিস্তানে কাগজ তৈয়ারীর কাঁচা মাল যথেষ্ট হইলেও কলের অভাবে পাকিস্তান এখনও কাগজের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল।

(৭) রেশম শিল্প

ভারতে রেশম শিল্প খুবই প্রাচীন এবং সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে সূক্ষ্ম রেশম বস্ত্রের বহু উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে ভারতে রেশম শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অনেকের বিশ্বাস, চীন দেশেই প্রথম রেশম উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয় এবং চীন হইতে জাপান, ভারত ও পারস্যে রেশম শিল্প প্রসার লাভ করে। পারস্য হইতে রেশম শিল্প গ্রীসের ভিতর দিয়া সারা ইউরোপে প্রসারিত হইয়াছে।

রেশম মূল্যবান জিনিস, তবু সৌখীন ও প্রয়োজনীয় পণ্য হিসাবে রেশম বস্ত্রের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। এই চাহিদার তীব্রতার জন্যই কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন শিল্প ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতেছে। কাষ্ঠমণ্ড বা তুলার মণ্ড হইতে কস্টিক সোডা, এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া সূক্ষ্ম যন্ত্রে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করা হয়। জাপান রেশম ও রেয়ন উভয় শিল্পেই বিশেষ সমৃদ্ধ। ভারতে কেরালা ও বোম্বাই রাজ্যে দুইটি রেয়ন সূতা উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তুঁতপাতা খাইয়া এক শ্রেণীর পোকা তুঁত গাছে যে রেশম গুটি তৈয়ারী করে, তাহাই আসল রেশম (Mulberry Silk)। এছাড়া আর এক রকম রেশম আছে যাহাকে বন্য রেশম (Wild or non-Mulberry Silk) বলে ; মুগা, এণ্ডি, তসর এই শ্রেণীভুক্ত। ভারতে বৎসরে প্রায় ৭ কোটি টাকার আসল রেশম ও ২ কোটি টাকার বন্য রেশম উৎপন্ন হয়।

ভারতের নানা রাজ্যে রেশমের গুটিপালন এবং রেশম সূতা উৎপাদন ও কাপড় তৈয়ারী কুটিরশিল্পরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তবে ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রধান। কাশ্মীর, পূর্ব পাঞ্জাব,

উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শুল্ক নির্ধারক বোর্ড সংরক্ষণ সুবিধার সুপারিশ করিলে ভারত সরকার রাসায়নিক শিল্পগুলিকে দুই বৎসরের জন্য সংরক্ষণ সুবিধা দেন। দুঃখের বিষয়, দুই বৎসর অতীত হইলে ভারত সরকার দেশবাসীর দাবী সত্ত্বেও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে এই সুবিধা বাড়াইয়া দেন নাই। সুবিধা না বাড়াইবার কারণ স্বরূপ ভারত সরকার ভারতে এই শিল্পপ্রসারে অত্যাবশ্যক গন্ধকাদি কাঁচামালের অভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং রাসায়নিক শিল্পে কাঁচামাল চলাচলের জন্য রেলের ভাড়া কমাইয়া ক্ষতি স্বীকার করিতে তাঁহারা অক্ষমতা জানান। যাহা হউক ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে রাসায়নিক শিল্প এই ভাবে সংরক্ষণ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতার চাপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আর প্রসারিত হয় নাই। সুতরাং যুদ্ধের মধ্যে ভারতে রাসায়নিক শিল্পের যেটুকু প্রসার হইয়াছে, জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে তাহার মূল্য কম নয়। ভারত বিভাগের পর অখণ্ড ভারতের রাসায়নিক শিল্প মোটামুটি ভারতেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

রাসায়নিক শিল্পপণ্যের প্রয়োজন নানাবিধ। এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সার জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করে, ব্লিচিং পাউডার জীবাণু-নাশে ও কাগজ উৎপাদনে সাহায্য করে। দেশরক্ষা ব্যবস্থায় বা সামরিক দিক হইতে এবং ঔষধপত্র প্রস্তুতিতে এ্যাসিডাদির প্রভূত প্রয়োজন। এছাড়া সাবান শিল্পে, চামড়া পাকা করিবার কারখানাগুলিতে, কাঁচ ও এনামেল শিল্পে এবং কাপড়ের কল, কাগজের কল প্রভৃতিতে নানাপ্রকার রাসায়নিক পণ্যের দরকার হয়। এইরূপ প্রয়োজনের চাপেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাসায়নিক শিল্প প্রসারলাভ করিয়াছিল। বিহারের সিন্দ্রিতে রাসায়নিক সার এ্যামোনিয়াম সালফেটের যে কারখানাটি ভারত সরকার ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে উৎপন্ন সারের জন্য ভারতে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং বিদেশী আমদানীর হিসাবে বৎসরে কয়েক কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

ভারতে প্রায় সর্বপ্রকার রাসায়নিক পণ্যের উৎপাদনই এখন বৃদ্ধির দিকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যেখানে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন সালফিউরিক এ্যাসিড ও ৩৯,৪১৬ টন কস্টিক সোডা উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে ইহাদের উৎপাদন বাড়িয়া যথাক্রমে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টন ও ৪২,৪১৮ টন হইয়াছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ এই ছয় বৎসর গড়ে

যেখানে সুপার ফসফেট উৎপন্ন হইয়াছে ৪৭ হাজার টন, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টন সুপার ফসফেট উৎপন্ন হইয়াছে।* অবশ্য এখনও ভারতে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক পণ্য আমদানী করিতে হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাসায়নিক সারসহ ৩৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার রাসায়নিক পণ্য এবং ১৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার ঔষধপত্র ভারতে আমদানী হয়।

রাসায়নিক শিল্পের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের প্রসারের সহিত ভারতের অন্যান্য নানাপ্রকার শিল্পের অগ্রগতির সম্ভাবনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেদিক হইতে দেখিলেও সরকারের উচিত এদেশে এই শিল্প যাহাতে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক নীতিতে সম্প্রসারিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা। দীর্ঘকাল পূর্বে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শিল্প কমিশন মত প্রকাশ করেন যে, শিল্পের দিক হইতে ভারতের অনুন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ এদেশে প্রচুর রাসায়নিক পণ্যের অভাব। ভারতে রাসায়নিক পণ্যের, বিশেষ করিয়া সালফিউরিক এ্যাসিডের কারখানাগুলিতে পুরাতন ও ব্যয়সাপেক্ষ 'চেম্বার প্রসেস' পদ্ধতি অনুসৃত হয়, ইহা অবিলম্বে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিবর্তিত হওয়া দরকার। এই শিল্পপ্রসারের পথে সব চেয়ে বড় বাধা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব। জাতীয় জীবনে রাসায়নিক পণ্যাদির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকারের উচিত যথাসত্বর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আমদানী বা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া এই শিল্পকে হয় সংরক্ষণাদি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে, আর না হয় সিন্ধ্রির সার কারখানার মত সরকারী দায়িত্বে পরিচালনা করিতে হইবে। আশার কথা, এদিক হইতে ভারত সরকারের অধিকতর আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

ভারতে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ভারত-সরকার ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যে পরামর্শদাতা বোর্ড বা প্যানেল গঠন করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্টে এই মূল্যবান তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ভারত সরকারের শিল্প-বাণিজ্য দপ্তর হইতে রাসায়নিক শিল্পের

* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বা ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্যের উৎপাদন নিম্নরূপ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে:—

সালফিউরিক এ্যাসিড—৪ লক্ষ ৭০ হাজার টন; সোডা—২ লক্ষ ৩০ হাজার টন; কষ্টিক সোডা—১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন; এ্যামোনিয়াম সালফেট—১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন; সুপার ফসফেট—৭ লক্ষ ২০ হাজার টন।

তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হয়, তাঁহারা ইণ্ডিয়ান কেমিকেল এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় কাজ চালাইয়া এই শিল্পের প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। ভারত সরকার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন [Industries (Development and Regulation) Act, 1951] অনুসারে চিনি, বাইসাইকেল প্রভৃতি শিল্পের ন্যায় ভারী রাসায়নিক [Heavy Chemicals (Acids and Fertilisers) and Heavy Chemicals (Alkalis)] শিল্পের জন্য একটি উন্নয়ন সংসদ বা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন।

অন্যান্য কয়েকটি ভারতীয় শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প

(Automobile Industry)

ভারত দরিদ্র দেশ বলিয়া এখানে ব্যক্তিগত ব্যবহারের (Private) মোটরগাড়ীর চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম, তবে বিরাটায়তন এই দেশে যাত্রী ও মালপত্র বহনের জন্য বাস ও লরীর চাহিদা খুবই বেশি। ভারতে সম্প্রতি কয়েকটি মোটরগাড়ী নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এইসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশীদের সাহায্য বা অংশ কম নয়। তাছাড়া এগুলিতে এখনও আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি জোড়া দিয়া গাড়ী তৈয়ারী করা হইতেছে।

ভারত সরকার ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতে মোটরগাড়ী নির্মাণের কথা বিবেচনা করেন এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা কয়েকটি মাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মোটরগাড়ী উৎপাদন ও মোটরগাড়ীর অংশ জোড়া দেওয়ার কাজটি সীমাবদ্ধ করিবার নীতি গ্রহণ করেন। ইহাতে এই শিল্পের সম্ভাবনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

ভারতকে বৎসরে ১২।১৩ কোটি টাকার মত মোটরগাড়ী বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় বলিয়া এবং আর্থিক পুনর্গঠনের ফলে ভারতে মোটরের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক বলিয়া এদেশে মোটরগাড়ী শিল্পের প্রসার অত্যাবশ্যক। বর্তমানে ভারতের উল্লেখযোগ্য মোটরগাড়ী নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হইল কলিকাতার নিকটবর্তী উত্তরপাড়ার হিন্দুস্থান মোটরস, বোম্বাইয়ের প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস্ এবং টাটা কোম্পানী। ভারতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১৯৩২টি মোটর গাড়া উৎপাদন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৫৭ হাজারে পৌঁছাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

ভারতে মোটর সাইকেল ও স্কুটার নির্মাণ ব্যবস্থার প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা হইয়াছে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১১ হাজার মোটর সাইকেল ও স্কুটার নির্মিত হইবে।

সাইকেল শিল্প
(Cycle Industry)

সাইকেল অত্যন্ত জনপ্রিয় যানবাহন এবং ভারতের মত গ্রামবহুল দেশে ইহার চাহিদা খুবই বেশী। ভারত দরিদ্র দেশ বলিয়াই অপেক্ষাকৃত অল্প-মূল্য সাইকেলও জনসাধারণ কিনিতে পারে না, নহিলে এই চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইত।

ভারতে প্রথম সাইকেল তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু জার্মান বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা সত্ত্বেও মাদ্রাজের এই কারখানাটির অবদান উল্লেখযোগ্য হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বলিতে গেলে ভারতে সাইকেল শিল্প ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালু হইয়াছে। বাংলা দেশের 'ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী', বিহারের 'হিন্দুস্থান বাইসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী' এবং বোম্বাইয়ের 'হিন্দ সাইকেলস্'—প্রথম দিকের এই কারখানাগুলির সম্ভাবনা দেখিয়াই ভারত সরকার এসম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠেন এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের সহযোগিতায় ও বিদেশী সাইকেল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও ভারতীয় শিল্পপতিদের মিলিত চেষ্টায় 'সেন র‍্যালে ইনডাসস্ট্রিস', 'টি আই সাইকেলস্ অফ ইণ্ডিয়া' এবং 'এটলাস সাইকেল ইনডাসট্রিস' এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে বর্তমানে মোট ৭৮টি সাইকেল কারখানা চালু আছে, তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় কারখানার সংখ্যা ২০টি।

ভারতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি হাজার জনে মাত্র ২টি সাইকেল ছিল, দশ বৎসর পরে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১টি। ভারতে বর্তমানে ৪০ লক্ষের কিছু বেশি সাইকেল চালু আছে।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যেখানে ৪ লক্ষ ৯১ হাজার সাইকেল নির্মিত হয়, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে নির্মিত হইয়াছে ৭ লক্ষ ৯০ হাজার সাইকেল। সাইকেল নির্মাণের উপযোগী কাঁচামাল ভারতেই সহজে ও সুলভে মিলিতে পারে বলিয়া ভারতীয় সাইকেল এদেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইয়াও ভবিষ্যতে বিদেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যাইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। কিছু পরিমাণ ভারতীয় সাইকেল এখনই বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। ভারতের সাইকেল শিল্পে ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ যেখানে ৪ কোটি টাকার

মত, সেখানে প্রায় ৪০ কোটি টাকার বিদেশী মূলধন খাটিতেছে। বর্তমানে ভারতে ৮ হাজারের মত কর্মীর এই শিল্পে কর্মসংস্থান হইয়াছে।

ভারতে সাইকেল উৎপাদনের দ্বারা পূর্বে এই অত্যাবশ্যক পণ্য বিদেশ হইতে আমদানীর জন্য যে অর্থব্যয় হইত, তাহা বহুলাংশে বাঁচিয়া যাইতেছে। অবশ্য ভাল সাইকেল এবং সরঞ্জাম এখনও বিদেশ হইতে আমদানী হয়, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা।*

চলচ্চিত্র শিল্প
(Film Industry)

ভারতে চলচ্চিত্র শিল্প ইতিমধ্যেই প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। মানুষকে আনন্দ দিতে এবং জনশিক্ষার উপায় হিসাবে চলচ্চিত্রের বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভারতীয় চিত্রের কাজও লক্ষণীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং ‘পথের পাঁচালী’, ‘আওয়ারা’, ‘দো বিঘা জমিন’, ‘বাবলা’, ‘অপরাজিত’, ‘মাদার ইণ্ডিয়া’, ‘দো আঁখে বারহ হাথ’ প্রভৃতি চিত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ভারত সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার নির্মিত ‘নিউজ রিল’ ও তথ্যমূলক ছবিগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশে বিদেশে প্রশংসিত হইয়াছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কাজ সুরু করে এবং বর্তমানে এই শিল্পে ৭০ হাজারের মত লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। ছবির সংখ্যা হিসাবে পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম এবং ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতে ৬০টি স্টুডিওতে ছবি তৈয়ারী হয়। ভারতে প্রায় ৩,৫০০টি সিনেমা হাউস বা প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখানো হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সামাজিক, অপরাধমূলক, ধর্মমূলক, জীবনী সংক্রান্ত, শিশুদের উপযোগী, ঐতিহাসিক প্রভৃতি মিলাইয়া ২৯৫ খানি ছবি নির্মিত হয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের স্থায়ীভাবে লগ্নীকৃত মূলধন ৩২ কোটি টাকার মত এবং কার্যকরী মূলধন ৯ কোটি টাকা। চলচ্চিত্র শিল্প খুবই লাভজনক। ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ৬০ কোটি লোক সিনেমা দেখিয়া থাকে।

* অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সাইকেল আমদানীর হিসাবে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরিমাণই সাম্প্রতিককালে সর্বোচ্চ; ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ও ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

বোম্বাই ভারতের চলচ্চিত্র, নির্মাণের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র এবং কলিকাতার স্থান দ্বিতীয়। সম্প্রতি মাদ্রাজও ছবি নির্মাণের হিসাবে কলিকাতার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতে কিছু কিছু ভাল ছবি তোলা হইলেও সাধারণভাবে ভারতীয় ছবির মান উন্নত হওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির (Film Enquiry Committee, 1951) সুপারিশসমূহ উল্লেখযোগ্য। এই কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের কারিগরী এবং শিল্পমূল্যের মান উন্নত করিবার ব্যবস্থার উপর জোর দেন এবং এই উদ্দেশ্যে দায়িত্বসম্পন্ন একটি চলচ্চিত্র সংস্থা (Film Council) গঠনের সুপারিশ করেন। জনমানসের উন্নয়ন সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোন কোন ভারতীয় ছবির দ্বারা যে দর্শকের মনের অধঃপতন ঘটিয়া থাকে, সে কথা অনস্বীকার্য। অবশ্য ছবির এই মান দেখা সেন্সার বোর্ডের প্রধান কর্তব্য।

ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে ভারতসরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক ডকুমেণ্টারী ফিল্ম ও নিউজ রীলগুলির অবদান উল্লেখযোগ্য।

ভারতে চলচ্চিত্রের উপযোগী ফিল্ম ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ যত ত্বরান্বিত হইবে, ততই এই শিল্প উন্নতি করিবে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা মূল্যের ফিল্ম এবং ৫৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল।

ভারত সরকার কর্তৃক ভারতে ২০ লক্ষ টাকা প্রাথমিক মূলধন সহ একটি 'ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন' গঠিত হইতেছে।

দিয়াশলাই শিল্প

(Match Industry)

দিয়াশলাই এক অত্যাবশ্যক পণ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ দিয়াশলাই শিল্পের দিক হইতে ভারত যাহাতে অপেক্ষাকৃত স্বাবলম্বী হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই শিল্পকে সংরক্ষণ-সুবিধা দেন। বিদেশী দিয়াশলাইয়ের উপর আমদানী শুল্ক বসায় ভারতে দিয়াশলাই শিল্পের যে স্বাভাবিক প্রসার-সম্ভাবনা ছিল, তাহা কিন্তু বিখ্যাত সুইডিস প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী লিমিটেডের (উইমকো) ভারতে কারখানা

স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়।* উত্তর প্রদেশের বেরিলিতে এই কোম্পানীর প্রধান কারখানা; এ ছাড়া কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে, মাদ্রাজে এবং আমেদাবাদে উইমকোর কারখানা আছে। ভারতের মোট প্রয়োজনীয় দিয়াশলাইয়ের অধিকাংশই এই কারখানাগুলি যোগাইয়া থাকে।

বর্তমানে ভারতে দিয়াশলাই কারখানার সংখ্যা ২৩৪, এই কারখানা-সমূহের বৎসরে প্রায় চার কোটি গ্রোস দিয়াশলাই উৎপাদন-ক্ষমতা আছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রতিটি ৬০ কাঠির ৫০ বাক্সের ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার পেটি (cases) দিয়াশলাই উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কারখানাগুলিতে লোক নিযুক্ত আছে ২০ হাজারের বেশি। এইগুলিতে যে ৬ কোটি টাকার মত মূলধন খাটিতেছে, তন্মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগের মত বিদেশী মূলধন।

শিমূলের মত নরম দাহ্য কাঠ দিয়াশলাই তৈয়ারীর প্রধান উপাদান। এই শিমূল কাঠ ভারতে যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়া এদেশে দিয়াশলাই শিল্প প্রসারের প্রভূত সম্ভাবনা আছে। অবশ্য দিয়াশলাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ফসফরাস, গন্ধক প্রভৃতি রাসায়নিক পণ্যের ভারতে কিছুটা অভাব আছে। পাকিস্তান এইরূপ রাসায়নিক পণ্যের দিক হইতে অধিকতর সমৃদ্ধ এবং সংখ্যা বর্তমানে সামান্য হইলেও পাকিস্তানে কারখানার সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতে কুটির শিল্প হিসাবে দিয়াশলাই শিল্পের স্থান ও সম্ভাবনা নগণ্য নয়। নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম্য শিল্প সংসদ (All India Khadi and Village Industries Board) এই কুটির শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব লইয়াছেন।

ভারত সরকার কর্তৃক আবগারী-শুল্ক-নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বাজারে দিয়াশলাইয়ের মূল্যের একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব দেখা যায়।

---

* ভারতের প্রথম দিয়াশলাই কারখানা ভারতীয় পরিচালনায় আমেদাবাদে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

শিল্পশ্রমিক ও ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্প পরিস্থিতি

(Industrial Labour and India's post-war Industrial Position)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় শিল্পের পক্ষে উন্নতিলাভের এক দুর্লভ সুযোগ আসে। এই সময় বিদেশী মালপত্রের আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং যন্ত্রপাতির প্রচণ্ড অভাব সত্ত্বেও বিরাট লাভজনক বাজারের সুযোগ পাইয়া ভারতে লক্ষণীয় শিল্পপ্রসার ঘটে। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা ছাড়িয়া দিলেও যুদ্ধের আমলে ভারতের পুরাতন শিল্পগুলি বিস্ময়করভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যুদ্ধের ঠিক আগের বৎসরের সহিত ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় শিল্পপণ্য উৎপাদনের নিম্নলিখিত হিসাব লক্ষ্য করিলেই প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যাইবে :—

	১৯৩৮-৩৯	১৯৪৩-৪৪
কাপড় (কোটি গজ)	৩৮০	৪৭০
ইস্পাত (লক্ষ টন)	৭'৫	১১'২৫
কাগজ (হাজার টন)	৫৩	৯৩'৫
চিনি (লক্ষ টন)	৬'৫	১২'৭
চা (কোটি পাউণ্ড)	৩৭'১	৪৫'২

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ থামিবার পর হইতেই কিন্তু কিছুদিনের জন্য ভারতীয় শিল্প উৎপাদন নিম্নমুখী হয়। উৎপাদনের এই অবনতির প্রধান কারণ যুদ্ধোত্তর বাজারে অনিশ্চয়তার সঞ্চার ও শ্রমিক বিক্ষোভ। অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আবার ভারতীয় শিল্প-পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধবিরতির পর ভারতে শ্রমিক বিক্ষোভ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যুদ্ধের মধ্যে ধর্মঘট ইত্যাদি খুবই কম হয়। তখন সরকার শিল্পাগারগুলিকে নিজ স্বার্থেই ভালভাবে চালু রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যুধ্যমান ভারত

সরকারের পণ্যসামগ্রীর প্রয়োজন ছিল তখন অত্যধিক। এইজন্য শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে একদিকে তাঁহারা যেমন 'ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলস্' বা ভারত-রক্ষা আইন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিকদের অল্প মূল্যে খাদ্যাদি যোগান ইত্যাদি ব্যাপারে আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন যথেষ্ট। শিল্প-পতিরাও সেই সময় এত লাভ করিয়াছিলেন যে, কারখানা চালু থাকায় তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ ছিল এবং নিজেদের আশাতীত মুনাফার একাংশ শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পরে সরকার পণ্য ক্রয় বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প চালু রাখার ব্যাপারে সরকারী আগ্রহ কিছুটা শিথিল হইল। শিল্পপতিরা ভারতে বিদেশী প্রতিযোগিতা কিভাবে চলিবে সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হইতে না পারিয়া এবং ভারতের অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎ ও ভারত সরকারের শিল্পনীতি সম্পর্কে অস্পষ্টতার মধ্যে থাকিয়া শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার বা অতিরিক্ত সুবিধাদানের ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করিলেন না। এদিকে শিল্পপতিদের নিকট হইতে উত্তরোত্তর অধিক সুবিধালাভ শ্রমিকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল, কারণ যুদ্ধের সময় অপেক্ষা যুদ্ধোত্তরকালে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এ অবস্থায় শ্রমিকেরা বাঁচিবার মত নিম্নতম মজুরী দাবী করিয়া সুরু করিল ব্যাপক আন্দোলন। যুদ্ধের পর ভারতীয় শিল্পজগতে যে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিয়াছিল, তাহা তাহারা একান্ত সাময়িক বলিয়া মনে করিল এবং শিল্পপতিদের নিকট দাবী জানাইল যে, যুদ্ধোত্তরকালের আয় হইতে যদি তাহাদের জীবনধারণোপযোগী ন্যায্য পারিশ্রমিক বৃদ্ধি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এই সাময়িক অনিশ্চিত অবস্থা এড়াইতে শিল্পপতিদের উচিত যুদ্ধকালে সঞ্চিত বিরাট মুনাফার একাংশ ব্যয় করা।*

* শিল্পপতিদের মুনাফা যুদ্ধের সময় কিরূপ বাড়িয়াছিল, তাহা যৌথ কোম্পানীসমূহ সম্পর্কিত পত্রিকার (Joint Stock Companies' Journal) নিম্নোক্ত হিসাবে বুঝা যাইবে:—

বৎসর	ম্যানেজিং এজেন্টদের প্রাপ্য (টাকায়)	অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশ (কোটি টাকায়)
১৯৪০-৪১	১·৬৭	১১ ৬২
১৯৪১-৪২	৩ ০২	১৩ ৬৫
১৯৪২-৪৩	৪·৫৮	১৭ ৬২
১৯৪৩-৪৪	৩·৯৭	২২·৪৮
১৯৪৪-৪৫	৬·৫৪	২৫·৬২

যাহা হউক, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবী শিল্পপতিদের আশানুরূপ সক্রিয় সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিল না। শ্রমিকদের আর্থিক সঙ্কট ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লাভালাভের প্রশ্ন ধর্মঘটে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৪০৬টি ধর্মঘটে মোট কাজের দিন নষ্ট হয় ৪৯,৯২,৭৯৫টি। যুদ্ধের মধ্যে কতকটা সরকারী কড়াকড়িতে এবং কতকটা শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্ট থাকায় ধর্মঘটের ও নষ্ট কাজের দিনের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। যুদ্ধ শেষ হইবার পর অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নের হিসাব হইতে উপলব্ধি করা যাইবে:—

বৎসর	ধর্মঘট	নষ্ট কাজের দিন
১৯৪৬	১৬১৯	১, ২৭, ১৭, ৭৬২
১৯৪৭	১৮১১	১, ৬৫, ৬২, ৬৬৬
১৯৪৮	১২৫৯	৭৮, ৩৭, ১৭৩
১৯৫০	৮১৪	১, ২৮, ০৬, ৭০৪
১৯৫২	৯৬৩	৩৩, ৭৩, ০০০
১৯৫৪	৮৪০	৩৩, ৭২, ৬৩০
১৯৫৫	১১৬৬	৫৬, ৯৭, ৮৪৮
১৯৫৬	১২০৩	৬৯, ৯২, ০৪০
১৯৫৭	১২৪৮	৪৯, ৮২, ২২৯

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পর কিছুদিন যুদ্ধোত্তর ক্রমবর্ধমান শ্রমিক বিক্ষোভ অনেকটা শান্ত হইয়াছিল, সাম্প্রতিক কালে পুনরায় ইহা বৃদ্ধির পথে চলিযাছে। যুদ্ধাবসানের দীর্ঘদিন পরেও পণ্যমূল্য কমিতেছে না বলিয়া এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে কিছুটা মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখা দেওয়ার সঙ্গে বেকার সমস্যার সমাধান হইতেছে না বলিয়া শ্রমিক মহলে অস্বস্তি দেখা যাইতেছে। অবশ্য বর্তমানে রাজনৈতিক স্বার্থ সংঘাতের জন্যও শ্রমিকদের কিছুটা বিক্ষোভ ঘটিতেছে বলিয়া মনে হয়। তবে এই অবস্থায়ও টাটা কোম্পানীর মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-মালিক শান্তিচুক্তি আশ্বাসের বিষয়।* সামগ্রিক ভাবে

* শ্রমিক বিক্ষোভে মালিক, শ্রমিক, পণ্য-ভোগকারী দেশবাসী, সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে ১ কোটি ২৮ লক্ষ কাজের দিন নষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রধানতঃ দায়ী বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প ধর্মঘট। একমাস স্থায়ী এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের ২ কোটি টাকা ক্ষতি হয় এবং ১০ কোটি ৮০ লক্ষ গজ কাপড় ও ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা কম উৎপন্ন হয়।

ভারতের এইরূপ শ্রমিক বিক্ষোভ সত্ত্বেও এখন শিল্পক্ষেত্রে উন্নতির যুগ চলিয়াছে। আশা করা যায়, শিল্প সমৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের সন্তোষ বিধান সম্ভব হইবে বলিয়া শ্রমিক বিক্ষোভের তীব্রতাও অতঃপর হ্রাস পাইবে।

ভারতের জাতীয় সরকার ক্ষমতা হাতে পাইয়াই শ্রমিক স্বার্থসংরক্ষণে আগাইয়া আসেন এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শিল্প শান্তি প্রস্তাব (Industrial Truce Resolution, April, 1948) ভারত সরকারের, শিল্পমালিকদের এবং শিল্পশ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ও জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যায়। এজন্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার, শিল্পপতি ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় শ্রমপরামর্শদাতা সংসদ (Central Advisory Council for Labour) গঠিত হয়। ইতিপূর্বে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পবিরোধ আইনের (The Industrial Disputes Act, 1947) জন্য শ্রমিক-মালিক বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনটি সংশোধিত হইয়াছে [The Industrial Disputes Appellate Tribunal Act, 1950 এবং The Industrial Disputes (Amendment Miscellaneous Provisions) Act, 1956]। এইভাবে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে শ্রমিকেরা অনেকটা সন্তুষ্ট হয়।

উপরোক্ত শিল্পশান্তি প্রস্তাব ও শিল্পবিরোধ আইন ছাড়া শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারত সরকার এই সময় নিম্নতম বেতন আইন (Minimum Wages Act) ও শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (Workmen's Compensation Act) পাশ করাইয়া শ্রমিকদের শান্তি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত করিয়া তোলেন। সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বে-সরকারী শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ প্রস্তাব দশ বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার এবং দশ বৎসর পরে নূতন করিয়া অবস্থা বিবেচনা করিবার যে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন, তাহাতে শিল্পপতিরাও অনেকটা আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হন। সরকার শিল্প প্রসারে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি যোগানে সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে শ্রমিক-মালিক, উভয় পক্ষের আশ্বস্ততায় পুনরায় কাজকারবার ভালভাবে চলিতে থাকে এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিক হইতে ভারতীয় শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় শিল্পগুলি যাহাতে শক্তিমান বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত

না হয়, তদুদ্দেশ্যে ভারত সরকার সংরক্ষণ নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য ট্যারিফ বোর্ড বা শুল্কনির্ধারণ বোর্ডেরও সম্প্রসারণ করিয়াছেন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষিত সরকারী শিল্পনীতিতে ভারতীয় শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ প্রস্তাব উপস্থিতের মত সামান্য কয়টি দেশরক্ষা সংক্রান্ত বা মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সরকারী বে-সরকারী উভয়বিধ চেষ্টায় ভারতীয় শিল্প অতঃপর ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের শিল্প পরিস্থিতি এখন যে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা 'ভারতীয় শিল্পের ক্রমোন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই দেখান হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পের মূলধন

(Industrial Finance In India)

যথেষ্ট কাঁচামাল, সুলভ শিল্পশ্রম এবং জাতীয়তাবোধ সত্ত্বেও ভারতে এ পর্যন্ত আশানুরূপ শিল্পপ্রসার হয় নাই। শাসনকর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা এবং পরিকল্পনা ও পরিচালনার ত্রুটি এই পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ হইলেও প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবও এজন্য কম দায়ী নয়।

এদেশে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মালিকানায় অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা লব্ধ অর্থে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হয় বলিয়া নূতন বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিল্পকে অনেক সময় অর্থাভাবজনিত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলিতে জনসাধারণের ব্যক্তিগত বা যৌথ অবদান যাহাই থাকুক, শিল্পপ্রতিষ্ঠানাদি গঠনে ব্যাঙ্ক অধিকাংশ আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক মধ্যস্থ হওয়ায় এই সব প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা তো থাকেই না, বরং আর্থিক নিরাপত্তা ও সম্ভ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণ অর্থনিযোগ করিতে আগ্রহশীল হইয়া উঠে। ভারতে ব্যাঙ্কের সহিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এইরূপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকার ফলে এবং তজ্জন্য জনসাধারণ যৌথ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শেয়ার কিনিয়া টাকা খাটাইতে সঙ্কোচবোধ করায় এদেশে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ব্যাপক প্রসার হইয়াছে।*

সাধারণের অর্থে গড়িয়া ওঠা প্রতিষ্ঠান জনসাধারণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালনা করিবে,—ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা এই আদর্শের অনুকূল নহে। তবু যে ম্যানেজিং এজেন্সি নীতি এদেশে জনপ্রিয় হইয়াছে, তাহার কারণ ম্যানেজিং এজেণ্টরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং বাহির হইতে মূলধন সংগ্রহের আগেই তাঁহারা ও তাঁহাদের বন্ধুবর্গ মোটা টাকার শেয়ার কিনিয়া প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণের কাছে নির্ভরযোগ্য করিয়া তোলেন। বলা বাহুল্য, পারিশ্রমিক ও মুনাফার অংশ হিসাবে এবং

* ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থের জন্য ম্যানেজিং এজেন্সির উপর কম নির্ভর করিয়া ব্যাঙ্কের উপর অধিকতর নির্ভর করিতে পরামর্শ দেন। ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক শিল্পীয় বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অভাবে এই মূল্যবান সুপারিশ কার্যকরী হয় নাই।

অন্যান্য নানাভাবে ম্যানেজিং এজেণ্টরা প্রতিষ্ঠানের লাভের একটি বড় অংশ টানিয়া লন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের অধিকাংশই অংশীদারদের বা সরকারের ন্যায্য প্রাপ্য। ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রেজেষ্ট্রিকৃত যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বল্পসংখ্যক ম্যানেজিং এজেণ্টরা ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন, এই বৎসর অসংখ্য অংশীদারের প্রাপ্য মোট লভ্যাংশের পরিমাণ হইয়াছিল ২৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

তবু এই অন্যায় ব্যবস্থা সত্ত্বেও ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় বলিতে পারা যায় যে, ভারতে বর্তমানে যেটুকু শিল্প প্রসার হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার দান কম নয়। এদেশে শিল্পে অর্থ যোগানের জন্য ব্যাঙ্ক নাই। জনসাধারণ একে গরীব, তায় ভীরু; তাহারা অজানা উদ্যোক্তাদের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সামান্য সঞ্চয় সাধারণ যৌথ কারবারে নিয়োগ করিতে রাজী নয়। নিজের টাকায় আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন, দেশে এমন ধনী শিল্পোৎসাহীরও একান্ত অভাব। এক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা প্রসারলাভ করিয়াছে বলিয়াই তবু একশ্রেণীর শিল্পোৎসাহী বা নির্ভরযোগ্য সচ্ছল ব্যক্তি এদেশে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতেছেন। অবশ্য যত দিন যাইতেছে, সাধারণ দেশবাসীর মনেও ক্রমেই অধিকতর পরিমাণ শিল্পচেতনা সঞ্চারিত হইতেছে। এখন যৌথ কারবারে অর্থনিয়োগ করিতে ভারতবাসী ঠিক আগের মত ইতস্ততঃ করে না। আশা করা যায়, ক্রমশঃ এদেশ হইতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার গলদ দূর হইবে। তবে ভারতের আর্থিক অবস্থা একটু পরিবর্তিত হইলেও এখনও এমন সময় আসে নাই যে, ম্যানেজিং এজেন্সি একেবারে বাদ দিয়া এদেশে বহুল উৎপাদনকারী বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিতে পারে।

কেবলমাত্র আধুনিক যন্ত্রশিল্পেরও মূলধন সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। কুটিরশিল্প যাঁহারা পরিচালনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অসজ্ঘবদ্ধ গ্রামবাসী। কুটিরশিল্পেও কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল লাগে, কুটিরশিল্পজাত পণ্যাদি বাজারজাত করিবার সুবন্দোবস্ত না হইলে শিল্পীদের আর্থিক সচ্ছলতা হইতে পারে না। ভারতের শতকরা অন্ততঃ ৯ জন লোক কুটিরশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই বিরাট জনসংখ্যার অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কুটিরশিল্পকে সকল দিক দিয়া সমুন্নত

করিতে হইবে এবং সেজন্য মূলধনের প্রয়োজন। এই শ্রেণীর শিল্পীদের জন্যই অ-কৃষি সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সমবায় সমিতি আইন প্রবর্তিত হইবার পর এতদিন চলিয়া গেলেও এখনও এদেশে অ-কৃষি সমবায় সমিতি বা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি গ্রাম্যশিল্পীদের প্রয়োজনমত অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক শিল্প বা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক (Industrial or Commercial Bank) প্রতিষ্ঠার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই বলিয়া মূলধনের অভাবে ভারতীয় শিল্পপ্রয়াস বহুলাংশে ব্যর্থ হইতেছে। তাঁহারা কুটিরশিল্পকে টাকা যোগাইয়া সাহায্য করিবার মত গ্রাম্য ঋণদাতা ব্যাঙ্ক (Rural Credit Bank) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও উৎসাহ দেখান নাই। অবশ্য বর্তমানে রাষ্ট্রীয়করণের পর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (আগেকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক) গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলিবার ও পল্লীঋণ যোগাইবার কাজে উৎসাহ দেখাইতেছে বলিয়া স্বভাবতঃই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আশা করা যায়। শ্রফ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থার (National Small Industries Corporation) কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতে যৌথ ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত স্বল্প মেয়াদে জনসাধারণের আমানত জমা রাখে, কাজেই তাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিয়া বা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করিয়া টাকা আটকাইয়া ফেলিবার সাহস করে না। শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধন এবং সাধারণ পরিচালনার জন্য স্বল্পমেয়াদী কার্যকরী মূলধন, এই দুইপ্রকার মূলধনের প্রয়োজন। এইরূপ মূলধন যোগাইবার জন্য পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে বহুসংখ্যক ইনডাসট্রিয়াল ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক আছে। জার্মানীতে যৌথ ব্যাঙ্কগুলিও একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে। কতকগুলি ব্যাঙ্ক একত্রে সম্ভাবনাময় কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ এই মূলধন দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে প্রাথমিক মূলধনরূপে ব্যবহার করেন। মনে হয় ভারতে এইভাবে চেষ্টা চলিলে যৌথ ব্যাঙ্কগুলি নূতন ও প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে। ভারতে কয়েকটি বড় বড় বিদেশী ব্যাঙ্ক কমার্শিয়াল ব্যাঙ্করূপে কাজ কারবার

করিয়া থাকে, কিন্তু নূতন দেশীয় শিল্প সম্পর্কে এইসব ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের মনোভাব কোনদিনই আশাপ্রদ নয়। কয়েকটি দেশীয় ব্যাঙ্ক বর্তমানে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের ব্যবসা বা শিল্প সংক্রান্ত প্রয়াসে সক্রিয় সহযোগিতা করা যে এইসব প্রতিষ্ঠানের অবশ্য কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে পরের গচ্ছিত টাকা এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ বিনিয়োগের পূর্বে সুচিন্তিত পরিকল্পনানুসারেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

মোটের উপর, এখন ম্যানেজিং এজেন্সির উপর নির্ভরশীলতা কমাইয়া ব্যাঙ্ক মারফৎ শিল্পাদিতে অর্থ-যোগান প্রসারিত করিবার দিন আসিয়াছে। একথা শুধু বড় বড় কারবার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থেও সরকারী তত্ত্বাবধানে বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা আবশ্যক। বাঙ্গালায় 'ইনডাসট্রিয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই প্রকার; কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রচার-কার্য ও সরকারী অর্থানুকূল্যের অভাবে ইহা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। ভারতের কয়েকটি রাজ্যের ক্ষুদ্রাকার ও মাঝারি কুটিরশিল্পের সাহায্যের জন্য আইন (State Aid to Industries Act) আছে, কিন্তু এই আইন অনুসারে দেয় ঋণের পরিমাণ এত সামান্য এবং ঋণ পরিশোধের সর্ত এত কঠোর যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন প্রবর্তনের উদ্দেশ্য একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে। এদিক হইতে রাজ্যের মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন যন্ত্রশিল্প এবং কুটিরশিল্পের মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের রাজ্য মূলধন সংস্থা আইন (Sate Finance Corporation Act, 1951) অনুযায়ী বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি ১২টি রাজ্য সরকারের মোট ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূলধনসহ নিজ নিজ 'ইনডাসট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন' বা শিল্পীয় মূলধন সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাহা না বলিলেও চলিবে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী (Industrial Finance Corporation Act of 1948) গঠিত কেন্দ্রীয় মূলধন সংস্থা বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়া * ইতিমধ্যেই লক্ষণীয় সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই সংস্থা শুধু

* ভারতের ইনডাসট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তপশীলী ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ও সমবায় ব্যাঙ্ক এই মূলধন যোগাইয়াছে। কর্পোরেশন জনসাধারণের ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদে গচ্ছিত রাখিতে পারে। প্রয়োজন হইলে কর্পোরেশন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতেও ঋণ লইতে পারে। কর্পোরেশন কোন প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে এবং ঋণদানের দীর্ঘতম

শিল্পাদিকে অর্থ সাহায্য করে না, শিল্পের দোষক্রটি, সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধেও খোলাখুলি আলোচনা করিয়া মূল্যবান সুপারিশ করিয়া থাকেন। তবে অনেকেই মনে করেন যে, এই সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেভাবে পরিচালিত হইতেছে তদপেক্ষা আরও ভালভাবে চলা উচিত। অবশ্য ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ইনডাসট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন সংশোধনের (Amendment) পর এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দৃঢ়তর এবং কার্যসীমা প্রশস্ততর হইয়াছে।

এ ছাড়া ভারত সরকারের উদ্যোগে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গঠিত জাতীয় শিল্প-উন্নয়ন সংস্থা (National Industrial Development Corporation) এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গঠিত শিল্পীয় মূলধন বিনিয়োগ সংস্থার (Industrial Credit and Investment Corporation) কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন ভারত সরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ভারতীয় ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় বীমা কোম্পানী যোগাইয়াছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই সংস্থাকে এক কোটি ডলার ঋণ দিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পকে ১১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঋণদান করিয়াছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গঠিত শিল্প পুনঃঋণদান সংস্থা (The Refinance Corporation for Industries Private Ltd.) ৩ হইতে ৭ বৎসরের মেয়াদে শিল্পসমূহকে ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণের উপর অনধিক ৫০ লক্ষ টাকা পুনঃ ঋণদানের উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। ছোটখাট শিল্পকে পণ্য বাজার জাত করা ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থাপিত জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার (National Small Industries Corporation) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রধানতঃ বেসরকারী মাঝারি ধরণের শিল্পকে এবং শিল্পে সাহায্যকারী ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিবার জন্যই ২৫ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন (বিলিকৃত মূলধন ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা) সহ 'দি রিফিনান্স কর্পোরেশন ফর ইন্‌ডাসট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড' নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

আর্থিক পুনর্গঠনের মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ছাড়া ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নরওয়ে, নিউ-জিল্যাণ্ড, সোভিয়েট রুশিয়া প্রভৃতি দেশের নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইতেছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে মোটামুটি সরকারী এবং বেসরকারী দুই হিসাবেই ভারতীয় শিল্পগুলিকে উন্নয়নের চেষ্টা করা হইতেছে। শিল্পে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দানের জন্য 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন', 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন', 'স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন' সমূহ, 'ন্যাশনাল ইনডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন,' 'ন্যাশানাল স্মল ইনডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন', 'দি রিফিনান্স কর্পোরেশন ফর ইন্ডাষ্ট্রিজ' প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। 'ইণ্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন' নামক বিশ্বব্যাঙ্কের সমান্তরাল আন্তর্জাতিক শিল্পীয় মূলধন সংস্থা শীঘ্রই ভারতকে সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কও এদেশের বড় বড় ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পে মূলধন যোগাইবার ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ছোটছোট শিল্পকে বর্তমানে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতেছে। অনুকূল পরিস্থিতিতে এদেশে শিল্পীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কও গড়িয়া উঠিতে পারে। ভারত সরকার আইন করিয়া নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা রদ করিয়াছেন এবং পুরাতন শিল্পের ক্ষেত্রেও ম্যানেজিং এজেণ্টদের সুযোগ সুবিধা সঙ্কুচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় সরকারী বেসরকারী উভয় হিসাবে মূলধন যোগানের উদার ব্যবস্থা ব্যতীত ভারতীয় শিল্পের আশানুরূপ প্রসার সম্ভব নয়।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্থাপিত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংসদের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। ১ কোটি টাকা মূলধন সহ প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তব্য ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইলে আবশ্যকীয় পণ্যের আমদানী রপ্তানী ব্যবসা পরিচালনা করা। ভারতে খাদ্যসঙ্কট চলিতেছে বলিয়া মধ্যবর্তী মুনাফাবাজ ও ফাটকাবাজদের হাত হইতে খাদ্যশস্য ব্যবসা এই প্রতিষ্ঠান নিজের হাতে লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের মূলধন যোগানের নানা পথ খোলা হইয়াছে, বিকল্প ঋণপত্র বিক্রয়ের দ্বারা সরকারের পক্ষে এই মূলধন সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু বেসরকারী দায়িত্বের বিরাট ক্ষেত্রে অসুবিধা সত্যই অত্যধিক। সরকার সরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে (Public Sector) আগে মূলধন যোগাইবেন, তারপর বেসরকারী ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে বেসরকারী শিল্প-

সমূহের মূলধন যোগানের সমস্যা নিঃসন্দেহে সুকঠিন। এদিক হইতে বেসরকারী মূলধন যোগানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রী এ. ডি. শ্রফের নেতৃত্বে গঠিত প্রাইভেট সেক্টর ফিনান্স কমিটির বা শ্রফ কমিটির রিপোর্টে (১৯৫৪) যে সকল মূল্যবান সুপারিশ আছে, সেগুলি কার্যকরী করিবার দিকে বিশেষ নজর দিতে হইবে। সরকারী মূলধন সংগ্রহের চাপে বেসরকারী শিল্পবাণিজ্যের মূলধন নিয়োগ যাহাতে প্রতিরুদ্ধ না হয়, শ্রফ কমিটি তাহার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

সংরক্ষণনীতি ও ভারতীয় শিল্প

(The Policy of Protection and Indian Industries)

শিল্পপ্রধান দেশসমূহ সর্বদাই বিদেশের পণ্যবাজার দখল করিয়া সমৃদ্ধিলাভের চেষ্টা করে। রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ ব্যতীত ব্রিটেনের মত শিল্পজীবী দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার কোন উপায় নাই। রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারে উৎসুক কোন দেশ স্বভাবতঃই বিদেশের বাজারে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ সুযোগ সুবিধা লাভে সচেষ্ট হয়। এই সমৃদ্ধ দেশগুলি সাধারণতঃ শক্তিমান হয় এবং দুর্বল ও পশ্চাৎপদ দেশসমূহে অবাধে পণ্য বিক্রয় করিয়া মুনাফা লুটিবার জন্য অনেক সময় ইহারা নানা বিচিত্র বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইহাদের তীব্র প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে শিল্প সংগঠন কঠিন হইয়া উঠে এবং যদিই বা কোন সময় এইরূপ পিছাইয়া পড়া দেশে কোন সম্ভাবনাময় শিল্প গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়, উপরোক্ত শিল্পোন্নত দেশের সঙ্ঘবদ্ধ ও বিত্তশালী শিল্প মালিকেরা কম লাভে অথবা সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করিয়া উৎপাদন মূল্যেরও কম দরে এরূপ দেশে পণ্য বিক্রয় (Dumping) সুরু করেন এবং ফলে নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি অত্যন্ত বিপন্ন হয়। জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এই বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশের শিল্প-সম্ভাবনাকে মুক্ত করিবার জন্যই নিরুপায় হইয়া অনেক দেশের শাসনকর্তৃপক্ষ দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দিয়া থাকেন। বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক নির্ধারণ সংরক্ষণ নীতির প্রধান ব্যবস্থা। সাধারণতঃ যেসব শিল্পের ভবিষ্যৎ আছে, সেই শিল্পগুলিকেই সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানে অসুবিধাও কম নয়। প্রথমতঃ এইভাবে বিদেশী পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক বসানো হইলে পণ্য রপ্তানীকারক রাষ্ট্রের সহিত শুল্ক নির্ধারক রাষ্ট্রের সম্প্রীতি স্বতঃই ক্ষুণ্ণ হয়; দ্বিতীয়তঃ, এই সংরক্ষণনীতি প্রচলিত হওয়ায় বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যাদির যে মূল্যহ্রাস স্বাভাবিক ছিল তাহা আর সম্ভব হয় না এবং দেশবাসীকে বাধ্য হইয়া অধিকতর মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে হয়। সংরক্ষণের অপর ব্যবস্থা আমদানী সঙ্কোচনের ফলেও রপ্তানীকারক দেশের সহিত সম্পর্ক তিক্ত হইবার সম্ভাবনা। দেশীয় পণ্যের শুল্ক হ্রাস করিয়া অথবা দেশীয় পণ্য উৎপাদনে আর্থিক সাহায্য দিয়া যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা

হয়, তাহাতেও সরকারী তহবিলের উপর চাপ পড়ে এবং অর্থাভাবে সরকারের কাজের অসুবিধা হয়। সুতরাং যে কোন ভাবেই সংরক্ষণনীতি কার্যকরী করিবার পূর্বে রাষ্ট্র-পরিচালকগণ যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিয়া তবেই অগ্রসর হন।

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় শিল্প সম্প্রসারিত হওয়া দূরে থাক, ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল। বাণিজ্যজীবী ব্রিটেন একরকম ভারতবর্ষের বাজারে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লাভের উদ্দেশ্যেই এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহার দিক হইতে অপচেষ্টার শেষ ছিল না। শাসক সম্প্রদায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভারতের শিল্প-পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিল প্রথমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সময় এবং পরে প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময়। প্রথম যুদ্ধের সুযোগে একদিকে যখন ভারতবর্ষে কিছু কিছু নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিল, অন্যদিকে তখন যুধ্যমান ব্রিটেনের রপ্তানী বাণিজ্য বহুলাংশে হ্রাস পাইল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটেনের পক্ষে অবিলম্বে রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারিত করা সম্ভব হইল না। এই সময় কিন্তু জাপানাদি পৃথিবীর নানা দেশ ভারতের বাজার দখলের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে এবং ব্রিটেনের হাত হইতে ভারতীয় পণ্যবাজারের উপর একচেটিয়া অধিকার নিশ্চিতভাবে সরিয়া যায়। এই সময় ভারতের নবগঠিত ও যুদ্ধের মধ্যে সম্প্রসারিত শিল্পগুলিকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইবার জন্য ভারতে একটি বড় রকমের আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের চাপে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য সমস্যা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে একটি কমিশন (Indian Fiscal Commission) গঠন করেন। এই কমিশন ভারতীয় শিল্পের অনুকূলে প্রভেদাত্মক সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করায় ভারতীয় শুল্ক নির্ধারক বোর্ডের (Tariff Board) জন্ম হয়। যে সকল ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ আছে এবং সাময়িক ভাবে সংরক্ষণ সুবিধা লাভ করিলে যেগুলি অল্পদিনের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল হইয়া সংরক্ষণ সুবিধা পরিত্যাগ করিতে পারিবে, সেই শ্রেণীর শিল্পকে শুল্ক নির্ধারক বোর্ড বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করেন। অবশ্য এই সুবিধা প্রদানের সময় এইরূপ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে কি না, তাহাও শুল্ক নির্ধারক বোর্ডের বিবেচ্য বিষয় হইয়াছিল।

এই সংরক্ষণ নীতির জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কার্পাস বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, ভারী রাসায়নিক পণ্যশিল্প (Heavy Chemicals) প্রভৃতি ১১টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সংরক্ষণ সুবিধা লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই সুবিধা লাভ না করিলে উপরোক্ত শিল্পগুলির অধিকাংশই যে শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক প্রতিযোগিতার চাপে দাঁড়াইতে পারিত না, ভারতীয় চিনি শিল্পের ইতিহাস হইতে তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই শিল্প ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে সংরক্ষণ সুবিধা পাইয়াছে। এই সময় ভারতে (ব্রহ্মদেশ সমেত) চিনির কলের সংখ্যা ছিল ৩২ এবং বৎসরে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টন। ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ টন চিনি বিদেশ হইতে আমদানী হয়। সংরক্ষণ সুবিধা লাভের পর ৫ বৎসরে ভারতীয় চিনি শিল্প কিভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে, তাহা ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে বুঝা যাইবে। এই বৎসর ব্রহ্মদেশ সহ ভারতে চিনির কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭ এবং উৎপন্ন চিনির পরিমাণ দাঁড়ায় কিঞ্চিদধিক ১১ লক্ষ ১১ হাজার টন। আমদানীর পরিমাণও কমিয়া এই বৎসরে ১২ হাজার টনের নীচে নামিয়া আসে। তারপর অবশ্য ভারত সরকার আমদানী শুল্ক কিছুটা কমাইবার এবং দেশীয় কলে উৎপন্ন চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক বসাইবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া চিনি শিল্পের উন্নতির ধারা কতকটা স্তিমিত হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প এবং বস্ত্রশিল্প বর্তমানে এরূপ প্রসারিত হইয়াছে যে, এই দুই শিল্পের দিক হইতে ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে বলা চলে।

ভারতবর্ষে সংরক্ষণনীতি চালু হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ পণ্য অটোয়া চুক্তি (১৯৩২), ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি এবং ভারত-শাসন আইনের দৌলতে ভারতের বাজারে কোন না কোন উপায়ে অন্য দেশের পণ্যের তুলনায় অধিকতর সুবিধা করিয়া লইয়াছে। তবে এইভাবে ব্রিটিশ পণ্য কিছু সুবিধা পাইলেও মোটের উপর সংরক্ষণনীতি ভারতীয় শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার চাপ হইতে যেভাবে রক্ষা করিয়াছে, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কাজ বাড়িবার জন্য ভারত সরকার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শুল্ক নির্ধারক বোর্ড বা ট্যারিফ বোর্ডের সংস্কার করেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে উদ্ভূত অবস্থা,

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি প্রভৃতির বিবেচনায় পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া সংরক্ষণ নীতির ভিত্তি স্থিরীকরণের জন্য শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারীকে সভাপতি করিয়া একটি নূতন 'ফিসকাল কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের রিপোর্ট দেন। কমিশন ভারতীয় শিল্পগুলিকে দেশরক্ষা সংক্রান্ত (Defence or Strategic Industries), মৌলিক (Basic Industries) এবং অন্যান্য শিল্প (Other Industries) এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রথম শ্রেণীর জন্য বিনাসর্তে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থার এবং অন্যান্য শিল্পগুলির ক্ষেত্রে জনসাধারণের আর্থিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনার সুপারিশ করেন।* তাঁহাদের সুপারিশ অনুসারেই শ্রী এম. ডি. ভাট, আই. এ. এস'কে চেয়ারম্যান করিয়া পাঁচজন সদস্য সমন্বিত একটি স্থায়ী শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) গঠিত হয়। তদন্ত করিয়া প্রার্থী শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দানের সুপারিশ ছাড়া জনস্বার্থের নিরিখে পণ্যমূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করাও এই শুল্ক কমিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্থির হয় যে, শুল্ক কমিশন সংরক্ষিত শুল্ক সম্বন্ধে প্রতি তিন বৎসর অন্তর তদন্ত করিবেন এবং সরকারকে এই তদন্তের ফলাফল জানাইবেন।

ট্যারিফ বোর্ডের মত ট্যারিফ কমিশনও কোন শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করিবার পূর্বে তিনটি জিনিসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। এইগুলি হইতেছে—(১) কাঁচামালের প্রাচুর্য ; (২) প্রথমদিকে সংরক্ষণ সুবিধা না পাইলে শিল্পটির গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা না থাকা ; এবং (৩) কিছুদিন পরে শিল্পটির পক্ষে,সংরক্ষণ সুবিধা পরিত্যাগ করিবার মত আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের সম্ভাবনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এই সর্তগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতার সহিত পরিমিত হওয়ায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতে আগে সোডা উৎপন্ন হইত না সত্য কিন্তু রাসায়নিক শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সোডার উৎপাদন বৃদ্ধি যে এদেশে সম্ভব, তাহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি

* ফিসক্যাল কমিশন বিদেশী পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক না বসাইয়া প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দেশীয় পণ্যউৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্যদানের কথাও সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবার সুপারিশ করেন। তবে পণ্যক্রেতা জনসাধারণের আর্থিক স্বার্থ এবং সরকারী রাজস্বের অবস্থা এই সুবিধাদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষভাবে বিবেচ্য। এইরূপ সাহায্যদানের জন্য কমিশন সরকারকে একটি ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড বা উন্নয়ন তহবিল গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন।

ভারতে কাঁচামাল হিসাবে সোডার অপ্রাচুর্যের জন্য ট্যারিফ বোর্ড ভারতীয় কাঁচশিল্পের সংরক্ষণ সুবিধার আবেদন বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন।

বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, কার্পাস বস্ত্র, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি সংরক্ষণ সুবিধাভোগী শিল্পগুলির সংরক্ষণ সুবিধা বাতিল করা হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, আত্মপ্রতিষ্ঠাই ইহাদের এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবার কারণ। পক্ষান্তরে ভারতে নূতন অনেকগুলি শিল্প সংরক্ষণ সুবিধা লাভ করিয়াছে। যে সকল শিল্প বোর্ডের সুপারিশক্রমে সংরক্ষণ সুবিধা পাইয়াছে, তন্মধ্যে কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, বাইসাইকেল, সেলাই কল, হারিকেন লণ্ঠন, ড্রাই ব্যাটারি, স্টীল হুপ, এ্যালয় টুল, রেশম, এ্যালুমিনিয়াম (এই শিল্পটিকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইবার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য বা 'সাবসিডি' দেওয়া হইয়াছে), প্লাইউড, ইলেকট্রিক মোটর, ফাউন্টেন পেন, কালি, পেন্সিল, লৌহ ও ইস্পাতের স্ক্রু, ইলেকট্রিক ল্যাম্পের পিতলের হোল্ডার, বল.বেয়ারিং, বনস্পতি প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রেয়ন, সংরক্ষিত ফল, প্লাস্টিক, এনামেল প্রভৃতি শিল্পও শুল্ক সম্পর্কে শাসনকর্তৃপক্ষের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পর শুল্ক কমিশনের সুপারিশে ভারতসরকার ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, এ্যালয়সমূহ, বিশেষ ধরণের ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ীর ব্যাটারি, সোডিয়াম সালফাইড, স্টার্চ, গ্লুকোজ প্রভৃতি শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে শুল্ক কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও সূতীকাপড়ের গাঁটবাঁধার বেড় (Cotton baling hoop) শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দিতে ভারত সরকার অস্বীকার করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব (Fiscal) কমিশন ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব কমিশনের সুপারিশের সর্ত পরিবর্তন করিয়া যথেষ্ট স্থানীয় কাঁচামাল বা বাজার থাকার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদারতা ঘোষণা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা এইরূপ সংরক্ষিত শিল্পে শিক্ষানবীশ নিয়োগ এবং উৎপাদনব্যয় কমাইবার জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর জোর দিয়াছেন।

ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে এখন জাতীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হইয়াছে* বলিয়া ভারতের শিল্প-ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া আশা করা

* ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সূচনা হইতেই দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তৎকালীন লীগ-

যায়। কাঁচামাল ও শ্রমসম্ভারের সদ্ব্যবহার হইলে এতদিন এদেশের শিল্প পরিস্থিতি এবং আর্থিক অবস্থার যে বহুল উন্নতি হইত, সে সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব কমিশন ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব কমিশনের সর্তসমূহ সংশোধন বা বাতিল করিয়া গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দানের প্রশ্নে নিম্নরূপ কয়েকটি ব্যবস্থার সুপারিশ করেন:—

(ক) যথেষ্ট স্থানীয় কাঁচামাল না পাওয়া গেলেও চলিবে;

(খ) সংরক্ষিত শিল্পের জন্য যথেষ্ট স্থানীয় বাজার না হইলেও চলিবে;

(গ) উদ্যোক্তাদের (Promoters) অনুমিত হিসাব নির্ধারণে অথবা সংরক্ষণের সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণে অসুবিধার অজুহাত সংরক্ষণ সুবিধাদানের পথে অন্তরায় হইবে না;

(ঘ) কমিশন স্বীকার করেন যে, অত্যধিক মূলধন বিনিয়োগ সাপেক্ষ শিল্পে এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ শিল্পের সুসংবদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়াইবার সম্ভাবনা সেইরূপ শিল্পকে শিল্প প্রতিষ্ঠার পূর্বাহ্নে সংরক্ষণ সুবিধাদানের আশ্বাস দেওয়া ভাল;

(ঙ) সংরক্ষণসুবিধাপ্রাপ্ত শিল্প শিক্ষানবীশদের শিক্ষাদানে বাধ্য থাকিবে; এবং

(চ) এই সুবিধাপ্রাপ্ত শিল্পে উৎপাদন ব্যয় কমাইবার জন্য কারিগরি ব্যবস্থার উন্নতিবিধান।

কংগ্রেস মিলিত অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য সদস্য মিঃ আই. চুন্দ্রিগর ভারতে জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন:—

"It is the duty of every country which is backward, to protect its infant industries, so that those infant industries might be able to stand on their own legs agaainst competition from foreign countries which have long and better experience in the line."

ভারত সরকারের শিল্পনীতি

(The Industrial Policy of the Government of India)

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ কৃষিকেন্দ্রিক দেশ ছিল। এদেশের প্রভূত শিল্প সম্ভাবনা সে সময় নানা অজুহাতে কার্যকরী করা হয় নাই। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে এবং দেশের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যসৃষ্টির অনুপূরক হিসাবে ভারত সরকার শিল্প প্রসারে সরকারী সহযোগিতার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভারতে যুদ্ধের সময় হইতে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই তাহার প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এজন্য ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়াছেন। খাদ্যশস্যের অত্যধিক অভাবের সময় খাদ্যশস্য ছাড়া গত কয়েক বৎসর ভারত সরকারের আমদানী নীতিতে যন্ত্রপাতি অগ্রাধিকার পাইয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর ভারত সরকার আমদানীতে বিদেশী কলকব্জার উপর আমদানী শুল্কের হার কমাইয়া অর্ধেক করিয়া দেন। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার কাঁচামালের উপরও শুল্ক কমান হয়। কারখানায় অধিক কাজ হইলে শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশে পণ্যাভাব কমিবে,—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে আয়করের হিসাবে ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূল্যাপকর্ষ তহবিলে চলতি হারের দ্বিগুণ পর্যন্ত অর্থ রক্ষার সুবিধা দিয়াছেন। নূতন প্রতিষ্ঠানকে দাঁড়াইবার সুযোগ দিতে ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ,—এই তিন বৎসরের মধ্যে যে সকল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পণ্য উৎপাদন সুরু হইবে, পাঁচ বৎসর সেইগুলির মোট মুনাফার শতকরা ৬ ভাগ আয়কর ও সুপারট্যাক্স হইতে রেহাই পাইবে। বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ছোট ও মাঝারি আকারের শিল্পগুলিকে (কুটির শিল্প সহ) আঞ্চলিক পরিবেশে সর্ব ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দিবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। ভারতীয় শিল্প জগতের সামগ্রিক

উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ফিসক্যাল কমিশন গঠন করেন, তাঁহাদের সুপারিশে স্থায়ী একটি শুল্ক নির্ধারণ সংস্থা বা ট্যারিফ কমিশন গঠিত হইয়াছে। এই কমিশন নূতন শিল্পগুলিকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া ছাড়াও শিল্প পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরাখবর সরকারকে জানাইবেন। ভারতীয় শিল্পের প্রসার বা উন্নতির সহায়ক হিসাবে ভারতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন [Industries (Development and Regulation) Act, 1951] প্রবর্তিত হয়। অনুরূপ উদ্দেশ্যেই ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা বিভাগ স্থাপন করেন। ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে 'ইনডাসট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন', 'রি-ফিনান্স কর্পোরেশন ফর ইনডাসট্রিজ', 'ন্যাশনাল ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন' প্রভৃতি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে 'ন্যাশনাল স্মল ইনডাসট্রিজ কর্পোরেশন', 'স্টেট এইড টু ইনডাসট্রিজ এ্যাক্ট' প্রভৃতির প্রবর্তন করেন।

শিল্পপতিরা যাহাতে পণ্য লইয়া অন্যায় মুনাফাবৃত্তি করিতে না পারে ভারত সরকার তজ্জন্য পণ্য মূল্য বোর্ডের (Commodity Prices Board) বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

যে সব শিল্প তেমন লাভজনক নয়, অথচ জাতীয় স্বার্থের হিসাবে যেগুলির গুরুত্ব অবিসংবাদিত, ভারতসরকার বা রাজ্যসরকারসমূহ আপন দায়িত্বে সেরূপ কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং কতকগুলি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। এছাড়া যেসব শিল্প সামরিক হিসাবে বা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভারতসরকার সেগুলি সরকারী কর্তৃত্বে রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতসরকার বে-সরকারী প্রচেষ্টায় সহযোগিতার নিদর্শন হিসাবে অংশীদার হইয়াছেন এবং সরকারী-বে-সরকারী মিলিত দায়িত্বে শিল্পগুলি চালিত হইতেছে।* ভারতসরকার বে-সরকারী

* ভারত সরকার তাঁহাদের শিল্পনীতি অনুযায়ী নিজ উদ্যোগে যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—দি সিন্ধ্রি ফার্টিলাইজারস এ্যাণ্ড কেমিকেলস্ লিমিটেড; পশ্চিমবঙ্গে রূপনারায়ণপুরে দি হিন্দুস্থান কেবলস্ লিমিটেড; বাঙ্গালোরের দি হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ লিমিটেড; দি হিন্দুস্থান সিপইয়ার্ড লিমিটেড; দি হিন্দুস্থান ইনসেক্টিসাইডস্ লিমিটেড; পুণার দি হিন্দুস্থান এ্যান্টিবাইওটিকস্ লিমিটেড; দি ন্যাশনাল ইনষ্ট্রুমেণ্টস্ ফ্যাক্টরি; দি হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট লিমিটেড; দি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ফ্যাক্টরি; দি ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি (পেরাম্বুর), দি নাহান ফাউণ্ড্রি লিমিটেড। এছাড়া পুণার পেনিসিলিন ফ্যাক্টরি; দিল্লীর ডি. ডি. টি. ফ্যাক্টরী, বাঙ্গালোরের

সহযোগিতায় শিল্প সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, মিশ্র-অর্থনীতিভিত্তিক সে প্রচেষ্টা ভারতের বিশেষ অবস্থায় কল্যাণকর হইবে বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু শিল্পপ্রসারে এই প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ (Nationalisation) সম্পর্কিত সরকারী নীতি অনেককে একটু দুঃখিত করিয়াছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে শিল্প-জাতীয়করণ নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অধিনায়কত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিও (National Planning Committee) এই নীতি গ্রহণ করেন। ভারতে ইংরাজ শাসনের অবসানে কংগ্রেসের হাতে শাসনভার আসার পর অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসী সরকার অতঃপর রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কিত নীতি কার্যকরী করিবেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শিল্পনীতি ঘোষণার সময় ভারত সরকার দেশের পণ্যাভাব ও পরিস্থিতির বিবেচনায় রাষ্ট্রীয়করণ প্রশ্নটি দশ বৎসরের জন্য স্থগিত রাখেন।* ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকার যে নূতন শিল্প-নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া অধিকাংশ শিল্পের ক্ষেত্রে বে-সরকারী মালিকানা বজায় থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতিতে স্থির হয় যে :—

(১) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার, অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, রেলপথ ইত্যাদি শিল্পে রাষ্ট্রের মালিকানা থাকিবে।

(২) জাহাজ নির্মাণ, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের

ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইনডাসট্রিজ, ভারত ইলেক্ট্রনিকস্ (প্রাইভেট) লিমিটেড ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থ (প্রাইভেট) লিমিটেড নঙ্গল ফার্টিলাইজারস্ এ্যাণ্ড কেমিকেলস (প্রাইভেট) লিমিটেড, প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠান। ইষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন, মধ্যপ্রদেশের ন্যাশনাল নিউজপ্রিণ্ট এ্যাণ্ড পেপার মিলস্, মহীশূর আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী প্রভৃতি সরকারী-বেসরকারী যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত। রৌরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানাও সরকারী প্রতিষ্ঠান।

* ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় শিল্প পরামর্শদান সমিতির (Central Advisory Council of Industries) প্রথম অধিবেশনে ভারতসরকারের তৎকালীন শিল্প-সচি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেন :—

"The policy of the Government is that the existing undertakings will not only remain with private enterprises for at least ten years, but that they will be assisted to increase their efficiency and expand their production."

যন্ত্রপাতি তৈয়ারী, বিমানের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী ইত্যাদির যেগুলি এই নীতি ঘোষণার সময় বে-সরকারী মালিকানায় পরিচালিত ছিল, সেগুলি বাদে এইসব শিল্প অতঃপর সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে।

(৩) বস্ত্র, পাট, সিমেন্ট, চা, চিনি, কাগজ ইত্যাদি ১৮টি বে-সরকারী মালিকানার গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সরকারের পর্যবেক্ষণের ও নিয়ন্ত্রণের অধীন হইবে।

ভারতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের দিকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতির একটু প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ভারতীয় শিল্পজগতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল সরকারী-বেসরকারী যুগ্ম-পরিচালনায় শিল্পগঠন। এই মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থার সূচনা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতিতে দেখা যায়। ইহার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের সংকল্প দেখা যায় এবং সংকল্পটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত আবাদী কংগ্রেসে। অতঃপর ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার যে নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে শিল্পের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃত্ব চালু করিয়া শিল্পপ্রসারের অনেকখানি দায়িত্ব তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন।* শিল্প-রাষ্ট্রীয়করণ আশানুরূপ না হইলেও সরকার ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণাধিকার ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক শিল্পের সরকারী লাইসেন্স লওয়া বাধ্যতামূলক এবং কোন শিল্পের পরিচালন সন্তোষজনক না হইলে সরকার সেই শিল্পের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঘোষিত শিল্পনীতিতে ভারতীয় শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া স্থির হয় যে, প্রথম শ্রেণীর ১৭টি শিল্পের মালিকানা (বে-সরকারী মালিকানা কোন বিশেষক্ষেত্রে অনুমোদন করা না হইলে) সরকারের হাতে আসিবে এবং নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরকারই গঠন করিবেন। ভারতে শিল্প প্রসার ত্বরান্বিত করিতে সরকার দ্বিতীয় শ্রেণীর

* এই শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছে :—

The adoption of the socialist pattern of society as the national objective, as well as the need for planned and rapid development requires that all industries of basic and strategic importance, or in the nature

১২টি শিল্পে অধিকতর অংশগ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হয়। অবশ্য সরকার কর্তৃক এই শ্রেণীর নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী প্রচেষ্টায়ও (সরকারী প্রচেষ্টার সহিত যুগ্মভাবে অথবা সরকারী-প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষভাবে) এইরূপ শিল্পপ্রসারের সুযোগ দেওয়া হইবে। এছাড়া বাকী শিল্পগুলি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িয়াছে। এই তৃতীয় শ্রেণীর শিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি হইল, এগুলি প্রধানতঃ বেসরকারী পরিচালনায় থাকিলেও সরকার প্রয়োজন বোধ করিলে এই শ্রেণীর কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। তবে সরকারের পরিচালনাগত দায়িত্ব কম হইলেও এই তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পগুলি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব আর্থিক সাহায্য পাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতিতে শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের প্রশ্ন দশ বৎসর পরে বিবেচনার যে কথা ছিল, এইভাবে তাহার পরিণতি ঘটে। শিল্প রাষ্ট্রীয়-করণের নীতি এই ভাবে বহুলাংশে বিসর্জিত হইবার প্রধান কারণ ভারতের সরকারী কর্তৃপক্ষ এই পণ্যাভাবগ্রস্ত দরিদ্র দেশে শিল্পোন্নতি তথা শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই বড করিয়া দেখিতেছেন এবং রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা এড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল ভারতের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী স্পষ্টই বলেন যে, কারখানার চাকা চালু রাখাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। উপস্থিত শিল্প-রাষ্ট্রীয়করণ তো হইবেই না, বিনাকারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় তাঁহারা হস্তক্ষেপও করিতে চান না। তিনি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে পার্লামেণ্টে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশযুক্ত শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন (১৯৫১) সংশোধন বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরায় বলেন যে, প্রস্তাবিত আইনের দ্বারা সরকার শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে চান না, পণ্য উৎপাদনের সকল প্রকার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।*

of public utility services, should be in the public sector. Other industries which are essential and require investment on a large scale which only the State, in the present circumstances, could provide, have also to be in the public sector. The State has, therefore, to assume direct responsibility for the future development of industries over a wider area.

* ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় শিল্প-পরামর্শদাতা সমিতির (Central

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের উপরিউল্লিখিত শিল্পনীতির প্রথম দুই শ্রেণীর শিল্পগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল, এগুলি ছাড়া বাকী সব শিল্প তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত :—

প্রথম শ্রেণী :—(১) অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ প্রভৃতি দেশরক্ষার সরঞ্জাম; (২) পারমাণবিক শক্তি; (৩) লৌহ ও ইস্পাত; (৪) লৌহ ও ইস্পাতের ভারী ঢালাই; (৫) কেন্দ্রীয় সরকার-নির্ধারিত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এবং খনি শিল্পের যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং এইরূপ অন্যান্য মৌলিক শিল্পে প্রযোজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম নির্মাণ; (৬) বৃহদাকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি; (৭) কয়লা; (৮) খনিজ তৈল; (৯) খনি হইতে লৌহ-মাক্ষিক; ম্যাঙ্গানিজ-মাক্ষিক; ক্রোম-মাক্ষিক; জিপসাম, গন্ধক, স্বর্ণ ও হীরক উত্তোলন; (১০) তামা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি খনি হইতে উত্তোলন ও কার্যোপযোগীকরণ; (১১) ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ [Atomic Energy (Control of Production and Use) Order, 1953] উল্লিখিত খনিজসমূহ; (১২) বিমানশিল্প; (১৩) আকাশপথ পরিবহন ব্যবস্থা; (১৪) রেলপথ পরিবহন; (১৫) জাহাজ-নির্মাণ; (১৬) টেলিফোন ও টেলিফোনের তার, টেলিগ্রাফের ও বেতারের যন্ত্রপাতি (রেডিও সেট বাদে); এবং (১৭) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও বণ্টন।

দ্বিতীয় শ্রেণী :—(১) ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের খনিজ-সুবিধা-দান আইনের ৩নং ধারায় (Section 3 of Minerals Concession Rules 1949) নির্দিষ্ট 'অপ্রধান খনিজ সমূহ' বাদে বাকী খনিজ; (২) এ্যালুমিনিয়াম ও উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত লৌহেতর ধাতুসমূহ বাদে অন্যান্য লৌহেতর ধাতু; (৩) যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম (Machine Tools); (৪) লৌহ মিশ্রিত ধাতু ও যন্ত্রের ইস্পাত; (৫) ঔষধ, রং, প্লাষ্টিক ইত্যাদি রাসায়নিক পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মৌলিক ও মধ্যবর্তী পণ্যসমূহ; (৬) এ্যান্টিবায়োটিকস্‌ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ঔষধ; (৭) সার; (৮) যৌগিক (Synthetic) রবার; (৯) কয়লার অঙ্গারোৎপাদন (Carbonisation of coal); (১০) রাসায়নিক মণ্ড; (১১) রাজপথ-পরিবহন; এবং (১২) সামুদ্রিক পরিবহন।

Advisory Council of Industries) অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও বলিয়াছিলেন :—

"The Government's resources were meant to increase production and not just apply them to transfer of ownership."

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এই শিল্পনীতিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে :—

(১) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং রাসায়নিক সার (নাইট্রোজেন সম্পর্কিত), ভারী ইনজিনিয়ারিং ও যন্ত্রপাতির শিল্পসহ ভারী রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ; (২) এ্যালুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, রাসায়নিক মণ্ড, রং এবং রাসায়নিক সার (ফসফেট সম্পর্কিত) এবং অত্যাবশ্যক ঔষধপত্রের মত পণ্যের উৎপাদন এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ; (৩) পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প এবং চিনিশিল্পের মত যে সব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্প ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির আধুনিকীকরণ এবং সংস্কার ; (৪) যে সব শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান, সেগুলির উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার ; এবং (৫) বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্য এবং সাধারণ উৎপাদন কার্যসূচীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাবের উপর সমবায়ের ভিত্তিতে যৌথ-কৃষির (Joint farming) যে পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ক্রমে শিল্পের ক্ষেত্রেও চালু হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প এবং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প খাতে বরাদ্দ হইয়াছিল যথাক্রমে ১৪৮ কোটি টাকা ও ৩০ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের শতকরা ৬·৩ ভাগ ও ১·৩ ভাগ), দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই দুই খাতে বরাদ্দ হইয়াছে যথাক্রমে ৮১৭ কোটি টাকা ও ২০০ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের শতকরা ১২·৯ ভাগ ও ৪·১ ভাগ)। শিল্প উন্নয়নের অনুপূরক খনি উন্নয়ন খাতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাত্র ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ হইয়াছে ৭৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বে-সরকারী খাতে যে ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ শিল্প ও খনিজ খাতে ধরা হইয়াছে ৫৭৫ কোটি টাকা। রেলপথ-উন্নয়নও শিল্পোন্নয়নের অনুপূরক, রেলপথ উন্নয়ন খাতে সরকারী হিসাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ যথাক্রমে ২৬৮ কোটি টাকা ও ৯০০ কোটি টাকার অধিকাংশই ভারতের শিল্প সম্প্রসারণে সাহায্যের জন্যই ব্যয়িত হইবে বলা যায়।

ভারতের কুটিরশিল্প

(The Cottage Industries of India)

প্রচুর যন্ত্রপাতি লইয়া যে সব কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইগুলিতে পণ্য উৎপন্ন হয় বহুল পরিমাণে এবং এইসব কারখানায় বহুসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কুটিরশিল্প এইপ্রকার যন্ত্রশিল্পের বিপরীত। কুটির-শিল্পে কারিগর ও যন্ত্রপাতি লাগে কম, মূলধন লাগে যৎসামান্য এবং উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণও অল্প হয়। সাধারণত গ্রাম্য কারিগর তাহার নিজের বাড়ীতে পরিবারভুক্ত লোকজনের সহায়তায় কুটিরশিল্প পরিচালনা করে। যন্ত্রশিল্পজাত পণ্য অপেক্ষা কুটিরশিল্পজাত পণ্যে রুচির এবং হৃদয়ের স্পর্শ অনেক বেশি।*

মোটামুটি বলিতে গেলে যে সব শিল্প কারখানা আইনের আওতায় পড়ে না, সেগুলিকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। ভারতে কুটিরশিল্পে ২ কোটির মত লোকের কর্মসংস্থান হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের প্রসার হয় নাই, অথচ যে কুটিরশিল্পের জন্য ভোগ্য-পণ্যাদির দিক হইতে ভারতবর্ষ বরাবর আত্মনির্ভরশীল ছিল, তাহা বহুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রধানতঃ ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রেই এই ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। ভারতের যে বস্ত্রশিল্প একদা দেশের চাহিদা মিটাইয়া মধ্যপ্রাচ্যের, এমন কি ইউরোপের বাজারে কাপড় সরবরাহ করিত, সেই সমৃদ্ধ শিল্পের এক ভগ্নাংশ মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। অবশ্য সম্প্রতি দেশের শাসনতান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় এই শিল্পের পুনরায় কিছুটা উন্নতি ঘটিতেছে।

ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ বলিয়া এদেশে কুটিরশিল্পের গুরুত্ব অসামান্য। চাষীদের সাধারণতঃ বৎসরে ৪।৫ মাস মাঠের কাজ করিতে হয়, বাকী ৭।৮ মাস বেতের কাজ, মাটির কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি কুটিরশিল্পকে দ্বিতীয় বৃত্তি

---

* ২০।২।১৯৫৭ তারিখে কলিকাতায় বেঙ্গল হোম ইনডাসট্রিজ এ্যাসোসিয়েশনের ৪ তম বার্ষিক উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বলেন যে গ্রামীণ শিল্পকলার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আজ আকৃষ্ট হইয়াছে।...যন্ত্রের একঘেয়ে ভাব নহে, মানুষের হাতে গড়া জিনিসে যে জীবনের মায়া জড়ানো থাকে, কুটিরশিল্পজাত পণ্য ব্যবহার করিয়া সেই কথাই তিনি সকলকে অনুভব করিতে বলেন।

হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের অনেকেই কিছু কিছু উপার্জন করিয়া থাকে। ভারতের যন্ত্রশিল্পে যত শ্রমিক কাজ করে, দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার হিসাবে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ১ ভাগের মত, অথচ যাহারা কুটিরশিল্পে নিয়োজিত আছে তাহারা শতকরা প্রায় ৭ ভাগ। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের দুর্নীতি-মূলক হস্তক্ষেপের ফলে ভারতীয় কুটিরশিল্পের সর্বনাশ না হইলে এই শিল্পে এদেশের আরও বেশি লোকের জীবিকার সংস্থান হইতে পারিত। ভারত বর্তমানে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সম্মুখীন, এসময় কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী হইয়া ভারতসরকার কর্তৃক অধ্যাপক ডি. জি. কার্ভের অধিনায়কত্বে গঠিত কার্ভে কমিটি (১৯৫৫) এইরূপ সুপারিশই করিয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও অসংখ্য ভারতবাসীর ভরসাস্থল কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের যথাসম্ভব উন্নতির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।*

বর্তমানে এদেশের প্রধানতম কুটিরশিল্প হস্তচালিত তাঁতশিল্প। ভারতে যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্প সুপ্রসারিত হইলেও এখনও এই তাঁতশিল্পের সম্ভাবনা বা গুরুত্ব যথেষ্ট। ভারতীয় তাঁতশিল্পে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয় এবং এই তাঁতে বৎসরে উৎপন্ন হয় ১৫০ কোটি গজ কাপড়। ভারতে এইরূপ তাঁতের সংখ্যা ২৮ লক্ষের মত। মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত খাদি আন্দোলনের সাফল্যের ফলে খাদি উৎপাদনও ভারতে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫ ৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ২ কোটি ৫৪ লক্ষ গজ খাদি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন খাদির মূল্য হিসাব করা হইয়াছে ১০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার। খাদি শিল্পের উন্নতির জন্য 'অল্ ইণ্ডিয়া খাদি এ্যাণ্ড ভিলেজ ইনডাসট্রিজ্ বোর্ড' বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন।

১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তুলাজাত বস্ত্রশুল্ক নির্ধারক বোর্ডের (Cotton Textile Tariff Board) অনুমোদনক্রমে ভারতসরকার তাঁতীদের কিছু সুবিধা দেওয়ায় তাঁতশিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁতশিল্প অনুসন্ধান কমিটি এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড' তাঁতশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করে। যুদ্ধাবসানে ভারতসরকার 'অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ডে'র সংস্কার সাধন করিয়া ইহার নূতন নামকরণ করেন 'স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডলুম কমিটি'।

* "The need for revitalising the small scale and village sector of industry is all the more in view of the large number of persons dependent on the sector and the extremely low level of living it affords at present."

নিখিল ভারত কুটিরশিল্প বোর্ডের (All India Cottage Industries Board) শাখা হিসাবে কয়েক বছর কাজ করিবার পর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর ইহার পরিবর্তে তাঁতশিল্পের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য পুনরায় একটি 'নিখিল ভারত তাঁত বোর্ড' (All India Handloom Board) গঠিত হয়।

বর্তমানে ভারতসরকার ভারতীয় তাঁতশিল্পকে প্রভূত সাহায্য করিতেছেন। রঙীন সাড়ী এখন তাঁতেই উৎপন্ন হয়, এছাড়া তাঁতশিল্প উন্নয়ন ভাণ্ডারে সরকার যে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, তাহা হইতে রাজ্য সরকারসমূহ মারফৎ তাঁতীরা এবং তাঁতবস্ত্রের মূল্যহ্রাসে (Rebate) জনসাধারণ উপকৃত হইতেছে। তাঁতশিল্পের সাহায্যের জন্য ভারতের প্রতি গজ মিলের কাপড়ে এক পয়সা হারে বৎসরে ৪ কোটি টাকার মত কর আদায় হয়।

সূতার অভাব তাঁতীদের একটি বড় সমস্যা। তাঁতীদের সূতার যোগান নিয়মিত ও দর নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে বস্ত্রশিল্পের উপর প্রাপ্ত কর বাবদ ২০ কোটি টাকাসহ মোট ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (কেন্দ্রীয় সরকার ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যসরকারসমূহ ১১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা) কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ব্যয়িত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার যে ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তন্মধ্যে তাঁতশিল্পের জন্য ১২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং খাদিশিল্পের জন্য ১২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

তাঁতশিল্পকে জনপ্রিয় করিতে বর্তমানে প্রতিবৎসর ৭ই মার্চ হইতে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত সারা ভারত তাঁতশিল্প সপ্তাহ পালিত হইতেছে।

ভারতের রেশম ও পশম শিল্প কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত খুবই সমৃদ্ধ ছিল, এখনও মূল্যবান কার্পেট, শাল ও রেশমী বস্ত্রাদির জন্য ভারতের আন্তর্জাতিক সুনাম আছে। অবশ্য ব্রিটেন, জাপান, চীন ও ম্যার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেশম শিল্পে এবং ইটালী ও অস্ট্রেলিয়া পশমশিল্পে প্রতিযোগিতা করিয়া এই দুই শিল্পের দিক হইতে ভারতের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়াছে। কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন শিল্পও ভারতের রেশম শিল্পের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। চীন ও জাপান হইতে প্রচুর রেশম আমদানী হইতে থাকায় ভারতীয় রেশম, এণ্ডি ও মুগার কাপড়ের বাজার কতকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবু ইহা সত্ত্বেও অভিজাত পণ্য হিসাবে ভারতীয় রেশমের সুনাম এখনও যথেষ্ট। কাশ্মীর ভারতীয়

পশমশিল্পের কেন্দ্রস্থল ; মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, মহীশূর প্রভৃতি কতকগুলি জায়গায় রেশমশিল্প এখনও খুবই সমৃদ্ধ। আসামের এণ্ডি এবং মুগার কাপড়েরও দেশবিদেশে প্রচুর চাহিদা আছে।

দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত মাখন, ঘৃত, ক্ষীর, পনীর ইত্যাদির উৎপাদন বা ডেয়ারী শিল্পও ভারতে লক্ষণীয় প্রসার লাভ করিয়াছে। মাদ্রাজ, আলিগড়, দানাপুর প্রভৃতি কতকগুলি জায়গায় বেশি উৎপন্ন হইলেও দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ভারতের সর্বত্র বহুলোকের উপজীবিকা। লর্ড লিনলিথগো বড়লাট থাকিবার সময় এদেশের গোজাতির উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে ডেয়ারী শিল্পের এখনও সম্ভাবনা আছে। এদেশে বৎসরে প্রায় ৭৭ কোটি টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ টনের কিছু বেশি ঘৃত উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষে প্রচুর ফল জন্মায়। নানা প্রকার ফল হইতে জ্যাম, জেলি বা মোরব্বা তৈয়ারী করিবার কাজে এদেশে বহুলোক নিয়োজিত আছে। ফল টিনে ভর্তি করিয়া সারা বৎসর বাজারে বিক্রয় করিবার ব্যবসাও লাভজনক। ভারতে ফল-শিল্প ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে।

হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি পালনও এক হিসাবে কুটিরশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলা চলে। এদেশে ডিমের ব্যবহার বা মাংসের চাহিদা ক্রমেই বাড়িতেছে, কৃষক বা গ্রামবাসীর এই লাভজনক ব্যবসার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইয়া উঠা খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড চাহিদা দেখা দেওয়ায় ভারতে এই শিল্প কিছুটা সম্প্রসারিত হইয়াছে। শুকনো মাছের ব্যবসাও এদেশে কিছু লোকের উপজীবিকা।

ভারতের চর্মশিল্পের গুরুত্বও কম নয়। ৩৮ কোটি টাকা মূল্যের আনুমানিক ২ কোটি গরুর, ৫৭ লক্ষ মহিষের, ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ছাগের এবং ১ কোটি ৭০ লক্ষ ভেড়ার চামড়া অখণ্ড ভারতে পাওয়া যাইত, ভারত বিভাগের ফলে গো-মহিষাদির এক ষষ্ঠাংশ এবং ছাগল ভেড়ার এক-অষ্টমাংশ পাকিস্তানে পড়িয়াছে।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, রেশমের জন্য গুটিপোকার চাষ, পশমের জন্য মেষপালন, ফল-শিল্প এবং হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া বা শূকর পালন কুটিরশিল্প হইলেও কৃষি-শিল্পের সহিত ইহারা অধিক সংশ্লিষ্ট। গৌণবৃত্তি হিসাবে দরিদ্র কৃষকদের আর্থিক সুবিধার জন্য সরকারী কৃষিবিভাগের উচিত এসব শিল্পের উন্নতি সাধনে আগ্রহশীল হওয়া। গ্রামবাসী যাহাতে আধুনিক পদ্ধতিতে এসব শিল্প পরিচালনা করিতে পারে, তজ্জন্য কৃষিবিভাগেপ অর্থ ও জনিষপত্র ধার দিয়া

সাহায্য করা দরকার। সমগ্রভাবে সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের সঙ্গে কুটিরশিল্পের প্রসার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

উপরোক্ত কৃষি-শিল্পগুলি ছাড়া ভারতে আরও অসংখ্যপ্রকার ছোটবড় কুটিরশিল্প প্রচলিত আছে। ছুরি, কাঁচি, হাতা, পেরেক, তালা, সিন্দুক এবং বিবিধপ্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র নির্মাণ করা ভারতের কর্মকার শ্রেণীর বহুলোকের উপজীবিকা। চর্মকার শ্রেণীর বহুলোক জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া জীবিকার্জন করে। গরুর গাড়ী, পালকি ইত্যাদি তৈয়ারীও অনেকের বৃত্তি। দর্জির কাজ করিয়া এবং পিতল, কাঁসা ও তামার বাসনপত্র তৈয়ারী করিয়াও অনেকের অন্নসংস্থান হয়। পশ্চিমবঙ্গের শাঁখের কাজ এবং পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের অলঙ্কার শিল্প জগদ্বিখ্যাত। হস্তনির্মিত কাগজ, কার্পেট, কাঁচের চুড়ি, ঝিনুক ও বেতের জিনিসপত্র, ইঁট ও টালি, চিনামাটি, মাটি এবং পাথরের মূর্তি ও বাসন, ছাতা, দিয়াশলাই, খেলার সরঞ্জাম, নানা-প্রকার আভরণ ইত্যাদি তৈয়ারী করাও বহু ভারতবাসীর জীবিকা সংস্থানের উপায়। এছাড়া গুড়, বিড়ি, সাবান, খেলনা, বিবিধপ্রকার তৈল, গন্ধদ্রব্য ও প্রসাধন দ্রব্য, মিষ্টান্ন, বিস্কুট ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া এবং মৌমাছির চাষ করিয়া অনেক লোকের দিন চলে।

যন্ত্রপাতি ও মূলধনের অপ্রাচুর্য, সংগঠন ব্যবস্থার দৈন্য, প্রয়োজনীয় নিম্নতম কারিগরি শিক্ষার অভাব, কাঁচামাল সংগ্রহের ও উৎপন্ন পণ্যাদি বাজারজাত করিবার অসুবিধা ইত্যাদি ভারতীয় কুটিরশিল্পের বর্তমান দুর্গতির কারণ।

ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে কুটিরশিল্প কর্মসংস্থানের একটি বড় উপায়। কুটিরশিল্পের কণ্ঠরোধ করিয়া এদেশে বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা সর্বক্ষেত্রে কল্যাণকর হইতে পারে না। যে যন্ত্রের সাহায্যে দশজন শ্রমিকের কাজ একজন শ্রমিক করিতে সক্ষম, গ্রামাঞ্চলে সেইরূপ যন্ত্রের প্রসার বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন।*

সঙ্ঘবদ্ধ যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্পের দাঁড়ানো খুবই কঠিন। কিন্তু যন্ত্রশিল্প প্রসারিত হইলেও ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে

* ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ বোম্বাইয়ে 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অরগানা-ইজেশনের' ১৯তম বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন :—

The rule should be that where a big scheme is essential, we may have it. But try a small scheme as much as possible, because however big the schemes we have, the need for middle and small industry is obvious. There is a colossal need and colossal room for it.

ভোগ্যপণ্যের বিপুল চাহিদার হিসাবে এবং গ্রামবাসীর গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিরূপে কুটিরশিল্পের স্থান চিরকালই থাকিবে।* জাপানের ন্যায় শিল্পসমৃদ্ধ দেশেও জাতীয় অর্থনীতিতে কুটিরশিল্পের স্থান নগণ্য নয়। ছোট ছোট কারখানায় তৈয়ারী জিনিস বড় বড় কারখানার কাজে লাগে বলিয়াও যন্ত্রশিল্পের সহিত কুটিরশিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজন আছে।

ইংরেজ আমলে ভারতীয় কুটিরশিল্প সরকারী সহযোগিতা পায় নাই। বর্তমানে জাতীয় সরকার আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাদি প্রবর্তন দ্বারা কুটির-শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান চমনলালের নেতৃত্বে একটি শিল্প মিশন ভারত হইতে জাপানে প্রেরিত হয়। জাপানের সম্প্রসারিত কুটির শিল্পের অভিজ্ঞতা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ভারতীয় কুটিরশিল্পের উন্নতি সাধনই ছিল এই মিশন প্রেরণের উদ্দেশ্য।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন বোর্ড গঠনের কথা বলিয়াছেন। কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতে ৩১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কুটিরশিল্পকে (১) যন্ত্রশিল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, (২) যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক এবং (৩) যন্ত্রশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী,—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বিচার করিয়াছেন। এছাড়া গ্রামীণ শিল্প সম্পর্কে গবেষণার জন্য তাঁহারা একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের সুপারিশ করিয়াছেন। খাদি শিল্প, গ্রামের তৈল শিল্প, নিম তৈল হইতে সাবান তৈয়ারী, হস্তনির্মিত কাগজ শিল্প, মৌমাছি পালন, দিয়াশলাই তৈয়ারী প্রভৃতি শিল্পের উন্নয়ন পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন কুটিরশিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন, কুটিরশিল্পের কাঁচামাল যোগানের সুবিধাদান, প্রয়োজন হইলে খাদির সাহায্যে মিলবস্ত্রের উপর সামান্য কর সংস্থাপনের মত যন্ত্রশিল্পজাত অন্যান্য পণ্যের উপর সামান্য সংরক্ষণ কর বসানো, কুটির ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পজাত পণ্যের বাজার রক্ষা ও নূতন বাজার সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হইয়াছে। গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ

---

* কার্ভে কমিটি (১৯৫৫) তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন :—

"The principle of self-employment is at least as important to a successful democracy as that of self-government."

করিয়াছেন।* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা (National Small Industries Corporation) গঠিত হওয়ায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার অনেক সুবিধা হইয়াছে।

ভারতে হস্তশিল্পসমূহের (Handicrafts) উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে একটি নিখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড গঠন করিয়াছেন এবং বোর্ড বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় মৃৎশিল্প, খেলনা শিল্প, মাদুর শিল্প, কাপড় ছাপার কাজ প্রভৃতি কুটিরশিল্পের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড (The Central Silk Board) ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনর্গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'নিখিল ভারত খাদি ও কুটিরশিল্প বোর্ড' গঠিত হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত করিতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শরণার্থীদের কুটিরশিল্প সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া বর্তমানে এদেশে সরকারের শরণার্থী পুনর্বাসন পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এছাড়া ভারত সরকার বর্তমানে নিজ দায়িত্বে বা বিভিন্ন রাজ্য সরকার মারফৎ খেলনার সরঞ্জাম, কাঁচের জিনিস, জুতা ও চামড়ার জিনিসপত্র, বুরুশ, ছুরি, কাঁচি, সাইকেলের সরঞ্জাম, তালা, ইস্পাতের তার, ছোট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈয়ারীতে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন।

* প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটিরশিল্পে বরাদ্দ নিম্নরূপ (কোটি টাকায়):— তাঁতশিল্প—১১.১ এবং ৫৯.৫, খাদি:—৮.৪ এবং ১৬.৭; গ্রাম্যশিল্প:—৪.১ এবং ৩৮.৮; ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—৫.২ এবং ৫.৫; হস্তশিল্প—১ এবং ৯, অন্যান্য শিল্প—১.৪ এবং ৬; পরিচালনা, গবেষণা ইত্যাদি সহ সাধারণ পরিকল্পনা সমূহ (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়)—১৫ মোট:—৩১.২ এবং ২০০।

ভারতের শিল্প-শ্রমিক

(Industrial Labour in India)

ভারতে কলকারখানা ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে, এইসব কারখানায় বহু লোকের কর্মসংস্থানও হইতেছে।* ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গড়পড়তা দৈনিক ৩০,৮৭,৮৬৪ জন শ্রমিক বিভিন্ন কারখানায় কাজ করিয়াছে। কিন্তু এখনও যেন এদেশে শিল্প-শ্রমিক একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। গ্রামের সহজ সুন্দর জীবনের প্রতি মমতার এবং সুযোগ আসিলেই ফেলিয়া আসা গ্রাম্যজীবনে ফিরিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষার জন্যই শ্রমিকদের একদল সমস্বার্থের বিবেচনায় নিজেদের একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। এ ছাড়া ভারতে চিনির কল, ধানকল প্রভৃতি যেসব মরশুমী কারখানা আছে, সেগুলিতেই গ্রাম্য চাষীরাও সাময়িক ভাবে কাজ করিতে আসে। এখানকার উপার্জন তাহারা বাড়তি উপার্জন মনে করে বলিয়া এসব কারখানার সহিত তাহাদের মনের সংযোগ স্থায়ীভাবে ঘনিষ্ঠ হয় না।

তবে অধিকাংশ শিল্প-শ্রমিকই ঠিক এই দলের নয়। ইহাদের সুসঙ্ঘবদ্ধ না হইবার কারণ নিজেদের জীবন সম্বন্ধে হতাশাবোধ। কুটিরশিল্পের যুগ শেষ হইবার পর ভারতে যখন অতি ধীরে ধীরে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটিতে লাগিল, তখন হইতেই ধনিক সম্প্রদায় এই শিল্পের উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিলেন। ধনতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার ফলে শিল্পে যাহাদের কর্মসংস্থান হইল, কাজের সংকীর্ণতা ও একঘেয়েমি ক্রমে তাহাদের সমস্ত উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিল। এই সময় মালিকেরা যদি শ্রমিকদের সুস্থ আমোদ-প্রমোদের ও শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, ফল তাহা হইলে অবশ্যই অন্যরূপ হইত। একবার শিল্প-শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগিলে এ দেশের কলকারখানার মজুরেরা অভাবে, অস্বাস্থ্যে, শিক্ষাহীনতায় ও মানসিক দৈন্যে বংশানুক্রমে জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়ে এবং দিনের পর দিন একই ধরণের কাজ একই ভাবে করিতে করিতে তাহারা প্রাণহীন যন্ত্রস্বরূপ হইয়া যায়। কাজের একঘেয়েমি হইতে

* ভারতের যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা ৩১ লক্ষের মত। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কয়েকটি বড় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :- বস্ত্রশিল্প ৮০৬৭০২, পাটকল—২৬৪৪৪৬, চিনিকল—৮৮৬৬০, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সহ যন্ত্রপাতি—১২৬৯১১, মৌলিক ধাতব শিল্প (Basic Metal Industries)—৯৫২৭৩।

এইভাবে জীবনের একঘেয়েমি যখন আসে, সেই অবস্থা যে কতখানি মারাত্মক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে তাহা গভীর বেদনার সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

এখন পরিস্থিতি অনেকটা ভাল হইয়াছে, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের দুর্দশার অবধি ছিল না। সেই সময় শিল্পপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করিতেন, সরকারী কর্তৃপক্ষেরও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহের একান্ত অভাব ছিল। প্রথম যুগে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের কারখানা আইন ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থে বোম্বাইয়ের ক্রমবর্ধমান বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে উদ্বেগের জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছিল, শ্রমিকদের স্বার্থে নয়।

পূর্বে শ্রমিকদের কাজের সময়ের কোন ঠিক ছিল না, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের কারখানা আইনেই প্রথম শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ঊর্ধ্বপক্ষে ১২ ঘণ্টা (অর্ধঘণ্টা বিশ্রাম সহ) স্থির করিয়া দেওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের ওলট-পালটের পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের কারখানা আইনে শ্রমিকদের সর্বোচ্চ কাজের সময় দিনে ১১ ঘণ্টা করা হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের খনি আইনে সপ্তাহে সর্বোচ্চ কাজের সময় উপরে ৬০ ঘণ্টা ও খনির নীচে ২৪ ঘণ্টা নির্দিষ্ট হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আইনে কাজের সর্বোচ্চ সময় কমিয়া দিনে ১০ ঘণ্টা ও সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা দাঁড়ায়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে সারা বৎসর চালু কারখানার শ্রমিকদের সর্বোচ্চ কাজের সময় দিনে ৯ ঘণ্টা ও সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা এবং মরশুম কারখানায় দিনে ১০ ঘণ্টা ও সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে শ্রমিক সঙ্ঘ আইন (Indian Trade Union Act, 1926) প্রবর্তিত হওয়ায় শ্রমিকসঙ্ঘ আইনের দৃষ্টিতে স্বীকৃত হয় এবং শ্রমিকদের শক্তি ও দাবী প্রতিষ্ঠা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিল্প বিরোধ আইন (Indian Trade Disputes Act, 1929) পাশ হয়। এই আইন অনুসারে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ হইলে সরকারী তদন্ত বোর্ড সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া স্থির হয়। ইহাতেও শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত সঙ্ঘবদ্ধ ও আত্মসচেতন হইয়া উঠে। এই আইন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে [Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950] এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে [Industrial Disputes (Amendment Miscell-

যুদ্ধোত্তরকালের শ্রমিক বিক্ষোভ সম্পর্কিত তথ্যাদির জন্য "শিল্পশ্রমিক ও ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্প পরিস্থিতি" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

aneous Provisions) Act, 1956] সম্প্রসারিত হইয়াছে। মিঃ জে. এইচ. হুইট্‌লের অধিনায়কত্বে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Labour, 1929) নিয়োজিত হয় এবং ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে এই কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কারখানা আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শিশু ও স্ত্রী শ্রমিকদের সম্পর্কে ব্যাপক ব্যবস্থা হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কারখানা আইন (Indian Factories Act, 1948) এই আইনের আধুনিক ও সংশোধিত রূপ। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক কল্যাণের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য "মজুরী আইন" (Payment of Wages Act, 1936) পাশ হয়। ইতিপূর্বে ১৯২৩ ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন (Workmen's Compensation Act) প্রবর্তিত হইয়াছিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল কারখানা শ্রমিকদের বীমা আইন (The Employees' State Insurance Act) পাশ হয়। এই যুগান্তকারী আইনে ও ইহার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধনে সরকারী সাহায্যে মালিক ও শ্রমিকদের চাঁদায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ রক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইনে (Employees' Provident Fund Act, 1952) ৫০ জন বা তদতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগকারী প্রত্যেক কারখানায় শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুবিধা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।*

* এই প্রসঙ্গে শ্রমিক সংক্রান্ত নিম্নলিখিত আইনগুলিও উল্লেখযোগ্য :—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় খনি আইন ও ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৪০, ১৯৪৬ ও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সংশোধন, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের বন্দর আইন (Indian Ports-Act, 1908) ; ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের চা বাগান শ্রমিক আইন (Tea District Emigrant Labour Act XXI, 1932); ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় রেলপথ আইন ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সংশোধন; ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ডক শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োগ) আইন; ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের সাপ্তাহিক ছুটি আইন (Weekly Holidays Act, 1942); ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োগ আইন (The Dock Workers Regulation and Employment Act, 1948) ও কয়লা খনি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও বোনাস আইন (Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948); ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের খনি প্রসূতি আইন (Mines Maternity Benefit Act, 1946); ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কয়লাখনির ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অভ্রখনির শ্রমিককল্যাণ তহবিল আইন (Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 and Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1947); ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী সংক্রান্ত শিল্প বিরোধ অর্ডিন্যান্স; ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের বাগিচা শ্রমিক আইন (Plantation Labour Act, 1951); ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের কর্মীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন (Employees Provident Fund Act, 1952) : ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের খনি মজুর আইন (Indian Mines Act, 1952); ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের বোম্বাই শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন (Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953) |

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নিম্নতম মজুরী আইন (Minimum Wages Act, 1948) এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ন্যায্য মজুরী আইন (Fair Wages Act, 1950) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মজুরী আইনের পরিপূরক হিসাবে বেতন ব্যবস্থার দিক দিয়া শিল্প শ্রমিকদের অবশ্যই অনেকটা সন্তুষ্ট করিয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শিল্প-বিরোধ আইনে (Industrial Disputes Act, 1947) শিল্প বিরোধ সালিসির ব্যাপারে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনের তুলনায় অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ১৯৩৩ ও ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক হিসাবে শিশুদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন [The Children (Pledging of Labour) Act II of 1933 & The Employment of Children Act XXVI of 1938] শ্রমসাধ্য কাজে শিশু শ্রমিকদের অবাঞ্ছিত নিয়োগ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের শ্রমিক ও প্রসূতিকল্যাণ অথবা ঋণমুক্তি সম্পর্কিত আইনগুলি শ্রমিকদের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই।

তবে একথাও ঠিক যে, উপরোক্ত আইনগুলি প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের অভাব, নিরক্ষরতা, অত্যল্প মজুরী, সুস্থ আমোদ-প্রমোদের অভাব প্রভৃতির জন্য শ্রমিকেরা জীবন্মৃত হইয়া থাকে। অথচ শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসগৃহের ব্যবস্থা, আমোদপ্রমোদ, শিশু ও প্রসূতিকল্যাণ প্রভৃতি ব্যবস্থা শ্রমিক কল্যাণ নীতির অন্তর্ভুক্ত। ভারতের শিল্পাঞ্চলে শতকরা অন্ততঃ ৭০ জন শ্রমিক বাসের জন্য একখানি মাত্র ঘর পায়। লণ্ডনে এরূপ শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৭ ভাগেরও কম। কৃষি মজুরদের তুলনায় সামান্য ভাল হইলেও শিল্প শ্রমিকদের অল্প মজুরীর জন্যই ভারতে এত ধর্মঘট হয়। উপার্জন দ্বারা জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব হওয়ায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম শ্রমিককে বাধ্য হইয়াই অনেক ক্ষেত্রে মালিকের সহিত বুঝাপড়ার শেষ অস্ত্র হিসাবে ধর্মঘটের সাহায্য লইতে হয়। শ্রমিক ও মালিক পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তাহাদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক থাকাই উচিত। কিন্তু এদেশে এই পারস্পরিক সম্পর্ক হৃদ্যতার না হইয়া অবিরাম সংগ্রামের সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।*

* এ সম্পর্কে ডাঃ নরগোপাল দাস ১৫।৮।৫১ তারিখের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় 'Human relations in Indian Industry' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন :—

Workers feel that they are not part of the management and must defend themselves against it. What should be well-integrated and co-operative units are split into warring factions.

ভারতের যন্ত্রশিল্পে শ্রমিকদের সংখ্যা ৩১ লক্ষের মত।* এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে একটি শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল শ্রেণী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহাদের জীবিকার নিম্নতম ব্যয় হিসাবে বেতন নির্ধারিত করিতে হইবে। শ্রমিকদের বাসস্থান ও শিক্ষার দৈন্য ঘুচাইবার ব্যবস্থা করাও এদেশে কম দরকার নয়। শ্রমিকেরা যাহাতে সুলভে পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকদের জন্য প্রবর্তিত নিম্নতম মজুরী আইন, শ্রমিক বীমা আইন প্রভৃতি যাহাতে আশানুরূপ কার্যকরী হয় তাহা দেখিতে হইবে। এছাড়া বেকার বীমার মত প্রয়োজনীয় নূতন ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার। শ্রমিকদের বাসস্থান ও পরিবেশ যাহাতে সকল দিক হইতে স্বাস্থ্যকর হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক সঙ্ঘ আইন (Trade Union Act) প্রবর্তিত হইবার পর শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন শ্রমিকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারের দিক হইতে আইন প্রবর্তন দ্বারা শ্রমিক কল্যাণের চেষ্টা চলিতেছে। এ অবস্থায় আশা করা যায় যে, মানুষের মত বাঁচিবার সুখ সুবিধা পাইলে ভারতীয় শ্রমিকের আপেক্ষিক অযোগ্যতা সম্পর্কিত দুর্নাম বিলুপ্ত হইবে।†

আইনের সাহায্যে শ্রমিকদের উন্নততর গৃহব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে কারখানা শ্রমিকদের জন্য ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে একটি নীতি (The Subsidised Industrial Housing Scheme) চালু হইয়াছে। বাগিচা শ্রমিকদের জন্য ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের বাগিচা শ্রমিক আইনে (The Plantation Labour Act, 1951) এইজন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

---

* ভারতীয় যন্ত্রশিল্পে গড়ে দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সরকারী হিসাবে নিম্নরূপ :— ১৯৫০—২৫০৪৩৯৯, ১৯৫১—২৫৩৬ ৫৪৪, ১৯৫২—২৫৬৭৪৫৩, ১৯৫৩—২৫২৮০২৬, ১৯৫৪—২৫৮৯৭৫১ ১৯৫৫—২৬৯০৪০৩, ১৯৫৬—২৮৮২৩০৯, ১৯৫৭—৩০,৮৭, ৮৬১।

† ভারতীয় শ্রমিকদের পণ্য-উৎপাদন হারের স্বল্পতা এক বিরাট সমস্যা সন্দেহ নাই। ভারতে প্রতি শ্রমিক প্রতি শিফ্‌টে ২·৭ টন কয়লা উত্তোলন করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক এক্ষেত্রে উত্তোলন করে প্রায় আটগুণ বা ২১·৬৮ টন। ভারতীয় কাপড়ের কলে প্রতি শ্রমিক যখন গড়পড়তা ২টি তাঁত চালায়, ইংলণ্ডে প্রতি শ্রমিক চালায় গড়ে ৫টি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি শ্রমিক চালায় গড়ে ৯টি। শিল্পজগতে ভারতের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ খাতে মোট ৪৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল। শিল্পাঞ্চলে যে সব স্থানে শ্রমিকদের বাসগৃহের একান্ত অভাব, সেখানেই গৃহনির্মাণ এই খাতে অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে। এ ছাড়া শ্রমিক কল্যাণের জন্য পরিকল্পনার কার্যকালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হিসাবে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ খাতে ১২০ কোটি টাকা এবং পৃথকভাবে শ্রমিক ও শ্রমিককল্যাণ খাতে ২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত সুপারিশ নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত :—

(১) শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক; (২) শ্রমিকদের বেতন ও সামাজিক নিরাপত্তা; (৩) শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ও কর্মস্থলের পরিবেশ; (৪) কর্মসংস্থান ও শিক্ষা; (৫) শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা।

শ্রমিক-মালিক সদ্ভাব ও উৎপাদন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে শ্রমিকসঙ্ঘ বা ট্রেড-ইউনিয়নগুলি প্রভূত সাহায্য করিতে পারে বলিয়া কমিশন মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে বিভিন্ন বিভাগে যোগাযোগ রক্ষার এবং শ্রমিককে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে উৎসাহিত করিতে গ্র্যাচুইটি দিবার কথাও পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশে আছে।

ভারতে শ্রমিকসঙ্ঘ আন্দোলন

(Trade Union Movement in India)

ভারতে শিল্পশ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের শিল্পশ্রমিকেরা 'বোম্বে মিলহ্যাণ্ডস্ এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে, বলিষ্ঠ না হইলেও ইহাকেই ভারতের প্রথম শ্রমিকসঙ্ঘ বলা যায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বদেশী নেতারা আন্দোলন শক্তিশালী করিবার জন্য শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ ও উত্তেজিত করিতে সচেষ্ট হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে অযোগ্য নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক চেতনার অভাব, সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব ইত্যাদি কারণে শ্রমিকসঙ্ঘগুলি শক্তিশালী হইতে পারে নাই। অবশ্য ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লোকমান্য তিলকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের শ্রমিকেরা অনেকটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ৬ দিন সাধারণ ধর্মঘট করে।

ভারতে প্রথম পাশ্চাত্ত্য ধরণের শ্রমিকসঙ্ঘ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আয় হ্রাস ও পণ্যমুল্য বৃদ্ধির জন্য স্বল্প বেতনভোগী শ্রমিক সাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং মালিকেরা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় উদাসীনতা দেখান বলিয়া ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে অনেকগুলি শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ইহার পূর্বে কুখ্যাত রাউলাট বিল ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সাধারণ দেশবাসীর সহিত ভারতীয় শিল্পশ্রমিকদেরও বিচলিত এবং সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিক্ষোভ ও গণচেতনার অভ্যুদয়ের মুখে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All-India Trade Union Congress) জন্মলাভ করে। শ্রমিকদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন নবজীবন লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় শ্রমিক বোর্ড (Central Labour Board) এবং বাংলায় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (Trade Union Federation) গঠিত হয়। এই বৎসরই সারা ভারতের রেলশ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত রেল কর্মচারী সঙ্ঘ (All-India Railwaymen's Federation) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার কিছুদিনের মধ্যে ডাক ও তার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সঙ্ঘগুলি

(Central and Provincial Federations of Postal and Telegraph Employees) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ভাবে শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতে থাকিলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিক আন্দোলনে যোগদানকারী শ্রমিককে মালিকেরা কর্মচ্যুত করিতে বা কঠোর কোন শাস্তি দিতে থাকেন এবং শ্রমিকসঙ্ঘগুলির মর্যাদা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। সরকার প্রথমটা মালিকপ্রীতিবশতঃ নিষ্ক্রিয় থাকিলেও শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রবল জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া সরকার ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রমিকসঙ্ঘ আইন' (Trade Union Act) পাশ করিয়া শ্রমিকসঙ্ঘগুলিকে আইনতঃ স্বীকার করিয়া লন।*

শ্রমিকসঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাশ হইবার পর ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের বিশেষ একটি শ্রেণী হিসাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি সচেষ্ট হইয়া উঠেন এবং এই সময় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে কম্যুনিষ্ট পার্টির অপরিসীম প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় শিল্প-ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রসার লাভ সম্ভব হয়। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দ ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই বৎসর সারা ভারতে অনেকগুলি বড় বড় শ্রমিকসঙ্ঘ গড়িয়া উঠে এবং বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে তিনমাস ধরিয়া সাধারণ ধর্মঘট চলে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালার বাউড়িয়া, চেঙ্গাইল ও লিলুয়ায় এবং বিহারের জামসেদপুরে বড় রকমের ধর্মঘট হয়। তবে এই বৎসর কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলির মতবিরোধের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত রেল-কর্মচারী ফেডারেশনের ন্যায় শক্তিশালী শ্রমিকসঙ্ঘ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। অবশ্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বামপন্থিগণ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পরিত্যাগ করায় ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের গতি সঙ্ঘগত দুর্বলতার জন্য স্বতঃই মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই মন্দগতি বা ট্রেড

---

* এই শ্রমিকসঙ্ঘ আইনটি ইংলণ্ডের ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বাণিজ্যবিরোধ ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশনের (Royal Commission on Trade Disputes and Trade Combinations, 1905) সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়।

ইউনিয়ন কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধজনিত দৌর্বল্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকসঙ্ঘগুলি নাগপুরে সম্মিলিত হইয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে নবরূপে শক্তিশালী করিয়া তোলে। তারপর অবশ্য ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শ্রমিকদের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়া মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি পুনরায় ক্ষুণ্ণ হয়। বিশিষ্ট শ্রমিক প্রতিষ্ঠান 'নাবিক সঙ্ঘ' (Seamen's Union) এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছেদ করে। এই সময় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (এম. এন. রায়) পরিচালনায় ভারতীয় শ্রমিক সঙ্ঘ (Indian Federation of Labour) নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তারপর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের নূতন প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (Indian National Trade Union Congress) গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রভূত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ভারতের সমাজতন্ত্রী কর্মীরা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দ মজদুর সভা (Hind Majdur Sabha) নামে একটি শ্রমিকসঙ্ঘ সংস্থা গঠন করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত সম্মিলিত শ্রমিকসঙ্ঘ কংগ্রেস (United Trade Union Congress) এইরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠান।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ঘটনাবহুল হইলেও এদেশে এই আন্দোলন এখনও আশানুরূপ প্রসার লাভ করে নাই বলা চলে। শ্রমিকদের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, জীবন সম্বন্ধে হতাশাবোধ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার অভাবই ইহার মূল কারণ। তবে আশার কথা শ্রমিকেরা এখন নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে ক্রমেই অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিতেছে। শিল্প-শ্রমিক ছাড়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, খনি, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান, রেলপথ, বন্দর, প্রভৃতির শ্রমজীবী কর্মিবৃন্দও ট্রেড ইউনিয়নে সদস্যরূপে যোগ দিয়া থাকেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন শ্রমিকদিগকে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক মর্যাদা দেয়। অতঃপর শ্রমিকেরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে থাকে এবং প্রদেশগুলিতে শ্রম-সচিবদের ও কেন্দ্রে শ্রমসদস্যকে বহু বিচিত্র সমস্যা লইয়া কর্মব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। এখন তো স্বাধীন দেশে শ্রমিকেরা পূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার জন্য শুধু শ্রমিক নেতারা নয়, সরকারও

এখন সচেষ্ট। স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধানের ২৩, ২৪, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, প্রভৃতি ধারাগুলি পড়িলেই একথার যথার্থতা বুঝা যাইবে। এইসব ধারায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা, শিশু ও স্ত্রী শ্রমিকদের স্বার্থ, স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ, জীবিকা নির্বাহের উপযোগী নিম্নতম মজুরী প্রভৃতির নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিক-মালিক বিরোধ বাধিলে এখন সালিশির দ্বারা মীমাংসা হয়। শ্রমিক কল্যাণের জন্য ভারতে যে সকল আইন প্রবর্তিত হইয়াছে সেগুলি পূর্ববর্তী 'ভারতের শিল্পশ্রমিক' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতে ধর্মঘটাদির ফলে পণ্য উৎপাদন যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তদুদ্দেশ্যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর দিল্লীতে সরকার, শিল্পপতি ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হয়, তাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে পণ্য উৎপাদন চালাইবার জন্য (Industrial Truce) শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই সরকারী প্রতিনিধিদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সরকার অধিক সংখ্যক শ্রমিককে কাজ দিবার জন্য 'শ্রমবিনিময় কেন্দ্র' খুলিয়াছেন এবং এই কেন্দ্রগুলি মারফৎ ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার, ১ লক্ষ ৮৫ হাজার, ১ লক্ষ ৬২ হাজার, ১ লক্ষ ৭০ হাজার, ১ লক্ষ ৯০ হাজার ও ১ লক্ষ ৯৩ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসংস্থানের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩২ হাজার।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালেই ভারতে শ্রমিক আন্দোলন প্রসার লাভ করিয়াছে। এই সময় প্রথম বৎসরেই ইউনিয়নের সংখ্যা ১ হাজার এবং শ্রমিক সদস্য সংখ্যা ৩ লক্ষ বৃদ্ধি পায়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ট্রেড ইউনিয়ন আইনে সঙ্ঘবদ্ধ ভারতের ২১,৮৯,৪৬৭ জন শ্রমজীবী ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য তালিকাভুক্ত ছিলেন।*

* ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরুতে ভারতে বিভিন্ন শ্রমিকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও সদস্যসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :—

	সংখ্যা	সদস্যসংখ্যা
অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস	৫৫৮	৪,২২,৮৫১
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস	৬১৭	৯,৭১,৭৪০
হিন্দ মজদুর সভা	১৯	২,০৩,৭৯৮
ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস	২৩৭	১,৫৯,১০৯
মোট	১৫৩১	১৭,৫৭,৪৯৮

শ্রমিক সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়নের অর্থাগম হয় সদস্যদের চাঁদা (ইহাই শ্রমিক সঙ্ঘের মোট আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ), দান, পুস্তক, সাময়িক পত্র প্রভৃতির বিক্রয়লব্ধ অর্থ, জমানো টাকার সুদ ইত্যাদি হইতে। শ্রমিক সঙ্ঘের ব্যয়ের খাতগুলির মধ্যে শ্রমিক বিরোধ পরিচালনা, বেকারদের সাহায্যদান, পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রকাশ,আইনগত ব্যয়, হিসাব পরীক্ষকের পারিশ্রমিক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শ্রমিকদের শিক্ষার ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে এবং এক একটি শিল্পের হিসাবে শ্রমিকদের স্থায়ী সঙ্ঘবদ্ধতা সৃষ্টি হইলে স্বভাবতঃই শ্রমিক সঙ্ঘ আন্দোলনের অধিকতর সাফল্য সূচিত হইবে।

ভারতের পথ ও পরিবহন

(India's Transport System)

পথ ও যানবাহন দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির অনুপূরক। ভারতে এই পথ ও যানবাহনের অবস্থা শোচনীয়। শতকরা ৮২ ভাগ অধিবাসী অধ্যুষিত পল্লীভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা কেবলমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এখনও সহর অঞ্চল হইতে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। বিগত যুদ্ধের প্রয়োজনে কিছুটা উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের হিসাবে সে উন্নতি নগণ্য। এইজন্যই ভারতের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠনের সকল পরিকল্পনাতেই পথ ও পরিবহন খাতে বহু পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে। বোম্বাই পরিকল্পনায় এই খাতে ধরা হইয়াছিল ৯৪০ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দ ১০,০০০ কোটি টাকা)। ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ যথাক্রমে ২,৩৫৬ কোটি টাকা ও ৪,৮০০ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে পথ ও পরিবহন খাতে যথাক্রমে ৫৫৭ কোটি টাকা ও ১,৩৮৫ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

ভারতে দর্শনীয় স্থান অসংখ্য, বিদেশী যাত্রীদের পক্ষে ভারতভ্রমণ লোভনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু পথঘাট ও যানবাহনের সুবিধার অভাবে এ হিসাবে ভারত আশানুরূপ লাভবান হয় না। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিদেশী যাত্রীর ভারতভ্রমণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি এ হিসাবে কিছুটা উন্নতি দেখা যাইতেছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানী বাদে ভারতে বিদেশী যাত্রী আসেন ৪৩৬৪৫ জন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় ১০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ ৬৮৮৮০ জন বিদেশী যাত্রীর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে ১৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা।

রেলপথ

ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথের গুরুত্বই সর্বাধিক। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রেলপথগুলিতে প্রত্যহ প্রায় ৪০ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করিয়াছে এবং দৈনিক গড়ে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টনের মত পণ্য রেলপথে বাহিত হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ভারতীয় রেলপথের মোট

মূলধনের পরিমাণ ১২২৮ কোটি টাকা। এই বৎসর ভারতীয় রেলপথসমূহে ৩৮৩ কোটি টাকা ভাড়া বা মাশুল বাবদ পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় রেলপথসমূহে নিযুক্ত ১১ লক্ষ ১১ হাজার জন কর্মচারী বেতন ও ভাতা বাবদ ১৭৩ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারতে ৪০,৫২৪ মাইল রেলপথ ছিল, ইহার মধ্যে ৬,৯৫৮ মাইল পাকিস্তানে এবং ৩৩,৫৬৬ মাইল ভারতে পড়িয়াছে। ইহার পর ১৪২ মাইল দীর্ঘ আসাম লিঙ্ক ও ১৭৭ মাইল দীর্ঘ কাণ্ডলা-দিশা রেলপথ সমেত ভারতে কিছু নূতন রেলপথ বসিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার আয়তন দাঁড়াইয়াছে ৩৪,৮৮৯ মাইল। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়নে ৪২৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ৯০০ কোটি টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতীয় রেলপথে ৮২০৯টি ইঞ্জিন, ১৯২২৫টি কামরা এবং ২২২৪৪১টি মালগাড়ী চালু ছিল, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৯২৮৮, ২৩৮৮০, এবং ২৪৩,১৯২ হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অতিরিক্ত ২২৫৮টি ইঞ্জিন, ১১৩৬৪টি কামরা ও ১০৭২৪৭টি মালগাড়ী সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতের ১৬০৭ মাইল রেলপথে দুইদিকে লাইন বসানো হইবে এবং ২৬৫ মাইল মিটার গেজ লাইন ব্রড গেজে পরিবর্তিত করা হইবে। এছাড়া ৮৪২ মাইল নূতন রেলপথ বসাইবার এবং ৮০০০ মাইল পুরাতন রেলপথ সংস্কারের ব্যবস্থাও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে রেলপথের পরিমাণ খুব কম, তদুপরি পরিচালন-ব্যবস্থাও এদেশে সমুন্নত নয়। ব্রিটেনে প্রতি এক হাজার বর্গমাইলে যখন ২১৪ মাইল রেলপথ আছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আছে ৭৯ মাইল, তখন ভারতে প্রতি এক হাজার বর্গ মাইলে রেলপথের পরিমাণ মাত্র ২২ মাইল।

ভারতে প্রথম রেলপথ খোলা হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রেলপথের শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হইয়াছে।

আগে ভারতে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রকার রেলপথ ছিল, এখন প্রায় সমস্ত রেলপথই সরকারী হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রীয়করণ নীতি গৃহীত হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতে আর বেসরকারী রেলপথ থাকিবে না।

ভারতীয় রেলপথসমূহের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ চেষ্টা চলিতেছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের পোপ কমিটির, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ওয়েজউড্ কমিটির এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় রেলপথ তদন্ত কমিটির (Indian Railway Enquiry Committee) রিপোর্টে এ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদির সন্নিবেশ দেখা যায়। আগে সরকারের সীমাহীন প্রয়োজনের চাপে রেলপথের কল্যাণে রেলপথের উদ্বৃত্ত নিয়োগ কঠিন ছিল, রেলের উদ্বৃত্ত বণ্টনের সুসঙ্গত নীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিটি বসে। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে অতঃপর ভারতীয় রেলপথ নাগরিকদের সম্পত্তি ধরিয়া ইহাতে নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এইভাবে বৎসরে ৩৪।৩৫ কোটি টাকা বাদ দিয়া রেলপথসমূহের উদ্বৃত্তের বাকী অংশ রেলবিভাগের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। রেলবিভাগের এই উন্নতিতে রেলপথ-উন্নয়নের এবং যাত্রী ও রেলকর্মচারীদের সুখ সুবিধা বিধানের চেষ্টা হইবে।

চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতীয় রেলপথের বিদেশের মুখাপেক্ষিতা কমিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই কারখানায় বৎসরে ১২০টি ইঞ্জিন ও ৫০টি বাষ্পীয় বয়লার নির্মিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। টাটা কোম্পানীও জামসেদপুরে ইঞ্জিন নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

কাজকর্মের সুবিধার জন্য বর্তমানে ভারতের সরকারী রেলপথগুলিকে সাত ভাগে ভাগ (Grouping) করা হইয়াছে। এই ভাগগুলি হইল:— (১) উত্তর বিভাগ—৩৩৩৯ মাইল, প্রধান কেন্দ্র দিল্লী; (২) উত্তরপূর্ব বিভাগ—৩০৬০ মাইল, প্রধান কেন্দ্র গোরক্ষপুর; (৩ ও ৪) পূর্ব বিভাগ ও দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগ—২৩২১ ও ৩৪২৩ মাইল, প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা; (৫) দক্ষিণ বিভাগ—৬১০০ মাইল—প্রধান কেন্দ্র মাদ্রাজ; (৬) পশ্চিম বিভাগ—৬০১৩ মাইল, প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই; (৭) কেন্দ্রীয় বিভাগ—৫২৯৬ মাইল, প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই, উত্তর পূর্ব সীমান্ত বিভাগ—১৭৩৮ মাইল, প্রধান কেন্দ্র পাণ্ডু।

১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রেলপথসমূহে যাত্রীসংখ্যা ছিল ১৪৩ কোটি ১০ লক্ষ এবং রেলপথসমূহ ১২ কোটি টন মাল বহন করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেশের প্রয়োজনের হিসাবে রেল-ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য অস্বস্তিকর।

১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রেলপথসমূহের মোট আয় ও মুনাফা হইয়াছে যথাক্রমে ৩৮২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ও ৭১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। এই বৎসর ভারত সরকারের রাজস্ব তহবিলে রেলপথগুলি ৩৮ কোটি টাকা দিয়াছে।

রাজপথ

দেশের সমৃদ্ধির প্রশ্নে রাস্তার গুরুত্ব লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।* পথ ও পরিবহন ব্যবস্থার সাফল্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সমৃদ্ধির প্রধান কারণ।

ভারতের রাজপথ বা সাধারণ স্থলপথের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। এত বড় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ সাধনের জন্য গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ন্যায় বড় রাস্তার একান্ত অভাব। এইরূপ বড় রাস্তা যে সামান্য কয়টি আছে, সেগুলিও সব জায়গায় যথেষ্ট প্রশস্ত ও সরল নয়। জেলাবোর্ডের রাস্তাগুলিই এদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পথ। ভারতের পল্লী অঞ্চলের রাস্তার অধিকাংশই কাঁচা, এগুলি বর্ষার কয়েক মাস কাদায় এবং বর্ষার পূর্ববর্তী কয়েক মাস ধূলায় একরূপ অগম্য হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে গরুর গাড়ীই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যানবাহন। গরুর গাড়ীগুলিতে ভারতীয় রেলপথের প্রায় সমান বা বৎসরে ১০ কোটি টনের মত মালপত্র বাহিত হয়। ইহা হইতেই ভারতীয় অর্থনীতিতে গরুর গাড়ীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। অবশ্য এখন ক্রমে রাস্তাঘাটের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে মোটরলরীর ব্যবহারও কিছুটা বাড়িতেছে। পল্লীগ্রামের পথে অনেক স্থানে এখনও পাল্কী চলে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরের অভ্যন্তরভাগে বাস ছাড়া ট্রামও চলে। 'বাস সার্ভিস' এখন গ্রাম অঞ্চলেও দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। এছাড়া ভারতের ছোট বড় অধিকাংশ শহরে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী বা টাঙ্গা ও একা, গরুর গাড়ী প্রভৃতি নানাপ্রকার যানবাহন চলাচল করে। যানবাহন হিসাবে সাইকেলও ভারতে ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বলাভ করিতেছে।

এদেশের রাস্তার উন্নতির জন্য ভারতসরকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'কেন্দ্রীয় রাস্তা

* এসম্পর্কে একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন:—

"The Road is, in very truth, one of the great fundamental institutions of mankind. Its history dates back to the dawn of recorded history and beyond. The beginnings are almost instinctive with man's first quest in search of food, water, plunder or sheer adventure. It develops with man's advance: it retrogrades with the breakdown of a social order. A people without roads would be a people without intercourse with the outside world—without the attributes of civilisation. Man the road builder thus cannot be separated from the man the builder of civilisation."

উন্নয়ন কমিটি' (জয়াকর কমিটি) গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশক্রমে প্রতি গ্যালন পেট্রোলের উপর দু আনা হারে কর বসাইয়া বিভিন্ন প্রদেশ সরকারকে বৎসরে ৯০ লক্ষ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। এইভাবে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে "রাস্তা উন্নয়ন তহবিল" সৃষ্টি হওয়ার ফলে কাজের বেশ কিছুটা সুবিধা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পথ ও যানবাহন দপ্তর দিল্লীর সেণ্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্ হইতেও বহু মূল্যবান সাহায্য পাইয়া থাকে।

ভারতে উল্লেখযোগ্য রাস্তার পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনার সূচনায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার মাইলের মত ছিল, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইহা ৩,২৮,০০০ মাইল হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাকা রাস্তার পরিমাণ ১,৪৪,০০০ মাইল। প্রতি বর্গমাইলে ব্রিটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে ২·০২ মাইল ও ১·০৩ মাইল রাস্তা আছে, ভারতে আছে সেখানে মাত্র ০·৪ মাইল। প্রতি হাজার বর্গ মাইলের হিসাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে পাকা (Metalled) রাস্তার পরিমাণ যথাক্রমে ২০২০ মাইল, ১৮৪০ মাইল ও ১০৩০ মাইল, ভারতে সেখানে এইরূপ রাস্তার পরিমাণ মাত্র ৭১ মাইল।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারগণ নাগপুরে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া ভারতে রাস্তা বাড়াইবার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করেন। আন্তঃপ্রাদেশিক জাতীয় সড়ক, প্রাদেশিক সড়ক, প্রধান জেলা সড়ক, অপ্রধান জেলা সড়ক ও গ্রাম্য রাস্তা—এই পাঁচ ভাগে ভারতের রাস্তাগুলিকে ভাগ করিয়া পরিকল্পনা রচনা করা হয়। পরিকল্পনাটি ২০ বৎসরের এবং বলা হয় পরিকল্পনা অন্তে ভারতের রাস্তার পরিমাণ ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল (১৯৪৩) হইতে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার মাইলে উঠিবে ও কোন গ্রামই বড় রাস্তা হইতে পাঁচ মাইলের বেশি দূর হইবে না।

দেশ বিভাগের ফলে নাগপুর পরিকল্পনা বহুলাংশে বানচাল হয় সন্দেহ নাই, তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় পরিকল্পনা কমিশন ইহা হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের রাস্তা খাতে ৪৮ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-কালে কেন্দ্রীয় রাজপথ তহবিলের (Central Road Fund) সাহায্য সহ ১৫৫ কোটি টাকার মত খরচ হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকার সমূহের হিসাবে রাস্তা খাতে ২৪৬ কোটি

টাকা এবং রাজপথ পরিবহন খাতে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় রাজপথ তহবিল হইতে রাস্তা-উন্নয়ন খাতে আরও ২৫ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন যে, এইভাবে অর্থ-বিনিয়োগের ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবসানে রাস্তার হিসাবে নাগপুর পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছান যাইবে।*

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তাখাতে রাজ্যসমূহের হিসাবে ৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ হিসাবে ১৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে রাজ্য-রাস্তা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮,০০০ মাইল পাকা রাস্তা নির্মিত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। আন্তঃরাজ্য পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব-সম্পন্ন রাস্তা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ১০০০ মাইল জাতীয় সড়ক নির্মাণের কথা পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় রাস্তা পরিকল্পনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ১২৫০ মাইল সংযোগ পথ ও ৭৫টি বড় সেতু নির্মিত হইবে এবং ৬০০০ মাইল বর্তমান রাজপথ সংস্কৃত হইবে। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া পরিকল্পনায় আশা করা হইয়াছে, তবে এই নিম্নস্তরের রাস্তা সম্পর্কে লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব হয় নাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে রাজ্য-রাজপথ-পরিবহনের হিসাবে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এজন্য বরাদ্দ হইয়াছে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের রাজপথ পরিবহন সংস্থা আইন (Road Transport Corporation Act, 1950) অনুসারে রাজ্যসরকারগুলিকে অনুরূপ সংস্থা বা কর্পোরেশন গড়িবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং রেলপথগুলি যাহাতে এই সংস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য উপরোক্ত রেলপথ পরিকল্পনায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। সব রকম গাড়ী মিলাইয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতে ভারতের রাস্তায় ২ লক্ষ ৯৫ হাজার মোটর গাড়ী চলিত, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরুতে এই সংখ্যা ৪ লক্ষ ২২ হাজার হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবহারের

* অনুমান করা হইয়াছে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে পাকা রাস্তার (Surfaced Roads) পরিমাণ ১,৪৪,০০০ মাইল এবং কাঁচা রাস্তার (Unsurfaced Roads) পরিমাণ ২,৩৫০০০ মাইল দাঁড়াইবে।

জন্য মোটর গাড়ীর (Private Car) সংখ্যা জিপ গাড়ী বাদে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার। ভারতের অনেকগুলি শহরে সরকার বাস চলাচল ব্যবসা আপন মালিকানায় আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ভারতে বিদেশী যাত্রীর সংখ্যা বাড়িলে বিশেষ করিয়া বিদেশী মুদ্রার হিসাবে ভারতের লাভ, তবে এজন্য উন্নত ধরণের পথ ও পরিবহন সহ ভ্রমণ-কারীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার।

জলপথ

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে ভারতের জলপথ খুবই সমৃদ্ধ ছিল। এখন অবশ্য রেলপথ ও রাজপথের প্রসার হওয়ায় এবং বহু নদনদী মজিয়া যাওয়ায় জলপথের গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবে পল্লীভারতে নৌকা ও স্টীমার যোগে বহু যাত্রী ও পণ্যের চলাচল হয়। ভারতসরকার এখন দামোদর, মহানদী, তুঙ্গভদ্রা, কোশী প্রভৃতি নদনদী পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেছেন, ইহাতে জলপথের কিছুটা উন্নতি অবশ্যই হইবে

ভারতে এখন স্টীমারের উপযোগী ১৫৫৭ মাইল এবং দেশীয় বড় নৌকার উপযোগী ৩৫৮৭ মাইল অন্তর্দেশীয় জলপথ আছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বোর্ড (Ganga-Brahmaputra Board) নামে এক সংস্থা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে, এই বোর্ড ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গায় নৌ-চলাচল-ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। ভারতের অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচলের উন্নতিকল্পে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। প্রস্তাবিত ফরাক্কা বাঁধ নির্মিত হইলে ভাগীরথীতে তথা পশ্চিমবঙ্গে জলপথ-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইবে।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের দিক হইতে ভারতের সুযোগ সুবিধা খুবই বেশি। ইহার উপকূল ৩,২০০ মাইল। জাহাজী ব্যবসায়ের দিক হইতে ভারত পিছাইয়া আছে বলিয়া এই উপকূলভাগ ভারতের আশানুরূপ আর্থিক উপকারে আসিতেছে না। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসরকার উপকূলীয় জাহাজী ব্যবসা ভারতীয় জাহাজের জন্য সংরক্ষিত করেন এবং বাণিজ্যিক নৌবহরের নাবিকদের শিক্ষাব্যবস্থা আপন হস্তে গ্রহণ করেন।

অখণ্ড ভারতবর্ষের সাতটি বড় বন্দরের মধ্যে করাচী ও চট্টগ্রাম পাকিস্তানে পড়িয়াছে; বাকী কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, কোচিন ও বিশাখাপত্তন ভারতে রহিয়াছে। ভারতসরকার কচ্ছ উপসাগরের উত্তরাংশে কাণ্ডলা বন্দরটিকে প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করিতেছেন। এছাড়া আরও কয়েকটি নূতন বন্দর নির্মাণ ও বর্তমান বন্দরগুলির উন্নতিসাধনের বিষয়ও বিবেচনা করা হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাহাজ চলাচল ও বন্দর উন্নয়নের হিসাবে ৬০ কোটি টাকা (২৬+৩৪) বরাদ্দ হয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ হিসাবে ৯৩ কোটি টাকা (৪৮+৪৫) বরাদ্দ হইয়াছে। কাণ্ডলা বন্দরের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বন্দরের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ১৪ কোটি টাকা। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরের উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে ১৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, ২৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ভারতের ১৫০টি অপ্রধান বন্দরের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে ২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেখানে বরাদ্দ হইয়াছে ৫ কোটি টাকা। ভারতের বাতিঘরগুলির (Light House) উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার সময় ভারতের নিজস্ব পণ্যবাহী জাহাজের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বাড়িয়া ৬ লক্ষ টন হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ইহা বাড়িয়া ৯ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে বলিয়া কমিশন আশা করিয়াছেন। ভারতের বিশাখাপত্তন কার-খানায় (Hindusthan Shipyard) এখন জাহাজ নির্মিত হইতেছে, এছাড়া বিদেশ হইতে জাহাজ কিনিবারও চেষ্টা চলিতেছে। ভারতে দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রস্থাপনে স্থান-নির্বাচন ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ভারতসরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ভারতে আসেন, তাঁহারা ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁহাদের রিপোর্ট দিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজী নীতি নির্ধারণ কমিটি (Shipping Policy Committee) ভারতের জাহাজী শক্তি যথাসম্ভব ২০ লক্ষ টনে বাড়াইবার সুপারিশ করিয়াছেন।

পৃথিবীর পণ্যবাহী জাহাজের পরিমাণ ৯ কোটি টনের কিছু বেশী হইবে, ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অংশ যথাক্রমে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন ও ২ কোটি টনের মত। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ভারতের পণ্যবাহী জাহাজের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টন হইয়াছে।

ভারতের পণ্যবাহী নৌবহর যাহাতে লাভজনক হয় তদুদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনে (The Merchant Shipping Act, 1958) উপযুক্ত তহবিল গঠন ছাড়া ভারতসরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি জাতীয় জাহাজ সংস্থা (National Shipping Board) গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের বাণিজ্য জাহাজী ব্যবসার উন্নতির হিসাবে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'ইষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন লিমিটেড' এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'দি ওয়েষ্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশনের' অবদান উল্লেখযোগ্য।

বিমানপথ (অসামরিক বিমান চলাচল)

যে দেশের স্থলপথ বা জলপথের উন্নতি হয় নাই, সে দেশের বিমানপথের উন্নতি কেহই আশা করে না। ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত না হইলে এদেশে বিমানপথের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।

বোম্বাইয়ের তৎকালীন রাজ্যপাল লর্ড লয়েডের চেষ্টায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অসামরিক বিমান চলাচল সুরু হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এই চলাচল ব্যবস্থা শ্লথগতি ছিল। মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতে অসামরিক বিমান চলাচল সম্প্রসারিত হইয়াছে।

যুদ্ধাবসানে ভারতে বহুসংখ্যক বিমান, বিমানক্ষেত্র, বিমানচালক ও বিমানশিল্পী উদ্বৃত্ত হওয়ায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এদেশে বিমান চলাচলের সুযোগ অনেক বাড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বিমানঘাঁটির সংখ্যা ছিল ৩, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা হইয়াছে ৮৪। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা (দমদম), বোম্বাই (সান্তা ক্রুজ') ও দিল্লী (পালাম) আন্তর্জাতিক বিমান-ঘাঁটি। ভৌগোলিক গুরুত্বের জন্য ভারতে অনেকগুলি বিদেশী কোম্পানীও ব্যবসা চালায়। বিমানের ভাড়া এখনও খুবই বেশি, ব্যয়সঙ্কোচনের দ্বারা ভাড়ার হার কিছুটা কমাইতে পারিলে সময় বাঁচাইবার, আরামের এবং নিরাপত্তার জন্য বিমানভ্রমণ অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে।

এতদিন ভারতে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়াওয়েজ, ভারত এয়ারওয়েজ, টাটা এয়ার লাইনস্. এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ, হিন্দুস্থান এয়ারওয়েজ,

ডেকান এয়ারওয়েজ, হিমালয়ান এভিয়েশন লিঃ, কলিঙ্গ এয়ার লাইনস্, এয়ার ইণ্ডিয়া লিঃ, এয়ার সারভিসেস অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড প্রভৃতি কোম্পানীগুলি নিজ নিজ দায়িত্বে বিমান চালাইয়াছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট হইতে ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং আইনের সাহায্যে [দি এয়ার কর্পোরেশন এ্যাক্ট (১৯৫৩)] দুইটি কর্পোরেশন বা যৌথসংস্থা রূপে ভারতীয় বিমান ব্যবসায় রাষ্ট্রীয়করণ (Nationalisation) হইয়াছে। এই কর্পোরেশন দুইটি হইল ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন ও এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার-ন্যাশনাল। প্রথমটি প্রতিবেশী পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান, ইরান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এবং ভারতের অভ্যন্তরভাগে বিমান চালাইতেছে এবং দ্বিতীয়টি বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থা হিসাবে কাজ করিতেছে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য সুরু হওয়া পর্যন্ত বিমান-পোতের উন্নতি সহ ভারতীয় অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে ৮ কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এজন্য ধরা হইয়াছে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

রাষ্ট্রীয়করণের পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশন দুইটির হিসাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইলেও প্রকৃত ব্যয় হইয়াছে ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহাদের জন্য মোট ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে (ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন—১৬ কোটি টাকা এবং এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল—১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা)।

প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ, ব্রিটিশ ওভারসিস্ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন, এয়ার ফ্রান্স, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এয়ার লাইন, কে. এল. এম., ট্রান্স ওয়ার্লড এয়ারওয়েজ প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বিমান চলাচল প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ভারতীয় সংস্থাকে বর্তমানকালে বিমান ব্যবসা চালাইতে হইবে। কাজেই খরচ যথাসম্ভব কমাইয়া বিমান পথের এবং যাত্রীদের সুখসুবিধার উন্নততর ব্যবস্থা হওয়া দরকার। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ট্রান্স ওয়ার্লড এয়ারওয়েজ ব্যতীত বাকীগুলি ভারতের অভ্যন্তর ভাগ দিয়া চলাচল করে। এছাড়া চাইনিজ ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ, ফিলিপাইন

এয়ারলাইন, কোয়ান্টাস এম্পায়ার এয়ারওয়েজ, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস প্রভৃতিও ভারতীয় পথের সহিত যুক্ত।

বেসরকারী পরিচালনায় ভারতের অধিকাংশ বিমান প্রতিষ্ঠানেরই আর্থিক ক্ষতি হইতেছিল, পৃথকভাবে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা তাহাদের অনেকগুলির পক্ষেই সাধ্যাতীত ছিল বলা চলে। সেদিক হইতে বিবেচনা করিয়াই ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত "রাজাধ্যক্ষ কমিটি" রিপোর্ট দেন। এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ভিত্তি করিয়া ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে মে হইতে কার্যকরী আইন অনুযায়ী (Air Corporation Act, 1953) ভারত সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থাটির রাষ্ট্রীয়করণ করেন। বলা বাহুল্য, এখন একীভূত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালনায় কিছুটা ব্যয়সঙ্কোচ সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টার-ন্যাশনাল' আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক বহু অসুবিধা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সুনাম ও ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

বর্তমানে ভারতীয় বিমান সংস্থা দুইটির মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স'-এর পরিবহন দূরত্ব ২০ হাজার মাইলের মত এবং ১৫টি দেশের ২৬টি বৃহৎ নগরের সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারী 'এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল'-এর পরিবহন দূরত্ব ২৩ হাজার ৫ শত মাইলের মত। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থায় বিমানগুলি ২ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল উড়িয়া ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার যাত্রী, ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ পাউণ্ড পণ্য এবং ১ কোটি ৩২ লক্ষ পাউণ্ড ডাক (Mails) বহন করিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক বিমান ব্যবসার ক্ষেত্রে 'এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল' ৬৭ লক্ষ ১৯ হাজার মাইল উড়িয়া ৮৮,৩১২ জন যাত্রী, ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড পণ্য এবং ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড ডাক বহন করিয়াছে। এই বৎসর ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বিমানগুলি ১ কোটি ৮৩ লক্ষ মাইল উড়িয়া ৫,৯৯,৫৭৩ জন যাত্রী বহন করিয়াছে।

ভারত আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (International Civil Aviation Organisation) অন্যতম সদস্য।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(India's Second Five-Year Plan)

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল সুরু হইয়া ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ শেষ হইয়াছে। অতঃপর সুরু হইয়াছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ইহার মেয়াদ ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। তারপর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল আরম্ভ হইবে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বিদেশী শাসনের অবসান ঘটার পর ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য কর্তৃপক্ষ সচেতন হইয়া উঠেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে মূল্যহীন, একথা দেশবাসীও উপলব্ধি করিতে থাকেন। শ্রীজওহরলাল নেহেরুর প্রধান মন্ত্রিত্বে পরিচালিত ভারত-সরকার ভারতের পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। পরিকল্পনা কমিশন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সহিত যোগাযোগ করিয়া এবং দেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজখবর লইয়া ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা রচনার সময় তাঁহারা ইতিপূর্বে রচিত বিভিন্ন পরিকল্পনার সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন।* ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু লোকসভায় এই যুগান্তকারী পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করেন। ইতিপূর্বে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই পরিকল্পনার যে খসড়া প্রকাশিত হয়, তাহাতে পরিকল্পনাটিকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছিল (১,৪৯২ কোটি ৯২ লক্ষ+৩০০ কোটি টাকা)। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক উপস্থাপিত পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ

---

* ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (National Planning Committee) রিপোর্ট (১৯৩৮), যুদ্ধের মধ্যে জে আর ডি টাটা, জি ডি বিড়লা, স্যার শ্রীরাম, ডাঃ জন মাথাই প্রমুখ আটজন অগ্রগণ্য ভারতীয় শিল্পপতি রচিত বোম্বাই পরিকল্পনা (Bombay Plan), শ্রী এস. এন অগ্রবালের গান্ধী পরিকল্পনা (Gandhian Plan), শ্রী এম. এন. রায়ের পরিকল্পিত জনগণের পরিকল্পনা (People's Plan), স্যার এম্‌ বিশ্বেশ্বরায়া রচিত যুদ্ধোত্তর ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনা (Reconstruction in Post-war India), কেন্দ্রীয় পুনর্গঠন মন্ত্রী স্যার আর্দেশির দালালের দপ্তরের (Planning and Development Department) বিভিন্ন শিল্প-সম্পর্কিত রিপোর্ট, বিভিন্নপ্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষের নিজ নিজ এলাকা সম্পর্কিত রিপোর্ট।

টাকা। পরে কার্যকালে অবশ্য আরও কিছু বেশি বরাদ্দের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ দাঁড়ায় ২,৩৫৬ কোটি টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত ২০১৩ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নানা খাতে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং কোন খাতে কিভাবে অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা পরে দেখানো হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই পরিকল্পনা কালে (১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্য হইয়াছে নিম্নরূপ :—

জাতীয় আয়বৃদ্ধি শতকরা ১৮·৪ ভাগ (১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৮৮৫০ কোটি হইতে ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০৪৮০ কোটি); মাথাপিছু বার্ষিক আয়বৃদ্ধি শতকরা ৮ ভাগ (২৪৬ টাকা হইতে ২৭৪ টাকা); খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ১ কোটি ৯ লক্ষ টন (৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন হইতে ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টন); তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি ১০ লক্ষ ৩০ হাজার গাঁইট (২৯ লক্ষ ৭০ হাজার গাঁইট হইতে ৪০ লক্ষ গাঁইট); শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি শতকরা ৩৭·৬ ভাগ, সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি—১ কোটি ৬০ লক্ষ একর (ছোটখাট পরিকল্পনায় উপকৃত ১ কোটি একর সহ)।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তথ্যসংগ্রহ ও খসড়া রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্য-সরকারকে জেলা ও গ্রামের ভিত্তিতে কৃষি, গ্রাম্যশিল্প এবং সমবায় ব্যবস্থার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করিয়া স্ব স্ব এলাকার জন্য পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ দেন। এই সময় সর্বভারতীয় ও সমগ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ চালাইতে থাকেন। এই বৎসরের শেষদিকে তাঁহাদের সহিত ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদের (Indian Statistical Institute) যোগাযোগ ঘটে এবং পরিষদ হইতে ভারতীয় অর্থনৈতিক তথ্যাদির উপর অনেক হিসাবপত্র প্রস্তুত হয়। বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদের এই হিসাবপত্র এবং কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর (Central Statistical Organisation) ও অর্থবিষয়ক মন্ত্রিদপ্তরের অর্থনৈতিক সংস্থার (Economic Division of the Ministry of Finance) হিসাবপত্র মিলাইয়া ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি খসড়া রচনা করেন (Draft Recommendations for the Formulation of the Second Five Year Plan)। কেন্দ্রীয় অর্থ বিষয়ক মন্ত্রিদপ্তরের অর্থনৈতিক সংস্থা এবং পরিকল্পনা কমিশনও উক্ত হিসাবাদির সাহায্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি খসড়া রচনা করিয়াছিলেন। এইসব খসড়া ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদ মণ্ডলীর (Panel of Economists) দ্বারা এবং ঐ বৎসরের মে মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) দ্বারা বিবেচিত হয়। দেশবাসীর বিবেচনা ও অভিমতের জন্য ইহাদের অধিকাংশই ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে হইতে আগস্ট মাসের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময় পুনরায় পরিকল্পনা কমিশন, বিভিন্ন রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে আলোচনা চলে। অবশেষে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই আলোচনা অন্তে যে খসড়া রচিত হইয়াছিল, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ও পার্লামেণ্ট সদস্যদের পরামর্শদাতা কমিটি (Consultative Committee of Members of Paliament) ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাহা অনুমোদন করেন। এইভাবে বিশদ ও ব্যাপক আলোচনার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচ্য কার্যকরী রূপ রচিত হইয়াছে।

আলোচ্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী সূত্রে ৪,৮০০ কোটি টাকা খরচ হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।* প্রথম পরিকল্পনার (সর্বশেষ বরাদ্দ ২৩৫৬ কোটি টাকা) তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক ব্যাপকভাবে রচিত হইয়াছে। মৌলিক শিল্পের (Basic Industries) ও রেলপথ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অধিকতর ব্যয় এই বরাদ্দ বৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী হিসাবে বিভিন্ন খাতে আরও ২,৪০০ কোটি টাকা লগ্নী হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। উক্ত দুইটি পরিকল্পনায় সরকারী হিসাবের প্রধান প্রধান খাতের ব্যয়বরাদ্দ পরবর্তী পৃষ্ঠায় তুলনামূলকভাবে সন্নিবিষ্ট হইল :—

* ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মে এবং নভেম্বর মাসে পরিকল্পনা পরিচালক জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দ দুইভাগে ভাগ করিয়া 'ক' ভাগে ৪,৫০০ কোটি টাকা এবং সম্ভবপর হইলে 'খ' ভাগে ৩০০ কোটি টাকা ধরেন। অবশ্য পরিকল্পনার কার্যকরী করণে ব্যয়বৃদ্ধির জন্য শেষ পর্যন্ত 'ক' ভাগেই ৪,৬৫০ কোটি টাকা খরচ হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছেন।

কোটি টাকায় *

	প্রথম পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পরিকল্পনা	
	মোট বরাদ্দ	শতকরা অংশ	মোট বরাদ্দ	শতকরা অংশ
১। **কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন**	৩৫৭	১৫·১	৫৬৮	১১·৮
(ক) কৃষি	২৪১	১০·২	৩৪১	৭·১
(খ) জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা	৯০	৩·৮	২০০	৪·১
(গ) স্থানীয় উন্নয়ন, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতি	২৬	১·১	২৭	০·৬
২। **সেচ ও শক্তিসম্পদ**	৬৬১	২৮·১	৯১৩	১৯·০
(ক) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৪০১	১৭·০	৪৮৬	১০·১
(খ) শক্তি সম্পদ	২৬০	১১·১	৪২৭	৮·৯
৩। **শিল্প ও খনি**	১৭৯	৭·৬	৮৯০	১৮·৫
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১৪৮	৬·৩	৬১৭	১২·৯
(খ) খনিজ উন্নয়ন	১	...	৭৩	১২·৫
(গ) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩০	১·৩	২০০	৪·১
৪। **পরিবহন ও যোগাযোগ**	৫৫৭	২৩·৬	১,৩৮৫	২৮·৯
(ক) রেলপথ	২৬৮	১১·৪	৯০০	১৮·৮
(খ) রাস্তা	১৩০	৫·৫	২৪৬	৫·১
(গ) পরিবহন ব্যবস্থা	১২	০·৫	১৭	০·৪
(ঘ) জাহাজ, বন্দর ও অন্তর্দেশীয় নৌচলাচল	৬০	২·৫	৯৬	২·০
(ঙ) অসামরিক বিমান চলাচল	২৪	১·০	৪৩	০·৯
(চ) অন্যান্য যোগাযোগ ও পরিবহন	৮	০·৩	১১	০·২
(ছ) ডাক, তার ও বেতার	৫৫	২·৪	৭২	৫·১

* সংশোধিত হিসাবে নিম্নলিখিতভাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'ক' অংশে (Part A) ৪,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে :—

কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন—৫১০, সেচ ও শক্তি সম্পদ—৮২০, গ্রাম্য ও কুটির শিল্প—১৬০, শিল্প ও খনিজ—৭৯০, পরিবহন ও যোগাযোগ—১৩৪০, সমাজ সেবা—৮১০ এবং বিবিধ—৭০; মোট—৪৫০০ কোটি টাকা।

	প্রথম পরিকল্পনা মোট বরাদ্দ	শতকরা অংশ	দ্বিতীয় পরিকল্পনা মোট বরাদ্দ	শতকরা অংশ
৫। **সমাজসেবা**	৫৩৩	২২.৬	৯৪৫	১৯.৭
(ক) শিক্ষা	১৬৪	৭.০	৩০৭	৬.৪
(খ) স্বাস্থ্য	১৪০	৫.৯	২৭৪	৫.৭
(গ) শ্রমিক ও শ্রমিককল্যাণ	৭	০.৩	২৯	০.৬
(ঘ) অনুন্নত উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ	৩৭	১.৫	১২০	২.৫
(ঙ) গৃহনির্মাণ	৪৯	২.১	১২০	২.৫
(চ) পুনর্বাসন	১৩৬	৫.৮	৯০	১.৯
(ছ) শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান	—	—	৫	০.১
৬। বিবিধ	৬৯	৩.০	৯৯	২.১
মোট	২,৩৫৬	১০০	৪,৮০০	১০০

এই গেল পরিকল্পনার সরকারী হিসাবের দিক। এছাড়া বেসরকারী হিসাবে ২,৪০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। বেসরকারী প্রধান প্রধান খাত নিম্নে দেওয়া ইইল :—

সংগঠিত শিল্প ও খনিজ—	৫৭৫ কোটি টাকা
বাগিচা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও রেলপথ বাদে অন্যান্য—	১২৫ কোটি টাকা
কৃষি এবং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প—	৩০০ কোটি টাকা
গৃহনির্মাণ (গৃহ, দোকান, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি)	১,০০০ কোটি টাকা
মজুত হিসাবে	৪০০ কোটি টাকা
মোট	২,৪০০ কোটি টাকা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী হিসাবে যে ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত ভাবে সংগৃহীত হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন :—

১।	**রাজস্বের উদ্বৃত্ত**	৮০০ কোটি টাকা
(ক)	চলতি (১৯৫৫-৫৬) করহারে	৩৫০ কোটি টাকা
(খ)	অতিরিক্ত করসংস্থাপন	৪৫০ কোটি টাকা
২।	**জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণসংগ্রহ**—	১,২০০ কোটি টাকা
(ক)	বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহ	৭০০ কোটি টাকা
(খ)	স্বল্প সঞ্চয়	৫০০ কোটি টাকা
৩।	**বাজেটের অন্যান্য সূত্র হইতে**	৪০০ কোটি টাকা
(ক)	উন্নয়ন খাতে রেলবিভাগের সাহায্য	১৫০ কোটি টাকা
(খ)	প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য জমা	২৫০ কোটি টাকা
৪।	**বৈদেশিক সূত্র হইতে**	৮০০ কোটি টাকা
৫।	**ঘাটতি ব্যয়**	১,২০০ কোটি টাকা
৬।	**সংগ্রহের সূত্র স্থির হয় নাই**	৪০০ কোটি টাকা
	মোট	৪,৮০০ কোটি টাকা*

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা ১৮.৪ ভাগ এবং মাথা পিছু বার্ষিক আয় শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ হিসাবে, আগেই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস নাগাদ ভারতের জাতীয় আয় ও ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ ও শতকরা ১৮ ভাগ আয় বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৩,৪৮০ কোটি টাকা ও ৩৩১ টাকায় দাঁড়াইবে। বিভিন্ন খাতে জাতীয় আয় নিম্নোক্তরূপে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে :—

* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় নিম্নরূপ (কোটি টাকায়) :—কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন—২৯৯, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি—৫৮৫, শিল্প ও খনি—১০০, পরিবহন ও যোগাযোগ—৫৩২, সমাজ সেবা—৪২৩, বিবিধ—৭৪ ; মোট—২০১৩।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ হইয়াছে নিম্নরূপ (কোটি টাকায়) :—কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন—৫৬৮, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি—৮৬০, গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রশিল্প—২০০, শিল্প ও খনিজ—৮৮০, যোগাযোগ ও পরিবহন—১৩৪৫, সমাজ সেবা—৮৬৩, বিবিধ—৮৪ ; মোট—৪৮০০।

১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের দরে কোটি টাকার হিসাবে

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
কৃষি ও সংশ্লিষ্ট উপজীবিকা	৪৪৫০	৫২৩০	৬১৭০
খনি	৮০	৯৫	১৫০
কলকারখানা (বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প)	৫৯০	৮৪০	১৩৮০
ক্ষুদ্র শিল্প	৭৪০	৮৪০	১০৮৫
নির্মাণকার্য	১৮০	২২০	২৯৫
বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ	১৬৫০	১৮৭৫	২৩০০
সরকারী শাসনবিভাগসহ চাকুরী ও বৃত্তি	১৪২০	১৭০০	২১০০
মোট *	৯,১১০	১০,৮০০	১৩,৪৮০

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক উন্নয়ন কি পরিমাণে আশা করা হইয়াছে, তাহার একটি তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। এই হিসাব হইতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুমান করা যাইবে :—

	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধির শতকরা হার
১। কৃষি				
খাদ্যশস্য (লক্ষ টন)†	৫৪০	৬৫০	৭৫০	১৫
তুলা (লক্ষ গাঁইট)	২৯	৪২	৫৫	৩১

* পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি নির্ণায়ক বিভিন্ন খাতে নিম্নরূপ উন্নতি ঘটিবে :—

১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মূল্যহারে কোটি টাকার হিসাবে

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
মোট নীট লগ্নী	৪৪৮	৭৯০	১,৪৪০
গৃহস্থালী হইতে নীট সঞ্চয়	৪৫৫	৭৫৬	১,৩১০
ভোগ্যপণ্যের খরচ	৮,৬৫৫	১০,০৪৪	১২,১৭০
জাতীয় আয় হিসাবে লগ্নীর শতকরা হার	৪'৯৪	৭'৩১	১,০'৬৮
জাতীয় আয় হইতে গৃহস্থালী হইতে সঞ্চয়ের (Domestic Savings) শতকরা হার	৪'৯৮	৭'০০	৯'৭

† এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সংশোধিত হিসাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্য ৮ কোটি ৫ লক্ষ টন, তুলা ৬৫ লক্ষ গাঁইট, পাট ৫৫ লক্ষ গাঁইট, গুড় ৭৮ লক্ষ টন এবং তৈলবীজ ২৭ লক্ষ টন উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধির শতকরা হার
ইক্ষু (গুড়, লক্ষ টন হিসাবে)	৫৬	৫৮	৭১	২২
তৈলবীজ (লক্ষ টন)	৫১	৫৫	৭০	২৭
পাট (লক্ষ গাঁইট)	৩৩	৪০	৫০	২৫
চা (লক্ষ পাউণ্ড)	৬,১৩০	৬,৪৪০	৭,০০০	৯
জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক	—	৫০০	৩,৮০০	৬৬০
সমাজ উন্নয়ন ব্লক	—	৬২২	১,১২০	৮০
জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন কার্যস্থচীতে উপকৃত লক্ষ লোক হিসাবে	—	৮০০	৩,২৫০	৩০৬
গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ (হাজার)	৮৩	১১৮	২০০	৭০
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি				
সেচসুবিধাপ্রাপ্ত জমি (লক্ষ একর)	৫১০	৬৭০	৮৮০	৩১
বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা (লক্ষ কিলোওয়াট)	২৩	৩৪	৬৯	১০৩
৩। খনিজ				
আকরিক লৌহ (লক্ষ টন)	৩০	৪৩	১২৫	১৯১
কয়লা (লক্ষ টন)	৩২৩	৩৮০	৬০০	৫৮
৪। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প				
ইস্পাত (লক্ষ টন)	১১	১৩	৪৩	২৩১
ঢালাই লৌহ (কারখানার জন্য) —লক্ষ টন	—	৩.৮	৭.৫	৯৭
এ্যালুমিনিয়াম (হাজার টন)	৩.৭	৭.৫	২৫.০	২৩৩
কাপড় ও পাটকলের যন্ত্রপাতি (লক্ষ টাকা মূল্যের হিসাবে)	(হিসাব হয় নাই)	৪১২	১৯৫০	৩৭৩

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধির শতকরা হার
চিনির কলের যন্ত্রপাতি „	„	২৮	২৫০	৭৭৯
সিমেণ্ট শিল্পের যন্ত্রপাতি „	„	৫৬	২০০	২৫৭
কাগজ শিল্পের যন্ত্রপাতি „	সামান্য	সামান্য	৪০০	—
ডিজেল ইঞ্জিন (হাজার অশ্বশক্তি)—		১০০	২০৫	১০৫
মোটর গাড়ী	১৬,৫০০	২৫,০০০	৫৭,০০০	১২৮
রেলইঞ্জিন	৩	১৭৫	৪০০	১২৯
ট্রাক্টর	—	—	৩০০০	—
সিমেণ্ট (লক্ষ টন)	২৭	৪৩	১৩০	২০২
তৈল শোধনাগার—পেট্রোল পরিশোধন (লক্ষ টন)	—	৩৬	৪৩	১৯
ইলেক্ট্রিক মোটর (হাজার অশ্বশক্তি)	৯৯	২৪০	৬০০	১৫০
তুলাজাত বস্ত্র (লক্ষ গজ)	৪৬,১৮০	৬৮,৫০০	৮৫,০০০	২৪
কাগজ ও বোর্ড (হাজার টন)	১১৪	২০০	৩৫০	৭৫
চিনি (লক্ষ টন)	১১	১৭	২৩	৩৫
সাইকেল (হাজার)	১০১	৫৫০	১০০০	৮২
সেলাইকল (হাজার)	৩৩	১১০	২২০	১০০
বৈদ্যুতিক পাখা (হাজার)	১৯৪	২৭৫	৬০০	১১৮
বৈদ্যুতিক তার (টন)	১,৪২০	৯,০০০	১৮,০০০	১০০
রাসায়নিক সার (হাজার টন)—				
এ্যামোনিয়াম সালফেট	৪৬	৩৮০	১,৪৫০	২৮২
সুপার ফসফেট	৫৫	১২০	৭২০	৫০০
সালফিউরিক এ্যাসিড	৯৯	১৭০	৪৭০	১৭৬
সোডা (Soda Ash)	৪৫	৮০	২৩০	১৮৮
কষ্টিক সোডা	১১	৩৬	১৫০	৩১৭

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধির শতকরা হার
৫। পরিবহন ও যোগাযোগ				
রেলপথ (লক্ষ যাত্রী-মাইল)	৯৫০	১,০৮০	১,২৪০	১৫
ঐ (লক্ষ টন পণ্যবহন)	৯১০	১,২০০	১,৬২০	৩৫
জাতীয় রাজপথ (হাজার মাইল)	১২.৩	১২.৯	১৩.৮	৭
পাকা রাস্তা (হাজার মাইল)	৯৭	১০৭	১২৫	১৭
উপকূল জাহাজী ব্যবসা (লক্ষ টন)	২.২	৩.২	৪.৩	৩৪
বহিঃসামুদ্রিক জাহাজী ব্যবসা (লক্ষ টন)	১.৭	২.৮	৪.৭	৬৮
বন্দর (পণ্য চলাচল লক্ষ টন)	২০০	২৫০	৩২৫	৫০
ডাকঘর (হাজার)	৩৬	৫৫	৭৫	৩৬
তার ঘর („)	৩.৬	৪.৯	৬.৩	২৮
টেলিফোন („)	১৬৮	২৭০	৪৫০	৬৭
৬। শিক্ষা				
প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় (লক্ষ)	২.২৩	২.৯৩	৩.৫০	১৯
প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রী (৬-১১ বৎসর) সমবয়সের বালক বালিকাদের শতকরা হার	৪২	৫১	৬৩	—

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রী (১১-১৪) সমবয়সের বালক-বালিকার শতকরা হার	১৪	১৯	২২'৫	—
উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী (১৪-১৭) সমবয়সের বালক-বালিকার শতকরা হার	৬'৪	৯'৪	১২'০	—
শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়	৮৩৫	১,১৩৬	১,৪১২	২৪
ঐ বিদ্যার্থী সংখ্যা (হাজার)	৭৫'৬	১০৩'৫	১৩৪'২	৩০

৭। **স্বাস্থ্য**

চিকিৎসা সম্পর্কিত বিদ্যালয় (হাজার)	৮'৬	১০	১২'৬	২৬
হাসপাতালের শয্যা (হাজার)	১১৩	১২৫	১৫৫	২৪
ডাক্তার (হাজার)	৫৯	৭০	৮২'৫	১৮
নার্স (হাজার)	১৭	২২	৩১	৪১
ধাত্রী (হাজার)	১৮	২৬	৩২	২৩
স্বাস্থ্যসহকারী ও স্যানিটারী ইনস্‌পেক্টর (হাজার)	৩'৫	৪	৭	৭৫

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন কার্যপরিচালনার অভিজ্ঞতার ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্বভাবতঃই লক্ষ্যের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাবে এই পরিকল্পনার শিল্পমুখিতা তথা উৎপাদনী ব্যবস্থার ধারা পরিবর্তনের আগ্রহ দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা পীড়িত ভারতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে ফলপ্রদ হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। জাতীয় আয় যথাসম্ভব বাড়াইয়া দেশবাসীর জীবন-যাত্রার মানবৃদ্ধি, প্রধানতঃ মৌলিক ও ভারী শিল্পের উপর জোর দিয়া দ্রুত শিল্পপ্রসার, যথাসম্ভব কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং আয়ের ও সম্পদের

অসাম্য হ্রাস করিয়া অর্থনৈতিক সমবণ্টনের যথাসম্ভব ব্যবস্থা,—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এইগুলিই প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারও লক্ষ্যরূপে ঘোষিত হইয়াছিল। * বলা বাহুল্য, উৎপাদনী ব্যবস্থার যে ধারা পরিবর্তন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সূচিত হইতেছে, তাহার পূর্ণ সুযোগের জন্য তৃতীয় বা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে। † এ দিক হইতে ভারতের অবস্থা ক্রমশঃ কি ভাবে উন্নত হইবে পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব হইতেই ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মূল্যহারে তাহা নিম্নে দেখানো হইল :—

বিষয়	প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)	চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৬ ৭১)	পঞ্চম পরিকল্পনা (১৯৭১-৭৬)
১। পরিকল্পনার মেয়াদ অন্তে জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	১০,৮০০	১৩,৪৮০	১৭,২৬০	২১,৬৮০	২৭,২৭০
২। মোট মূলধন বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	৩,১০০	৬,২০০	৯,৯০০	১৪,৮০০	২০,৭০০
৩। পরিকল্পনার মেয়াদ অন্তে জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে লগ্নীর পরিমাণ	৭·৩	১০·৭	১৩·৭	১৬.০	১৭·০

* The central objective of planning in India is to raise the standard of living of the people and to open out to them opportunities for a richer and more varied life. It must, therefore, aim both at utilising more effectively the available resources, human and material, so as to obtain from them a larger output of goods and services and also at reducing inequalities of income, wealth and opportunity.

† The principal objective of the second five year plan is to secure a more rapid growth of national economy and to increase a country's productive potential in a way that will make possible accelerated development in the succeeding plan periods. Immediate needs have to be met, but it is essential to think in terms of the more long range dividends that a big and bold programme of development has to offer . . . . The second five year plan has to increase the flow of goods and services available and also to carry forward the process of institutional change.

৪। পরিকল্পনার মেয়াদ অন্তে জনসংখ্যা (কোটিতে)	৩৮·৪	৪০·৮	৪৩·৪	৪৬·৫	৫০·০
৫। পরিকল্পনার মেয়াদ অন্তে মাথাপিছু বার্ষিক আয় (টাকায়)	২৮১	৩৩১	৩৯৬	৪৬৬	৫৪৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়—সরকারী খাতে ৪,৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে ধরা হয় ২,৫৫৯ কোটি টাকা এবং বাকীটা হয় রাজ্যসরকার সমূহের হিসাবে। এই ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

কোটি টাকার হিসাবে

বিষয়	কেন্দ্রীয় সরকার	'ক' শ্রেণী রাজ্যসমূহ	'খ' শ্রেণী রাজ্যসমূহ	'গ' শ্রেণী রাজ্যসমূহ	মোট
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	৬৫	৩৫৯	১১২	৩১	৫৬৮
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১০৫	৫৬৭	২২৭	২৪	৯১৩
শিল্প ও খনি	৭৪৭	৯৯	৩৭	৭	৮৯০
পরিবহন ও যোগাযোগ	১২০৩	১২০	৪১	২১	১৩৮৫
সমাজ সেবা	৩৯৬	৩৯৩	১১৭	৩৯	৯৪৫
বিবিধ	৪৩	৪২	১১	৩	৯৯
মোট—	২,৫৫৯	১,৫৮০	৫৩৫	১২৫	৪,৮০০

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, পরিকল্পনার সরকারী হিসাবে যে ৪৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩,৮০০ কোটি টাকা লগ্নীর হিসাবে বা ফলপ্রসূ সম্পদের হিসাবে ধরা হইবে, বাকী ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে পূর্ব হইতে চলতি উন্নয়ন পরিকল্পনার হিসাবে। সরকারী খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে বিভিন্ন রাজ্যে নিম্নরূপ অর্থবরাদ্দ হইয়াছে :—

(কোটি টাকায়)—অন্ধ্র—১১৯·০, আসাম—৫৭·৯, বিহার—১৯৪·২, বোম্বাই—২৬৬·২, মধ্যপ্রদেশ—১২৩·৭, মাদ্রাজ—১৭৩·১, উড়িষ্যা—১০০·০, পাঞ্জাব—১২৬·৩, উত্তরপ্রদেশ—২৫৩·১, পশ্চিমবঙ্গ—১৫৩·৭, হায়দরাবাদ—

১০০'২, মধ্যভারত—৬৭'৩, মহীশূর—৮০'৬, পেপসু—৩৬'৩, রাজস্থান—৯৭'৪, সৌরাষ্ট্র—৪৭'৭, কেরালা (ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন)—৭২'০, জম্মু ও কাশ্মীর—৩৩'৯, 'গ' শ্রেণীর রাজ্যসমূহ—১০৫'২ (ভুপাল—১৪'৩, হিমাচল প্রদেশ—১৪'৭, দিল্লী—১৭, মণিপুর—৬'২, ত্রিপুরা—৮'৫, বিন্ধ্যপ্রদেশ—২৪ ৯), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—৫'৯, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি—৯'৫, পণ্ডিচেরী—৪'৮।

পরিকল্পনার আমলে কর্মসংস্থান

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিলেন। অন্তর্বর্তী কালে কিছু কিছু কর্মসংস্থানমূলক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াইয়াও (২০৬৯ কোটি টাকা হইতে ২৩৫৬ কোটি টাকা), প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান আশানুরূপ হয় নাই। সরকারী হিসাবে এই পরিকল্পনার আমলে (১৯৫১-৫৬) কাজ জুটিয়াছে মাত্র ৪৫ লক্ষ লোকের। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও সামান্য কিছু লোক হয়তো কাজ পাইয়া থাকিবে। আগেকার বেকার ছাড়া ভারতে বৎসরে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোক কাজ করিবার মত অবস্থায় বা বয়সে পৌঁছায়, কাজেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান নিঃসন্দেহে হতাশাজনক।

পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। এই সংখ্যা দেশের প্রকৃত বেকারের তুলনায় অনেক কম বলিয়াই মনে হয়। ইহার উপর ভারতে প্রযোজনের তুলনায় উপার্জন অনেক কম এমন অসংখ্য অর্ধবেকার আছে।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে যে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান প্রয়োজন, তাহারা গ্রামে ও শহরে ছড়াইয়া আছে। (পুরাতন বেকার—শহরে ২৫ লক্ষ+গ্রামে ২৮ লক্ষ=৫৩ লক্ষ; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে কর্মপ্রার্থী—শহরে ৩৮ লক্ষ+গ্রামে ৬২ লক্ষ=১ কোটি; মোট—১ কোটি ৫৩ লক্ষ)। পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে নিম্নলিখিতভাবে কর্মসংস্থান আশা করেন:—নির্মাণকার্য (construction)—২১ লক্ষ (কৃষি ও সম্যাজ উন্নয়ন ২'৬৬ লক্ষ, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি—৩'৭২ লক্ষ, শিল্প ও খনি—৪'০৩ লক্ষ, রেলপথ

সহ পরিবহন—১'২৭, সমাজ সেবা—৬'১৮ লক্ষ, সরকারী চাকুরীসহ বিবিধ—২'৩৪ লক্ষ); সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি—৫১ হাজার; রেলপথ—২ লক্ষ ৫৩ হাজার; অন্যান্য যোগাযোগ ও পরিবহন—১ লক্ষ ৮০ হাজার; শিল্প ও খনি—৭ লক্ষ ৫০ হাজার; বন, মৎস্য ও জাতীয় সম্প্রসারণ—৪ লক্ষ ১৩ হাজার; গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—৪ লক্ষ ৫০ হাজার; শিক্ষা—৩ লক্ষ ১০ হাজার; স্বাস্থ্য—১ লক্ষ ১৬ হাজার; অন্যান্য সমাজ সেবা—১ লক্ষ ৪২ হাজার; সরকারী চাকুরী—৪ লক্ষ ৩৪ হাজার; ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি—২৭ লক্ষ ৪ হাজার। এই মোটামুটি ৮০ লক্ষ ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী উন্নত ধরণের কৃষিকার্য, সেচ সুবিধা ইত্যাদির জন্য কৃষিবিভাগে উন্নতি দেখা দেওয়ায় কৃষির হিসাবে আরও ১৬ লক্ষ লোকের কাজ জুটিবে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তভাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৫৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল; বিহারের পুরুলিয়া সমেত যে অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, তাহার হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন ৪ কোটি টাকার পরিকল্পনা বিহার হইতে কাটিয়া পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল ৭২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে কৃষি ও পল্লীউন্নয়ন খাতে ৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, সেচ ও শক্তি উৎপাদন খাতে—১৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, শিল্প খাতে—১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে—১৫ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সহ সমাজসেবা খাতে—৩১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের হিসাবে দেখানো হয় যে, পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে এই রাজ্যে চাউল উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টনের স্থলে ৪০ লক্ষ টনে উঠিয়াছিল এবং মোট জমির হিসাবে সেচসুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ শতকরা ১৪'৮ ভাগের স্থলে ৩১'৭ ভাগে উঠিয়াছিল। আশা করা হইয়াছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ইহা শতকরা ৪৬'৬ ভাগে উঠিবে। কর্ম সংস্থানের হিসাবে দেখা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা কালে এই রাজ্যে ৩ লক্ষ লোকের কাজ জুটিয়াছে, আশা করা হইয়াছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার লোকের পূর্ণ সময়ের কাজ জুটিবে এবং সমগ্রভাবে কর্মসংস্থানে উন্নতি হইবে।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দের হিসাব সন্নিবিষ্ট হইল :—

১। **কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন**	৩৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা
কৃষি	১৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা
জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা
২। **সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি**	৩০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
সেচ-ব্যবস্থা	১৭ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা
বৈদ্যুতিক শক্তি	১২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা
৩। **শিল্প**	৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা
বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প	৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা
৪। **পরিবহন ও যোগাযোগ**	১৯ কোটি ৩ লক্ষ টাকা
রাস্তা	১৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
রাজপথ পরিবহন	১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা
৫। **সমাজ সেবা**	৫২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা
শিক্ষা	২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
স্বাস্থ্য	১৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা
গৃহ নির্মাণ	৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন	১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা
সমাজ কল্যাণ	— ৩৭ লক্ষ টাকা
শ্রমিক ও শ্রমিক কল্যাণ	১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
৬। **বিবিধ** (বিহার হইতে প্রাপ্ত অংশের পরিকল্পনা বরাদ্দ সহ)	১৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা
মোট	১৫৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা

উপসংহার

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষিকেন্দ্রিক ও গ্রামকেন্দ্রিক করিয়া রচিত হইয়াছিল, খাদ্যে অসচ্ছলতা ও গ্রাম্য-জীবনের দুর্দশা যথাসম্ভব বিদূরণের যুক্তিই ছিল এই নীতির ভিত্তি। আলোচ্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ করিয়া মৌলিক শিল্পের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক জগতে কোন দেশকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইলে শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অত্যাবশ্যক। মৌলিক শিল্পের প্রসার এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার অনুপূরক। সমগ্রভাবে শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের নীতি ভারতে শাসন কর্তৃপক্ষ এখন একরূপ পরিত্যাগই করিয়াছেন, অভাবগ্রস্ত দেশে উৎপাদন বৃদ্ধিই তাঁহাদের এখন মূল লক্ষ্য। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঘোষিত শিল্পনীতি এতদুদ্দেশ্যে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংশোধিত হইয়াছে। অবশ্য জাতীয় রক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি সরকারী পরিচালনায় অথবা সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আবাদী কংগ্রেস (জানুয়ারী, ১৯৫৫) গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ভারতের কংগ্রেসী শাসনকর্তৃপক্ষ দেশকে সমাজতান্ত্রিক রূপ দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়ার দিকে ভারতের পরিকল্পনা সচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই পরিকল্পনা গান্ধীজীর সর্বোদয় পরিকল্পনার আদর্শে রচিত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনাকালে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়ণের দিক হইতে প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যসম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।*

আগেই বলা হইয়াছে, জাতীয় আয়বৃদ্ধি, জনগণের জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পপ্রসার, কর্ম-সংস্থানবৃদ্ধি, ধনবণ্টনে অসমতাহ্রাস,—এইগুলিই প্রধানতঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্য কার্যকরী হইলে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতি অবশ্যই অনেকটা হ্রাস পাইবে। তবে সরকারী মহল উল্লসিত হইলেও (স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গত

* It (first plan) has laid foundation for achieving the socialist pattern of society—an economic social order, based upon the values of freedom and democracy, without caste, class and privilege, in which there will be substantial rise in employment and production and the largest measure of social justice attainable. (Second Five Year Plan—Introduction, P. 1).

২৫।৫।৫৬ তারিখে রাজ্যসভায় বলিয়াছেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রথমবার আমাদের দেশে দারিদ্র্যে একটা ছেদ পড়িল, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়) দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধারণ দেশবাসী এখনও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না বলিয়া আলোচ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে তাহারা আশানুরূপ আগ্রহ দেখাইতেছে না। বেকার সমস্যার সমাধানে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতার কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাদের কাজ আছে, তাহারাও নিত্যব্যবহার্য পণ্যের বর্ধিত মূল্যের জন্য (যুদ্ধের আগের হিসাব ছাড়িয়া দেওয়া যাক্, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১৫·৭) আয় ও ব্যয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া দিন দিন দরিদ্রতর হইয়া পড়িতেছে। যেরূপ মনে হইতেছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'ক' ভাগেই ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় হইবে, 'খ' ভাগে ৩০০ কোটি টাকার ভরসা এই ঘাটতি ব্যয়। এই বিরাট পরিমাণ টাকা বাজারে আসিয়া যদি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে, তাহা হইলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা আরও বাড়িয়া যাইবে। পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রী কে. সি. নিয়োগী পর্যন্ত এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বাজারে টাকা বাড়ার সঙ্গে সমানুপাতিক সমবণ্টনের ভিত্তিতে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ করা যায় সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে কর্মসংস্থান বাড়াইবার জন্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার ঘটাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ যন্ত্রশিল্পে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে চাহিদার তুলনায় ভোগ্যপণ্যের যোগান বৃদ্ধি কঠিন হইবে সন্দেহ নাই। বেসরকারী হিসাবে ২,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন। সরকারী ব্যয়নির্বাহের জন্য দেশের লোকের হাতের টাকা যেভাবে ক্রমবর্ধমান করভার, ঋণ ও স্বল্পসঞ্চয় হিসাবে টানিয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বেসরকারী হিসাবে এত টাকা লগ্নী হওয়া দুষ্কর।* অথচ একথা না বলিলেও চলিবে যে, পণ্যোৎপাদন ও কর্মসংস্থানের হিসাবে বেসরকারী মূলধন ও প্রয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম।

* সরকারী হিসাবের ৪,৮০০ কোটি টাকার মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর সংস্থাপন দ্বারা সংগ্রহের আশা করা হইয়াছে, এছাড়া সংগ্রহ-সূত্রহীন ৪০০ কোটি টাকাও কর বসাইয়াই সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে।

পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য যে অর্থসংস্থানের আশা করিয়াছেন, কার্যক্ষেত্রে ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুমিত হিসাবে পাওয়া যাইবে না বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করেন। সরকারী বাজেট-উদ্বৃত্ত, ঋণসংগ্রহ এবং বৈদেশিক সাহায্যের খাতের টাকা অনুমান মত পাওয়া না গেলে পরিকল্পনার অপরিহার্য মৌলিক শিল্পের প্রসারের ও বড় বড় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের অপরিহার্যতার দরুণ জনস্বার্থ সম্পর্কিত অনেক পরিকল্পনা হয় স্থগিত বা বাতিল করিতে হইবে, আর না হয় কর বাড়াইয়া ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় লইয়া নোট ছাপাইয়া সেগুলি কার্যকরী করিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, উভয় ক্ষেত্রেই বিপদের সম্ভাবনা। সরকারী ক্ষেত্রের টাকার টানে বেসরকারী ক্ষেত্রে অর্থাভাবের প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলা হইয়াছে।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কার্যক্রমের গতি কিছুটা সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের দিকে গিয়াছে, একথা স্বীকার্য। তবে এই সুলক্ষণ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ দুঃখ নিরোধের আশ্বাস অবিলম্বে পাইতেছে না বলিয়া তাহারা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পথে প্রাথমিক কর্তব্য হইল বৈদেশিক লগ্নীর মুনাফা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সম্পূর্ণ-ভাবে মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ ঘটাইয়া সমস্ত চাষের জমি প্রকৃত কৃষকের মধ্যে বণ্টন করা ও দেশবাসীর সর্বোচ্চ আয় সঙ্গতভাবে বাঁধিয়া দেওয়া। শেষোক্ত উভয়ক্ষেত্রেই সরকারী সদিচ্ছা ঘোষিত হইয়াছে এবং জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে যৌথ খামার ও সেবা সমবায় নীতির প্রয়োগে এবং ভূদান আন্দোলনের সমর্থনে এইদিকে কিছুটা অগ্রগতিও সূচিত হইয়াছে। কৃষির উন্নতির প্রথম প্রয়োজন হিসাবে অধ্যাপক মহলানবিশ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভূমির পুনর্বণ্টন শেষ করিবার কথা বলিয়াছিলেন। পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ কোন সময় নির্দেশ করেন নাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক খাতে ধরা হইয়াছিল ১৫৬ কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত এই খাতে ৩৭৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। হয়তো এই জন্যই আশ্বস্ত হইয়া পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী

* প্রকৃতপক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল করিবার মত বিপুল অর্থসংগ্রহ যে অত্যন্ত কঠিন, ভারতীয়-পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা মিঃ এ পি মুনের মত লোকও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

পরিকল্পনায় বৈদেশিক খাতে ৮০০ কোটি টাকা ধরিয়াছিলেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসের মধ্যেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের হিসাবে ১০১৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক অর্থগ্রহণের দায়ও যথেষ্ট। সুদের কথা ছাড়াও এক্ষেত্রে মনে রাখিতেই হইবে যে, ভারতের শাসন-কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন ও দৃঢ়চিত্ত না হইলে বিদেশী সাহায্যের সহিত ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশী প্রভাব আসিয়া পড়াও অসম্ভব নয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে তৃতীয় কার্যকরী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে এখন ভারতে তথ্যানুসন্ধান ও জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত এসম্পর্কে যেটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যসূচী ব্যাপক হইবে এবং ইহাতে সরকারী খাতে ৯ হাজার কোটি টাকা সহ মোট ব্যয়বরাদ্দ হইবে ১২ হাজার ৫ শত কোটি টাকা। শুনা যাইতেছে এই পরিকল্পনায় যন্ত্রশিল্পে (Large Scale Industries) ২,০০০ কোটি টাকা এবং কৃষিতে ১,৫০০ কোটি টাকার মত বরাদ্দ হইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ২ কোটি ৫০ লক্ষ পূর্ণ ও আংশিক সময়ের কর্মসংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

কংগ্রেস পরিকল্পনা উপসমিতির সভাপতি শ্রী ইউ. এন. ডেবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে এক পত্রে (মে, ১৯৫৯) জানাইয়াছেন যে, 'তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি-উৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং কর্মসংস্থানের ন্যূনতম লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে হইবে।'

শ্রীডেবর এই পত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছেন :—কৃষি, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্রমাগত প্রচেষ্টা, সরকারী শিল্পোদ্যমের প্রয়াস, বেকার লোকশক্তির সংগঠন, রাষ্ট্রীয় ব্যবসা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মজুত বৃদ্ধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির তহবিলের উন্নয়ন কার্য অথবা শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কাজে ব্যবহার, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পরিকল্পনার সম্প্রসারণ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও

কর্মীদিগকে প্রদত্ত বোনাস ও লভ্যাংশের সংগঠন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, অবসর-কালীন ভাতা ও বাধ্যতামূলক জীবনবীমা পরিকল্পনা, পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়ের জন্য আগাম অর্থ দাদন বন্ধ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্ক-সমূহের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ

(Community Development and National Extension Service in the Second Five Year Plan)

সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা মূলতঃ গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা। নিজেদের অভাব উপলব্ধি করিয়া গ্রামবাসিগণ সরকারী প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিবেন এবং স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে বিশেষ করিয়া অভাবগ্রস্ত (under-privileged) পরিবারগুলির উন্নয়ন সহ গ্রাম্যজীবনের লক্ষণীয় উন্নতি ঘটাইবেন,—ইহাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। গ্রামবহুল ভারতে এই পরিকল্পনার গুরুত্ব যথেষ্ট। পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন যে, এই পরিকল্পনার কার্যকরিতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং পুরাতন অভাব পূরণের সহিত নূতন অভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাও পূরণের ব্যবস্থা হইবে।* সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার প্রধান কাজ হইল কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত ব্যবস্থার, সমবায় নীতির ও ভূমিপ্রথার, গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের, গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যুতিকীকরণের, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি সমাজ-সেবামূলক কাজের এবং অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নের চেষ্টা করা।

সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনাকে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট অবদান আছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন অধিনায়ক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান পশ্চাৎপদ দেশসমূহে কারিগরি সাহায্যদানের জন্য এক সাহায্য পরিকল্পনা (Point Four Aid Programme) ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বেই মার্কিন সাহায্যে এটোয়া, ফরিদাবাদ, নীলখেরী প্রভৃতি স্থানে

---

* সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন :—

"Self-help and Co-operation are the principles on which the movement rests . . . . Once the impulse has been given and the first stages of the journey covered, a programme such as that of community development and national extension grows out of its own experience and momentum. As it expands, it meets old needs and creates new ones."

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রামোন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছিল। ভারতসরকার উৎসাহিত হইয়া সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল (Special Development Fund) গঠন করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেষ্টার বোলস্ ভারতে মার্কিন কারিগরি সাহায্য সম্পর্কিত এক চুক্তি (Indo-U. S. Technical Co-operation Agreement) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির সুবিধাও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যকরিতায় সাহায্য করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় মার্কিন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সাহায্যও উল্লেখযোগ্য।

সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার প্রতিটি কর্মকেন্দ্রে গড়ে ১০০টি গ্রাম (পরিধি ১৫০ হইতে ১৭০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬০ হইতে ৭০ হাজার) পড়ে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন) হইতে ভারতে এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার মূল সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার তুলনায় অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরণের গ্রামোন্নয়ন কার্যসূচী সম্বলিত জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার (National Extension Service) প্রবর্তন করেন। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমগ্র ভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে মোট ১,২০০ ব্লকে ১,২৩,০০০ গ্রামে প্রায় ৮ কোটি লোক এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে কর্মকেন্দ্রসমূহে ১৪ হাজার নূতন বিদ্যালয় ও ৩৫ হাজার বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (শিক্ষার্থীসংখ্যা ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার) স্থাপিত হইয়াছে এবং ৫,১৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। পরিকল্পনাকালে গ্রামাঞ্চলে ৮০ হাজারটি শৌচাগার নির্মিত হইয়াছে এবং ৪,০৬৯ মাইল পাকা রাস্তা ও ২৮ হাজার মাইল কাঁচা রাস্তা (unmetalled road) তৈয়ারী হইয়াছে।

সমাজ-উন্নয়নকর্মীদের শিক্ষার জন্য এই পরিকল্পনা আমলে ৪৩টি কর্মী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় মোট কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ হাজার। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয়

সম্প্রসারণ পরিকল্পনার দরুণ বরাদ্দ হয় ৯৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন এলাকায় সরকার যত টাকা ব্যয় করেন, জনসাধারণের সাহায্য হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণ তাহার শতকরা ৫৬ ভাগের মত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই খাতে জনসাধারণের সাহায্য হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ইহা সরকারী ব্যয় ১০৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার শতকরা ৬৪ ভাগ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার হিসাবে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) ঘোষণা করিয়াছেন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সমগ্র দেশকে জাতীয় সম্প্রসারণ কর্মব্যবস্থার অধীনে আনা হইবে। সমবায় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ নীতির প্রসার, ভূমির একত্রীকরণ, গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি, ছোটখাট চাষী কৃষিশ্রমিক বা গ্রাম্য শিল্পীকে সাহায্য করিবার কর্মসূচী গ্রহণ, উপজাতি এলাকায় এবং স্ত্রীলোক ও যুবকদের মধ্যে ব্যাপক কাজ,—বিশেষ ভাবে এইগুলি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে উন্নয়ন ব্লকের* নিম্নরূপ হিসাব অনুমিত হইয়াছে :—

বৎসর	জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা	সমাজ-উন্নয়ন ব্লকে রূপান্তর
১৯৫৬-৫৭	৫০০	২৫০
১৯৫৭-৫৮	৬৫০	২০০
১৯৫৮-৫৯	৭৫০	২৬০
১৯৫৯-৬০	৯০০	৩০০
১৯৬০-৬১	১,০০০	৩৬০
মোট—	৩,৮০০	১,১২০

* মোটামুটি প্রত্যেক জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের জন্য ৪ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক সমাজ উন্নয়ন ব্লকের জন্য ১২ লক্ষ টাকা নিয়োজিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা নিম্নলিখিত

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ম ২ লক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং এ জন্ম অতিরিক্ত ১৮টি কর্মী শিক্ষাকেন্দ্র ও ২৫টি বুনিয়াদি কৃষি বিদ্যালয় খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইভাবে কর্মীশিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ৬১ ও কৃষি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫ দাঁড়াইবে।*

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ২৪০৫টি ব্লকের ৩০২,৯৪৭ গ্রামে কার্যকরী হইয়াছে। ইহাতে উপকৃত হইয়াছে প্রায় ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ লোক বা গ্রামীন ভারতের লোক-সংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ।

ভাবে ব্যয়িত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে :—ব্লক-প্রধান কেন্দ্রসমূহের কর্মী ও সরঞ্জাম—৫২ কোটি টাকা, কৃষি—৫ কোটি টাকা, যানবাহন—১৮ কোটি টাকা, গ্রাম্যশিল্প—৫ কোটি টাকা, শিক্ষা—১২ কোটি টাকা, সমাজশিক্ষা (Social Education)—১০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য—২০ কোটি টাকা, গৃহনির্মাণ (পরিকল্পনার কর্মীদের গৃহ ও গ্রাম্য গৃহ)—১৬ কোটি টাকা এবং সমাজ উন্নয়ন (বিবিধ)—১২ কোটি টাকা; মোট :—২০০ কোটি টাকা।

* সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্পর্কে কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্ম ভারত-সরকারের ভারপ্রাপ্ত দপ্তর নীলখেরী ও রাঁচীতে দুইটি উন্নত ধরণের সমাজ শিক্ষা বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। এছাড়া সরকারী সাহায্যে অনুরূপ শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বেসরকারী শিক্ষায়তন আছে এলাহাবাদ, শান্তিনিকেতন, হায়দরাবাদ, গান্ধীগ্রাম, উদয়পুর, বরোদা, বেলুড়মঠ (পশ্চিমবঙ্গ), কোয়েম্বাটর, গায়গোত্তি এবং কস্তুরবাগ্রামে (ইন্দোর)।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্প

(Agriculture and Industry in the Second Five Year Plan)

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের তুলনায় কৃষির উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল। মোট বরাদ্দ (সংশোধনের পর) ২,৩৫৬ কোটি টাকার মধ্যে শিল্পে ধরা হইয়াছিল ১৭৯ কোটি টাকা (শতকরা ৭·৬ ভাগ) এবং কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছিল ৩৫৭ কোটি টাকা (শতকরা ১৫·১ ভাগ)। সমাজ উন্নয়ন বা স্থানীয় উন্নয়ন খাতের ব্যয়ের উদ্দেশ্য পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন, সুতরাং ইহা কৃষি উন্নয়নের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই দুই খাতের টাকা বাদ দিলেও শুধু কৃষি-খাতে ব্যয় বরাদ্দ হয় ২৪১ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ খাতে ৩৮৪ কোটি টাকা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল,—এই ৪০১ কোটি টাকায়ও কৃষি উন্নয়নের প্রভূত সাহায্য হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য আলোচ্য পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিক শক্তি খাতে যে ২৬০ কোটি টাকা এবং রেলপথ উন্নয়ন খাতে যে ২৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, তাহাতে শিল্পপ্রসারে লক্ষণীয় সাহায্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। মোটের উপর, সব জড়াইয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল।

কৃষির উপর এই গুরুত্ব আরোপের কারণ কৃষিকেন্দ্রিক পল্লী ভারতের সাচ্ছল্যসৃষ্টির অগ্রাধিকার স্বীকার ছাড়াও ভারতকে খাদ্যের হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা। দেশবিভাগের ফলে শতকরা ১৮ ভাগ লোক সহ শতকরা ২৩ ভাগ সেচসুবিধাপ্রাপ্ত চাষের জমি লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইলে ভারতের কৃষিসমস্যা তীব্র হইয়া উঠে। ইহার উপর ভারতে অবিরাম লোকবৃদ্ধি ঘটে এবং পাকিস্তান হইতে প্রায় ১ কোটি শরণার্থী ভারতে আসিয়া পড়ে। জীবনধারণের প্রথম অত্যাবশ্যক জিনিস খাদ্য, ভারতের খাদ্যের সমস্যা সঙ্কটজনক স্তরে আসিয়া পৌঁছায়। বিদেশ হইতে অবিরাম অত্যধিক পরিমাণ খাদ্য আমদানী করিলে মূল্য পরিশোধে অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার অভাব যথেষ্ট। যে সামান্য

পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ভারত সংগ্রহ করিতে সমর্থ, তাহা যদি খাদ্য আমদানীতেই চলিয়া যায়, তাহা হইলে অন্যান্য ভোগ্যপণ্য, এবং শিল্প গঠনে অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে কি করিয়া আনা সম্ভব? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রাথমিক স্তর ধরিয়া লইয়া এইজন্য পরিকল্পনা কমিশন ভারতকে খাদ্যের হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আশ্বাসের কথা, পরিকল্পনা কমিশনের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর জোর পড়ায় খাদ্যশস্য-সমেত কৃষিপণ্যের উৎপাদন লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বা ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টনে উঠিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকারী হিসাবে এই সময় মোট খাদ্যশস্য জন্মিয়াছে ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টন।

শিল্পসমৃদ্ধি না হইলে আধুনিক পৃথিবীতে ভারতের অগ্রগতি সত্যই সম্ভব নয়। ভারতের কৃষিব্যবস্থা অত্যধিক ভারগ্রস্ত, এই কৃষির পক্ষে ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আর্থিক সাফল্য নিশ্চিত করা অসম্ভব। প্রথম পরিকল্পনা অন্তে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে কর্তৃপক্ষ ভারতীয় অর্থনীতিক কাঠামোকে কৃষিকেন্দ্রিকতা হইতে শিল্পকেন্দ্রিকতার দিকে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। অবশ্য এই শিল্পমুখিতা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই পূর্ণাঙ্গ সফলতা লাভ করিবে না, তবে পরবর্তী তৃতীয় বা চতুর্থ পরিকল্পনায় ইহা ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

সরকারী খাতে শেষ পর্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ হইয়াছিল ২,৩৫৬ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ হইয়াছে ৪,৮০০ কোটি টাকা (এক্ষেত্রেও সংশোধিত হিসাবে মূল বা 'ক' খাতে ৪,৫০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে)। প্রথম পরিকল্পনায় যেখানে কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন খাতে ৩৫৭ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেক্ষেত্রে ধরা হইয়াছে ৫৬৮ কোটি টাকা। টাকার অঙ্ক বাড়িলেও মোট বরাদ্দের শতকরা অংশ হিসাবে কৃষি বরাদ্দ ১৫'১ ভাগ হইতে ১১'৮ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে শিল্প ও খনি খাতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়

যেখানে ১৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল (মোট বরাদ্দের শতাংশের ৭'৬ ভাগ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেখানে এই বরাদ্দ ৮৯০ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ১৮'৫ ভাগ) হইয়াছে।* দ্বিতীয় পরিকল্পনার কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন খাতের সহিত সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (ইহাদের কার্যকরিতা কৃষি-উন্নয়নের অনুপূরক) যুক্ত হইলে কৃষিখাতে মোট ১,০৫৪ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা ২১'৯ ভাগ ধরা হইয়াছে বলা চলে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ-খাতে ধরা হইয়াছে ৮৯০ কোটি টাকা (বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ৬১৭ কোটি টাকা, গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পে ২০০ কোটি টাকা এবং খনি-উন্নয়নে ৭৩ কোটি টাকা) বা মোট বরাদ্দের শতকরা ১৮'৫ ভাগ। এছাড়া রেলপথ উন্নয়নের জন্য যে ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, তাহার বহুলাংশও শিল্প-প্রসারে সহায়তা করিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, শিল্প, খনি ও রেলপথ উন্নয়ন খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ দাঁড়াইয়াছে ১,৭৯০ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের শতকরা ৩৭'৩ ভাগ)। ইহার উপর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ৩৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, তাহার একাংশও নিঃসন্দেহে শিল্পক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতে যে ২,৪০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, তাহাতেও কৃষির তুলনায় শিল্পের উপর অনেক বেশি জোর পড়িয়াছে।†

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল মৌলিক শিল্পের প্রসার এবং রেলপথ উন্নয়ন। ভোগ্যপণ্য শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইলে মৌলিক শিল্পের সম্প্রসারণ না হইলে চলে না এবং সমগ্র ভাবে শিল্প প্রসারের পক্ষেই রেলপথ-উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী

* এইস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পরিকল্পনা সংশোধনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎখাতে ৯১৩ কোটি টাকার স্থলে ব্যয়বরাদ্দ ৮৩২ কোটি টাকায় পুনঃ-নির্ধারিত হওয়ায় প্রথম অনুমিত সেচ-সুবিধা প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ একরের স্থলে ১ কোটি ৪ লক্ষ একরে নামিয়া আসিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা করিতেছেন।

† এই ২,৪০০ কোটি টাকার হিসাব নিম্নরূপ :—(১) সঙ্ঘবদ্ধ শিল্প ও খনিজ—৫৭৫ কোটি টাকা, (২) বাগিচা এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও রেলপথ ব্যতীত অন্যান্য পরিবহন—১২৫ কোটি টাকা, (৩) নির্মাণকার্য (Construction)—১,০০০ কোটি টাকা, (৪) কৃষি এবং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—৩০০ কোটি টাকা, (৫) মজুত হিসাবে—৪০০ কোটি টাকা।

পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল হইলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার একটা সক্রিয় প্রয়াস দেখা যায়, পণ্যাভাব ও বেকারসমস্যা পীড়িত এ দেশে এই প্রয়াসের আশ্বাস যথেষ্ট। রৌরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা নির্মিত হইতেছে। টাটা ও কুলটি কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত ছাড়া কলকারখানা গড়িবার অপর উপাদান সিমেন্টের উৎপাদন বাড়াইবার ব্যাপক চেষ্টা চলিতেছে (১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টন উৎপাদন ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনে তুলিবার আশা করা হইয়াছে)। শিল্পের পক্ষে অপর অত্যাবশ্যক পণ্য কয়লার উত্তোলনও ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ৬ কোটি টনে উঠিবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন। এইভাবে মৌলিক শিল্পের উন্নয়নের সহিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভোগ্যপণ্য শিল্পেরও লক্ষণীয় সমৃদ্ধি ঘটিবে।* বিশেষ করিয়াও কুটির-শিল্পের জন্য যে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, বিকেন্দ্রীভূত ভাবে গ্রামাঞ্চলের কর্মসংস্থানের ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের দিক হইতে তাহার গুরুত্ব সন্দেহাতীত।

অবশ্য শিল্পপ্রসারে অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে কৃষির হিসাবে যে উন্নতি আশা করা হইয়াছে, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাহা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় অর্থনীতি এখনও কৃষিকেন্দ্রিক বলিয়া এই উন্নতির আবশ্যকতায় সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল মুসৌরীতে অনুষ্ঠিত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়ন কমিশনারদের সভায় পরিকল্পনা কমিশনের সহ-

* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শীর্ষক প্রবন্ধে সম্ভাব্য উন্নতি দ্রষ্টব্য।

† লক্ষ টনের হিসাবে

	১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের উৎপাদন	১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের মূল হিসাব	১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাব
খাদ্যশস্য	৬৫০	৭৫০	৮০৫
তৈলবীজ	৫৫	৭০	৭৬
তুলা	৪২	৫৫	৬৫
পাট	৪০	৫০	৫৫

সভাপতি শ্রী ভি টি কৃষ্ণমাচারী সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতে শিল্পোন্নয়নের যে-কোনও পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে কৃষির উন্নতি বা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা একই সঙ্গে করিতে হইবে।†

একথা বলাই বাহুল্য যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে যদি মৌলিক শিল্প প্রসারে, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাসমূহে, অথবা সমাজসেবাখাতে বিপুল অর্থব্যয় হয়, অথচ সেই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে যন্ত্রশিল্পজাত ভোগ্য-পণ্যের বা কৃষিপণ্যের আশানুরূপ উৎপাদনবৃদ্ধি না ঘটে, তাহা হইলে অন্তর্দেশীয় বাজারে পণ্যের চাহিদা ও যোগানে অসামঞ্জস্য ঘটিবে। এই ভাবে পণ্যাভাবগ্রস্ত দেশে পরিকল্পনাকালীন বাড়তি মুদ্রা প্রচলনের চাপে মুদ্রাস্ফীতির বিপদ ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থের সংস্থান

(Financing the Second Five Year Plan)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই হইয়াছিল বরাদ্দকৃত অর্থের সংস্থান সম্পর্কে। স্বর্গত নলিনীরঞ্জন সরকারের মত অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের আশাকৃত অর্থ দেশের অভ্যন্তর ভাগ হইতে সংগৃহীত হইবে না এবং শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবে পরিকল্পনা সঙ্কুচিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রী ভি. কে. আর. ভি. রাও-ও এইরূপ আতঙ্কিতদের অন্যতম ছিলেন। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এসম্পর্কে বরাবরই ছিলেন আশাবাদী। ভারতের পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে কলিকাতার সংবাদিকদের নিকট জোরের সহিত বলেন যে, অর্থের সমস্যা কখনও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পথে প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং পরিকল্পনা শেষ করিতেও অর্থের অভাব হইবে না বলিয়া তিনি আশা করেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থের সংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষের আশা সফল হইয়াছে এবং অর্থাভাবে কাজ সত্যই আটকায় নাই। বরং পার্লামেন্টের গৃহীত ২০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ কার্যকালে বৃদ্ধি করিবার প্রশ্নও দেখা দেয় এবং কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত বরাদ্দ বাড়াইয়া ২৩৫৬ কোটি টাকা করেন। অর্থসংস্থানের সাফল্য পরিকল্পনার রূপারোপেও মোটামুটি সাফল্য সৃষ্টি করিয়াছে।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ৪,৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে (অবশ্য পরবর্তীকালে প্রয়োজনানুরূপ সংশোধন করিয়া এই বরাদ্দ 'ক' খাতে ৪,৫০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে, 'খ' খাতে ধরা হইয়াছে ৩০০ কোটি টাকা। 'ক' খাতের বরাদ্দ ব্যয়ের উপর প্রাথমিক

* গত ২৮।২।৫৭ তারিখে প্রাক্তন মার্শাল পরিকল্পনা পরিচালক মিঃ পল হফম্যান ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে উন্নয়নের ব্যাপারে ভারত অন্যান্য অনুন্নত দেশের শিক্ষাস্থল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ স্যার জর্জ সুষ্টার এই সাফল্য সম্পর্কে বলিয়াছেন :—

India's Five Year Plan is a first-class example of an attempt to map out a general plan of action based on realistic application of the country's resources and requirements.

ভাবে নির্ভর করা হইবে. 'খ' খাতের কার্যকরিতা নির্ভর করিবে অর্থসঙ্গতির উপর) এবং পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন যে, বেসরকারী খাতেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ২,৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হইবে। প্রথম পরিকল্পনার সময়কার তীব্র আতঙ্ক দেখা না গেলেও এবারও কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে উৎসাহ এবং সম্ভাবনার দৌলতে অর্থসংস্থানের যে সাফল্য ঘটিয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থের ক্ষেত্রে হয়তো তাহা সম্ভব হইবে না।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সরকারী বরাদ্দের ৪,৮০০ কোটি টাকা নিম্নলিখিতভাবে সংগৃহীত হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন :—রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত—৮০০ কোটি টাকা (১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের চলতি করহারে ৩৫০ কোটি টাকা + অতিরিক্ত করস্থাপন ৪৫০ কোটি টাকা), ঋণসংগ্রহ—১২০০ কোটি টাকা (বাজার হইতে ঋণ—৭০০ কোটি টাকা + স্বল্প সঞ্চয় ৫০০ কোটি টাকা), উন্নয়ন খাতে রেলপথের সাহায্য—১৫০ কোটি টাকা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য জমা—২৫০ কোটি টাকা, বৈদেশিক সূত্র হইতে—৮০০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয়—১২০০ কোটি টাকা, এবং সংগ্রহের সূত্র স্থির নাই—৪০০ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা কমিশনের ধারণা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারসমূহের রাজস্ব বাবদ আয় হইবে পাঁচ হাজার কোটি টাকার মত এবং ইহা হইতে শাসনকার্য সংক্রান্ত ব্যয় বাদে ৩৫০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। আগেই বলা হইয়াছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের দিক হইতে হতাশ হইতে হয় নাই বলিয়া কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থসংগ্রহের আশা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রথম পরিকল্পনায় ঋণ হিসাবে সংগ্রহের আশা করা হইয়াছিল ১১৫ কোটি টাকা, প্রকৃতপক্ষে এই খাতে ২০২ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে অর্থের

* ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ পরিকল্পনায় এই প্রথম তিন বৎসরে যথাক্রমে ৬৩৯ কোটি, ৮৪৬ কোটি ও ৯৮১ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং শেষ দুই-বৎসরে 'ক' খাতের দরুণ ৪৫০০ কোটি টাকার মধ্যেই ২০৩৪ কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে।

প্রচলন গতি বৃদ্ধি পাইয়া দেশবাসীকে বৎসরে ১৪০ কোটি টাকা ঋণপত্র কিনিতে সমর্থ করিবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ অনুমান করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বল্প সঞ্চয় খাতে যেখানে ৬৫ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে, সেখানে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে বৎসরে ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা উচ্চাশা নহে বলিয়াই পরিকল্পনা কমিশনের ধারণা। বৈদেশিক সূত্রে সংগ্রহ সম্পর্কেও একই কথা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সূত্রে ১৫৬ কোটি টাকা ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে ৩৭৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার। এই হিসাবেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্তৃপক্ষ এই স্থলে ৮০০ কোটি টাকা সংস্থানের ভরসা পাইয়াছেন।* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যসরকারসমূহের হিসাবে ২৩০ কোটি টাকার স্থলে ৮৫ কোটি টাকার মত পাওয়া গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুত ২২৯ কোটি টাকার স্থলে ৩৬০ কোটি টাকা যোগাইয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও রাজ্যসরকারসমূহ না পারিলে কেন্দ্রীয় সরকার হয় তো তাঁহাদের প্রদেয় অর্থের ঘাটতি পূরণ করিতে পারিবেন। রেলপথের আয় ক্রমবর্ধমান বলিয়া পরিকল্পনায় রেলপথসমূহ নিজেদের উন্নয়ন ব্যয় চালাইয়াও পাঁচ বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা অনায়াসেই যোগাইতে পারিবে। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারসমূহের হিসাবে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য জমার খাতে ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা (১৭ কোটি + ৬ কোটি ৬০ লক্ষ) পাওয়া গিয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে বৎসরে গড়ে ৩০ কোটি টাকা বা পাঁচ বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা এই সূত্রে পাওয়া যাইবে।

* ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিক পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যয়যোগ্য বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ ১৮৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, টাকায় পরিশোধযোগ্য মার্কিণ ঋণ ১১৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, মার্কিণ ঋণ (P. L. 480 Assistance) বাবদ ২৭০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, অন্যান্য রাষ্ট্রের ঋণ বাবদ ২৭০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং সাহায্য (grants) বাবদ ১০০ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা সহ মোট ১০১৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে এই খাতের ১৩০ কোটি টাকা অব্যবহৃত ছিল। ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য এই খাত হইতে ব্যয় হইয়াছে আনুমানিক ৪০২ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে নূতন কর সংস্থাপন এবং ঘাটতি ব্যয়ের উপর যে অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দেখা যায়, তাহা বিপজ্জনক বলিয়া অনেকের ধারণা। পরিকল্পনায় সোজাসুজি ৪৫০ কোটি টাকা নূতন কর সংস্থাপনের এবং ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে। এছাড়া যে ৪০০ কোটি টাকার কোন সংগ্রহসূত্র স্থির হয় নাই, তাহাও করসংস্থাপন বা ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যেই যোগাইতে হইবে। জিনিসপত্রের বর্ধিত মূল্যের জন্য পরিকল্পনার বরাদ্দ যদি বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত অর্থও এই দুই সূত্রের সাহায্যেই সংগৃহীত হইবে। যদি পূর্বোক্ত খাতগুলির কোনটিতে আশাকৃত অর্থের চেয়ে কম টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলেও এই সূত্রটিই ভরসা।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতের আর্থিক পরিস্থিতিতে নূতন কর সংস্থাপন এবং ঘাটতি ব্যয়,—দুই-ই বিপজ্জনক পথ। ভারতবাসী করভারে প্রপীড়িত, নূতন করের বোঝা বহিবার মত অবস্থা সত্যই তাহাদের নাই। এই জন্যই প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানে নূতন নূতন কর বহনে বাধ্য হইয়া ইতিমধ্যে সাধারণ দেশবাসীর অবস্থায় লক্ষণীয় অবনতি ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই বর্ধিত কর প্রদানে বাধ্য হইবার সঙ্গে প্রকৃত আয়ের অঙ্ক আনুপাতিক হারে বাড়িতেছে না বলিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মান নিঃসন্দেহে নামিয়া যাইতেছে।

এছাড়া এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিবেচনা করিতে হইবে। দেশের লোকের হাতের টাকা যদি কর বসাইয়া টানিয়া লওয়া হয় এবং সরকারী হিসাবের সাফল্যের নিরিখে লোভনীয় সর্তে সরকারী ঋণপত্র তাহাদের সম্মুখে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হয়, বেসরকারী উন্নয়নের হিসাবে যে ২৪০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে, তাহা আসিবে কোথা হইতে?* একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতের আর্থিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতের আশাকৃত সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

---

* ডাঃ জন মাথাইয়ের নেতৃত্বে 'কর তদন্ত কমিশন' (Taxation Enquiry Commission, 1953) অবশ্য ঘাটতি ব্যয়ের চেয়ে করসংস্থাপনে অর্থসংগ্রহের পক্ষপাতী। ভারতসরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য আমন্ত্রিত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডারও ঘাটতি ব্যয় সীমাবদ্ধ করিবার এবং করের অতিরিক্ত সম্ভাবনার সুযোগ লইবার পরামর্শ দিয়াছেন। অধ্যাপক ক্যালডারের ধারণা এদেশে ধনীরা বৎসরে ২০০।৩০০ কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে এই টাকা আদায়েও কড়াকড়ি হওয়া দরকার।

সরকারের হাতে মুদ্রানীতি পরিচালনার ভার, তাঁহারা নোট ছাপাইয়া সাময়িকভাবে খরচ মিটাইতে পারেন। কিন্তু উপযুক্ত জামিনবিহীন নোট বেশি ছাপাইলে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা বিপন্ন হইবে। এইরূপ ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয়গ্রহণ অসমীচীন। ঘাটতি ব্যয়কে আলাদীনের আশ্চর্যপ্রদীপের সহিত তুলনা করা যায়। দরকারের সময় সংযতভাবে ইহার আশ্রয় লইলে যেমন দৈত্যের সাহায্যে সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অসংযতভাবে ইহার আশ্রয় লইলে তেমনি দৈত্য সাহায্য-গ্রহণকারীর সর্বনাশ করে।* অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যধিক ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ না করিতে অধ্যাপক বি. আর. শেনয়, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডাঃ নিকোলাস ক্যালডার, অধ্যাপক সি. এন. ভকিল অধ্যাপক জে. পি. নিয়োগী প্রমুখ অনেকে ভারতসরকারকে পরামর্শ দিলেও অধ্যাপক এস. এন. সেনের মত কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেড় হাজার কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ে বিপদের সম্ভাবনা নাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর এখন ভারতবাসীর মনে পরিকল্পনা সম্পর্কে যথেষ্ট আশা ও আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এদেশের বর্তমান যুগকে অনেকে "পরিকল্পনার যুগ" (Plan Period) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য দেশবাসীর সম্ভাব্য দুঃখ ভোগে কাতর না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই উৎসাহ সত্ত্বেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনাতেই আংশিক ঘাটতি ব্যযের চাপে দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি তথা পণ্যমূল্যবৃদ্ধি (বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি) দেখা দিয়াছে এবং সম্পত্তি কর ও ব্যয় করের মত বিচিত্র কর ছাড়াও বহু ভোগ্যপণের উপর যেরূপ চড়াহারে কর বসিয়াছে তাহা অস্বস্তিকর সন্দেহ নাই। পরিকল্পনার খরচ যোগাইতে তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া বৃদ্ধি বা আয়করযোগ্য সর্বনিম্ন আয়ের পরিমাণ ৪,২০০ টাকা হইতে ৩,০০০ টাকায় নামাইয়া আনাও মধ্যবিত্ত দেশবাসীর দুর্ভোগবৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য

* "The place of deficit financing in a developing economy has often been a subject of controversy. Opinions ranging from condemning it as a high road to inflation to commending it as a means of mobilizing resources for economic development, are expressed by economic analysts and planners. Without going into this controversy, the essential point to remember is that deficit financing is only a tool of economic policy and its results, like the results of any other tool of policy, are dependent on the care and skill with which it is weilded.
—Srimati Tarakeswari Singha, Union Deputy Minister of Finance, A.I.C.C. Economic Review, January 9, 1959.

দৃষ্টান্ত। বাস্তবিক পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগীর মত লোক যখন বিরূপ সমালোচনা করিয়া পরিকল্পনাটিকে ফাঁপা ও অবাস্তব বলিয়া অভিহিত করেন, সাধারণ দেশবাসীর মনোভাব স্বভাবতই বিষণ্ণ হইয়া পড়ে।*

ভারতের মত পশ্চাৎপদ দেশের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার দায়িত্বগ্রহণের যৌক্তিকতা কেহই অস্বীকার করেন না। তবে যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে যে দুঃখদুর্দশা চলিতেছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে করভার বা মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধির অসুবিধা সহজেই অনুমেয়। পরিকল্পনার আর্থিক সংস্থানের জন্য সর্বপ্রকার অর্থসংগ্রহের সূত্রেরই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করা দরকার সন্দেহ নাই। দেশবাসীর দুর্দশা হ্রাস করিতে পরিকল্পনায় কর্ম-সংস্থানের সুযোগ যতটা সম্ভব বাড়াইতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতির কুফল বিদূরণ করিতে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়াইয়া পণ্যমূল্যের বৃদ্ধিতে বাধা দিতে হইবে। বড় কিছু না দিলে বড় কিছু পাওয়া যায় না, এই শাশ্বত সত্যের আবেদন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। অনভিজ্ঞতার অস্বস্তির জন্য প্রথম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সঙ্কোচ দেখা দিয়াছিল, পরিকল্পনা কমিশনের দিক হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সাহস ও দায়িত্বগ্রহণ অবশ্যই স্বাভাবিক হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতে আর্থিক পরিস্থিতির উপর যে প্রভূত চাপ পড়িবে, একথা পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করিয়াছেন।†

* শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন :—

"The Plan as it stands is open to the criticism that, as a five year programme, it lacks definiteness, in unrealistic and over-ambitious and its massive super-structure has been raised on precarious foundations."

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ভারত সফর করিয়া বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদল (World Bank Mission) ভারতসরকারের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেন, তাহাতেও তাঁহারা সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেন যে, ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক।

† "It is obvious that the Second Five Year Plan will strain the financial resources of the country. A maesure of strain is implicit in any development plan, for, by definition, a plan is an attempt to raise the rate of investment above what it would otherwise have been. It follows that correspondingly larger effort is necessary to secure the resources needed. It is from this point of view that in the light of the continuing requirements of the economy over a number of years that the task of mobilising resources has to be approached."

বেকার সমস্যা ও ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(Unemployment Problem and India's Second Five Year Plan)

ভারতে বেকার সমস্যার সমাধানে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করে নাই। অবশ্য এই ব্যর্থতার উল্লেখের অর্থ ইহাই নয় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রয়াস সমগ্রভাবে নিষ্ফল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিকল্পনার আমলে নদনদী সংস্কার, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, পথঘাট উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতি দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ স্বষ্টিকারী কাজও কিছু কিছু হইয়াছে, তবে প্রত্যক্ষ ভয়াবহ বেকার-সঙ্কট হ্রাস না পাওয়ায় রূপায়িত পরিকল্পনার বাস্তব সাফল্য সম্পর্কে জনসাধারণ উল্লসিত হইতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষিকেন্দ্রিক বা গ্রামকেন্দ্রিকভাবে রচিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে কৃষিব্যবস্থা ভারগ্রস্ত ও পুরাতন রীতির, নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ কৃষিতে খুবই কম। শিল্পপ্রসার না ঘটিলে এদেশে সর্বজনীন কর্মসংস্থান কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতে আশানুরূপ শিল্পপ্রসার একান্ত কঠিন এইজন্য যে, এদেশে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর ব্যবস্থা নাই এবং আবশ্যক যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আনিতে হইলে তজ্জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। ভারত খাদ্যের হিসাবে অসচ্ছল ছিল বলিয়া যুদ্ধের সময় হইতে বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। এত বেশি বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্যশস্যের হিসাবে ব্যয়িত হইলে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য আমদানীর পর অর্থাভাবে যন্ত্রপাতি আমদানী কঠিন হইয়া পড়ে। এইজন্যই সম্ভবতঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কৃষিকেন্দ্রিক করিয়া ভারতকে খাদ্যের দিক হইতে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি হইতে ভারতীয় অর্থনীতির শিল্পমুখিতা স্বাভাবিক ছিল। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অনুভূত খাদ্যশস্যের অভাব আবার স্বভাবতই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের সহিত কৃষির উপর জোর দিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাজকর্মের সম্ভাবনা এমনিই কম ছিল,

বেকার-সমস্যাসংশ্লিষ্ট আন্দোলনের ফলে যদিও অন্তর্বর্তীকালে ১৭৫ কোটি টাকার কতকগুলি কর্মসংস্থানসূচক ব্যবস্থা পরিকল্পনায় সংযোজিত হয়, তথাপি মোটের উপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার তীব্রতা কমে নাই। বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই পরিকল্পনার আমলে কাজকর্মের সুবিধা না পাইয়া সবিশেষ হতাশ হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের আশা করা হইয়াছিল, কার্যকালে নূতন নিয়োগ মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। কর্তৃপক্ষই অনুমান করিয়াছেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে মোট ৪৫ লক্ষের মত লোকের কাজ জুটিয়াছে। ভারতে আগেও প্রচুর বেকার ছিল, তাছাড়া এদেশে বৎসরে সরকারী হিসাবেই ২০ লক্ষ করিয়া লোক নূতন কর্মপ্রার্থী হয় ধরিলে মোট বেকারের হিসাবে সরকারী কর্তৃপক্ষ অনুমিত ৪৫ লক্ষ কর্মসংস্থান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত হতাশাজনক। ইহার উপর যাহারা কাজ পাইয়াছে, তাহাদের কাজও সব সময়ে স্থায়ী নয় এবং উপার্জনের মাত্রাও সব সময়ে সপরিবারে জীবনযাপনের নিম্নতম প্রয়োজনের উপযোগী নয়। কাজেই সব মিলাইয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন কর্মসংস্থান পরিস্থিতি শোচনীয়ই বলা চলে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান সমস্যার ভয়াবহতা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বহুলাংশে হ্রাস পাইবে, এরূপ আশা করা দেশবাসীর পক্ষে খুবই সঙ্গত। দুঃখের বিষয়, এদিক হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও আশাপ্রদ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও মোটামুটি প্রথম পরিকল্পনার মতই মূলধন আত্যন্তিক হইয়াছে। হয়তো ইহাতে একটি শুভ মনোভাব সূচিত হইয়াছে, স্থায়ী জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দিকেই ইহার লক্ষ্য, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন-ব্যবস্থাকেন্দ্রিক এই পরিকল্পনায় দেশের প্রয়োজনের নিরিখে অত্যাবশ্যক কর্ম-সংস্থানের উপর জোর পড়ে নাই। আবাদী কংগ্রেসে (জানুয়ারী, ১৯৫৫) গৃহীত নীতি অনুসারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের প্রতিশ্রুতি অবশ্য দেওয়া হইয়াছে এবং বেকারসমস্যা সমাধানের গুরুত্বের কথাও ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে, তবে উপরোল্লিখিত আগামী দিনের উজ্জ্বল আর্থিক ভারত গঠনের দিকেই ইহার লক্ষ্য বেশি। মনে হয় জাতীয় অর্থনীতির রূপ পরিবর্তনের দ্বারা পরিকল্পনা কমিশন আশা করিতেছেন যে, এই পরিবর্তনের ধারা পরবর্তী

পরিকল্পনায় সক্রিয় থাকিলে পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামো গঠন সম্ভবপর হইবে।*

পরিকল্পনা কমিশনের অনুমান অনুসারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন খাতে এক কোটির মত লোকের কর্মসংস্থান হইবে।† কিন্তু তাঁহাদের হিসাবে এই সময়ে ভারতে কাজের প্রয়োজন হইবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ লোকের (সহরাঞ্চলে আগের বেকার ২৫ লক্ষ + সহরাঞ্চলে নূতন কর্মপ্রার্থী ৩৮ লক্ষ + গ্রামাঞ্চলে আগের বেকার ২৮ লক্ষ + গ্রামাঞ্চলে নূতন কর্মপ্রার্থী ৬২ লক্ষ), কাজেই পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ীই অর্ধ কোটির বেশী লোক প্রথম পরিকল্পনার শেষের মত দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও বেকার থাকিবে। এই বেকারের হিসাব পরিকল্পনা কমিশন কম করিয়া ধরিয়াছেন বলিয়াই আমাদের ধারণা এবং বলা বাহুল্য, এ ধারণা সত্য হইলে প্রকৃত অবস্থা খুবই আতঙ্কজনক। যাহা হউক, পরিকল্পনা কমিশনের প্রায় অনুরূপভাবেই সম্প্রতি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বেকারের সংখ্যা ও কর্মসংস্থানের প্রয়োজনের হিসাব করিয়াছেন বলিয়া কমিশনের হিসাব ধরিয়াই আমরা আলোচনা চালাইতেছি। ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরু হইতে ১৫ বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে ৪ কোটি ১০ লক্ষ লোকের কাজ চাই। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় দশ বৎসরের (১৯৫৬-৬৬) হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সময়ের মধ্যে ভারতকে কাজ দিতে হইবে তিন কোটি লোককে। শ্রী বি. এন. দাতারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের ৫ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের কাজ চাই এবং এজন্য তিনি

---

* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহের কথা বলা হইয়াছে :—(১) জাতীয় আয়বৃদ্ধি; (২) জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি; (৩) দ্রুত শিল্পপ্রসার (মূল ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ); (৪) অধিকতর কর্মসংস্থান, (৫) আয় ও সম্পদের অসমতা হ্রাস এবং অর্থনৈতিক শক্তির অপেক্ষাকৃত সমবণ্টন।

† গৃহনির্মাণ ইত্যাদি—২১ লক্ষ, (কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন—২ ৬৬ লক্ষ, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি—৩·৭২ লক্ষ, শিল্প ও খনি—৪·০৩ লক্ষ, রেলপথসহ পরিবহন—১·২৭ লক্ষ, সমাজসেবা—৬·৯৮ লক্ষ, সরকারী চাকুরীসহ বিবিধ—২·৩৪ লক্ষ); সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি—৫১ লক্ষ; রেলপথ—২·৫৩ লক্ষ; অন্যান্য পরিবহন—১·৮০ লক্ষ; শিল্প ও খনিজ—৭·৫০ লক্ষ; কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প—৪·৫০ লক্ষ; বন, মৎস্যবিভাগ ও জাতীয় সম্প্রসারণ—৪·১৩ লক্ষ; শিক্ষা—৩·১০ লক্ষ; স্বাস্থ্য—১·১৬ লক্ষ; অপরাপর সমাজসেবা—১·৪২ লক্ষ; সরকারী চাকুরী—৪·৩৪ লক্ষ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি—২৭·০৪ লক্ষ; কৃষি—১৬ লক্ষ = মোট ৯৫·০৩ লক্ষ।

১৯৫৬-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি, ১৯৬১-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি এবং ১৯৬৬-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। মোটের উপর উপরোক্ত হিসাবগুলিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে কর্মসংস্থান আশাপ্রদ হইবে না ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে প্রস্তুতিমূলক ধরিয়া সমস্যা সমাধানের অধিকতর আশা করা হইয়াছে পরবর্তী পরিকল্পনার উপর।*

আগেই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এদেশে মূলধন বিনিয়োগের ধারার এবং অর্থনীতিকে কৃষি হইতে শিল্পে সরাইয়া লইয়া যাইবার প্রয়াসের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং তদনুসারেই হিসাবাদি নির্ধারিত হইয়াছে। এই পরিবর্তন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরবর্তী-কালেও কার্যকরী থাকিবে। ভারগ্রস্ত কৃষিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা কম, শিল্পবাণিজ্যের উপরই দেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল, উপরোক্ত পরিবর্তনের পিছনে ইহাই প্রধান যুক্তি। এইভাবে দেখা যায়, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে কৃষিতে (সমাজ উন্নয়ন, সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণসহ) মোট মূলধনের শতকরা ৩৩ ভাগ লগ্নী হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তখন এই খাতে ধরা হইয়াছে শতকরা ২১ ভাগ ; পক্ষান্তরে শিল্প ও বৈদ্যুতিক শক্তির খাতে প্রথম পরিকল্পনায় যেখানে শতকরা ১৮ ভাগ (৭ + ১১) বরাদ্দ হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেখানে ধরা হইয়াছে শতকরা ২৮ ভাগ (১৯ + ৯)। এ ছাড়া রেলপথ খাতে প্রথম পরিকল্পনায় শতকরা ১২ ভাগের স্থলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা যে ১৯ ভাগ ধরা হইয়াছে, ইহাও প্রধানতঃ শিল্পের কাজে লাগিবে। জাতীয় আয়ের হিসাবেও দেখা যায়, প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিকল্পনার পূর্ববর্তী বৎসর বা ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব কৃষিতে শতকরা ১৮ ভাগ, খনিতে শতকরা ১৯ ভাগ, বৃহৎ-শিল্পে শতকরা ৪৩ ভাগ ও ক্ষুদ্রশিল্পে শতকরা ১৪ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর বা ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসর বা ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় আয় কৃষিতে

* প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা কমিশনই হিসাব করিয়াছেন যে, ভারতের জাতীয় আয় ও ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় ক্রমান্বয়ে বাড়িতে বাড়িতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বা ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ২৭,২৭০ কোটি টাকা ও ৫৪৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। অবশ্য পণ্যমূল্য সেইসঙ্গে কিভাবে বাড়ে তাহারই উপর যে প্রকৃত আয়বৃদ্ধি নির্ভর করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শতকরা ১৮ ভাগ, খনিতে শতকরা ৫৮ ভাগ, বৃহৎ শিল্পে শতকরা ৬৪ ভাগ ও ক্ষুদ্র শিল্পে শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কাজেই একথা ঠিক যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনীতিকে কিছুটা কৃষি হইতে শিল্পের দিকে লইয়া যাইবার প্রয়াস রহিয়াছে।* ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় এই অর্থনীতিক পটভূমিকা পরিবর্তনের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। ডাঃ ভি. কে আর. ভি. রাও এই অপরিহার্য পরিবর্তনের সপক্ষে ১৫ বৎসর পরে মোট জনসংখ্যার হিসাবে বিভিন্ন বিভাগের কর্মসংস্থানের নিম্নরূপ হার-পরিবর্তন অনুমান করিয়াছেন :—

	বর্তমানের সংখ্যা	১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের সম্ভাব্য সংখ্যা
কৃষিশ্রমিক	৭১.৯%	৫৮%
শিল্পশ্রমিক	৯.৭%	১৬.১%
বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি	৬.৬%	৯.৮%

ভারতের বেকার সমস্যাকে নিম্নরূপ তিনভাগে ভাগ করা যায় :—(১) গ্রাম্যবেকার (বর্তমানে এই বেকারত্ব প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের), (২) সহরাঞ্চলের বেকার (এই বেকারত্ব প্রধানতঃ দেশের শিল্প বাণিজ্যিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল), এবং (৩) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার।

আগেই বলা হইয়াছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য অর্থনীতির উপর জোর পড়িয়াছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিনিয়োগের রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হইলেও কর্মসংস্থান শেষ পর্যন্ত গ্রামেই বেশি হইবে বলিয়া মনে হয়। মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দিয়া যে শিল্পসম্প্রসারণের আয়োজন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হইয়াছে তাহাতে শিল্পপ্রসারের সমানুপাতিক ভাবে কর্মসংস্থান অবশ্যই হইবে না। সাধারণতঃ আমরা আশা করি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর

---

* বেসরকারী সূত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহার খাতগুলি নিম্নরূপ :—

সঙ্ঘবদ্ধ শিল্প ও খনিজ—৫৭৫ কোটি টাকা; বাগিচা, বেসরকারী পরিবহন ও বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন প্রয়াস—১২৫ কোটি টাকা : কৃষি ও গ্রাম্য শিল্প—৩০০ কোটি টাকা; গৃহনির্মাণ—১০০০ কোটি টাকা; উৎপাদনবৃদ্ধি, আর্থিক কর্মপ্রসার, মজুতবৃদ্ধি ইত্যাদি—৪০০ কোটি টাকা। এই হিসাব হইতেও বুঝা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে বেসরকারী হিসাবেও কৃষির তুলনায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর জোর দিয়াছেন এবং এইভাবে কৃষির তুলনায় শিল্পের উপর জোর দিয়া উপস্থিত জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো পরিবর্তন এবং পরিণামে কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধানের আশা পোষণ করিয়াছেন।

যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাহাতে আনুপাতিকভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা তাহার কাছাকাছি কর্মসুযোগ জন্মে। আলোচ্য পরিকল্পনায় কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভাবনা নাই, কারণ এই পরিকল্পনায় ভোগ্যপণ্য শিল্পের দিকে আপেক্ষিক ঝোঁক নাই। সেইরূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকারদের জন্যও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনার মতই হতাশাজনক, কারণ ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারণের উপরই তাহাদের নিয়োগ প্রধানতঃ নির্ভর করে। একথা সকলেই জানেন যে শিক্ষিত বেকারদের ক্ষেত্রে এইরূপ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন প্রসারের সম্ভাবনা যথেষ্ট। এইজন্য বোধ হয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকারদের যাহাতে অন্ততঃ কিছুটা সুরাহা হয় তজ্জন্য পরিকল্পনা কমিশন নিয়োজিত এক পর্যবেক্ষণ সংস্থা (Study Group) অবস্থা পর্যালোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে পণ্য পরিবহন. ইত্যাদি সম্পর্কিত সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানাদি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। এদেশে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ, পরিকল্পনার পাঁচবৎসরে আরও ১৪ লক্ষ শিক্ষিত বেকার শ্রেণীভুক্ত হইলে বেকারদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪২ লক্ষ। পরিকল্পনার রূপায়নে ১০ লক্ষ শিক্ষিত লোকের কাজ জুটিবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন। এছাড়া ইতিমধ্যে বৃদ্ধদের অবসর গ্রহণের ফলে আরও ২ লক্ষ ৪০ হাজার লোক কাজ পাইবে।

এবার গ্রাম্য-বেকারদের কথায় আসা যাক। ভারতবর্ষ গ্রামে গাঁথা দেশ এবং ভারতের শতকরা ৮২ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। তাছাড়া সহরাঞ্চলে শিল্পাদিতে যাহারা কর্মপ্রার্থী, গ্রামের বেকারের সহিত তাহাদের পারিবারিক সচ্ছলতাগত সম্পর্ক অনেকক্ষেত্রেই বিদ্যমান। গ্রাম্য বেকারসমস্যার সমাধান কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও কুটির-শিল্প সম্প্রসারণের উপর নির্ভর করে। কৃষি-কেন্দ্রিক প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর কৃষির অবস্থা স্বাভাবিকভাবে কিছুটা উন্নত হইয়া থাকিলে এবং বিবিধ নদনদী পরিকল্পনার ফলে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সহজপ্রাপ্য ও সুলভ হইলে গ্রামে কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ কঠিন নয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। গান্ধীজীর অর্থনীতির সহিত পরিচিতেরা জানেন যে, বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য এবং গ্রামাঞ্চলে সার্বজনীন কর্মসংস্থানের জন্য গান্ধীজী কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার চাহিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পে যে কর্মসংস্থান আশা করা হইয়াছে এসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত শ্রী ডি. জি. কার্ভের নেতৃত্বে গঠিত কার্ভে কমিটি এবং পল্লী-শিল্প উন্নয়ন বোর্ড তদপেক্ষা অনেক বেশি কর্মসংস্থান আশা করিয়াছেন। কার্ভে কমিটি বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র ও গ্রাম্য-শিল্পের জন্য তাঁহাদের প্রস্তাবমত ২৫৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা (কেন্দ্রীয় খাতে ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যসমূহের খাতে ২৩৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা) ব্যয় করা হইলে ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে। শ্রী বৈকুণ্ঠলাল মেটা পরিচালিত নিখিল ভারত পল্লী-শিল্প-বোর্ড আবার প্রধানতঃ অম্বর চরকা চালু দ্বারা শুধুমাত্র হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া এই শিল্পে ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের আশা করিয়াছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থবরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি, তদুপরি পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন যে জাতীয় আয়ের হিসাবে প্রথম পরিকল্পনাকালীন শতকরা ৭ শতাংশ লগ্নীর হিসাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শতকরা ১২ শতাংশ লগ্নী হইবে।* কাজেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদি ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইয়া থাকে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হওয়া সেক্ষেত্রে আশ্চর্য নয়। তবে, আগেই বলা হইয়াছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থনিয়োগে প্রধানতঃ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসুযোগ সৃষ্টি হইবে না বলিয়া মনে করা হইতেছে। দায়িত্বশীল কেহ কেহ এমন আশঙ্কাও করিতেছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৬৫ লক্ষের মত হইবে। এদেশে প্রয়োজন সরকারী হিসাবেই নিম্নতমপক্ষে দেড় কোটি লোকের কাজের এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে ৫৩ লক্ষ বেকার লইয়া (আমাদের ধারণা এ সংখ্যা আরও বেশি)। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তেও বিপুলসংখ্যক বেকারের সমস্যা দেশের অর্থনীতিকে ভারগ্রস্ত রাখিবে। বলা বাহুল্য, ভারতের আর্থিক উন্নয়নের আয়োজনের বিপরীতে এই সঙ্কটের কথা ভাবিতেও ভয় হয়। ইহার উপর যদি পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে টান পড়ে,

* "In the beginning of the first Plan, the rate of savings was 7%, during the middle of the second Plan this rate is approximately 10%, it would be necessary to step up this rate to 14% during the third Plan period."

—Sriman Narain—'Last Two Years of the Plan—*Hindusthan Standard*, 9. 3.1959.

অবস্থা সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আরও শোচনীয় হইবে। বড় বড় পরিকল্পনায় হাত দিয়া মাঝপথে কাজ বন্ধ রাখা যায় না, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এসব বড় পরিকল্পনায় যে কম, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। কাজেই টাকা কম পড়িলে ছোটখাট কর্মসংস্থানমূলক পরিকল্পনারই আঘাত পাইবার কথা।

ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমান র‍্যাশান্যালাইজেশনের নীতি চালু হইতেছে, ইহাতে শিল্পের উৎপাদনের সমানুপাতিকভাবে শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। কাজেই শিল্পনীতি যদি সংস্কৃত হয়, শিল্পের প্রসার ঘটিলেও তদনুযায়ী শিল্পে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান নাও ঘটিতে পারে।* এ অবস্থা চলিলে ভারতে বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ক্রমেই যে জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বেকার সমস্যা এমন বাস্তব সমস্যা এবং মানুষের শ্রমশক্তি অব্যবহৃত বা অপচিত হইলে তাহার প্রতিক্রিয়ায় সমাজের এমন ক্ষতি হয় যে, বেকার সমস্যার স্থায়ী রূপ জাতীয় স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক। আগেকার দিনের মত রাষ্ট্র আর এখন জনস্বার্থনিরপেক্ষভাবে চলিতে পারে না, কল্যাণব্রতী আধুনিক রাষ্ট্রের নিম্নতম কর্তব্য হইল কর্মোৎসাহ-নিয়োগে উৎসুক উপযুক্ত নাগরিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিকে উপযুক্ত কাজ দেওয়া। কাজ না থাকাটাই বেকারত্বের সবচেয়ে বড় ক্ষতি নয়, দীর্ঘদিন বেকার থাকিলে মানুষ যে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, হতাশায় নিজেকে অপদার্থ বলিয়া মনে করে, ইহাই হইল বেকারত্বের সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

মোটের উপর, পরিকল্পনা সুরু হইবার এতদিন পরেও ভারতের ভয়াবহ বেকার সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান যে এখনও হইতেছে না, ইহা নিতান্তই দুঃখের কথা।

* বাস্তবিক যন্ত্র-শিল্পে উৎপাদন লক্ষণীয় ভাবে বাড়িয়াছে, কিন্তু শিল্প সংস্কারের ফলে কর্মসংস্থান যে তদনুযায়ী বাড়ে নাই, নিম্নের হিসাব হইতেই তাহা বুঝা যাইবে :—

বৎসর	শিল্পোৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৪৭ = ১০০	শিল্প-শ্রমিক সংখ্যা
১৯৫০	১০৫·০	২৯,১৪,৩৯৯
১৯৫১	১১৭·২	২৫,১৬,৫৪৪
১৯৫২	১২৮·৯	২৫,৬৭,৪৫৩
১৯৫৩	১৩৫·২	২৫,২৮,০২৬

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পুনর্গঠন

(Economic Planning for West Bengal)

অখণ্ড ভারতবর্ষে বাংলা ছিল শ্রেষ্ঠ প্রদেশ, শিক্ষাসংস্কৃতিতে বাঙ্গালীর গৌরব ছিল অবিসংবাদিত। মহামতি গোখেল বলিয়াছিলেন, 'আজ বাংলা যাহা চিন্তা করে, কাল ভারতবর্ষ তাহাই চিন্তা করিবে'। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা প্রথম হইতেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বাংলার লোকসংখ্যাও অবিরাম বাড়িয়াছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই বৃদ্ধি শতকরা ৪৩·১ ভাগ। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৬,০৩,০৬,৫২৫।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভাগের সহিত বাংলা বিভক্ত হয়। অখণ্ড বাংলার ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল পশ্চিমবঙ্গে পড়ে। নানা আন্দোলনের ফলে বিহার হইতে কিছু জমি পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয় এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন দাঁড়াইয়াছে ৩৩,৯২৭ বর্গমাইল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীর ভিত্তিতে এই রাজ্যের জনসংখ্যা ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিন কোটির মত হইয়াছে। দেশবিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ। হস্তান্তরিত বিহারের এলাকার লোকসংখ্যা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে ৩৬ লক্ষ শরণার্থী (ইহা সরকারী হিসাব, বেসরকারী হিসাব ৪৫ লক্ষের মত) আসায় পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুহার হ্রাসের জন্যও কিছু লোক বাড়িয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মৃত্যুহার ছিল হাজার করা ১৮·৮ জন, বর্তমানে ইহা অর্ধেকে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে দাবী করা হইয়াছে।

ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ এখনও কৃষিকেন্দ্রিক, কাজেই পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে কৃষির কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী সর্বসমেত এই রাজ্যের শতকরা ৫৭·২১ ভাগ অধিবাসী কৃষিজীবী। কৃষিসমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে পড়িয়াছে, কৃষির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ মোটেই উন্নত নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অবশ্য এই খাতে কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। এই রাজ্যে ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল ৩৯ লক্ষ ১০ হাজার টন, ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬ লক্ষ টনের

কিছু বেশি হয়, ইহার পর উৎপাদন অবিরাম হ্রাস পাইয়া বর্তমানে ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যে তীব্র খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে, বৎসরে ১১ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের (মূলতঃ চাউলের) ঘাটতিই তাহার প্রধান কারণ।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিভূমির পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লক্ষ একরের কিছু বেশী। গত ১০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে সেচ-সুবিধাপ্রাপ্ত চাষের জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে। এই রাজ্যের কৃষি খাতে ব্যয়ের পরিমাণও গত ১০ বৎসরে প্রায় দেড়গুণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই রাজ্যে চাষের লক্ষণীয় উন্নতি হইতেছে না। তাছাড়া শরণার্থী সমাগমের ফলে বর্ধিত প্রয়োজনের চাপেও পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সচ্ছলতা কিছুতেই আসিতেছে না।*

পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫৮ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু চাষীরা যে এখানে যুগোপযোগী নয়, তাহা এই রাজ্যে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ কৃষিজীবীর হিসাবে মাত্র ১২ লক্ষের মত সমবায় সমিতির সদস্যসংখ্যাদ্বারা প্রমাণিত হয়। বর্তমানে অবশ্য পরিকল্পনার যুগ চলিতেছে। দামোদর পরিকল্পনা ছাড়া শুধু পশ্চিমবঙ্গে চাষের উন্নতির জন্য ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্যকরী হইতেছে। এই পরিকল্পনায় খরিফ শস্যের ৬ লক্ষ একর ও রবিশস্যের ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমি সেচের সুবিধা পাইবে। এই রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের প্রসারেরও চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গে অতঃপর চাষের ক্রমোন্নতি ঘটিবে। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোথাও জাপানী প্রথায় চাষের ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গিয়াছে। খরচ একটু হইলেও জাপানী প্রথায় ধান চাষে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিমবঙ্গে কর্ষণযোগ্য জমিসংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সোনারপুর-আরাপাঁচ পরিকল্পনায় ২৪ পরগণার সোনারপুরের ২৩,০০০ একর জলমগ্ন জমি উদ্ধার করিয়া সেখানে বর্তমানে চাষ হইতেছে।

তবে কৃষির উন্নতির প্রয়োজন থাকিলেও শিল্পপ্রসার ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের

* পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে গড়ে ৮ লক্ষ টন চাউলের অভাব, মোট প্রয়োজন ৪৭ লক্ষ টন চাউলের। চাউল ছাড়া গম, ডাল, গোলআলু, গুড়, সরিষার তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ডিম, মাংস প্রভৃতি খাদ্যের দিক হইতেও পশ্চিমবঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বঙ্গবিভাগের পর বাংলার সব কয়টি পাটকল পশ্চিমবঙ্গে পড়িলেও শতকরা ৮২ ভাগ পাটচাষের জমির পূর্ববঙ্গে পড়ে। পাট উৎপাদনের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই লক্ষণীয় উন্নতি করিয়াছে সত্য, তবু কাঁচা পাটের অভাব এখনও এই রাজ্যে যথেষ্ট।

মত জনবহুল রাজ্যে কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ৭৭৬, এ হিসাবে ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয় (দিল্লী প্রথম ও কেরালা দ্বিতীয়)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র ভারতে লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ২৮৭। ইহার উপর পশ্চিমবঙ্গে বহিরাগতের চাপ ক্রমেই বাড়িতেছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবিকাসংস্থানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নতির সহিত কুটির শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ বা উন্নতি দরকার। পশ্চিমবঙ্গে যন্ত্রশিল্পের প্রসারেরও আপেক্ষিক সুবিধা আছে, তবে অধিকতর সংখ্যক লোকের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের তুলনায় কুটিরশিল্পে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্তের সংখ্যা প্রচুর বলিয়া শিল্পোন্নতি অবিলম্বে আবশ্যক। ভারতের শিল্পশ্রমিকের শতকরা ৩১ ভাগের মত পশ্চিমবঙ্গে নিয়োজিত, বোম্বাইয়ে নিয়োজিত শতকরা ২১ ভাগের কিছু বেশি। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের ব্যাপক চেষ্টা হওয়া দরকার।

আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-পরিস্থিতি আশাপ্রদ। ভারতের শতকরা ৯৫ ভাগ পাটশিল্প, ৫০ ভাগ কাগজশিল্প, ৩০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, ৫০ ভাগ এনামেল শিল্প, ৪০ ভাগ কাঁচশিল্প, ৬০ ভাগ মৃৎশিল্প, ৮০ ভাগ হোসিয়ারী শিল্প ও ২৮ ভাগ চা শিল্প পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে।* কারখানা আইনের আওতায় পড়ে পশ্চিমবঙ্গের এমন ১১৭০টি কারখানায় ১৫২ কোটি টাকা মূলধন খাটিতেছে। এইগুলিতে বৎসরে ২৭০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের শিল্পপণ্য উৎপন্ন হয় এবং ৫ লক্ষের মত শ্রমিক কার্জ করে। সব শিল্প মিলাইয়া পশ্চিমবঙ্গে শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ৬ লক্ষের বেশি (ভারতের মোট শিল্পশ্রমিকের শতকরা ৩১.৪ ভাগ)। কাজেই ইহা হইতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সমৃদ্ধিই অনুমিত হইবে।

কিন্তু সত্যই এইরূপ শিল্পপ্রসারে পশ্চিমবঙ্গের যতটা লাভ হওয়া উচিত ছিল, ততটা লাভ হয় নাই। ইহার কারণ এই রাজ্যে শিল্প-মালিকানার এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে আসিয়াছে। তবে আশার কথা, এখন ক্রমেই বাঙ্গালীরা কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় এবং শিল্পে

* ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গে রেজিষ্ট্রিকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৩,৩০০টি। ইহাদের মধ্যে যেগুলিতে ৫০ জন বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানার সংখ্যা ১২০০। ৯৮টি পাটকল, ৪২টি কাপড়ের কল, ৩০০ চা বাগান, ২১৮টি কয়লাখনি, ৫টি কাগজের কল এবং ছোটবড় অন্যান্য বহু কলকারখানা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

কর্মসংগ্রহে অধিকতর উৎসাহী হইয়া উঠিতেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের হিসাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। অবিভক্ত বাংলার ১৬৯ কোটি টাকা আদায়ী মূলধন সমন্বিত ৮৫৭৬টি যৌথ কোম্পানীর মধ্যে মাত্র ৩ কোটি টাকা আদায়ী মূলধনযুক্ত ১২০৫টি কোম্পানী ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের ভাগে গিয়াছে। দামোদর পরিকল্পনায় সস্তা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য এবং খনি অঞ্চল কলিকাতার সহিত জলপথে যুক্ত হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে এখনও প্রভূত শিল্পোন্নতি সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। শিল্পে ঋণ দিয়া সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় শিল্পীয় মূলধন সংস্থার ন্যায় পশ্চিমবঙ্গেও ২ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনসহ একটি শিল্পীয় মূলধন সংস্থা (Industrial Finance Corporation) গঠিত হইয়াছে।

কৃষিশিল্পের প্রসারের উপর দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধানের জন্য অবিলম্বে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার দরকার। পাকিস্তানের সহিত সম্পর্কের যত উন্নতি হইবে, পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যের তথা সাধারণ আর্থিক পরিস্থিতির ততই উন্নতি আশা করা যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গে ২০৯ মাইল জাতীয় সড়ক, ৪৫৩ মাইল রাজ্য সড়ক এবং ১৫০২ মাইল জেলা সড়ক তৈয়ারী হইয়াছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তার উন্নতি আরও হইবে। পথ ও পরিবহনের উন্নতি ঘটিলে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের নিঃসন্দেহে সুবিধা হইবে। সদ্ব্যবহার সম্ভব হইলে পশ্চিমবঙ্গের ৫২৫৬ বর্গমাইল অরণ্য সম্পদও এই রাজ্যের আর্থিক পুনর্গঠনে সহায়তা করিতে পারে।

আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের এক গুরুতর সমস্যা। পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পর পূর্ববঙ্গ হইতে যে বিপুলসংখ্যক লোক (সরকারী হিসাবে ৪০ লক্ষ) পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছে, তাহারা নিঃস্ব এবং একান্ত অসহায়। এই শরণার্থীদের পুনর্বাসনের দায় সরকারী অর্থনীতি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পুনর্গঠনে স্বভাবতঃই অসুবিধা হইতেছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত এই শরণার্থীদের জন্য ব্যয় হইয়াছে শুধু পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে ৮৬ কোটি টাকা। অবশ্য, বলা বাহুল্য, মানুষের শ্রমশক্তি মূল্যবান সম্পদ, শরণার্থীদের পুনর্বাসন সম্ভব হইলে ইহার সক্রিয় সহযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির সাফল্যে যথেষ্ট আনুকূল্য করিবে। তবে শরণার্থী সমাগম অব্যাহত ভাবে দিনের পর দিন চলিতেছে বলিয়া এবং সর্বভারতীয় সমস্যারূপে আশাপ্রদ স্বীকৃতি না পাইয়া পশ্চিমবঙ্গের উপর পুনর্বাসনের অতিরিক্ত চাপ পড়িতেছে বলিয়া কর্তৃপক্ষের দিক হইতে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কঠিন হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পূর্বপাকিস্তান হইতে ভারতে আগত শরণার্থীদের জন্য ৬৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত ইহাদের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ১৪৮ কোটি টাকা।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সহ সমাজসেবার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে কিছু উন্নতি দেখা গেলেও অবস্থা এত শোচনীয় যে, প্রয়োজনের হিসাবে এই উন্নতি অকিঞ্চিৎকর বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ২২৫৮৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬৯৮টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ১৫৫৬টি মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয় এবং ১২০টি বহুমুখী বিদ্যালয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সহ সমাজসেবা খাতে ২৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত এই খাতে ব্যয়িত হইয়াছে ৩০ কোটি টাকার কিছু বেশি। এই রাজ্যের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজসেবা খাতে ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে—ইহার মধ্যে স্বাস্থ্যে ১৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ও শিক্ষায় ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের যে লক্ষণীয় প্রসার ঘটিয়াছে, তাহাতে কৃষিজীবী ও গ্রাম্যশিল্পীদের উৎসাহিত হওয়ার কথা। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সমিতি ও সমবায় সমিতির সদস্যদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২,৯৪৬ ও ৬,৩৫,০০০ এবং এই সমবায় সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে এই সমবায় সমিতির ও সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৬,৬৮৬ ও ১০,৬০,৭৪৭ হইয়াছে এবং সমবায় সমিতির ও সমবায় সমিতি সমূহের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। সমবায় সমিতিগুলি আগের তুলনায় বর্তমানে ঋণদান ব্যতীত সমবায় আন্দোলনের অন্যান্য কল্যাণকর কার্যধারার দিকে যে অধিক দৃষ্টি দিতেছেন, ইহাও আশার কথা। অবশ্য এই উন্নতি সত্ত্বেও বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মত দরিদ্র

কৃষিজীবী ও গ্রাম্যশিল্পী বহুল রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের আরও অনেক প্রসার হওয়া দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়** প্রথমে বরাদ্দ হয় ৬৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা (দামোদর পরিকল্পনায় দেয় অর্থ বাদে), প্রথম পরিকল্পনায় এই সময় সমগ্র ভারতের হিসাবে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২,০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। কার্যকালে ভারতের বরাদ্দের পরিমাণও যেমন বাড়িয়া ২,৩৫৬ কোটি টাকায় উঠে, পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইয়া ৭২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা হয়। বিভিন্ন বিভাগের এই বরাদ্দ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

(কোটি টাকায়)

বিষয়	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ব্যয়িত	সংশোধিত বরাদ্দের অনুপাতে ব্যয়ের শতকরা হার
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	১০.৪৯	৮.৫২	৮.৮৭	১০৪.১
সেচ ও শক্তি উৎপাদন	১৬.১৩	১৫.৮০	১৫.১৭	৯৬.০
শিল্প	১.১৭	১.১৫	১.২০	১০৪.৩
পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫.৭৫	১৫.৫৪	১৫.২৩	৯৮.০
সমাজসেবা	২৫.৫৫	৩১.২৪	৩০.১৫	৯৬.৫
মোট :—	৬৯.০৯	৭২.২৫	৭০.৬২	৯৭.৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যের **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার** হিসাবে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনা কমিশনের নিকট ২৬৬ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। পরিকল্পনা কমিশন প্রথমে ১৬১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা অনুমোদন করিলেও পরে অর্থাভাবের জন্য পরিকল্পনার শতকরা ৫ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দ দাঁড়ায় ১৫৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা (দামোদর পরিকল্পনার হিসাবে দেয় ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা সমেত)। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুমতি দিয়াছেন, যদি পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৩৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত রাজস্বের অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতিরিক্ত পরিকল্পনায় হাত দিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নিম্নোক্তভাবে ব্যয় করা হইবে বলিয়া ধরা হয় :—১৯৫৬-৫৭—৪৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা, ১৯৫৭-৫৮—

৩০ কোটি ১ লক্ষ টাকা, ১৯৫৮-৫৯—৩০ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা, ১৯৫৯-৬০—২৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬০-৬১—২২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা।

অতঃপর বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে অংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহার পরিকল্পনা বাবদ ৪ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে যুক্ত হইয়াছে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ ১৫৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা (অনুমিত মোট ব্যয় ৪৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বরাদ্দ ১৩ কোটি টাকা), বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, গ্রাম পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের জন্য ৬৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের কথা আগেই বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গে ৭৫ হাজার একরের মত পতিত জমি উদ্ধার করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে মোট ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিদেশী যন্ত্রপাতি পশ্চিমবঙ্গে আমদানী হইবে। পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাসমূহের ও সহরাঞ্চলের উন্নতিকল্পে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এছাড়া দুর্গাপুরের কোকচুল্লি পরিকল্পনায় যে ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে। এই পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের হিসাবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, অরণ্য ও ভূমি সংরক্ষণের হিসাবে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, ডেয়ারী শিল্প ও দুগ্ধ সরবরাহ খাতে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, গৃহনির্মাণ খাতে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা এবং সাংস্কৃতিক খাতে ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে যে ১৫৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, তাহার মোটামুটি হিসাব লিপিবদ্ধ হইল :—

১। **কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন**	৩৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা
(ক) কৃষি	১৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা
(খ) জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা

২। **সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি**	৩০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
(ক) সেচ ব্যবস্থা	১৭ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা
(খ) বৈদ্যুতিক শক্তি	১২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা
৩। **শিল্প ও খনি**	৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা
(খ) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা
৪। **পরিবহন ও যোগাযোগ**	১৯ কোটি ৩ লক্ষ টাকা
(ক) রাস্তা	১৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
(খ) রাজপথ পরিবহন	১ কোটি ৯৩ লক্ষ ধাকা
৫। **সমাজসেবা**	৫২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা
(ক) শিক্ষা	২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
(খ) স্বাস্থ্য	১৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা
(গ) গৃহনির্মাণ	৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
(ঘ) অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন	১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা
(ঙ) সমাজ কল্যাণ	— ৩৭ লক্ষ টাকা
(চ) শ্রমিক ও শ্রমিক কল্যাণ	১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
৬। **বিবিধ** (বিহার হইতে প্রাপ্য এলাকার বরাদ্দ সহ)	১৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা
মোট	১৫৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা

আগেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। তাহাদের এই অনগ্রসরতার কারণ শুধু তাহাদের সংস্কৃতিমূলক মনোভাব, পরিশ্রম-বিমুখতা, অল্পে আত্মসন্তুষ্টি, কোনপ্রকার ঝুঁকি না লইবার দৃষ্টিভঙ্গি—এসবই নয়, মূলধনের অভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, হাতে কলমে শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষার সুযোগের অভাব—এগুলিও বড় কথা। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্মেলনে স্বয়ং পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন যে, 'পশ্চিমবঙ্গের চটকলে, পাটকলে, কাপড়কলে, কয়লা খনিতে, চা বাগানে প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পে মোট চাকুরীর শতকরা ৬০ ভাগ অবাঙ্গালীর করায়ত্ত।' বলা বাহুল্য অবস্থা এইরূপ চলিলে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি ?*

* ২৩।৪।৫৯ তারিখে বারাকপুরে কর্মনিয়োগ উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রী আবদুস সাত্তার বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষিত বেকার আছেন।

অবশ্য যুদ্ধোত্তরকালে, বিশেষ করিয়া দেশবিভাগ জনিত শরণার্থী সমাগমের পর হইতে বাঙ্গালীদের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের চেতনা লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সময় সরকারী এবং বেসরকারী চেষ্টায় বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো পরিবর্তন খুবই সম্ভব। এজন্য প্রয়োজনীয় শিল্পবাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবাণিজ্যে বাঙ্গালীর অগ্রাধিকারের দাবী প্রাদেশিকতা নয়, দুর্গত পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার অনুপূরক, সংশ্লিষ্ট সকলেরই একথা মানিয়া লইবার দিন আসিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারের উচিত পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা বা কারবারগুলির কাজকর্ম লক্ষ্য করা এবং বাঙ্গালীর সুযোগ সুবিধার নিরিখে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করা। প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা যোগ্যতাপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব অধিবাসীকে (শরণার্থী সমেত) শিল্পবাণিজ্যে প্রাথমিক মূলধন যোগানে সরকারী কর্তৃপক্ষকে অপেক্ষাকৃত উদার হইতে হইবে। উপরোক্ত পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্মেলনের একটি প্রণিধানযোগ্য প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যবসায়-উদ্যোগী (বাঙ্গালী) প্রারম্ভিক পুঁজির শতকরা ২৫ ভাগ সংগ্রহ করতে পারিলে অবশিষ্ট শতকরা ৭৫ ভাগের ব্যবস্থা 'ইনডাসট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন' 'স্টেট্ ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন' 'ইন্ডাসট্রিয়াল ক্রেডিট্ এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন' প্রভৃতির দ্বারা হওয়া উচিত।

ভারতে বিদেশী মূলধন

(Foreign Captial in India)

ভারতে ঠিক কি পরিমাণ বিদেশী মূলধন খাটিতেছে, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবেষণা বিভাগের ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে এই পরিমাণ ৩২০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা (বাজার দর ৫১৯ কোটি টাকা) বলা হইয়াছে।* ইহার মধ্যে একা ব্রিটেনের অংশ ২৩০ কোটি টাকা। মনে হয় কারবারী সম্ভ্রমসহ বাজার দর খুবই কম ধরিয়া এ হিসাব করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এখনও ভারতে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা।

বিদেশীরা ঋণ এবং কারবারী মূলধন উভয় হিসাবেই ভারতে অর্থ বিনিযোগ করিয়াছে। ঋণ দেওয়া হইয়াছে সরকারী ও আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে, মূলধন যোগান হইয়াছে পূর্ণ বিদেশী কোম্পানীতে, ভারতীয় ও বিদেশীদের পার্টনারসিপে গঠিত কোম্পানীতে এবং পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবমত উপরোক্ত ৩২০ কোটি টাকা বিদেশী মূলধনের মধ্যে চা শিল্পে ৫২ কোটি টাকা, তৈলশিল্পে ২২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎশিল্পে ১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, পাটশিল্পে ১৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা এবং বস্ত্রশিল্পে ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা নিয়োজিত। ভারতে রেলপথ বসানো ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে ভারত সরকার বিদেশ হইতে, বিশেষতঃ ইংলণ্ড হইতে যে ঋণ সংগ্রহ করেন, যুদ্ধকালীন সঞ্চিত স্টার্লিং পাওনা হইতে তাহা প্রায় শোধ হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নীর পরিমাণ ছিল খাতাপত্রে ৪১ কোটি টাকার মত।

ভারতে নিয়োজিত বিদেশী মূলধনের অধিকাংশই পাটশিল্প, চা ও কফি বাগান, পেট্রোল, কয়লা, স্বর্ণ প্রভৃতির খনি, বিভিন্ন বে-সরকারী রেলপথ, ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, জাহাজী কারবার, চামড়ার কারখানা, চিনির কল, কাপড়ের কল, মদ তৈয়ারীর কারখানা, পশমের কল প্রভৃতিতে নিয়োজিত

* ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের এক হিসাবে ভারতে লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ খাতাপত্রে (Book value) ৪৮১ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহার শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবসাবাণিজ্যে লগ্নী এবং ইহার মধ্যে ব্রিটেনের অংশ ৩৯২ কোটি টাকা।

আছে। তাছাড়া ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির ম্যানেজিং এজেণ্ট হিসাবে কাজ করে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠানেও বহু পরিমাণ বিদেশী মূলধন খাটিতেছে। ভারতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পর অনিশ্চিত অবস্থার আশঙ্কায় একশত কোটি টাকার বেশি মূলধন বিদেশীগণ ভারতীয়দের নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন। তবে বর্তমানে অবস্থা অনেকটা অনুকূল হওয়ায় আবার কিছু কিছু বিদেশী মূলধন ভারতে নিয়োজিত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে—এই দুই বৎসরে ৬১ কোটি টাকার নূতন বিদেশী মূলধন ভারতের শিল্পবাণিজ্যে লগ্নী হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে দেশীয় শিল্পাদি যখন গড়িয়া উঠে নাই, সেই সময়ই অধিকতর পরিমাণ বিদেশী মূলধন এদেশে আমদানী হইয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী কালে ভারতে দেশীয় মূলধনে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের প্রচেষ্টা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগেও ভারতে শিল্পপ্রচেষ্টা গতিলাভ করিয়াছিল। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় পরিচালকদের কোন কোন ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা ও দায়িত্বহীনতার জন্য কয়েকটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে ভারতে বিদেশী মূলধনের আমদানী ও প্রভাব অবশ্যই আরও কমিয়া যাইত। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্প প্রভেদাত্মক সংরক্ষণের সুবিধা পায়। ইহার ফলে ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগ নীতি আরও সাফল্যলাভ করে। এই সংরক্ষণ সুবিধার জন্য ১৯২৯-৩২ খ্রীষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দার চাপও ভারতীয় শিল্পাদি কাটাইয়া উঠে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পণ্যাভাব ও চড়া বাজারের সুযোগে ভারতে শিল্পোন্নতি দ্রুত হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতের স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠায় যত মূলধন বিনিয়োগ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভারতীয়।

ভারতের শিল্পবাণিজ্যে অধিকতর পরিমাণ ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগের যে আগ্রহ বর্তমানে দেখা যাইতেছে, তাহা অবশ্যই ভারতের শিল্প-সমৃদ্ধিকামী প্রত্যেকের মনে আশার সঞ্চার করিবে। তাছাড়া এখন বিদেশী প্রতিষ্ঠান-সমূহের জাতীয়করণ সম্পর্কেও ভারতে বড় রকমের একটি আন্দোলন সুরু হইয়াছে। এইরূপ আন্দোলনকারীদের মতে শুধুমাত্র ভারতস্থ ব্রিটিশ সম্পত্তি

জাতীয়করণের দ্বারা বাৎসরিক প্রায় ৮০ কোটি টাকা আয় হইতে পারে। বাস্তবিক কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী বা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের মত লাভজনক প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইলে পারিশ্রমিক, মুনাফা ও আয়কর হিসাবে প্রতিবৎসর অজস্র পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে পারিবে না এবং সেই টাকা এদেশের উপকারে আসিবে। তবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও যুদ্ধোত্তর ফাঁপা বাজারের হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা ও সাবধানতা যে আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতের ন্যায় বিশাল ও দরিদ্র দেশের আর্থিক পুনর্গঠন করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এই যুক্তিতেই ভারত সরকার (পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারও) বর্তমানে নিজ এলাকায় জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে বিদেশী মূলধন আমদানীতে বাধা না দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কথা হইতেছে, এই মূলধন যতটা সম্ভব ঋণ হিসাবে নির্দিষ্ট সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতেই সংগ্রহ করা উচিত এবং কোন সময়েই মূলধন বিনিয়োগকারী বিদেশীদের ভারতস্থ প্রতিষ্ঠানে সর্বাত্মক কর্তৃত্বাধিকার থাকা উচিত নয়। দেশী বিদেশী সব প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়দের শিক্ষার্থী হিসাবে গ্রহণের ব্যবস্থা হওয়াও দরকার। মোটের উপর জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল না হইলে বিদেশী মূলধনে ভারতের সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা সমর্থনযোগ্য। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচয়িতা পরিকল্পনা কমিশনও এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই বোম্বাই পরিকল্পনায় ৭০০ কোটি টাকা বিদেশী অর্থ ধরা হইয়াছিল। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদেশী অর্থ ধরা হইয়াছিল ১৫৬ কোটি টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারত বিদেশ হইতে ৩৭৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। অবশ্য ইহার সব টাকা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে খরচ হয় নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা কালের প্রতিশ্রুত বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের অব্যয়িত অংশ ব্যয়িত হইতেছে। তাছাড়া এই সময় যে অর্থের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে তাহারও বহুলাংশ এই পরিকল্পনাকালে ব্যয়িত হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনাকালে ৮০০ কোটি টাকা বিদেশী অর্থ সংগৃহীত হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম

দিকের মধ্যেই এই পরিকল্পনাকালের হিসাবে ১০১৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।*

ভারতে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের ফলে ক্ষতি অনেক হইয়াছে বটে, তবে লাভও কম হয় নাই। এদেশ হইতে পারিশ্রমিক ও মুনাফা হিসাবে অবিশ্বাস্য পরিমাণ টাকা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, বিদেশীরা কাজ-কারবার চালাইতে আসিয়া ভারতের রাজনীতির উপর প্রভাব-বিস্তার করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতাসূচক আর্থিক উন্নতির প্রয়াসে বাধা দিয়াছেন, এবং পারতপক্ষে এদেশবাসীকে সংশ্লিষ্ট শিল্পবাণিজ্যে দায়িত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেন নাই,—ইহা হইল ক্ষতির দিক। পক্ষান্তরে ভারতে বৈদেশিক মূলধন নিয়োজিত হইবার ফলেই চা, পাট প্রভৃতি নানা নূতন সমৃদ্ধ শিল্প এদেশে গড়িয়া উঠিয়া পৃথিবীর বাজার দখল করিয়াছে, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় খনি ও কলকারখানার কাজ সুরু হইয়াছে, অল্প হইলেও বিদেশী প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতীয়গণ শিল্পবাণিজ্যের শিক্ষালাভ করিয়াছেন, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বা সাফল্য দেখিয়া এদেশবাসীও দেশীয় যৌথ কারবার সংগঠনে বা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইয়াছে, বিদেশীদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয়দের মন কূপমণ্ডূকতা হইতে কিছুটা মুক্তি পাইয়াছে,—ভারতের আর্থিক ভবিষ্যতের বিবেচনায় এসব লাভ অবশ্যই উপেক্ষণীয় নয়।

ভারতে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া মোটামুটি জাতীয়

---

* ভারতকে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য: (কোটি টাকায়)

	সূত্র	প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে প্রতিশ্রুত	প্রথম পরিকল্পনা-কালে প্রতিশ্রুত	দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে প্রতিশ্রুত	১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যয়িত
১।	বিশ্বব্যাঙ্ক	২৭·০০	৩০·৬৯	১৮৩·৭৬	১৪৩·৩৯
২।	বৈদেশিক রাষ্ট্র		১৫৩·৩৮	২৫৫·৭০	১৭৩·৬৯
৩।	ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান			৯২·০৯	৫·৩৩
৪।	টি. সি এ. এবং মার্কিন উন্নয়ন ঋণ (টাকায় পরিশোধিতব্য)		৩৯·২৮	১১৫·৪৮	৩৫·৪২
৫।	পি. এল ৪৮০ সাহায্য			২৭০·৬৭	১৬০·০৯
৬।	দাতব্য		১৫৪·৩৪	১০০·৫৯	১৭১·৯৪
	মোট	২৭·০০	৩৭৭·৬৯	১০১৮·২৯	৬৮৯·৮৬

স্বার্থের নিরিখে ভারতসরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষিত শিল্পনীতিতে বিদেশী মূলধন সম্পর্কে নিম্নরূপ নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন :—

(১) ভারতে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ ও বিদেশী শিল্পোদ্যম জাতীয় স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনাভার ভারতীয়দের হাতে থাকিবে। এইসব শিল্পে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরিবর্তে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্ভব করিতে যোগ্য ভারতীয়দিগকে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে ;

(২) ভারতের সাধারণ শিল্পনীতি প্রয়োগক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য থাকিবে না ;

(৩) ভারতের বৈদেশিক তহবিলের অবস্থা অনুসারে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও মুনাফা ভারতের বাহিরে লইয়া যাইবার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ দেওয়া হইবে ;

(৪) বিদেশী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণের সময় ন্যায্য ও সমতাসূচকহারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

ভারতে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অনুসন্ধানাদির জন্য ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিটি (External Capital Committee) নিযুক্ত হয়। এই কমিটি স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা বিদেশীরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা অপচেষ্টা করে এবং ইহার ফলে দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়।*

এই বৈদেশিক মূলধন কমিটি ব্যতীত ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'ভারতীয় রাজস্ব কমিশন'ও (Indian Fiscal Commission) এদেশে বিদেশী মূলধন নিয়োগকারীদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে সমালোচনা করেন।

বিদেশী মূলধনের সাহায্য গ্রহণ ভারতের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরিহার্য। তবে মূলধন বিনিয়োগের কুফল বিদূরিত করিতে নিঃসন্দেহে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজন :—

(১) বিদেশী মূলধন প্রধানতঃ সুদের ভিত্তিতে ঋণ হিসাবে সংগৃহীত হইবে এবং এই সুদের হার নির্দিষ্ট হইবে।

* The vested interests created by external capital have a tendency to acquire enormous political influence which is usually exercised for the purpose of maintaining the status quo and of vigorously resisting any political progress.

(২) মূলধন বিনিয়োগে এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠায় ভারতীয়রা যাহাতে বিদেশীদের সমান সুযোগ পায়, তজ্জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। কোনরূপ বিদেশী মুদ্রায় ইহাদের হিসাব রক্ষা চলিবে না। কারবারের আয়কর এদেশেই দিতে হইবে।

(৩) বৈদেশিক মূলধন-সমন্বিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় অংশীদার এবং আনুপাতিক হারে ভারতীয় পরিচালক গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) খনি প্রভৃতি পরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ বিশিষ্ট কোন শিল্পের উপর বিদেশীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। দেশের আর্থিক সম্ভ্রম এবং দেশ-রক্ষা সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা যে সব শিল্পের উপর নির্ভর করে সেগুলি সম্বন্ধেও এই নীতি প্রযোজ্য হইবে।

(৫) দেশবাসীর সাধারণ স্বার্থ যে সব প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত (ট্রাম কোম্পানী, রেল কোম্পানী, ইলেকট্রিক কোম্পানী প্রভৃতি), সেইগুলির পরিচালনায় ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য কার্যকরী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৬) গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে ভারতীয় শিক্ষানবিশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই শিক্ষানবিশদের নিয়মিত বৃত্তি বা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

(India's Foregin Trade)

শিল্পক্ষেত্রে ভারত অনগ্রসর দেশ। অবশ্য এদেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুলভ শ্রমসম্ভার শিল্পপ্রসারে যথাযথ ব্যবহৃত হইলে ভারত এতদিনে অনায়াসেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশরূপে পরিগণিত হইতে পারিত। দুঃখের বিষয়, এতকাল ভারত ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী জাপান প্রভৃতি দেশে তাহার কাঁচামালের অধিকাংশ রপ্তানি করিয়াছে এবং সেই কাঁচামাল হইতে তৈয়ারী শিল্পপণ্যসমূহ আমদানী করিয়া চতুর্গুণ মূল্যে ক্রয় করিয়াছে।

তবু যে ইংরেজ আমলে বাণিজ্যিক গতি ভারতের অনুকূলে ছিল, রপ্তানীকৃত কাঁচামালের প্রাচুর্য ছাড়া তাহার আর একটি কারণ,—আর্থিক অসাচ্ছল্যের জন্য ভারতবাসী যথেষ্ট পরিমাণে আমদানীকৃত ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করিতে পারে নাই। শিল্পপ্রসার না হইলে ভারতের ন্যায় বিপুলায়তন ও জনবহুল দেশে দেশবাসীর আর্থিক স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই সৃষ্টি হইতে পারে না। কৃষিজীবী দেশের অধিবাসী হিসাবে ভারতবাসীর ক্রয়ক্ষমতা একান্ত সীমাবদ্ধ।

ভারত হইতে প্রধানত পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, তৈলবীজ, মশলা, তামাক, তুলাজাত দ্রব্য, বিভিন্ন খনিজ, বিবিধপ্রকার ফল, কাঁচা চামড়া, কয়লা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয় এবং যন্ত্রপাতি, তুলা, খাদ্যশস্য, পেট্রোলাদি খনিজ তৈল, রাসায়নিক পণ্য, মদ, সিগারেট, ঘড়ি, সাইকেল, কাঁচের জিনিসপত্র, মোটর গাড়ী, রেডিও, রেলইঞ্জিন প্রভৃতি নানাপ্রকার পণ্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। যুদ্ধের আগে কাঁচামাল ছিল ভারতের প্রধান রপ্তানী পণ্য, যুদ্ধের মধ্যে সুযোগ সুবিধা পাইয়া ভারতে কিছু শিল্পপ্রগতি হওয়ায় কাঁচামাল ঠিক আগের মত রপ্তানী হইতেছে না। স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় আর্থিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের আমদানীও লক্ষণীয়ভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের হিসাবে গত কয়েক বৎসর ভারত খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী জোর দিয়াছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় অংশ ব্রিটেনের। ব্রিটেনের পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। যুদ্ধের পরে কিছুদিন জাপান ও জার্মানীর

বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হয়, এখন ক্রমেই তাহারা হৃতস্থান ফিরিয়া পাইতেছে। ভারতের বহির্বাণিজ্যে জাপানের ও জার্মানীর স্থান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পাকিস্তান, কানাডা, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্য চলে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী কয়টি প্রধান প্রধান দেশের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :--

আমদানি বাণিজ্য—(কোটি টাকায়) ব্রিটেন—২৩৮·৫০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—১৭০·৩২, ইরাণ—৫৫·৪০, পশ্চিম জার্মানী—১২২·৮২, জাপান—৫৪·৪২, ফ্রান্স—২৮·৬৯, সোভিয়েট রাশিয়া—২২·৬৮, পাকিস্তান—১৩·৪০।

রপ্তানী বাণিজ্য—(কোটি টাকায়) ব্রিটেন—১৬০·১১, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—১৩১·৩৯, পাকিস্তান—৬·৬৮, জাপান—২৭·২১, সোভিয়েট রাশিয়া—১৭·৪৮, পশ্চিম জার্মানী—১৬·০৯, কানাডা—১৩·৯২, ব্রহ্মদেশ ১৩·১৯, ফ্রান্স—১০·১৮।

দেশের সমৃদ্ধির সহিত বহির্বাণিজ্যের প্রসার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার ফলে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি যদি সম্ভব হয়, ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণও নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাইবে। কেহ কেহ মনে করেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করিলে ভারতের বহির্বাণিজ্য, বিশেষ করিয়া আমদানী বাণিজ্য লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাইবে। কিন্তু জাপানের অগ্রগতির হিসাব অনুধাবন করিলে দেখা যায়, এধারণা ঠিক নয়। ভারতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়া এদেশবাসীর আর্থিক সাচ্ছল্য যদি বাড়ে, সেক্ষেত্রে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে। তখন ভারত হইতে বিদেশে শিল্পজাত পণ্যসমূহ রপ্তানীর সুযোগ যেমন বেশি হইবে, প্রয়োজনের বৈচিত্র্যে ও বিস্তারে বাজার প্রসারিত হইবে বলিয়া ভারতে বিদেশী পণ্য আমদানীও সেইরূপ বর্তমানের হিসাবে সঙ্কুচিত হইবে না।

স্বাধীনতালাভের পর হইতে বহির্বাণিজ্যের গতি বরাবর ভারতের প্রতিকূলে রহিয়াছে। অবশ্য সমগ্রভাবে দেখিলে কয়েক বৎসর আগের তুলনায় বর্তমানে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতিতে হতাশার পরিমাণ কমিতেছে বলা চলে। কারণ এখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বিদেশ হইতে অধিকতর

পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানীতে যে বাণিজ্যের গতির প্রতিকূলতা ঘটিতেছে, দেশের স্থায়ী স্বার্থের দিক হইতে তাহা অবশ্যই ততটা আতঙ্কের নয়। তবে যে কারণেই হউক, রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বাণিজ্য বেশী হইলে ভারতকে তাহার স্টার্লিং তহবিল কমাইতে হইবে এবং এই স্টার্লিং তহবিল একটানা কমিতে থাকাও স্বস্তিকর নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অধিকতর পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য যাহাতে বৃদ্ধি পায়, ভারতসরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'রপ্তানী প্রসার কমিটি' (Export Promotion Committee) তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদের ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে পণ্যের মান-উন্নয়ন করিবার ও বাণিজ্য প্রথার জটিলতা হ্রাস করিবার সুপারিশ করেন। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এদেশে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ৫ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া একটি 'রপ্তানী বীমা কর্পোরেশন'ও (Export Risks Insurance Corporation) গঠিত হইয়াছে। বিদেশী মুদ্রার অভাবে যথাসম্ভব আমদানী কমাইবার জন্য ভারতসরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'আমদানী উপদেষ্টা পরিষদ' বর্তমানে নানাদিক হইতে চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দ ছিল খুবই দুর্বৎসর। এই বৎসর ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট বেশি ছিল, কিন্তু আমদানী আরও বেশি হওয়ায় ঘাটতি দাঁড়ায় ২১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রচণ্ড খাদ্যাভাবের জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে ২১৬ কোটি টাকা মূল্যের ৪৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইয়াছিল। বর্তমানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকারিতার জন্য বিদেশ হইতে আমদানী বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী হিসাব একত্রে ধরিয়া জলপথ, স্থলপথ ও আকাশপথে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত কয়েক বৎসরের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

কোটি টাকার হিসাবে : চালানী বাণিজ্য (Transit trade) বাদে

বৎসর	আমদানী	রপ্তানী	ঘাটতি
১৯৫০-৫১	৬২৩·৩৬	৬০১·৩৫	২২·০১
১৯৫১-৫২	৯৪৩·১৩	৭৩২·৯৯	২১০·১৪

বৎসর	আমদানী	রপ্তানী	ঘাটতি
১৯৫২-৫৩	৬৬৯'৮৮	৫৭৭'৩৭	৯২'৫১
১৯৫৩-৫৪	৫৭১'৯৩	৫৩০'৬২	৪১'৩১
১৯৫৪-৫৫	৬৫৬'২৬	৫৯৩'৫৪	৬২'৭২
১৯৫৫-৫৬	৭০৪'৮১	৬০৯'৪১	৯৫'৪০
১৯৫৬-৫৭	৮৩২'৪৫	৬১২'৫২	২১৯'৯৩
১৯৫৭-৫৮	৯২৭'১৯	৬৩৭'৪৩	২৮৯'৭৬

ভারতে যে সব পণ্য প্রধানত আমদানী হয় এবং ভারত হইতে প্রধানত যে সকল পণ্য রপ্তানী হয়, পূর্বেই তাহাদের মোটামুটি উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের স্বরূপ বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে এইরূপ পণ্যের তালিকা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল :—

আমদানী—(কোটি টাকার হিসাবে) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বাদে অন্যান্য যন্ত্রপাতি—১৭১'৮৩, লৌহ ও ইস্পাত—১৪৬'৯৮, পেট্রোলজাত পণ্য—৭৭'৭৬, পরিবহন সরঞ্জাম—৭৫'৮১, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম—৬১'১৪, কাঁচা তুলা—৪৮'৬২, গম—৩৪'৭৫, পেট্রোল—২৯'৭৫, রাসায়নিক পণ্য—৩৭'১৩, খনিজ পণ্য—২২'৫৪, সূতা—১৯'১৫, সমর সরঞ্জাম—১৮'৫৩, তাম্র—১৭'৯৪, চাউল—১৬'৯০, ঔষধপত্র ও চিকিৎসা-সরঞ্জাম—১৬'৩৯, ফল ও বাদাম—১৫'৮৪, পশম—১২'৯৮, কাগজ ও বোর্ড—১২'১৪, রঙ ও নীল—১০'৮৯, এ্যালুমিনিয়াম—৮'০১, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য—৭'৯৯, দস্তা—৭'২৩, কাঁচা পাট—৭'২০, খনিজ—৬'৬৯, বনস্পতি—৫'২১ ; মোট—১০২৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।*

রপ্তানী—(কোটি টাকার হিসাবে)—চা—১২৩'৪০, তুলাজাত বস্ত্র—৬৫'১৯, তুলাজাত নহে এমন বস্ত্র—৫৯'৯৮, কাপড় ও পদাচ্ছাদনী ব্যতীত অন্যান্য সূতিজাত পণ্য—৫৮'২৯, রৌপ্য ও প্ল্যাটিনাম শ্রেণীর ধাতু—৩৭'৬৭, পাকা চামড়া—২১'৫৮, কাঁচা তুলা—১৮'৬৬, ফল ও বাদাম—১৬'০৪, অপরিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ তৈল—১৪'৪০, পশম—১২'৯৩, চিনি—১২'৮৮, লৌহমাক্ষিক—১১'৬৭, তামাক—১১'৫৯, বনস্পতি—১১'৪২, অপরিশুদ্ধ খনিজ—১১'৩০, সূতা—

* প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে সরকারের নিজস্ব হিসাবে (Government Account) ১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ (এপ্রিল—সেপ্টেম্বর) খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আমদানী হইয়াছে যথাক্রমে ১৩৮'৯, ২৯১'৩, ৪৯২'৯ ও ২৫০'৪ কোটি টাকার পণ্য। ইহার মধ্যে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য ছিল যথাক্রমে ২৮'৯, ১০১'৬, ১৫২'৬ এবং ৫৩'৮ কোটি টাকা।

৯·৭৮, কার্পেট, সতরঞ্জ ইত্যাদি আচ্ছাদনী—৮·৮৪, কফি—৭·৭৩, কাঁচা চামড়া—৬·৯৯, পেট্রোলজাত পণ্য—৬·৬২, কয়লা—৫·৩৪ ; মোট (পুনর্বাণিজ্য ব্যতীত)—৬৩৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা।

ভারতের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারে দ্রুত ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ভারতসরকারও এ বিষয়ে অবহিত বলিয়া ইতিমধ্যে বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, খয়ের, মরিচ প্রভৃতির জন্য কয়েকটি রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ (Export Promotion Council) গঠন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে জাপানের পরাজয় এবং পূর্ব-গোলার্ধে শ্বেতশক্তির মর্যাদাহানির জন্য প্রাচ্যের বাজার এখনও কিছুটা অরক্ষিত। এসময় ভারতের পক্ষে প্রাচ্যের পণ্যবাজারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করা স্বাভাবিক। বিশেষ করিয়া ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী পাকিস্তান, ব্রহ্ম ও সিংহলের বাজারে ভারতের সুযোগ সুবিধা প্রচুর। জাপান দ্রুত হৃতগৌরব ফিরিয়া পাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াও প্রাচ্য-বাজার দখলে সচেষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি এই বিরাট বাজারে অবশ্যই নিবদ্ধ। রপ্তানী বাণিজ্যের উপর ব্রিটেনের জীবিকা নির্ভর করে বলিয়া ব্রিটেনও প্রাচ্যের বাজার হারাইতে চাহে না। এ অবস্থায় রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের যে কোন সুযোগ হারানোই ক্ষতিকর। তাছাড়া ভারত যদি সজাগ না থাকে, তাহার নিজের বাজারের উপরও এইসব বিদেশী প্রতিযোগীরা প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারতের আর্থিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে আমদানী বাণিজ্য যত সঙ্কুচিত হয় ততই মঙ্গল। এজন্য অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বা বিলাসপণ্য কম আমদানী হইলেও ক্ষতি নাই। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন মন্ত্রীকে বিদেশী দ্রব্য যথাসম্ভব কম আমদানীর জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। ঐ সময়েই ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইও দেশবাসীকে অনুরূপ অনুরোধ জানাইয়াছেন।*

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত নীতির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে :—

* "It will be necessary for us to think more and more of getting things which are necessary for development rather than for enjoyment. Things for enjoyment should be produced, but if we cannot produce them, we should go without them for the time being."

(১) ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গতির সীমার মধ্যে বহির্বাণিজ্যের দায় সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে ;

(২) বহির্বাণিজ্য এমন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে পরিকল্পনার অর্থব্যবস্থা ও পণ্যমূল্যনীতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকে ;

(৩) বাণিজ্যনীতি যথাসম্ভব স্থায়ী করিতে হইবে ;

(৪) রপ্তানী বাণিজ্যের যথাসম্ভব সম্প্রসারণ করিতে হইবে ;

(৫) বাণিজ্যনীতি এমনভাবে কার্যকরী করিতে হইবে যাহাতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পণ্য উৎপাদন ও পণ্য ব্যবহারের লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সাহায্য হয়।

ভারতে শরণার্থী সমস্যা

(Refugee Problem in India)

ভারত বিভাগের ফলে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে এক কোটির মত অমুসলমান ভারতে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন, ইহার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আসিয়াছেন আনুমানিক ৫৫ লক্ষ এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছেন আনুমানিক ৫০ লক্ষ।* ভারত হইতেও প্রায় ৪০ লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন, তবে অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ইহাদের কিছু ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারত হইতে যে সব মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বর্তমান পূর্বপাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ বা বিহারের অধিবাসী। পাকিস্তান ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে পূর্বাহ্ণেই একটি চুক্তি সম্পাদিত হইযাছিল, ইহা পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সমাধানে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। পূব পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা গোড়ার দিকে পশ্চিমাঞ্চলের মত এতটা জটিল ও ব্যাপক না হইলেও এই নিরুপায় হতভাগ্যদের জীবনধারণের জন্য দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গের বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম হইতে তাহাদের প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি দেখান নাই। বলিতে গেলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিক হইতে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে তৎপর হইয়াছেন।

আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা এত বিরাট যে, পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্বপাঞ্জাব ইহাদের কাহারও পক্ষেই পৃথকভাবে এই ভার সম্পূর্ণ বহন করা সম্ভব নয়। এই অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়াই ভারত সরকার শরণার্থী সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে স্বীকার করেন এবং পুনর্বাসনের জন্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতকে মূলত (১) পূর্বপাঞ্জাব, (২) বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ, (৩) উত্তরপ্রদেশ ও বিহার, (৪) দিল্লী ও রাজপুতানা এবং (৫) পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা—এই পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

এই ব্যবস্থা অনুসারে পশ্চিমপাকিস্তানের অধিবাসীরা প্রথম চারিটি অঞ্চলে ছড়াইয়া যান এবং কতকটা সরকারী সাহায্যে ও কতকটা নিজেদের সাহস ও

* সরকারী হিসাবে অবশ্য ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিমপাকিস্তান হইতে ৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার এবং পূর্বপাকিস্তান হইতে ৪১ লক্ষ ১৭ হাজার শরণার্থী ভারতে আসিয়াছেন।

আত্মনির্ভরশীলতার জন্য পুনর্বাসিত হন। ত্রিপুরা ছাড়া পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীরা তবু আসামকে কিছুটা মানাইয়া লইয়াছে, উড়িষ্যায়, বিহারে বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে তাঁহাদের অনেকেরই প্রবল অনিচ্ছা। মোটের উপর পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের সর্বাধিক চাপ পড়িয়াছে পশ্চিমবঙ্গে এবং কর্মসংস্থানের আশায় বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সহরাঞ্চলগুলিতে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী করাচীতে যে আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তি হয়, তদনুসারে আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পত্তি রক্ষার ও সম্পত্তি নষ্ট হইলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু এই চুক্তির সুবিধা কার্যত আশ্রয়প্রার্থীরা খুব কমই পাইয়াছেন। আগেই বলা হইয়াছে, ভারত সরকার পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনে প্রথম হইতেই উদারতা দেখান।* কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীরা প্রথম দিকের সংকটময় দিনগুলিতে খুব কমই সরকারী করুণা লাভ করিয়াছিল।

শরণার্থী সমস্যার অপ্রত্যাশিত দ্রুত ব্যাপকতা সংশ্লিষ্ট সকলকেই অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ যে সব ব্যবস্থা করিয়াছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা নিশ্চিত সাফল্যের আত্মবিশ্বাসে প্রদীপ্ত না হইয়া কতকটা পরীক্ষামূলক রূপ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে অপচয়ও হইয়াছে অনেক ক্ষেত্রে।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রিগণ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে আশ্রয়দানের মত আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা স্থির করেন। এই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যা লইয়া গঠিত পূর্বোল্লিখিত অঞ্চলে ১০ লক্ষ শরণার্থীর আশ্রয় হইবে বলিয়া ধরা হয়। উড়িষ্যায় পুনর্বাসনের অসুবিধা ছাড়াও শরণার্থীর প্রকৃত সংখ্যা উপরোক্ত হিসাবের অনেক বেশি হওয়ায় স্বভাবতই পুনর্বাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলারক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। এই সময় আন্দামানে কিছু আশ্রয়প্রার্থী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

---

* ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের প্রথম (অন্তর্বর্তীকালীন) বাজেট পেশ প্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থসদস্য শ্রী সন্মুখম্ চেট্টি ঘোষণা করিয়াছিলেন :—

"Financial considerations should not stand in the way of affording relief to these unfortunate people and in alleviating their sufferings in one of the most poignant of human tragedies that could take place outside a war."

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে "পশ্চিমবঙ্গ ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনা বিল" নামে যে আইনের খসড়াটি গৃহীত হয়, তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। এই বিলের লক্ষ্য হিসাবে বলা হইয়াছিল :—(১) আপন আয়ত্তাতীত কারণে যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা; (২) উপনগর নির্মাণ করা; (৩) সহর ও গ্রামাঞ্চলে উন্নততর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা; এবং (৪) কৃষি, বন ও মৎস্য বিভাগের এবং শিল্পাদির উন্নতি সাধন করা। ইহা ব্যতীত পূর্ববঙ্গের ২ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য ২৪ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা রচিত হয়।

অতঃপর শুধু সরকারী ভাবে নয়, বে-সরকারী ভাবেও শরণার্থী পুনর্বাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সর্বত্র উদ্বেগ দেখা যায়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পুনর্বসতি সম্মেলনে ডাঃ মেঘনাদ সাহা কর্তৃক উত্থাপিত এবং ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সমর্থিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল :—

(১) বাস্তুচ্যুত লোকদের শ্রেণীগত এবং বৃত্তিগত হিসাব গ্রহণ করিতে হইবে; (২) পশ্চিমবঙ্গের ১৫ লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য পতিত জমি সরকারকে দখল ও উদ্ধার করিতে হইবে; (৩) অব্যবহার্য পুষ্করিণী, কূপ ও অন্যান্য জলাশয়ের সংস্কার করিতে হইবে; (৪) দখলীকৃত জমিতে এবং লোক ও সম্পত্তির বিনিময় দ্বারা প্রাপ্ত জমিতে প্রজাস্বত্বের বিধি অনুসারে উদ্বাস্তুদের বসাইতে হইবে এবং শস্য ও অন্যান্য উৎপাদনের জন্য সম্ভাব্য স্থানে সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে; (৫) সমবায়ের ভিত্তিতে জেলে, তাঁতী, কামার, কুমোর, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের পুনর্বাসন করিতে হইবে; (৬) পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, ব্যবসায় এবং পোর্ট প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে ভারতীয়দের চাকুরীদান নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়া পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকদের চাকুরীক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। উদ্বাস্তুদের শিল্পব্যবস্থা সংক্রান্ত শিক্ষাদানের জন্য অবিলম্বে যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষালয় খুলিতে হইবে; (৭) ছোট ছোট কুটির শিল্পের প্রবর্তন দ্বারা বেকার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৮) পশ্চিমবঙ্গের জমিতে যাহাতে দুইবার শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে পল্লী অঞ্চলে চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আগেই বলা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সমবেত চেষ্টায় পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের পুনর্বাসন মোটামুটি সন্তোষজনক হইয়াছে। অবশ্য এই পুনর্বাসনের ব্যাপারে শরণার্থীদের কর্মনিষ্ঠা ও দুঃখজয়ী মনোভাবও অসাধ্যসাধন করিয়াছে। বিশেষ করিয়া পূর্ব পাঞ্জাবে বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় সেখানে শরণার্থী পুনর্বাসনের সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই।* সরকারী হিসাবে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থী পুনর্বাসনে মোট ব্যয় হইয়াছে ১৮১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। এই তারিখ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য মোট সরকারী ভাবে ব্যয় হইয়াছে ১৪৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের জন্য যথাক্রমে ৭ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ও ১৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে।

দেশবিভাগের ধাক্কায় দেশত্যাগের জোয়ার প্রতিরুদ্ধ হইবার পর অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, ভারতের মুসলমানদের মত পাকিস্তানের অমুসলমানেরা বাস্তুত্যাগের আর আগ্রহ দেখাইবেন না। কিছুটা অস্বস্তিকর পরিবেশের জন্য এবং বহুলাংশে শোচনীয় অর্থ নৈতিক সংকটে পূর্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দুদের দলে দলে অবিরাম ভারতে চলিয়া আসা কিন্তু বন্ধ হয় নাই। সরকারী হিসাবে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৩১ লক্ষ ৬১ হাজার অমুসলমান পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়ের আশায় আসিয়াছেন। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় কিছু কিছু শরণার্থী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইলেও সবচেয়ে বেশি চাপ পড়িতেছে পশ্চিমবঙ্গে, কাজেই আশ্রয়প্রার্থী আগমন বন্ধ না হইলে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যার সমাধান তথা অর্থ নৈতিক কাঠামোর দৃঢ়তা কিছুতেই আশা করা যায় না।

সরকারী হিসাবে প্রকাশ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতে শরণার্থীর সংখ্যা ৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার এবং পূর্ব পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত শরণার্থীর সংখ্যা ৪১ লক্ষ ১৭ হাজার।

* ১৮১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের জন্য ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারত সরকার যে ২৪ লক্ষ ৪৯ হাজার একর জমি ও ৪ লক্ষ গৃহ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার উদ্বাস্তু কৃষিজীবী পুনর্বাসিত হইয়াছে।

প্রকৃত সংখ্যা এই সরকারী সংখ্যার চেয়ে বেশি হইবে বলিয়াও অনেকে মনে করেন।

শরণার্থীদের সাহায্যদান ছাড়া সরকার তাঁহাদের পুনর্বাসনের জন্য গৃহ-নির্মাণ খাতে ও ব্যবসায় খাতে ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান হইতে সহরাঞ্চলে (urban) আগত শরণার্থীদের গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে ১৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এই সময় পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানাগত শরণার্থীদের মোট ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে ৫৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। খয়রাতী সাহায্য (Doles), শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ছাড়াই শুধু পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য এ পর্যন্ত ৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের সরকারী হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সর্বসমেত পশ্চিমবঙ্গে ২৮ লক্ষ ৯৯ হাজার জন পুনর্বাসিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সহরাঞ্চলে ১৫ লক্ষ ৯১ হাজার এবং গ্রামাঞ্চলে ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার শরণার্থী আশ্রয় লইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১৪৭টি জবরদখল কলোনীর (squatters' colonies) মধ্যে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৫টি বাদে সবগুলিরই বৈধকরণ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং ৮১টি এইরূপ কলোনীর ইতিমধ্যেই বৈধকরণ হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের শিক্ষার জন্য মোট ১৫৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২১টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী বালক-বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ১২৮০টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। এছাড়া এই সময় ক্যাম্পগুলিতে প্রতিষ্ঠিত আরও ১৭৫টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরও ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্টাইপেণ্ড বা বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৫৫ হাজার।

পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের পুনর্বাসন সুষ্ঠুভাবে সম্ভব করিতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিক হইতে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা কার্যকরী হইতেছে। দণ্ডকারণ্যের এলাকা হইল গোদাবরী নদীর উত্তর দিকে অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই রাজ্য সংলগ্ন ৮০ হাজার বর্গমাইল। ২০ হাজার বর্গ-মাইল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই পরিকল্পনা সার্থক করিতে মোট ৩০ কোটি

টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রথমে ৪৫ হাজার একর জমির উন্নয়নে হাত দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয় দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার কাজ আশানুরূপ দ্রুততার সহিত নিষ্পন্ন হইতেছে না। ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় বাজেটে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার জন্য ৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল, প্রকৃত ব্যয় অর্ধেকের কম হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিকল্পনার জন্য ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ৬ কোটি টাকা।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সাফল্য যে পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের সমস্যার বহুলাংশে সমাধান করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, এই গুরুতর সমস্যা দীর্ঘকাল চলিবার ফলে সমগ্র দেশের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে, আশার কথা, ভারতসরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের শরণার্থীদের সমস্যা সমাধান করিতে পারিবেন।

ভারতে আগত এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন বিরাট ব্যাপার। এই আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে কৃষিজীবী বেশি হইলেও ডাক্তার, উকিল, শিল্পী, কারিকর, কেরাণী, শ্রমিক প্রভৃতি নানা পেশার লোক আছেন, কাজেই ইহাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান করিতে হইলে সমগ্রভাবে ভারতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়া দরকার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সমাধানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ভারতের আর্থিক উন্নয়নের সহিত শরণার্থী সমস্যার সমাধান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শরণার্থী পুনর্বাসন খাতে ১৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইযাছিল।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শরণার্থী পুনর্বাসন খাতে ৮৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইযাছে, ইহার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য হইয়াছে ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ও পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য

* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল নিম্নলিখিতভাবে :—সহরাঞ্চলের ঋণ ১২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা; গ্রামাঞ্চলের ঋণ ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, পুনর্বাসন অর্থব্যবস্থা পরিচালনা ঋণ ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, শিল্পীয় ঋণ ৩ কোটি টাকা, গৃহনির্মাণ ৬৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা; এবং সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা ২১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

হইয়াছে ৬৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।* এই টাকা কিভাবে ব্যয়িত হইবার কথা, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—(কোটি টাকায়):—

পরিকল্পনা	পশ্চিমপাকিস্তানের শরণার্থী	পূর্বপাকিস্তানের শরণার্থী	মোট
(১) সহরাঞ্চলের ঋণ	১.৪৭	৪.২৫	৫.৭২
(২) (ক) গ্রাম্য ঋণ	০.১৬	১৪.৪৪	১৪.৬০
(খ) কৃষি-ভূমি উন্নয়ন	—	৪.৮০	৪.৮০
(৩) গৃহনির্মাণ	৫.৭৮	১৬.৬৮	২৪.৪৬
(৪) (ক) শিল্পীয় ঋণ	৪.৬৮	৫.৬০	১১.২২
(খ) কুটির শিল্প	০.৯৪		
(৫) শিক্ষা	৩.৭৫	১০.৯৬	১৪.৭১
(৬) বৃত্তিমূলক ও কারিগরীশিক্ষা	১.৯২	৫.২৫	৭.১৭
(৭) চিকিৎসা সুবিধা	—	২.৮২	২.৮২
মোট	১৮.৭০	৬৬.৮০	৮৫.৫০

---

* পরিস্থিতির গুরুত্বে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য এই বরাদ্দ একশত কোটি টাকা করিবার কথা হইয়াছে।

ভারতে ভূমিপ্রথা

(Types of Land-Tenure in India)

ভূমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এই ভূমি যাহারা ভোগ করে, রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয়নির্বাহের জন্য তাহাদের নিকট হইতে খাজনা লওয়া হয়। জমি হইতে যে পরিমাণ সুবিধা ভোগ করা যায়, রাষ্ট্রের খাজনা তদনুপাতেই নির্ধারিত হইবার কথা। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া মুসলমান আমল হইতেই স্বাভাবিক উৎপাদন অনুযায়ী উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট একাংশের হিসাবে খাজনা স্থির হইয়া আসিতেছে। সম্রাট আকবরের সময়ে তাঁহার অর্থসচিব তোডরমল যে ভূমিপ্রথা চালু করেন তাহাতে ৯ বৎসরের মেয়াদে বণ্টিত জমির প্রজা সরকারকে মোট উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ হিসাবে খাজনা দিবে বলিয়া স্থির হয়। ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় ভূমিপ্রথাও মোটামুটি এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীন ভারতেও ব্রিটিশ যুগের নীতি অল্পস্বল্প পরিবর্তিত হইয়া চালু আছে। কৃষিজীবী ভারতে ভূমিপ্রথার গুরুত্ব যথেষ্ট।*

ভারতের ভূমিপ্রথা প্রধানত জমিদারী, মহলওয়ারী ও রায়তওয়ারী,—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এছাড়া জমিদারী বন্দোবস্তের প্রায় অনুরূপ মালগুজারী

* ভারতের বিশেষ করিয়া পল্লী ভারতের, অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী অথচ ইহাদের বৃহৎ এক অংশের (প্রায় ১ কোটি) নিজস্ব জমি নাই। এই সব ভূমিহীন কৃষিমজুরদের ভূমিদানের জন্য আচার্য বিনোবা ভাবে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে মানবতামূলক ভূদান আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন। আচার্য বিনোবা ভাবে আশা করেন যে, জমির বর্তমান মালিকদের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তিনি ভূমিহীন চাষীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি সংগ্রহ করিতে পারিবেন (লক্ষ্য ৫ কোটি একর)। এই আন্দোলনে মানবিক স্পর্শ আছে বলিয়া ইহা এদেশে সরকারী-বেসরকারী উভয় মহলেই লক্ষণীয় সাড়া জাগাইয়াছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত ভাবেজী ৪৪ লক্ষ একরের মত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমি তিনি ভূমিহীন চাষীদের ভিতর বণ্টন করিয়াছেন। ভূদান আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জনকল্যাণের আদর্শে সম্পত্তিদান, বুদ্ধিদান, জীবনদান, সাধনদান ও গৃহদান আন্দোলনও চালাইতেছেন। সমগ্র গ্রামকে একক সমস্বার্থগতরূপে গড়িয়া তুলিতে তিনি গ্রামদান আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছেন এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ৪৫৭০ খানি গ্রাম সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভূদান আন্দোলনের সাহায্যার্থে ভারত সরকার ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ১১ লক্ষ ৯২ হাজার ও ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। পশ্চিমবঙ্গে এপর্যন্ত ভূদান আন্দোলনের আবেদন খুব বেশী হয় নাই। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত ১২৬৮১ একর জমি এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৬ খানি গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।

নামে আর এক প্রকার ভূমিপ্রথাও ভারতে প্রচলিত আছে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারীপ্রথা বিলোপের ব্যবস্থা হইয়াছে।* বলা বাহুল্য, ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের হিসাবে এদেশে রায়তওয়ারী ভূমিপ্রথার অগ্রগতিই কাম্য।

জমিদারীপ্রথা বিলোপের সিদ্ধান্তের সহিত সরকার জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দানের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষতিপূরণের হার একইরূপ না হইলেও মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ করিয়া সরকার ও রায়তদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন ভারতের সকল রাজ্যেরই নীতি। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে পৃথক পৃথক ভাবে প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এইসব আইনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে একজন নাগরিক উর্ধ্বপক্ষে কতখানি জমি নিজ দখলে রাখিতে পারিবেন, তাহাও স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।†

১। জমিদারী বন্দোবস্ত

জমিদারী বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতে হয় এবং দেয় রাজস্ব সম্পর্কে কোন গোলযোগ না হইলে তাঁহাকেই জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। সরকার জমিদারদের সহিত সোজাসুজি রাজস্ব সম্পর্কে বুঝাপড়া করেন এবং জমিদারদের অধীনস্থ প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ সম্পর্ক রাখেন না। প্রজারা জমির পরিমাণ বা গুণ হিসাবে জমিদারকে খাজনা দেয়।

জমিদারী বন্দোবস্ত বলিতে সাধারণত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই বুঝায়, যদিও ভারতে চিরস্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় প্রকার জমিদারী ব্যবস্থাই প্রচলিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ. বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হয়। উত্তর প্রদেশের তালুকদারী এবং মধ্য ভারতের মালগুজারী বন্দোবস্ত অস্থায়ী জমিদারী প্রথার নিদর্শন।

* জমিদারী বিলোপের ফলে মোট জমির হিসাবে জায়গীরদার, ইজারাদার, জমিদার প্রভৃতিদের অংশ শতকরা ৪৩ ভাগ হইতে শতকরা ৫ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে।

† ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারী বিলোপের জন্য রাজ্যপুনর্গঠনের পূর্ব হিসাবে যে ক্ষতিপূরণ হার স্থির হয় তাহাতে মোট ৬২৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবার কথা। ইহার মধ্যে বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানের (আজমীড় সহ) অংশ যথাক্রমে ২৪০ কোটি টাকা, ১৭৯ কোটি টাকা, ৭০ কোটি টাকা ও ৩৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা।

১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (বাংলা ১১৭৬ সাল) পর সরকারী খাজনা আদায়ের অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়া এবং রাজকর্মচারীদের অমানুষিক অত্যাচারের নানা অভিযোগ শুনিয়া ভারতের তৎকালীন প্রধান শাসনকর্তা লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল ব্যক্তিদের জমিদার করিয়া দিলে একদিকে যেমন রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হইবে, অন্যদিকে তেমনি লোভী রাজকর্মচারীদের জুলুম হইতে দরিদ্র প্রজারা রেহাই পাইবে। সেই সময়কার জমির হিসাবে সম্ভাব্য আয়ের ১০/১১ ভাগের মত রাজস্ব নির্ধারিত হইল এবং বাকী ১/১১ অংশ জমিদারেরা পারিশ্রমিক ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য পাইবেন বলিয়া স্থির হইল। জমিদারদের যথাসময়ে রাজস্ব প্রদান সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করিয়া বলা হয় যে, নির্ধারিত দিনের মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে সূর্যাস্ত আইনে জমিদারী নিলামে তুলিয়া দেওয়া হইবে। এইসময় বাংলায় জমিদারদের হাতে যে জমি আসিয়াছিল, তাহার বাৎসরিক আয় ছিল ৪ কোটি টাকার মত। তারপর অবশ্য নানাভাবে বাংলার জমির উন্নতি হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই জমির বার্ষিক আয় অন্তত ১৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

২। **মহলওয়ারী বন্দোবস্ত**—এই ভূমিব্যবস্থা অনুসারে একটি গ্রাম বা মহলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে সরকারের নিকট হইতে জমির মালিকানা লাভ করে এবং সময়মত রাজস্ব দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উত্তরপ্রদেশ, পূর্বপাঞ্জাব ও উড়িষ্যায় কোথাও কোথাও এই প্রথা প্রচলিত। সাধারণত ভূতপূর্ব নবাব পরিবারের বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহুসংখ্যক লোক নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে বাস করিলে তাহাদের আপেক্ষিক সুবিধা হিসাবে মহলওয়ারী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাহারাণপুর আইন অনুসারে জমির সম্ভাব্য আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের মত মহলওয়ারী বন্দোবস্তের রাজস্ব নির্ধারিত হয়। কালক্রমে এখন অবশ্য এই প্রথার সম্ভ্রমটুকু নষ্ট হইয়াছে এবং এখন গ্রামবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক বাড়িয়া যাওয়ায় যৌথ মালিকানা নীতিতে অসুবিধা হইতেছে যথেষ্ট। ইহার ফলে ক্রমে সরকারী কর্মচারীদের বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের খাজনা নির্ধারণ ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায় সুযোগ গ্রহণের সুবিধা হইতেছে।

৩। **রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত**—রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত অনুসারে

সরকার সরাসরি প্রজাদের ১০ হইতে ৩০ বৎসরের মেয়াদে নির্ধারিত সময়ে খাজনা দিবার সর্তে জমি বন্দোবস্ত করেন। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমি বিক্রয় হইলেও মেয়াদের কোন পরিবর্তন হয় না। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের অনেক জায়গায় এই ভূমি-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত অনুসারে সাধারণত জমির ফসলের মূল্য হইতে সব খরচ বাদ দিয়া নীট মুনাফার শতকরা ৫০ ভাগের মত রাজস্ব নির্ধারিত হয়। জমির আয় বৃদ্ধির হিসাবে সরকার খাজনা বাড়াইতে পারেন, তবে মাদ্রাজে কোন ক্ষেত্রেই শতকরা ১৮ ভাগের বেশি খাজনা বাড়ান যায় না। বোম্বাইয়ের উর্ধ্বতম হার এভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই বটে, তবে খাজনা বৃদ্ধির সময় সরকার জমির উন্নতি অবনতি সম্পর্কে এবং উৎপন্ন ফসলের সাম্প্রতিক মূল্য সম্পর্কে খুব ভাল করিয়া খোঁজখবর লন এবং জমির অবস্থা অনুসারেই খাজনা বৃদ্ধির হার স্থির করেন।

৪। **মালগুজারী বন্দোবস্ত**—মালগুজারীপ্রথা প্রধানত মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত। মালগুজারদের জমিদার আখ্যা দেওয়া হয় বটে, তবে আসলে তাঁহারা রায়ত ছাড়া আর কিছু নন। মালগুজারগণ সরকারের নিকট হইতে জমি পান, কিন্তু তাঁহাদের জমিতে প্রজা বসাইবার সময় সেই প্রজার খাজনার হার স্থির করেন সেটেলমেণ্ট অফিসার। প্রত্যেক সেটেলমেণ্টের সময় মালগুজারদের জমির রাজস্বের পরিমাণ নূতন করিয়া স্থির হয়। মারাঠা যুগ হইতে বিশেষ জমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, এমন এক শ্রেণীর কৃষকের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বৃটিশ সরকার মালগুজারী প্রথার প্রবর্তন করেন। সেটেলমেণ্ট অফিসার যখন মালগুজারদের প্রজার খাজনার হার স্থির করেন, তখন তাঁহাদিগকে জমির সাম্প্রতিক নীট আয়, মালগুজারদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই প্রথা একটু জটিল। মালগুজারগণ কার্যত প্রজা ও সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন এবং তাঁহারা জমির আয়ের আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক পান।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী বিলোপ

(The Abolition of Zamindary System in West Bengal)

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন, তখন তাঁহার আশা ছিল এই জমিদারী ব্যবস্থার দ্বারা সরকার, জমিদার শ্রেণী ও প্রজাসাধারণ, সকলেরই উপকার হইবে। প্রথমদিকে অবশ্য জমিদারী হাতে পাইয়া জমিদারগণ গ্রামাঞ্চলের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং প্রজাদের সুখদুঃখে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর নানা কারণে বাংলার জমির আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের সাচ্ছল্য বাড়িয়া যায় এবং প্রায় একই সময়ে সহরগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকায় জমিদারদের অধিকাংশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিলাসোপকরণের মোহে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে চলিয়া আসিতে থাকেন। জমিদারগণ গ্রাম ত্যাগ করায় জমিদারীর সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ কমিয়া যায় এবং তাঁহাদের নিকট জমিদারী ক্রমে অর্থাগমের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে। জমিদারের এই উদাসীনতার সহিত নায়েব গোমস্তার নিষ্করুণ শোষণ মিলিয়া বাংলার জনসাধারণের জীবন দুর্বহ করিয়া তোলে। ক্রমে জমিদার বা নায়েব গোমস্তার অত্যাচার হইতে প্রজাদের বাঁচাইবার জন্য সারা দেশে প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। শুধু বাংলায় নয়, বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি যে সব জায়গায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল, সর্বত্রই প্রজাদের রক্ষার জন্য এইরূপ আন্দোলন সুরু হয়।*

এই আন্দোলনের পরিণতিতেই জমিদারী বিলোপের ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকার একদা জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি করিযাছিলেন, পরিস্থিতি প্রতিকূল হইয়া উঠায় সরকারই জনস্বার্থে জমিদারীপ্রথা বিলোপের সংকল্প করিয়াছেন। রাজ্যপুনর্বিন্যাসের পূর্ববর্তী হিসাবে জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য সারা ভারতে ৬২৫ কোটি টাকা এবং শুধু পশ্চিমবঙ্গে ৭০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

* ভারতের ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার, একথা ভারতের পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এদেশে ভূমিপ্রথা এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়ের অসমতা হ্রাস পায়, শোষণ বন্ধ হয়, ভূমি ভোগকারী প্রজারা ও শ্রমজীবীরা নিরাপদ হন এবং বিভিন্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সমান অধিকার বা সুযোগ ভোগ নিশ্চিত হয়।

বাংলাদেশে জমিদারীপ্রথা প্রচলিত থাকার সুদীর্ঘ ইতিহাসে সরকার বারবার প্রজাদের সুবিধার জন্য প্রজাস্বত্ব সম্পর্কিত নানা আইন প্রবর্তন করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এইরূপ আইন প্রবর্তিত হয়, ইহার পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত হয়। প্রথমে প্রজার জমি বিক্রয়ের অধিকার ছিল না, জমিদার যথেচ্ছভাবে খাজনা বাড়াইবারও অধিকারী ছিলেন। দখলীকৃত জমিতে প্রজাদের কূপ খননের বা গাছ কাটিবার ক্ষমতা ছিল না। বাকী খাজনার দায়ে জমিদারেরা এই সময় অনায়াসে প্রজাদের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইতে পারিতেন। এসব অসুবিধা ক্রমে আইনের সাহায্যে বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু জমিদারদের জুলুম হইতে সর্বাংশে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাইবার ব্যবস্থা করা কিছুতেই সম্ভব হইল না। তাছাড়া দেশের আর্থিক অবস্থা ও খাদ্যপরিস্থিতির বিবেচনায় জমি যাহারা চাষ করে, জমির উপর তাহাদের স্থায়ী মমতা সৃষ্টির প্রয়োজন ক্রমেই অধিকতর অনুভূত হইতে লাগিল। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলার জমিদারীপ্রথা বিলোপের নীতি সরকারীভাবে স্বীকৃত হইল। বাংলা সরকার এ সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে 'ভূমি রাজস্ব কমিশন' (Bengal Land Revenue Commission) নামে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশনে জমিদারদের প্রতিনিধি স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব ও শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্লাউড কমিশন তাঁহাদের ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে মত প্রকাশ করেন যে, অধিকার ভোগের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া সমানুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে সরকারের উচিত লাখেরাজ, চিরস্থায়ী ও অস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারীতে জমিদার ও সর্বস্তরের মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকার ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা। মৌলভী ফজলুল হকের প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে জমিদারী বিলোপের নীতি ঘোষিত হয় এবং স্থির হয় যে একটি 'ট্রাইবিউনাল' বসাইয়া ক্ষতিপূরণের হার স্থির হইবে।

দেশবিভাগের ও স্বাধীনতালাভের পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজ এলাকায় জমিদারী বিলোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যথাসম্ভব জমিদারী বিলোপের সুপারিশ

করিয়াছেন এবং মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যেও ইতিমধ্যেই জমিদারী বিলোপ ব্যবস্থা কার্যকরী হইতেছে।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় জমিদারী বিলোপের জন্য 'ভূমি দখল বিল'টি (West Bengal Estates Acquisition Bill) উপস্থাপিত হয়। ৭টি পরিচ্ছেদ ও ৫৩টি ধারা সম্বলিত এই বিল উপস্থাপন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-রাজস্ব-মন্ত্রী বলেন যে, "প্রজাস্বত্বের আমূল পরিবর্তন, ভূমিসংস্কার এবং চাষীকে জমির সত্যকার মালিক করাই এই আইনের লক্ষ্য"। এই বিলটি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর বিধান সভার নিম্ন ও উচ্চ কক্ষে গৃহীত হইয়া পরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া আইনে পরিণত হইয়াছে এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল হইতে পশ্চিমবঙ্গে কার্যকরী হইয়াছে। ইহার পর ভূমিপ্রথার সংস্কার সুষ্ঠু করিতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আর একটি আইন (West Bengal Land Reforms Act) বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

আলোচ্য আইনে পশ্চিমবঙ্গের সকল জমি সরকারের হাতে আসিতেছে না। কলিকাতা সহর এই আইনের আওতার বাহিরে, তাছাড়া বাস্তুজমি, মিউনিসিপ্যালিটিতে অবস্থিত পাকাবাড়ী, ২৫ একরের কম অ-কৃষি খাস জমি, চা বাগান, কলকারখানার জমি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের ও সমবায় সমিতির জমি,—এগুলিতেও এই আইন প্রযোজ্য হইবে না। জমিদার চলিয়া যাইবেন, জমিদারের নিকট হইতে যে সকল রায়ত বা অ-কৃষিজীবী প্রজা জমি বন্দোবস্ত লইয়াছেন, তাঁহারা এবার সরকারের অধীনে আসিয়া জমিদারের পরিবর্তে সরকারকে খাজনা দিবেন। যে সব জোতদার বা লাটদার নিজেরা জমি চাষ না করিয়া বর্গাদারদের জমি বিলি করিয়াছেন, ঊর্ধ্বপক্ষে প্রত্যেকের হিসাবে ৩৩ একর জমি খাস রাখিয়া বাকী জমি সরকার বর্তমানে আইনের সাহায্যে দখল করিবেন। আইনে আরও বলা হইয়াছে যে, অন্য মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের প্রত্যেককেও ঊর্ধ্বপক্ষে ২৫ একর পরিমিত জমি ভোগ করিতে দেওয়া হইবে। ক্ষতিপূরণ দানে ছোটখাট জমিদারদের অধিকতর সুবিধা দিবার দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। আইনে চাষীদের জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিবার নীতি সরকার মানিয়া লইয়াছেন। ক্ষতিপূরণ আংশিক নগদে এবং আংশিক ২০ বৎসরের মেয়াদী বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা

সুদের সরকারী ঋণপত্রে (Bond) দেওয়া হইতেছে। ঋণপত্র দিয়া সরকার উপস্থিত নগদ টাকা দিবার দায় হইতে রেহাই পাইবেন, নগদ টাকা জমিদারেরা শিল্পবাণিজ্যে খাটাইয়া দেশের সমৃদ্ধিসাধন করিবেন বলিয়া সরকার আশা করিয়াছেন। ক্ষতিপূরণের হার নীট বার্ষিক আয়ের হিসাবে নিম্নরূপ স্থির হইযাছে :—

প্রথম	৫০০ টাকা	নিট আয়ের	২০ গুণ
পরবর্তী	৫০০ টাকা	নিট আয়ের	১৮ গুণ
পরবর্তী	১,০০০ টাকা	নিট আয়ের	১৭ গুণ
পরবর্তী	২,০০০ টাকা	নিট আয়ের	১২ গুণ
পরবর্তী	১০,০০০ টাকা	নিট আয়ের	১০ গুণ
পরবর্তী	১৫,০০০ টাকা	নিট আয়ের	৬ গুণ
পরবর্তী	৮০,০০০ টাকা	নিট আয়ের	৩ গুণ
পরবর্তী	অবশিষ্ট	নিট আয়ের	২ গুণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমিদারীপ্রথা বিলোপের এই সংকল্প অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নাই। মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ হওয়াতে প্রজাদের সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে হয়। তবে অনেকে মনে করিতেছেন, সরকারী পরিচালনা ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু ও সহৃদয় না হয়, তাহা হইলে বাকী খাজনার ব্যাপারে জমিদারী আমলের তুলনায় প্রজাদের বিপদ বাড়িয়া যাইবে।

জমিদারী আমলে রায়ত ও কোর্ফাদের যে বিপুল পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দেওযা হইয়াছে, আলোচ্য আইনে তাহা সরকার ফিরাইয়া না লইয়া তাহাদের প্রজাস্বত্বই মানিযা লইয়াছেন। ইহাদের অনেকেই ঠিক চাষী প্রজা নয়, জমি বিলি করিয়া খাজনা-ভোগী মাত্র। এক্ষেত্রে সরকারের আরও সাবধানতার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। পূর্বোল্লিখিত চা-বাগান ইত্যাদির মালিক এখন আর জমিদারকে খাজনা দিবেন না, সরকারের প্রত্যক্ষ প্রজারূপে সরকারকেই খাজনা দিবেন। ইঁহাদের প্রজাস্বত্ব সম্পর্কেও পুনর্বিবেচনা করা উচিত ছিল বলিয়া অনেকের অভিমত। এই সব বিপুলায়তন জমি-ভোগকারীদের অতীত ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই জনস্বার্থের অনুকূল নহে।

জমিদারীপ্রথা বিলোপের চেয়ে বিলোপের পরবর্তী কার্যরীতি অনেক কঠিন, ইহার গুরুত্বও কম নয়। সরকার যে সব জমি হাতে লইলেন, সেগুলি

কিভাবে পুনর্বিলি করিবেন, তাহার সাফল্যের উপরই এই ব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। যাহাদের মুখ চাহিয়া জমিদারীপ্রথা বিলোপ করা হইল, সেই অসহায় দরিদ্র প্রজাকুল যদি অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার না পায়, তাহা হইলে শুধু মধ্যস্বত্বভোগীদের সরাইয়া দিয়া সরকারের কিছু আয়বৃদ্ধিতেই এই ব্যবস্থার সফলতা নিরূপিত হইবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ছয় শত পঁচিশ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া সরকারের পক্ষে বৎসরে ২০ কোটি টাকার মত আয়বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের নিরিখে এমন কিছু লোভনীয় ব্যাপার নয়। জনকল্যাণই এক্ষেত্রে আসল কথা হওয়া উচিত।* প্রকৃতপক্ষে জমিদারদের উপর আয়কর বসাইয়াও অনেক টাকা সংগৃহীত হইতে পারিত।

জমিদারীপ্রথা বিলোপের পর জমির সুষ্ঠু পুনর্বণ্টনের প্রশ্নে সরকারের পক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েৎ বা সমবায়িক যৌথ সংস্থার উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনেকে মনে করেন।

---

* জমিদারী বিলেপের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে (রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের পূর্ববর্তী হিসাবে) নিম্নরূপ ক্ষতিপূরণ ধার্য হইয়াছে :—(কোটি টাকা)—অন্ধ্র-৯ ৬০, আসাম—৫'১৮, বিহার—২৪০'০, বোম্বাই—২০'৮৯, হায়দরাবাদ—১৫'১৮, মধ্যপ্রদেশ—২২'১০, মাদ্রাজ—৪'৮১, মহীশূর—১'৮০, উড়িষ্যা—১০'৫০, রাজস্থান (আজমীর) সহ)—৩২'৮৮ সৌরাষ্ট্র—১০'২০, ত্রিবাঙ্কুর—কোচিন—০'২০, উত্তর প্রদেশ—১৭৯'০, পশ্চিমবঙ্গ—৭০'০। মোট—৬২৫'২৫।

ভারতের মুদ্রানীতি

(Indian Currency System)

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মুদ্রার প্রচলন আছে। বৈদিক যুগে, বৌদ্ধ যুগে এবং কুশান ও হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে যে স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহা নানাস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারাদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। পাঠান এবং মোগল যুগে ভারতীয় মুদ্রানীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালিত হইত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালের প্রথম দিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মুদ্রানীতি চলিতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাদ্রাজের স্বর্ণমুদ্রা ও বাংলার রৌপ্যমুদ্রার উল্লেখ করা যায়। কোম্পানী ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই অসম মুদ্রাব্যবস্থার বিলোপ ঘটাইয়া সারা ভারতে একই প্রকার মুদ্রানীতি চালাইবার চেষ্টা সুরু করেন। ৩০ বৎসর এইভাবে চেষ্টার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে আইনসঙ্গত মুদ্রা হিসাবে বর্তমান টাকার প্রচলন হয়। এই সময় এক টাকার ওজন ধরা হয় ১৮০ গ্রেণ, ইহার মধ্যে ১৬৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকিত। আইনসঙ্গত মুদ্রা না হইলেও সরকার এ সময় ১৫ টাকা মূল্যে প্রতিখানি স্বর্ণমোহর ক্রয় করিতেন। তারপর অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সোনা সস্তা হইয়া যাওয়ায় এইভাবে স্বর্ণমুদ্রা ক্রয়নীতি বাতিল হইয়া যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পুনরায় নোটের পরিবর্তে রৌপ্য-মুদ্রার ন্যায় স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার চলিতে আরম্ভ করে।

এ ভাবে ভারতবর্ষে রৌপ্যমান (Silver Standard Currency) চলিতে থাকে এবং রূপার বাটের সোনার হিসাবে যে বাজার দর, তদনুসারে টাকার স্বর্ণমূল্য নির্ধারিত হইতে থাকে। এই ব্যবস্থা কিন্তু দীর্ঘকাল ভাল ভাবে চলিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু নূতন রৌপ্যখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় রূপার মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমিয়া গেল। তবু ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি দেশ অসুবিধা সহ্য করিয়াও দ্বিধাতুমান রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ভারতবর্ষে টাকার মূল্যের কিছু দিন খুব বেশি অবনতি হয় নাই। ঐ সব দেশ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিধাতুমান পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মুদ্রানীতি একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া গেল এবং টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময় হার মাত্র ২০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৯ পেন্স হিসাবে কমিয়া ২ শিলিং

হইতে ১ শিলিং ৩ পেন্স হইল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় মুদ্রানীতির এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মুদ্রামানের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য বঙ্গীয় বণিক সমিতি (Bengal Chamber of Commerce) প্রমুখ ব্যবসায়ীসংঘ ভারত সরকারের উপর বিশেষ চাপ দিতে থাকেন। ভারত সরকারও এই সময় ব্রিটেনে যে সব খরচপত্র করেন, বিনিময়হারে বিশৃঙ্খলার দরুণ তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রভূত ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় দেশবাসীর উপর নানাভাবে করভার চাপাইয়াও সরকারের নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব ছিল। এই বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ভারত সরকার ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্সেলের নেতৃত্বে অবাধ রৌপ্যনীতি বাতিল ও স্বর্ণমান প্রচলন সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন এবং এই কমিটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রিপোর্ট দেন। হার্সেল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় টাঁকশালগুলি হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার অবাধ মুদ্রণ বন্ধ হইয়া গেল এবং ভারত সরকারের নিজ দায়িত্বে টাকা ছাপাইবার ব্যবস্থা হইল। কমিটি টাকার বিনিময়মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স ধরিয়া সরকারকে জনসাধারণের নিকট হইতে স্বর্ণ থান ও মুদ্রা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। সরকার পাওনা আদায়ের সময় জনসাধারণের নিকট হইতে ১৫ টাকা হিসাবে প্রতিটি ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। হার্সেল কমিটির সুপারিশ কার্যকরী হইবার পরও কিন্তু ভারতে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইল না। এই সময় রৌপ্য সরকারী মুদ্রার প্রধান উপাদান হইলেও ইহার মূল্য বাজারের অবস্থা অনুসারে উঠানামা করিতে লাগিল এবং টাকার নির্দিষ্ট মূল্যের সহিত রৌপ্য মূল্যের কোনরূপ স্থিরীকৃত বিনিময়-হার রহিল না।

ইহার পর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার হেনরি ফাউলারের নেতৃত্বে আর একটি কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এই ফাউলার কমিটির সুপারিশে টাকা ও স্টার্লিংয়ের বিনিময় হার ১ শিলিং ৪ পেন্সে নির্দিষ্ট হইয়া যায়। ভারতের বাজারে টাকার অবাধ ব্যবহারের সহিত কমিটি ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে আইনসঙ্গত মুদ্রার মর্যাদা দিলেন। সরকার জনসাধারণকে নির্দিষ্ট মূল্যের স্বর্ণের পরিবর্তে টাকা দিতে লাগিলেন এবং টাঁকশালের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে মোটামুটি সমতাসৃষ্টির জন্য সাময়িকভাবে নূতন রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন। স্থির হইল, রৌপ্য মুদ্রা ছাপাইয়া সরকারের যে মুনাফা হইবে, তাহা স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া বিশেষ তহবিল হিসাবে রক্ষা করা হইবে।

যাহা হউক, ফাউলার কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতে স্বর্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard) প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নীতি অনুসারে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে রৌপ্য মুদ্রাই আইনসঙ্গত মুদ্রা হিসাবে অবাধে চলিতে লাগিল এবং বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন বা বিদেশে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে টাকা ও স্বর্ণের মধ্যে সরকারের মধ্যস্থতায় নির্দিষ্ট মূল্যে বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। এই মুদ্রামান সাবলীলভাবে চালু করিতে ভারত সরকার তাঁহাদের লণ্ডনস্থ 'স্বর্ণমান তহবিল' (Gold Standard Reserve) নামক তহবিলটি বিশেষভাবে বাড়াইয়া ফেলিলেন। এই ব্যবস্থা কিন্তু অনেকের পছন্দ হইল না। শেষ পর্যন্ত ভারতে অবাধ মুদ্রানীতি চালু করা সম্ভব কি না, তাহা বিবেচনা করিতে স্যার অষ্টিন চেম্বারলেনের নেতৃত্বে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি এদেশে পূর্ণ স্বর্ণমান প্রচলনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন এবং টাকার বিনিময়হার ১ শিলিং ৪ পেন্সেই রাখিয়া তাঁহারা বৈদেশিক লেনদেনে স্বর্ণ এবং অন্তর্দেশীয় লেনদেনে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের নীতি সমর্থন করেন।

স্বর্ণবিনিময় মানের ফলে ভারতের বাজারে মুদ্রার অসম প্রচলনগতি নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং পণ্য ও মুদ্রা-যোগান ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য না থাকায় পণ্যবাজারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এই মুদ্রানীতির প্রতিবাদে ভারতে দীর্ঘকাল বিক্ষোভ দেখা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, বিশেষতঃ যুদ্ধের শেষদিকে রৌপ্যের মূল্য অভাবিতভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় স্বর্ণবিনিময় মান অনুসারে টাকার বিনিময়হার অপরিবর্তিত রাখা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠে। এক আউন্স রৌপ্যের মূল্য ৩ শিলিং ৭ পেন্স হইলে তবেই ১ শিলিং ৪ পেন্স হিসাবে টাকার মূল্যনির্ধারণ পোষায়, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রতি আউন্স রূপার দর দাঁড়ায় ৬ শিলিং ৬ পেন্স। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুদ্রানীতিতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারত সরকার ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটি (Babington Smith Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি ক্রমবর্ধমান রৌপ্যমূল্যের দোহাই দিয়া তাঁহাদের ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রিপোর্টে টাকার মূল্য ২ শিলিং ধার্য করিবার সুপারিশ করেন।

এই সুপারিশ কার্যকরী হওয়ায় ভারতের ব্যবসাদারদের প্রভূত ক্ষতি হয়। একই সঙ্গে ইহার ফলে বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের

দর দারুণ চড়িয়া গেল অথচ ভারতের বাজারে বিদেশী পণ্য হইল আশাতীতরূপে সস্তা।

এইভাবে ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষতির ও পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার ফলে নিরুপায় ভারত সরকার অবশেষে ভারতীয় মুদ্রানীতি ও বিনিময় ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কমাণ্ডার হিল্টন-ইয়ংকে সভাপতি করিয়া একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Indian Exchange and Currency) নিযুক্ত করেন। এই কমিশন প্রচলিত মুদ্রামানের পরিবর্তন সাধন করিয়া ভারতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনবিহীন একশ্রেণীর স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। এই বিচিত্র মুদ্রাব্যবস্থার নাম স্বর্ণপিণ্ডমান (Gold Bullion Standard)। সুপারিশে বলা হয় যে, এই মুদ্রানীতি অনুসারে দেশে স্বর্ণমুদ্রা চলিবে না বটে, তবে জনসাধারণকে প্রচলিত কাগজী মুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে যে-কোন পরিমাণ স্বর্ণ আদান-প্রদানে টাঁকশাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিবেন। কি প্রয়োজনে স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় চলিতেছে, দেশবাসীর নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে কোনরূপ কৈফিয়ৎ চাহিতে পারিবেন না। এই কমিশনের সুপারিশে জনসাধারণের নোটের পরিবর্তে টাঁকশাল হইতে অবাধে রৌপ্যমুদ্রা পাইবার অধিকার বাতিল হইয়া যায়। হিল্টন-ইয়ং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আইন প্রণীত হইবার সময় স্থির হয় যে, সরকার ৪০ তোলার অনধিক পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন না। হিল্টন-ইয়ং কমিশন ২৫ বৎসরের মত নোট ছাপিবার অধিকার সহ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরামর্শও দিয়াছিলেন। কমিশনের অন্যতম সদস্য স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস টাকার বিনিময়মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স করিবার পরামর্শ দিলেও অধিকাংশ সদস্য টাকার বিনিময়হার ১ শিলিং ৬ পেন্স নির্ধারিত করিবার সুপারিশ করেন এবং এই সুপারিশ অনুসারেই ভারত সরকার আইন করিয়া টাকার বিনিময়মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্সে বাঁধিয়া দেন।* এইসঙ্গে ভারত সরকার প্রতি তোলা বিশুদ্ধ স্বর্ণের জন্য ২১ টাকা ৩ আনা ১০ পাই হিসাবে মূল্য প্রদানে

*** টাকার ১ শিলিং ৬ পেন্স বিনিময়-হারের পক্ষে যুক্তি—**

(১) বহুদিনের চালু নীতি, দেশবাসী ইহাতে অভ্যস্ত; (২) বিনিময়মূল্য উপরের দিকে থাকিলে ভারতে অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিদেশী পণ্য আমদানী হইতে পারে; (৩) বিদেশে, বিশেষতঃ ব্রিটেনে ভারত সরকারকে যে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, ইহাতে তাহার পরিমাণ কম হইবে।

স্বীকৃত হন। ইহার পর হইতে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার ভারতে আইনসঙ্গত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকিবার অধিকার লোপ পায়।

হিল্টন-ইয়ং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গোল্ড বুলিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রচলিত থাকে, কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার চাপে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ব্রিটিশ মুদ্রার সহিত স্বর্ণের নির্দিষ্ট সম্পর্ক যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন আর ভারতে স্বর্ণমানের প্রায় অনুরূপ এই স্বর্ণপিণ্ডমান রক্ষা করা সম্ভব হইল না। এই অবস্থায় ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে ভারতীয় মুদ্রাকে স্টার্লিংয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে স্টার্লিং বিনিময় মান (Sterling Exchange Standard) নামক নূতন মুদ্রামানের প্রবর্তন করিলেন। এই মান প্রবর্তিত হওয়ার পর ব্রিটিশ মুদ্রা স্টার্লিংয়ের ভালমন্দ বা উত্থান-পতনের সহিত ভারতীয় মুদ্রা টাকার ভালমন্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। এই নূতন মুদ্রামানেও টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স হিসাবেই নির্ধারিত হয়।

এই নূতন মুদ্রামানও ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর স্টার্লিংয়ের বিনিময় মূল্য হ্রাস করে। মার্কিন মুদ্রার হিসাবে ৪ ডলার ৮৬ সেণ্টের স্থলে এই সময় প্রতিটি ব্রিটিশ মুদ্রা স্টার্লিংয়ের বিনিময় মূল্য ৪ ডলার ৩ সেণ্টে নামিয়া আসে। ইহাতে বিশ্বের বাজারে স্টার্লিংয়ের সম্ভ্রম অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় স্টার্লিং এক্সচেঞ্জ স্ট্যাণ্ডার্ড বা স্টার্লিং বিনিময় মান অনুসারে ভারতীয় টাকার স্টার্লিংয়ের উপর বাধ্যতামূলক নির্ভরশীলতায় অনেকে ক্ষুব্ধ হন। তারপর অবশ্য ভারতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সূচনায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলিত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আইনের দিক হইতে এই নির্ভরশীলতার অবসান ঘটাইবার আগ্রহ দেখা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ও ৪১

টাকার ১ শিলিং ৪ পেন্স বিনিময়-হারের পক্ষে যুক্তি—(১) উৎপাদন ব্যয়ের দিক হইতে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা; (২) নিম্নতর বিনিময়-হারে কৃষকদের ঋণভার হ্রাস; (৩) বিদেশী পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে আমদানী হ্রাস এবং দেশীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার বৃদ্ধি; (৪) অন্তর্দেশীয় পণ্য ও অর্থের প্রচলনগতি বাড়িবার ফলে দেশবাসীর আয় বৃদ্ধি এবং বিদেশী দায়ের দিক হইতে একটু অসুবিধা হইলেও এদেশে আয়কর, শুল্ক ইত্যাদিতে সরকারের প্রভূত অর্থাগমের সম্ভাবনা।

সংখ্যক ধারা সংশোধিত হয়। এই সংশোধনের ফলে স্টার্লিং ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন বাধ্যবাধকতা রহিল না এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্টার্লিংয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন মুদ্রা হিসাবে টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময়-হার স্থির করিবার অধিকারী হইলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের স্টার্লিং ও ভারতীয় টাকার মধ্যে সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা শেষ হইবার পর ইন্‌টারন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের আওতায় স্বাধীন ভারত টাকার যে স্বর্ণমূল্য স্থির করিয়া লয়, তদনুযায়ীই অতঃপর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হইতেছে। টাকার বিনিময় মূল্য কিন্তু আগের ১ শিলিং ৬ পেন্সেই অপরিবর্তিত রহিয়া গেল।

অবশ্য আইনতঃ ভারতীয় মুদ্রার সহিত ব্রিটিশ মুদ্রার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিন্ন হইলেও ইঙ্গ-ভারতীয় ঘনিষ্ঠতার জন্য স্টার্লিংযের উপর টাকার অলিখিত একটা নির্ভরশীলতা ইহার পরেও চলিতে থাকে। তারপর তীব্র ডলার সঙ্কটের চাপে বাধ্য হইয়া ব্রিটেন ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর পুনরায় স্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস করে। এবার স্টার্লিংয়ের ডলার-বিনিময় মূল্য ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে নির্ধারিত ৪ ডলার ৩ সেণ্টের স্থলে ২ ডলার ৮০ সেণ্টে নামিয়া আসিল। টাকার মুদ্রাগত স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবার পর ভারতের এখন ব্রিটেনের সহিত একযোগে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু নানা অর্থনৈতিক সুবিধা বিবেচনা করিয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষও স্টার্লিংযের মুদ্রামূল্য হ্রাসের সহিত টাকারও মূল্য হ্রাস ঘোষণা করিলেন। স্টার্লিংয়ের হিসাবে টাকার দর এখনও ১ শিলিং ৬ পেন্সই আছে, কিন্তু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ভারতীয় মুদ্রা প্রতিটি টাকার বিনিময় মূল্য মার্কিন মুদ্রা ডলারের হিসাবে আগের ৩০.২২৫ সেণ্টের স্থলে ২১ সেণ্টে দাঁড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে, ভারত স্টার্লিংয়ের সহিত টাকার মূল্য হ্রাস করিলেও কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশ পাকিস্তান কিন্তু প্রথমে পাকিস্তানী টাকার মূল্য হ্রাস করে নাই। ডলারের হিসাবে পাকিস্তানী টাকার বিনিময়-মূল্য দাঁড়ায় ৩০.২২৫ সেণ্টে। স্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় প্রতিটি পাকিস্তানী টাকার স্টার্লিং বিনিময়-হার আগের ১ শিলিং ৬ পেন্সের স্থলে ২ শিলিং ১.৯ পেন্সে দাঁড়াইয়াছিল। ভারতীয় টাকার সহিত বিনিময় মূল্যের হিসাবে প্রতি একশত পাকিস্তানী টাকার বিনিময় মূল্য হইল ১৪৪টি ভারতীয় টাকা। এই অর্থে ১০০টি ভারতীয় টাকা পাকিস্তানের ৬৯ টাকা ৮ আনার সমান হইল। বলা বাহুল্য,

ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক এমনি ঘনিষ্ঠ যে, এই অসম মুদ্রাবিনিময় মূল্যের জন্য পারস্পরিক লেনদেনে উভয় দেশেরই অসুবিধার শেষ ছিল না। সরকার যাহোক করিয়া কাজ চালাইলেও জনসাধারণ বা ব্যবসাদারেরা এজন্য অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের দারুণ ক্ষতি হইয়াছিল এবং সরকারী বিনিময়মূল্য না মানিয়া কাজের সুবিধার জন্য অনেকক্ষেত্রে পাকিস্তানী টাকার উনমূল্যে বিনিময়ও হইয়াছিল। যাহা হউক, পাকিস্তান ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতের সমহারে তাহার মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতে রৌপ্য, তাম্র, প্রভৃতি ধাতুর অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়। এ সময় আনি, দুয়ানি, সিকি, পয়সা প্রভৃতি বাজার হইতে অনেকাংশে উঠিয়া যায়। সরকার নিরুপায় হইয়া এক টাকা ও দুই টাকার নোট চালু করেন এবং রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য আগেকার রৌপ্যবহুল মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ মার্কা টাকার প্রচলন আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেন। যুদ্ধের পরেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় সরকার যুদ্ধের শেষদিকে প্রচলিত সামান্য রূপাওয়ালা ষষ্ঠ জর্জ মার্কা টাকা টানিয়া লইয়া নিকেলের টাকা চালু করেন। একই কারণে তামার পয়সার ওজন কমাইয়া দেওয়া হয় এবং নিকেলের আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি, ডবলপয়সা প্রভৃতি বাজারে চালু হয়।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতসরকার ভারতে দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করিয়াছেন। এই নূতন ব্যবস্থায় প্রতি টাকা একশত নয়া পয়সার সমান।*

* এসম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য "ভারতীয় মুদ্রার দশমিকীকরণ" শীর্ষক পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় মুদ্রার দশমিকীকরণ

(Decimalisation of Indian Coinage)

ভারতে এতদিন টাকা আনা পাই বা টাকা আনা পয়সা,—এই হিসাবে মুদ্রাব্যবস্থা চলিতেছিল, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে আনা এবং পাই বাতিল করিয়া শুধুমাত্র টাকা ও পয়সা (নয়া পয়সা) হিসাবে নূতন মুদ্রাব্যবস্থা চালু হইয়াছে। আগে ১ টাকায় ১৬ আনা, ৬৪ পয়সা বা ১৯২ পাই পাওয়া যাইত, বর্তমান ব্যবস্থায় নূতন ১ টাকা আগের এক টাকার সমান হইলেও এই এক টাকার বিনিময় মূল্য ১০০ নয়া পয়সা ধার্য হইয়াছে। এইভাবে আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলি ইত্যাদির পরিবর্তে ৫ নয়া পয়সা, ১০ নয়া পয়সা, ২৫ নয়া পয়সা, ৫০ নয়া পয়সার হিসাব বাজারে চলিয়াছে। নূতন মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন মুদ্রাব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে অনুমান করিয়া কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে কিছুদিন (উপস্থিত তিন বৎসর) পুরাতন মুদ্রাসমূহ ও নয়া পয়সা একই সঙ্গে বাজারে চালু থাকিবে। ইতিমধ্যে নয়া পয়সা পুরাতন টাকার ভগ্নাংশ মুদ্রাগুলিকে সরাইয়া দিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

হিসাবের সুবিধার জন্যই ভারত সরকার এই নূতন দশমিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন। আনা এবং পাই বা পুরাতন পয়সার হিসাবে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হইত, নূতন ব্যবস্থায় দশ ও তাহার গুণিতক ধরিয়া হিসাবে অনেক সুবিধা হইবে। আগে পাইকে বারো দিয়া ভাগ করিয়া আনা এবং আনাকে ষোল দিয়া ভাগ করিয়া টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইত, এখন নয়া পয়সার ডান দিক হইতে দুই ঘর পরে দশমিক চিহ্ন বসাইলে টাকা ও নয়া পয়সার পুরা হিসাব মিলিবে।

অবশ্য ভারতে নয়া পয়সা চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জনসাধারণ এই নূতন মুদ্রাব্যবস্থাকে স্বাগত জানায় নাই। বরং প্রথম দিকে নয়া পয়সার বিরুদ্ধে এমন বিক্ষোভ দেখা গিয়াছে যে, বাজারে এই নূতন পয়সার লেনদেন স্তিমিত হইয়াছে এবং পুরাতন পয়সা এবং আনি, দুয়ানি, সিকি ও আধুলি বাজারে চলতি মুদ্রারূপে সগৌরবে বিরাজ করিয়াছে। তবে নয়া পয়সার এইরূপ বিরূপ অভ্যর্থনার কারণ যে শুধু দেশবাসী নীতিগত ভাবে নয়া পয়সার একান্ত বিরুদ্ধে তাহা নয়, নয়া পয়সা ও পুরাতন মুদ্রা একই সঙ্গে চালু থাকার

সময় সরকারী নির্দেশে বাজারে নয়া পয়সার সহিত পুরাতন পয়সার যে বিনিময়-হার প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার অন্যায্যতাই সমস্ত বিক্ষোভের মূল। এই বিনিময়-হারে সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতি পদক্ষেপেই ক্ষতির সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডাকঘরে যে বিক্ষোভ দেখা গিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলেই অবস্থা বুঝা যাইবে। আগে ডাকঘরে একখানি পোস্টকার্ড কিনিতে তিন পয়সা এবং একখানি খাম কিনিতে দু-আনা লাগিত। এ হিসাবে এক টাকায় ২১ খানি পোস্টকার্ড কিনিয়াও এক পয়সা উদ্বৃত্ত থাকিত অথবা ৮ খানি খাম কিনিতে পারা যাইত। নূতন ব্যবস্থায় প্রতি পোস্টকার্ড পাঁচ নয়া পয়সা ও প্রতিটি খাম ১৩ নয়া পয়সা হওয়ায় এক টাকায় মাত্র ২০ খানি পোস্টকার্ড ও সাতখানি খাম (৯ নয়া পয়সা ফেরৎ) পাওয়া যাইবে। বেসরকারী ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যেখানেই হিসাবের গোলমাল, সেখানেই বিক্রেতার সুবিধা অনুযায়ী নয়া পয়সা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ফলে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে জিনিসের দাম তিন আনা, নয়া পয়সায় তাহার মূল্য ১৯ নয়া পয়সা। ব্যবসাদার হিসাবের সুবিধার জন্য স্বচ্ছন্দে ২০ পয়সা করিয়া লইয়াছেন। বাজারে দু আনার কোন জিনিস কিনিতে গেলে খুচরা পুরো পয়সা দিতে না পারিলেই বিক্রেতা ২ আনার জন্য ১৩ নয়া পয়সা কাটিয়া লইতেছেন, অথচ দুই আনার বিনিময় চলিতেছে বার নয়া পয়সায়। বাস ট্রামে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক আনার জায়গায় ৭ নয়া পয়সা আদায় করা হইতেছে।

বর্তমান দশমিক মুদ্রাব্যবস্থার যাঁহারা বিরুদ্ধে তাঁহারা মনে করেন যে, ভারতে সকলের গ্রহণযোগ্য সুশৃঙ্খল এক মুদ্রানীতি চালু থাকার সময় কেতাবী মতে সুবিধার জন্য এই নূতন মুদ্রাব্যবস্থা এখনই চালু করা ঠিক হয় নাই। বিশেষতঃ ভারতে যখন ওজন ও মাপে অবিলম্বে দশমিক ব্যবস্থা চালু হইতেছে না, তখন শুধু মুদ্রাব্যবস্থার এ পরিবর্তনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অযৌক্তিক। তাছাড়া এই শ্রেণীর লোকেরা আরও বলেন যে, দশমিক মুদ্রাব্যবস্থায় হিসাব লিখনের যে সুবিধা হইবে তাহা ভোগ করিবে ব্যবসাদারেরা, ব্যবসাদারদের এই সুবিধা তাঁহাদের মুনাফাবৃদ্ধির অনুপূরক। পক্ষান্তরে সাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলেও পুরাতন মুদ্রাব্যবস্থায় পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত, এই নূতন মুদ্রার দশমিক হিসাবে তাহাদের এমন কিছু প্রত্যক্ষ সুবিধা হইবে না ; বরং দশের কম নয়া পয়সা লিখিতে দশমিক চিহ্নের পর শূন্যের ব্যবহারে (১ টাকা ৭ নয়া পয়সা = ১·০৭ টাকা) তাহাদের ভুল হইয়া যাইতে পারে। ছোট ছোট

ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে এই ভুলের সম্ভাবনা আরও বেশি। সমালোচকেরা ব্রিটেনের মত পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় সমৃদ্ধ দেশের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ যখন অভ্যস্ত মুদ্রাব্যবস্থা পাল্টাইয়া দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তনে কোনরূপ আগ্রহ দেখান নাই, নানা সমস্যাক্লিষ্ট নূতন স্বাধীন দেশ ভারতের এই দায়িত্ব গ্রহণ না করাই উচিত ছিল।

যাহা হউক, মোটের উপর "শূন্য" সংখ্যার আবিষ্কারক ভারত এই "শূন্য"-ভিত্তিক দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যখন দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, এই সুবিধাজনক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তন ভারত-সরকারের পক্ষে দায়িত্বের ব্যাপার হইলেও আতঙ্কের বিষয় নয় বলিয়াই আমরা মনে করি। এ সম্পর্কে আইন প্রবর্তনের পূর্বে ভারত সরকার বিজ্ঞান কংগ্রেস এবং বিভিন্ন বণিক্ সমিতির (Chamber of Commerce) অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং সকলেই ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার দশমিকীকরণের পক্ষে মত দেন। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপার এদেশে নূতন নয়, ভারতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই পরিবর্তন সম্পর্কে চেষ্টা চলিতেছে।

আগেই বলা হইয়াছে, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা চালু হইযাছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই-আগস্ট মাসে লোকসভায় ও রাজ্যসভায এই মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কিত আইনটি [Indian Coinage (Amendment) Act, 1955] পাশ হয। উপস্থিত (তিন বৎসরের জন্য) লেনদেনের ক্ষেত্রে বা হিসাবের কাজে নূতন ও পুরাতন দুই প্রকারের মুদ্রাই বিহিত মুদ্রা (Legal Tender) রূপে চালু থাকিবে বলিযা স্থির হইয়াছে।

পুরাতন ও নূতন মুদ্রার বিনিময়ের হার নিম্নরূপ (তিন পাই = ১ পয়সা) :—

পুরাতন প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ আনা	পাই	নয়া পয়সার সংখ্যা	পুরাতন প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ আনা	পাই	নয়া পয়সার সংখ্যা	পুরাতন প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ আনা	পাই	নয়া পয়সার সংখ্যা
০	৩	২	২	—	১২	৩	৯	২৩
০	৬	৩	২	৩	১৪	৪	—	২৫
০	৯	৫	২	৬	১৬	৪	৩	২৭
১	—	৬	২	৯	১৭	৪	৬	২৮
১	৩	৮	৩	—	১৯	৪	৯	৩০
১	৬	৯	৩	৩	২০	৫	—	৩১
১	৯	১১	৩	৬	২২	৫	৩	৩৩

৫	৬	৩৪	৯	—	৫৬	১২	৬	৭৮
৫	৯	৩৬	৯	৩	৫৮	১২	৯	৮০
৬	—	৩৭	৯	৬	৫৯	১৩	—	৮১
৬	৩	৩৯	৯	৯	৬১	১৩	৩	৮৩
৬	৬	৪১	১০	—	৬২	১৩	৬	৮৪
৬	৯	৪২	১০	৩	৬৪	১৩	৯	৮৬
৭	—	৪৪	১০	৬	৬৬	১৪	—	৮৭
৭	৩	৪৫	১০	৯	৬৭	১৪	৩	৮৯
৭	৬	৪৭	১১	—	৬৯	১৪	৬	৯১
৭	৯	৪৮	১১	৩	৭০	১৪	৯	৯২
৮	—	৫০	১১	৬	৭২	১৫	—	৯৪
			১১	৯	৭৩	১৫	৩	
৮	৩	৫২	১২	—	৭৫	১৫	৬	৯৭
৮	৬	৫৩				১৫	৯	৯৮
৮	৯	৫৫	১২	৩	৭৭	১৬	—	১০০

নূতন দশমিক মুদ্রাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারত সরকার খুবই আশাবাদী। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু এই পরিবর্তনের অনুকূলে দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, নূতন মুদ্রাব্যবস্থা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। এইসঙ্গে তিনি যথাসত্বর ভারতে ওজন এবং মাপেরও দশমিকীকরণ হইবে বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছেন।*

* দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলিয়াছেন :—

"On the 1st of April of this year 1957, a silent but far-reaching revolution is going to begin in India. This is the introduction of decimal and metric system in our coinage.

This will no doubt, be followed by the extension of this system later to weights and measures. For the present, however, we are introducing this system in the coinage only.

. . . I am convinced, however, that this change was not only necessary but essential, and any delay in it would have come in the way of our future progress. I have no doubt that some time or other this change would have become unavoidable. The later we made it, the more difficult it would have become.

. . . The world today is one of science, technology and industry in their innumerable aspects. A cumbrous system of coinage and weights and measures is wasteful of time and energy and delays work. As our social life becomes more advanced and complex these petty delays and waste mount up and add to a great deal. Therefore, it has become necessary to make this change now rather than at a later stage."

স্বর্ণমান

(Gold Standard)

কোন দেশের মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ, সেই দেশের কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে বিলিকৃত নোট বা যে কোন ধাতুমুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বর্ণপ্রদানে সব সময় বাধ্য থাকেন।* বলা নিষ্প্রয়োজন, এইভাবে মুদ্রা সর্বদা স্বর্ণের দ্বারা বিনিময়যোগ্য হওয়ায় মুদ্রানীতির উপর লোকের বিশ্বাস বাড়ে এবং সরকার জনসাধারণের আস্থাভাজন হওয়ায় তাঁহাদের কাজকর্মের প্রভূত সুবিধা হয়। মুদ্রা ছাড়া স্বর্ণমান-সমন্বিত দেশে লোকে সরকারী কোষাগারে সোনার থান জমা দিয়া পরিবর্তে সমমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা পাইবার অধিকারী হয়। এই অবস্থায় লোকের অবাধে স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানীরও অধিকার থাকে।

মুদ্রানীতিতে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সরকারের হাতে যে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ মজুত থাকা আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অস্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ায় নূতন সোনার খনি আবিষ্কৃত হইবার পর সোনা সস্তা হইলে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষের আগ্রহ জন্মায়। বিনিময়ের সুবিধা, আকৃতি, সকলের নিকট গৃহীত হইবার যোগ্যতা এবং সঞ্চয়ের সুবিধা (Medium, Measure, Standard and Store)—মুদ্রার যে চারিটি প্রধান গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, মূল্যবান উজ্জ্বল ধাতুখণ্ড হিসাবে স্বর্ণমুদ্রার সেই চারিটি গুণই বর্তমান। এ হিসাবে পৃথিবীতে সোনা যখন অপেক্ষাকৃত সুলভ হইল এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে লাগিল, তখন প্রচলিত রৌপ্যমানের স্থানে ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বর্ণের হিসাবে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা সহজে বিনিময় করা হয়। বৃটিশ মুদ্রা স্টার্লিং ১২৩১/৪ গ্রেণ, মার্কিন মুদ্রার ডলার ২৫ গ্রেণ এবং ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঁ ৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ লইয়া মুদ্রিত হইতে থাকে। এইভাবে জাপানী মুদ্রা ইয়েন, ইতালীর মুদ্রা লীরা, জার্মান মুদ্রা মার্ক প্রভৃতির স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট হইয়া যায়। এই ব্যবস্থায়

---

* A Gold Standard will be used to denote a state of affairs in which a country weeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another.

(*Money*—D. H. Robertson)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাজারে লক্ষণায় শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় বহির্বাণিজ্যের দিক হইতে কোন দেশেরই এ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তাছাড়া এই সময় প্রচলিত নোট প্রভৃতি মুদ্রার বিনিময়ে জনসাধারণ সমমূল্যের স্বর্ণ পাইবার অধিকারী ছিল বলিয়া কোন দেশের সরকার খেয়াল বা খুসীমত নোট ছাপাইয়া দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিতে পারিতেন না এবং সরকারী তহবিলের স্বর্ণসম্পদের হিসাবে বাজারে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা চালু থাকায় পণ্যমূল্য অপ্রত্যাশিত-ভাবে উঠানামা করিত না বলিয়া দেশবাসী অসহায় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত না।

প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। রপ্তানী বাণিজ্যের ও পণ্যবাহী নৌবহরের আযের উপর নির্ভরশীল ব্রিটেনের ন্যায় দেশের এই সময় বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয় এবং যুদ্ধ পরিচালনার ব্যয়ভার বহনে এই সব দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়া যায়। যুদ্ধাবসানে রপ্তানী বাণিজ্য পুনর্গঠিত হইবার পূর্বেই ইহাদিগকে বিদেশ হইতে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যাদি আমদানী করিতে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ দেশের বাহিরে পাঠাইযা দিতে হয। আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধির জন্য স্বভাবতঃই ব্রিটেনের মত দেশের স্বর্ণসম্পদ কমিয়া যায়। তবু এই অবস্থায়ও (১৯২৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিশালী দেশের কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এই ভাঙ্গন প্রতিরোধ করিয়া নিজ নিজ দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়ত সাফল্যমণ্ডিত হইত, কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সুরু হইয়া বিরাট অর্থনৈতিক মন্দাভাব সারা পৃথিবীতে সঞ্চারিত হয় এবং ইহার ফলে ব্রিটেনে স্বর্ণসঙ্কট দেখা দেয়। পরাজিত অধমর্ণ জার্মানীতে আপন লগ্নী বাঁচাইতে ব্রিটেনকে আবার এই সময় বিপন্ন জার্মানীকে অর্থ সাহায্য করিতে হইতেছিল। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণসম্পদ হ্রাস পাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণসম্পদের এক-সপ্তমাংশ এবং ফ্রান্সের স্বর্ণসম্পদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ হইয়া যায় এবং তাহার পক্ষে আর স্বর্ণমান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর নিরুপায় ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে।

ভারতে এই সময় পূর্ণ স্বর্ণমান না হইলেও স্বর্ণমানের প্রায় অনুরূপ স্বর্ণ-পিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) প্রচলিত ছিল। ব্রিটেন স্বর্ণমান

ত্যাগ করায় ভারত সরকার ব্রিটিশ মুদ্রানীতির উপর ভারতীয় মুদ্রানীতির নির্ভরশীলতার বিবেচনায় অবিলম্বে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কিত আইন (Currency Act) বাতিল করিয়া টাকার সহিত স্বর্ণের প্রচলিত বিনিময় সম্পর্ক বাতিল করিয়া দেন এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে টাকাকে স্টার্লিংয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করিয়া স্টার্লিং বিনিময় মান (Sterling Exchange Standard) প্রবর্তন করেন। স্বর্ণমান পরিত্যাগ করায় ব্রিটেনের স্টার্লিং মুদ্রার সম্ভ্রম কমিয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ইহার মূল্যও হ্রাস পায়। ভারতীয় টাকারও অনুরূপ অবস্থা হয়। অবশ্য ইহার ফলে বিদেশের বাজারে ব্রিটিশ বা ভারতীয় পণ্য অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্য কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেন পুনরায় মুদ্রামূল্য হ্রাস করে। ভারতীয় মুদ্রা এখন আইনতঃ ব্রিটিশ মুদ্রার উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু কমনওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত দেশ হিসাবে কার্যক্ষেত্রে এই নির্ভরশীলতা এখনও বহুলাংশে বজায় আছে বলিয়া ভারতও তাহার মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে।

মুদ্রানীতি হিসাবে স্বর্ণমানই শ্রেষ্ঠ। ব্রিটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর ধীরে ধীরে পৃথিবী হইতে স্বর্ণমান একরূপ নির্বাসিত হইয়াছে এবং এখন আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের হার আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডারের মধ্যস্থতায় আপোষের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আর্থিক অবস্থার হিসাবে ব্রিটেন নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্রিটেনের স্বর্ণসম্পদ এখনও অপ্রচুর। তবু ব্রিটেন যুদ্ধের শেষদিকে 'ব্যাঙ্কর' নামে এক নূতন মুদ্রামান অনুসারে আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনার প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক 'ব্যাঙ্কর' মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ পাওয়া যাইবে না, কিন্তু স্বর্ণের পরিবর্তে 'ব্যাঙ্কর' কোষাগার হইতে গ্রহণ করা যাইবে। ব্রিটেনের এই প্রস্তাবের বিপরীতে স্বর্ণসচ্ছল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ইউনিটাস' নামে এক নূতন আন্তর্জাতিক মুদ্রামান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। বলা হয়, প্রতিটি ইউনিটাসের মূল্য হইবে ১০ ডলার এবং ইহাতে ৩৭·১৪ গ্রেণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকিবে। 'ইউনিটাস' অবাধে স্বর্ণে পরিবর্তিত হইতে পারিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করে যে, যেসব দেশ এই আন্তর্জাতিক মুদ্রামান স্বীকার করিয়া লইবে, তাহাদিগকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ তহবিলে (International Stabilisation Fund) নির্দিষ্ট

পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ, স্থানীয় মুদ্রা বা অন্য জামিন জমা রাখিতে হইবে। ব্রিটেনের লর্ড কিন্‌স্ পরিকল্পিত 'ব্যাঙ্কর' মুদ্রামানের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি মর্গেনথো পরিকল্পিত 'ইউনিটাস্' মুদ্রামান অপেক্ষাকৃত উদার ও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এ সম্পর্কে আগ্রহও দেখাইয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর ⅘ অংশ স্বর্ণসম্পদের মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণমানানুরূপ মুদ্রানীতি প্রতিষ্ঠার এ চেষ্টা স্বর্ণাভাবগ্রস্ত পৃথিবী গ্রহণ করিতে পারে নাই। ব্রিটেনের 'ব্যাঙ্কর' মুদ্রামান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এমনিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সারা জগতে স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রথম প্রযোজন একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা মুদ্রাভাণ্ডারের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক আগ্রহশীল দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার 'ব্রেটন উডস্' সহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে এক আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে যে সব দেশ সদস্য হইয়াছে, তাহাদিগকে মোট দেয় চাঁদার শতকরা ২৫ ভাগ স্বর্ণে বা মার্কিন মুদ্রা ডলারে দিতে হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইতেছে, একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান মারফৎ আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা ও সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন দেশের মুদ্রামানের সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া পারস্পরিক দেনাপাওনা শৃঙ্খলার সহিত মিটাইবার ব্যবস্থা করা। স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের শেষে সদস্য দেশগুলি আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন না পাওয়া গেলে মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন করা চলিবে না। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইবার পর প্রত্যেক দেশকে প্রতি বৎসর মজুত স্বর্ণসম্পদ, বৈদেশিক সম্পত্তি, উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ, স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানী, আমদানী ও রপ্তানীকৃত পণ্যাদির মূল্য, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার, জাতীয় আয় প্রভৃতির বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণী আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডারের কার্যালয়ে পাঠাইতে হয়। এইভাবে এই মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক মারফৎ সব দেশের মুদ্রানীতির উপরই পুনরায় স্বর্ণের কিছুটা প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক স্বর্ণসম্পদের অধিকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণকেন্দ্রিক এই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা, ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাভাণ্ডারের

চাঁদার এক তৃতীয়াংশ তাহারই দান; কাজেই এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় পৃথিবীতে পুনরায় স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।*

অবশ্য আধুনিক যুগে মুদ্রাব্যবস্থার জটিলতা ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য স্বর্ণমান সকল দেশের আর্থিক স্বার্থের অনুকূল হইবে বলিয়া মনে হয় না। সরকারের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস থাকিলে দেশের ভিতর মুদ্রা ও স্বর্ণের অবাধ বিনিময়-ব্যবস্থার মত ব্যয়বহুল মুদ্রানীতি প্রয়োজন নাই। তাছাড়া আজকাল রাষ্ট্রপরিচালকদের প্রায়ই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া তাঁহাদের হাতে মুদ্রার সঙ্কোচ ও প্রসারের ব্যাপক ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এদিক হইতে দেখিলে জগতে এখন পূর্ণ-স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নিঃসন্দেহে কমিয়া গিয়াছে।

* স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠায় স্বর্ণপ্রাচুর্য অত্যাবশ্যক, কাজেই স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশগুলির মুনাফাবৃত্তি কমানো এই ব্যবস্থার অনুপূরক। পৃথিবীর সর্বাধিক স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধিই চায়। এবিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের নির্দেশও তাহারা মানিতে চাহে না। সারা পৃথিবীতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ আউন্সের মত স্বর্ণ উত্তোলিত হয়, ইহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় উত্তোলিত হয় ১ কোটি ১৫ লক্ষ আউন্সের মত।

ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং

(India's Sterling Balances)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে শাসনতান্ত্রিক সুবিধাভোগ করিয়া ব্রিটেন ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় পাওনাদার দেশ হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের নানা ওলটপালটের মধ্যে ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রিটেনের সহিত তাহার আর্থিক সম্পর্ক বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন প্রকৃতপক্ষে ভারত উত্তমর্ণ দেশ, ব্রিটেন তাহার অধমর্ণ। যুদ্ধের সুযোগে সাড়ে চারিশত কোটি টাকার বিলাতী দেনা শোধ করিয়াও ব্রিটেনের নিকট ভারতের প্রচুর পাওনা জমিয়াছে। এই পাওনা যুদ্ধের কয়েক বৎসর ধরিয়াই জমে এবং ভারত বিভাগের সময় অখণ্ড ভারতের হিসাবে ইহার পরিমাণ ছিল ১৫৪৭ কোটি টাকা।

যুদ্ধের সুযোগে ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত তিনটি কারণে :—

(১) যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারত হইতে প্রচুর পণ্যসামগ্রী কিনিয়াছেন, কিন্তু এইসব জিনিসের দাম (৪৩১ কোটি টাকা) নগদ দিতে পারেন নাই।

(২) যুদ্ধ বাধিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের সহিত একটি আর্থিক চুক্তি (Financial Settlement of 1939) সম্পাদন করিয়া ভারতের সমরব্যয়ের একাংশ বহনের প্রতিশ্রুতি দেন। এ হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট ভারত সরকারের পাওনা হয় ১২৯২ কোটি টাকা। এই টাকা নগদ না দিয়া ব্রিটিশ সরকার ইহার পরিবর্তে স্টার্লিং প্রতিশ্রুতি পত্র বা সিকিউরিটি দিয়াছেন।

(৩) যুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্য বা মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশের সৈন্যদের ভারতে অবস্থানের ব্যয়ভার প্রধানতঃ বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষই বহন করেন। এই হিসাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের যুদ্ধকালীন বাণিজ্যে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের দরুণ যে অর্থ মার্কিন সরকার ডলার মুদ্রায় প্রদান করেন, ব্রিটিশ সরকার সেইসব ডলারের অধিকাংশ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার জন্য সাম্রাজ্যিক ডলার তহবিলে (Empire Dollar Pool) জমা রাখিয়া পরিবর্তে ভারতের নামে সমপরিমাণ স্টার্লিং প্রতিশ্রুতিপত্র (১৬৫ কোটি

টাকা) জমা দেন। এইভাবে ভারতের পাওনার পরিমাণ ক্রমেই স্ফীত হয়। এছাড়া যুদ্ধের সময় ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যে ভারতের যে সাধারণ উদ্বৃত্ত হয়, তাহাও নগদ পরিশোধিত না হইয়া স্টার্লিং তহবিলের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়।

ব্রিটেনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যয়, ক্যাপিটেশন চার্জ বা ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে সামরিক শিক্ষা দিয়া ভারতে প্রেরণের খরচ, ভারত হইতে প্রত্যাগত অবসর-প্রাপ্ত সৈন্য ও সিভিলিয়ানদের পেন্সন, ব্রিটেনে গৃহীত ঋণের সুদ প্রভৃতির হিসাবে ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে প্রতি বৎসর প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ স্টার্লিং খরচ করিতে হইত। এই আর্থিক দায়িত্ব অপরিহার্য ছিল বলিয়া ভারত সরকার বরাবরই ব্রিটেনে একটি স্টার্লিং তহবিল রক্ষা করিতেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই তহবিলে মাত্র ৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ছিল। যুদ্ধের মধ্যে পাওনা জমিতে জমিতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইহা ১৬৫৮ কোটি টাকায় পৌঁছায়। বিলাতী দেনা শোধ (৪৬৭ কোটি টাকা) এবং ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিছু স্বর্ণক্রয় প্রভৃতি বাবদ যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা না হইলে ভারতের পাওনার পরিমাণ অবশ্যই আরও অধিক হইত।

কিন্তু এইভাবে ব্রিটেনের নিকট ভারত সরকারের পাওনার অঙ্ক যতই বাড়িতে থাকে, ভারতীয় আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও মুদ্রানীতিতে ততই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ভারতও যুদ্ধের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশকে আধুনিক যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে হইলে দেউলিয়া হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার যুদ্ধের কয় বৎসর দেশবাসীর স্কন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা করভার চাপাইয়া এবং ঋণপত্রের পর ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া কোনক্রমে বাজেটের ঘাটতি পূরণ করিয়াছেন। এইভাবে ভারত সরকারের অন্তর্দেশীয় ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাছাড়া যে সব ভারতীয় পণ্যের পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকার স্টার্লিং প্রতিশ্রুতিপত্র জমা দিয়াছেন, সেইসব পণ্যের নগদ মূল্য ভারত সরকারকেই প্রদান করিতে হইযাছে ; এই মূল্য প্রদানের জন্যই বিশেষ করিয়া ভারত সরকার অজস্র পরিমাণ নোট ছাপিতে বাধ্য হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই নোটের বদলে জামিন হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখার কথা, কিন্তু তাহা না করিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

আইনের একটি ধারার সুযোগ লইয়া জমা রাখা হইয়াছে প্রচুর স্টার্লিং প্রতিশ্রুতিপত্র।*

ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে ভারতবাসীর বহু দুঃখভোগের বিনিময়ে। ভারতে দীর্ঘকাল চরম পণ্যাভাব চলিয়াছে, খাদ্যের অভাবে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরে মৃত্যুবরণ করিয়াছে ৪৫ লক্ষ নরনারী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যুদ্ধান্তে ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের একমাত্র ভরসা স্বরূপ এই স্টার্লিং পাওনা প্রত্যর্পণের ব্যাপারে ব্রিটেনের দিক হইতে মোটেই আগ্রহ দেখা যায় নাই। টোরি দলপতি মিঃ চার্চিল স্বয়ং যুদ্ধে ভারতের স্বার্থ সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া কমন্স সভার প্রকাশ্য অধিবেশনে ভারতের সামরিক ব্যয়ভারের একাংশ বহনের পূর্বোল্লিখিত ইঙ্গ-ভারতীয় আর্থিক চুক্তি বাতিল করিবার দাবী জানান। বলা বাহুল্য এ দাবী সঙ্গত নয়। ভারত যুদ্ধ করিয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ হিসাবে, অন্যথায় একান্ত অপ্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বিপন্ন করিয়া তাহার যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার প্রয়োজন ছিল না। ব্রিটেনের সমগোষ্ঠীর আয়র্ল্যাণ্ড যে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা বজায় রাখিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেক্ষেত্রে যুদ্ধ সুরু হইবার ২৭ মাস পরে যুদ্ধে যোগ দিল, সেখানে হীনবল ভারতের প্রথম হইতে যুদ্ধে নামিবার কি যুক্তি থাকিতে পারে? তাছাড়া ভারত সীমান্তে জাপানকে প্রতিরোধের অর্থ যে জাপানের সহায়তায় বলীয়ান জার্মান অভিযান হইতে ব্রিটেনকে একদিক দিয়া রক্ষা করা,—ইহাও অস্বীকার করিবার কথা নয়। যাহা হউক, সে সময় ব্রিটেনে শ্রমিক-সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মিঃ চার্চিলের এ দাবী কার্যকরী হয় নাই।

এক শ্রেণীর ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং ব্রিটেনের কিছু লোক ভারতের পাওনা আর একভাবে কমাইবার চেষ্টা করে। তাহারা প্রচার করিতে থাকে যে, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের অসহায়তার সুযোগ লইয়া ভারতবাসী অত্যধিক দরে ব্রিটেনকে পণ্য যোগাইয়াছে বলিয়াই স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ এত বেশি হইতে পারিয়াছে। এসম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করেন। সুখের বিষয়, কমিটি তদন্ত করিয়া ভারতের সততা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইয়াছেন।

---

* Of the total amount of assets not less than two-fifths shall consist of gold coin, gold bullion or *Sterling securities*. —Section 33(2)

দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় ভারতে চালু ১২৩৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকার নোটের বদলে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ ছিল ১১৩৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

এছাড়া ব্রিটেনের বিখ্যাত অর্থনৈতিক পত্রিকা 'ইকনমিস্ট' এবং পরলোকগত প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ লর্ড কিন্‌স্ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমাইয়া জনসাধারণকে সুখেস্বচ্ছন্দে বাঁচিবার সুযোগ দিতে হইলে ভারতের পাওনা স্টার্লিংয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষায় বর্ষিত এই অযাচিত উপদেশের উত্তর হইতেছে, ভারতের মুদ্রাস্ফীতি শুধু ভারতের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য হয় নাই, মূলতঃ হইয়াছে পণ্যাভাবের জন্য। আর্থিক পুনর্গঠন না হইলে এই পণ্যাভাব দূর করা অসম্ভব এবং সেজন্য প্রয়োজন মূলধনের। কাজেই স্টার্লিং পাওনা কমানোর অর্থ হাতের অপ্রচুর মূলধন কমাইয়া ফেলা, তাহা নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে আত্মহত্যারই সমান। ভারতের চাকুরীয়া ব্রিটিশ পেন্সন-ভোগীদের প্রাপ্য মিটাইতে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি পূরণে স্টার্লিং পাওনাই ভারতের প্রধান ভরসা।

যুদ্ধান্তে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটেনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ৩৭৫ কোটি ডলারের এক নূতন ঋণগ্রহণ প্রসঙ্গে তাহার বৈদেশিক ঋণসম্পর্কিত এমন এক সর্ত উপস্থাপিত হয়, যাহাতে ভারতের সম্পূর্ণ পাওনা প্রত্যর্পণের ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সর্তে বলা হইয়াছিল যে, ব্রিটেনের বাহিরের ঋণ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে পাওনাদার দেশগুলির সহিত একটা বুঝাপড়া করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ পাওনার একাংশ অবিলম্বে পরিশোধ করিতে হইবে, একাংশ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধনীয় হইবে এবং তৃতীয় অংশ যাহাতে পাওনাদার দেশ ছাড়িয়া দেয়, তজ্জন্য আলাপ-আলোচনা করিয়া ব্রিটিশ সরকারকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য তৎকালীন ভারত সরকার দৃঢ়তার সহিত ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী এই সর্ত মানিতে অস্বীকার করেন।*

যাহা হউক, কয়েকটি চুক্তির সাহায্যে স্টার্লিং পাওনা সম্বন্ধে এখন ব্রিটেনের সহিত ভারতের মোটামুটি বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৭

* ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খান ১৯৪৬ ২৮শে অক্টোবর এসম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদে ঘোষণা করেন :—

"I want to make it absolutely clear that whatever agreement may have been arrived at between the U.S.A. and the United Kingdom in connection with the Anglo-American loan, we are not bound by it. We were not a party to it and if it is mentioned as one of the terms that there shall be a scaling down of balances, India is not certainly bound by it and we do not accept that proposition."

খ্রীষ্টাব্দে মধ্যবর্তীকালীন দুইটি সংক্ষিপ্ত চুক্তি হয় এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তৃতীয় চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। প্রথম দুইটি চুক্তিতে ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের হিসাবে ব্রিটেনের দেয় হয় ৮ কোটি ৩০ লক্ষ স্টার্লিং। তৃতীয় চুক্তিতে ভারত ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুনের মধ্যে আরও ৮ কোটি স্টার্লিং ফিরিয়া পাইবার অধিকার লাভ করে।* তৃতীয় চুক্তির সময় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের নিকট ব্রিটেনের মোট দেনা ছিল কিঞ্চিদধিক ১৫ শত কোটি টাকা।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন হইতে ব্রিটেনের ও ভারতের মধ্যে পুনরায় স্টার্লিং সম্পর্কিত আলোচনা সুরু হয় এবং চুক্তি প্রকাশিত হয় ৪ঠা আগস্ট। এই চুক্তির ফলে ভারত স্টার্লিং সঙ্ঘের পূর্ণ সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় সঞ্চয় হইতে দুর্লভ মুদ্রার (Hard Currency) দায় মিটাইবার অবাধ অধিকার লাভ করে। ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ভারত বৎসরে ৫ কোটি স্টার্লিং ফিরিয়া পাইবে বলিয়া স্থির হয় এবং এছাড়া ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত আমদানীর অর্ডারের জন্য প্রয়োজনীয় বাড়তি অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

পরবর্তী চুক্তি হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তিতে স্টার্লিং পাওনা চলতি হিসাব (Current account) ও আটক হিসাব (Blocked account) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হয় এবং ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীর চুক্তিতে এই সময়কার ভারতের পাওনা ৫৭ কোটি স্টার্লিংয়ের মধ্যে ৩১ কোটি স্টার্লিং ২নং হিসাব (আটক হিসাব) হইতে ১নং হিসাবে (চলতি বা অবাধ হিসাব) সরাইয়া আনা হয়। আরও স্থির হয় যে, ভারতের প্রাপ্য শোধ হিসাবে প্রতি বৎসর আরও ৩ কোটি ৫০ লক্ষ স্টার্লিং ২নং হইতে ১নং হিসাবে স্থানান্তরিত করা হইবে। ইহার পর যে স্টার্লিং পাওনা থাকিবে তাহা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন ১নং বা অবাধ হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যে আর্থিক চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে উপরিউক্ত ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের

---

* এই সময় আটক তহবিলে (২ নং হিসাব) ভারতের হিসাবে (পাকিস্তানের হিসাব তখন পৃথক হইয়াছে) ১০৭০ কোটি টাকা ছিল। তৃতীয় চুক্তিতে স্থির হয়, ব্রিটেনের পরিত্যক্ত সামরিক সরঞ্জামের জন্য ১৩৩ কোটি টাকা এবং ব্রিটেনে প্রেরিতব্য পেন্সনের দরুন হিসাব হস্তান্তরে ২২৪ কোটি টাকা ভারতের পাওনা হইতে বাদ যাইবে।

৮ই ফেব্রুয়ারীর চুক্তি পরিষ্কার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই চুক্তির কার্যকারিতা বিগত ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন স্থির হয়। ইহার পর ব্রিটিশ সরকার বা ভারত সরকার কেহই এখনও (এপ্রিল, ১৯৫৭) পুরাতন চুক্তির পরিবর্তে নূতন কোন চুক্তির প্রয়োজন ঘোষণা করেন নাই

বলা বাহুল্য, ভারতে বর্তমানে যে আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকরী হইতেছে, তাহার জন্য বিদেশ হইতে প্রচুর মালপত্র ও বহুসংখ্যক কুশলী যন্ত্রবিদ আনিতে হইতেছে। এই হিসাবে ভারতে সঞ্চিত স্টার্লিং তহবিল (Sterling Balances) দ্রুত ক্ষয় পাইতেছে। এই ক্ষয়ের পরিমাণ কিরূপ তাহা টাকায় রূপান্তরিত হিসাবে নিম্নের অঙ্কগুলি হইতে জানা যাইবে :—

মার্চ, ১৯৪৬	১৬৫৮ কোটি টাকা (অখণ্ড ভারতের হিসাবে);
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯	৯৪১ কোটি টাকা;
জুলাই, ১৯৫১	৮৫৭ কোটি টাকা;
এপ্রিল, ১৯৫৪	৭৫২ কোটি টাকা;
ডিসেম্বর, ১৯৫৬	৫৩৩ কোটি টাকা;
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯	২০৬ কোটি টাকা।

ভারতে মুদ্রাস্ফীতি

(Inflation in India)

ইংরেজী 'ইনফ্লেশন' শব্দের পরিবর্তে বাংলায় এখন মুদ্রাস্ফীতি শব্দটি চালু হইয়া গিয়াছে। 'ইনফ্লেশন' বলিতে যাহা বুঝায়, মুদ্রাস্ফীতি বলিতে এখন সকলেই প্রায় তাহাই বুঝিয়া লইতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইনফ্লেশন শব্দটি অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতি দুর্বল শব্দ। ইংরেজী 'ইনফ্লেট' শব্দের অর্থ বাতাস দিয়া বেলুন, ফুটবল ব্লাডার প্রভৃতি ফাঁপাইয়া তোলা। ইহাতে বেলুন বা ব্লাডারের আয়তন বাড়ে, ওজন বাড়ে না। এই 'ইনফ্লেট' শব্দ হইতে 'ইনফ্লেশন' শব্দ আসিয়াছে। ইনফ্লেশনের অর্থ দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া এবং সেই সঙ্গে তাল রাখিয়া পণ্যের যোগান না বাড়ায় মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা আনুপাতিক হারে কমিয়া যাওয়া। এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে নির্দিষ্ট আয়ের লোকের বা দেশের বাড়তি টাকার সুবিধা যাহারা না পাইয়াছে (ইহারা সংখ্যায় প্রচুর) তাহাদের দুঃখদুর্দশার আর সীমা থাকে না। মুদ্রাস্ফীতির সময় পণ্যমূল্য যেভাবে বাড়িয়া যায়, মজুরীর হার সে তুলনায় অনেক কম বাড়ে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষের প্রচলিত কাগজী মুদ্রার পরিমাণ ছিল ১৭৮ কোটি টাকা, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী অখণ্ড ভারতে এই নোটের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৩৭ কোটি টাকা, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই শুধুমাত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৭২১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এদেশে টাকার পরিমাণ এত বাড়া সত্ত্বেও পণ্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশবাসী বাড়তি টাকার কোন সুবিধা পাইতেছে না। প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত টাকা সাধারণ দেশবাসীর হাতে যায় নাই, অর্থবান ব্যক্তিরা এবং মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি যুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন।

যাহা হউক চড়া পণ্য বাজারে ধনীরা ততটা কষ্ট পাইতেছে না, কষ্ট পাইতেছে মধ্যবিত্ত ও গরীবেরা। অবশ্য ধনীদের মধ্যে যাহাদের আয় নির্দিষ্ট, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও বর্তমান বাজারে কিছুটা নামিয়া গিয়াছে।

এই ফাঁপাই টাকার আমলকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতির যুগ। যুদ্ধ শেষ হইবার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলেও এখনও সমগ্রভাবে দেশে টাকার প্রাচুর্য এবং ভোগ্যপণ্যের অভাব প্রায় একইরূপ আছে, কাজেই এখনও ভারতে 'ইনফ্লেশন' বা মুদ্রাস্ফীতি চলিতেছে বলা চলে।

ভারতে যুদ্ধের জন্যই মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে। যুধ্যমান দেশে প্রচলিত মুদ্রার প্রাচুর্য ঘটে দুইটি কারণে। প্রথমতঃ, যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার অসংখ্য লোক নিয়োগ করিতে বাধ্য হন এবং এইসব লোককে বেতন ও মাগ্‌গি ভাতা হিসাবে এবং পুরাতন লোকদের মাগ্‌গি ভাতা হিসাবে বহু অর্থ দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, সরকার বাধ্য হইয়া সামরিক পণ্যাদি ও সমরবিভাগীয় দ্রব্যাদি যে কোন মূল্যে কিনিয়া থাকেন। দেশে প্রয়োজনের তুলনায় পণ্যের অভাব ঘটায় এই সময় পণ্যসমূহের মূল্যরেখা এমনি অনেকখানি উপরে উঠিয়া যায়। যুদ্ধের বিপুল খরচ চালাইতে নোট ছাপানোর ব্যাপারে এসময় সরকারের রক্ষণশীলতা বজায় থাকে না। ভারতেও মহাযুদ্ধের ফলে এই অবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধের ছয় বৎসরে ভারত সরকারের প্রয়োজনে দেশে নোট বাড়িয়াছে হাজার কোটি টাকার বেশি, অথচ আগে যেমন নোটের জামিন হিসাবে সরকারী কোষাগারে স্বর্ণসম্পদ রক্ষা করা হইত, এই বাড়তি হাজার কোটি টাকার নোটের বেলায় সে নিয়ম মানা হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারতে প্রচলিত ১৭৮ কোটি টাকার নোটের পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ছিল ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ (এই স্বর্ণ অনেক কম দরে কেনা হইয়াছিল, এখানে ক্রয়মূল্যই ধরা হইয়াছে)। যুদ্ধের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিলিকৃত নোটের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী ১২৩৭ কোটি টাকা হয়, অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, এই পর্বতপ্রমাণ নোটের পরিবর্তে সঞ্চিত স্বর্ণসম্পদ এক কপর্দকও বাড়ে নাই। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে (৩৩।২ ধারা) নোটের পরিবর্তে জামিন হিসাবে বিলাতী স্টার্লিং সিকিউরিটি জমা রাখিবার ব্যবস্থা হয়।* ভারত সরকার যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থার চরম সুবিধা গ্রহণ

* যুদ্ধের মধ্যে ভারতের নামে অত্যধিক পরিমাণ ষ্টার্লিং সম্পদ জমিয়া যাওয়ায় এবং তৎপরিবর্তে ভারত সরকার নোটের পর নোট ছাপিয়া চলায় ভারতে মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে বলিয়া অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন:—

'The disastrous effects of this inflation upon India's economy, are then to be contributed to the vast war-time accumulation of sterling assets to the credit of the Reserve Bank of India. As Shenoy has put it, "It has been a case of entrepreneurs living upon wage-earners, industry living upon agriculture and other primary producing trades, middlemen living upon cultivators, rationed areas living upon not-rationed areas, and the United Kingdom, for whose benefit inflation has been indulged in, living on top of them all.'

Prof. R. N. Chatterjee—Indian Economics (1959), p. 368.

করিয়াছেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারীর হিসাবে দেখা যায়, ঐদিন ভারতে প্রচলিত ১২৩৭ কোটি টাকার নোটের পরিবর্তে জামিন ছিল ১১৩৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার স্টার্লিং সিকিউরিটি। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই শুধুমাত্র ভারতায় যুক্তরাষ্ট্রে যে ১৭২১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার নোট চালু ছিল, ইহার পরিবর্তে জামিন ছিল নিম্নরূপ :—সোনা ১১৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, স্টার্লিং সিকিউরিটি—১৭৩ কোটি টাকা, কাঁচা টাকা (Rupee Coins) —১২৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর কাগজ (Rupee Securities)—১৩২০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ভাবে স্টার্লিং সিকিউরিটিকে অথবা নিকেলের টাকা বা ঋণপত্রকে জামিন হিসাবে রক্ষা করা ভারতীয় মুদ্রা-নীতির নিরাপত্তার দিক হইতে অবশ্যই কিছুটা বিপজ্জনক।

যুদ্ধ শেষ হইবার এতদিন পরে এখনও ভারতে যুদ্ধোত্তর স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়া আসে নাই। এ অবস্থায় এদেশে মুদ্রাসঙ্কোচনের বা ডিফ্লেশনের চেষ্টা হওয়াই স্বাভাবিক। যুদ্ধাবসানে বহু লোক বেকার হইয়াছে, বহু প্রতিষ্ঠানে বাড়তি লোকদের চাকুরী বজায় রাখিতে নূতন নিয়োগ বন্ধ আছে। তাছাড়া যুদ্ধকালীন আয় কমিয়া যাওয়ায় এখন বহু ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছে, অথচ ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইতেছে না বলিয়া দেশে পণ্যমূল্যরেখা নামিতেছে না। খাদ্যের মূল্যহারের উপর দেশের সাধারণ পণ্যের মূল্যহার বহুলাংশে নির্ভরশীল, ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ১৯:৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে খাদ্যদ্রব্যসমূহের পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইহা ৩৮৫'২ হয়। আবার ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা ১১৩'৩ হইয়াছে।

পণ্যের যোগান বাড়ানোই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায়। লোকের হাতে টাকা বেশি হইলেও চাহিদার তুলনায় কোন পণ্যের যোগান যদি বেশি হয়, সেই পণ্যের মূল্য আর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় না, বরং লোকের হাতের বাড়তি টাকা ফলপ্রসূ কোন উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। এইভাবে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয় এবং নূতন অর্থাগমের সম্ভাবনা ঘটিয়া দেশে সচ্ছলতা আসে। ভারতেও বর্তমানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পণ্যবৃদ্ধির যে

লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহা যদি স্থায়ী ও ক্রমপ্রসারিত হয়, পরিকল্পনার দরুন অতিরিক্ত অর্থব্যয় সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতির চাপ অবশ্যই অনেক কমিয়া যাইবে। ভারতের মত যে দেশে ৩৬ কোটির বেশি লোকের বাস, সেখানে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় প্রয়োজনানুযায়ী প্রাচুর্য থাকিলে ১৭০০ কোটি টাকা বাজারে চালু থাকা মোটেই আতঙ্কজনক বলিয়া মনে হইত না।

দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে শাসনকর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি বা শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভার বৃদ্ধি এবং সরকারী ঋণ সংগ্রহ নীতির সম্প্রসারণই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ব্যয়াধিক্যে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ কঠিন হইলেও অবস্থা যথাসম্ভব আয়ত্তে রাখিতে ভারত সরকার এখন এই ব্যবস্থার দিকে লক্ষণীয় সক্রিয় আগ্রহ দেখাইতেছেন। অবশ্য এসব ব্যবস্থা প্রধানতঃ ধনীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য, ধনীদের হাতের নগদ টাকা এইভাবে কমাইয়া ফেলিতে পারিলে তাহাদের বাজার হইতে যে কোন মূল্যে পণ্য সংগ্রহের আগ্রহ কমাইতে পারা যাইবে এবং ফলে পরিমিত পণ্যের বাজারে বিশৃঙ্খলা ও মূল্যবৃদ্ধির চাপ হ্রাস পাইবে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ৪।৫ বৎসর ভারতে এইভাবে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইবার কোন ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নাই, বর্তমানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলেই এসম্পর্কে সরকারের কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। এখন এদেশে পণ্য বাড়ানোই সরকারের নীতি এবং এই পণ্যবৃদ্ধির আগ্রহে তাঁহারা বহুদিনের পরিকল্পিত শিল্পাদি জাতীয়করণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বহুলাংশে এড়াইয়া গিয়াছেন।* ভারতে শিল্পপ্রসার সম্পর্কে তাঁহারা এখন বে-সরকারী সম্ভাবনার উপর বিশেষ জোর দিতেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পখাতে মাত্র ১৭৩ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছিল, আশা করা হইয়াছিল ৫৩৩ কোটি টাকা বে-সরকারী সূত্রে শিল্পখাতে নিয়োজিত হইবে। শিল্পে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভারত সরকার এখন উদারতা দেখাইতেছেন। এছাড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকারিতার জন্য তাঁহারা জাতীয় ঋণ সংগ্রহের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সেদিক

* ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী সেণ্ট্রাল এডভাইসারি কাউন্সিল অব ইণ্ডাষ্ট্রিজের অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর নিম্নোক্ত মন্তব্য এসম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য :—

"The Government's resources were meant to increase production and not just apply them to transfer of ownership."

হইতে আশাপ্রদ সাড়াও পাওয়া যাইতেছে। সাম্প্রতিক কালে যাঁহারা আয়কর ফাঁকি দিয়াছেন, তাঁহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আয়কর তদন্ত কমিশন বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করিয়াছেন। শাস্তি না হইবার সরকারী প্রতিশ্রুতিতে বহু লোক তাঁহাদের গোপন আয়ের হিসাব সরকারের নিকট পেশ করিতেছেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রী ভি. মুনীস্বামীর এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রী এম. সি. শাহ জানাইয়াছেন যে, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত আয়কর তদন্ত কমিশন মারফৎ অথবা স্বেচ্ছায় ১২১ কোটি টাকার গোপন আয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার ফলে সরকারের প্রাপ্য দাঁড়ায় ৪৬ কোটি টাকার মত। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ভারতসরকারকে করনীতি সম্পর্কে পরামর্শ দিতে আসিয়া ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডারও ধনীদের বিপুল পরিমাণে কর ফাঁকির কথা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই ফাঁকির টাকা আদায় হইলে শুধু সরকারের কাজকর্মেরই সুবিধা হইবে না, ধনীদের হাতের সমপরিমাণ নগদ টাকা কমিয়া যাইবে বলিয়া পণ্য-বাজারের উপর তাঁহাদের চাপ কমিবে। আর্থিক সাচ্ছল্যের জন্য ধনীরা এতদিন শুধু ব্যাঙ্কে টাকা ফেলিয়া রাখেন নাই, বাড়ী, জমি, বিবিধপ্রকার ভোগ্য পণ্য, সরকারী ঋণপত্র, সোনারূপা, শেয়ার বাজার প্রভৃতিতে টাকা খাটাইয়াছেন। যুদ্ধোত্তর অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে শিল্পপ্রসারে আগ্রহ ছিল তাঁহাদের কম। তাঁহাদের মুনাফাবৃত্তি স্বাভাবিক এবং এইরূপ ঝুঁকিদারী কারবারের ফলে প্রত্যেক জিনিসের চাহিদাই অভাবিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সব কিছুই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া ভোগ্যপণ্যের মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়ায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র দেশবাসীর দুর্ভোগের শেষ ছিল না। এখন আবহাওয়ার একটু পরিবর্তন হইয়াছে, এসময় সরকারী দৃঢ়তা বজায় থাকিলে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকারিতার সময় সরকার যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলেন, ইহা পণ্য বাজারের আশানুরূপ শৃঙ্খলা রক্ষার অনুকূল নহে বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেক বেশি ঘাটতি ব্যয়ের (Deficit Financing) ব্যবস্থা হইয়াছে, জামিনবিহীন বেশি কাগজী মুদ্রা বাজারে চলিবার সহিত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা যদি সমানহারে প্রসারিত না হয়,

তাহা হইলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা কমিবার পরিবর্তে বাড়িয়াই যাইবে।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতই পণ্য বাজারের যে অবস্থা হইয়াছে এবং ঘাটতি ব্যয়ের ফলে চালু নোটের পরিমাণ যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে এই মুদ্রাস্ফীতিকালীন অসুবিধা সম্পর্কে সরকারকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কৃষির উন্নতির সহিত যন্ত্রশিল্প ছাড়া কুটিরশিল্পের ব্যাপক উন্নতি হইলে তবেই এই বৃহৎ দেশের পণ্যপ্রাচুর্য ঘটা এবং সাধারণ দেশবাসী সমেত সকলের আর্থিক সচ্ছলতা হওয়া সম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণদান সীমাবদ্ধ করিতে পারিলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কিছুটা কমিতে পারে বলিয়া মনে হয়। সরকারী খাতে ব্যয়সঙ্কোচও নিঃসন্দেহে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের সহায়ক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে "ফেডারেশন অফ ব্রিটিশ ইণ্ডাষ্ট্রিজ" এক রিপোর্টে মতপ্রকাশ করেন যে, ব্রিটেনে যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি নিরোধে ব্রিটিশ সরকারের ব্যয়সঙ্কোচই হইল প্রথম পথ।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর ভারত সরকার মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত :—

(১) সরকারী আয়ব্যয়ে অসমতা দূর করিতে সরকারী খরচ কঠোরভাবে কমাইতে হইবে ;

(২) যৌথ কোম্পানীসমূহের লভ্যাংশ শতকরা ৬ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে ;

(৩) যে সব ব্যবসাদার ঝুঁকিদারী কারবারের জন্য (speculative purposes) ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করে, তাহাদিগকে ব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান নিয়ন্ত্রণ করা হইবে ;

(৪) নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া হইবে এবং এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে প্রথম দিকে আয়কর প্রদান হইতে রেহাই দেওয়া হইবে ;

* "If nothing is done to counter or otherwise neutralise the inflationary effect of deficit financing, prices will rise and with them costs will rise in turn; the rise in costs will increase the financial requirements of the Plan and that will mean a greater volume of deficit financing. This in its turn will lead to a further rise in prices and therefore in costs."

(৫) চালু প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে উৎপাদন বাড়াইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে মূল্যাপকর্ষ তহবিলে টাকা রাখার ব্যাপারে, আয়কর নির্ধারণের ব্যাপারে এবং বিদেশ হইতে আমদানীকৃত কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতির জন্য আমদানী শুল্ক নির্ধারণের ব্যাপারে উদারতার সহিত বিবেচনা করা হইবে ;

(৬) দেশবাসী যাহাতে স্বল্পহারে সঞ্চয় করিতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রাদিতে টাকা খাটাইতে পারে, তজ্জন্য প্রবল প্রচারকার্য চালাইতে হইবে ;

(৭) ভারতের সর্বত্র শিল্পসংক্রান্ত গোলযোগের ক্ষেত্রে একই বিধান চালু করিতে হইবে।*

---

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ধিত হারে আয়কর ও অতিরিক্ত লাভের উপর কর সংস্থাপন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায্য দরে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, বোনাস ও কমিশন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়।

ভারতীয় ওজন ও মাপের দশমিকীকরণ

(Decimalisation of Weights and Measures)

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে যেমন ভারতীয় মুদ্রার দশমিকীকরণ সম্পন্ন হইয়াছে, ভারতীয় ওজন ও মাপের দশমিকীকরণও তেমনি আইনতঃ ভারতে কার্যকরী হইয়াছে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর হইতে। দশমিকী মুদ্রার চেয়ে ওজন ও মাপের দশমিকীকরণের ব্যবস্থা অনেক জটিল বলিয়া এবং ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ওজন ও মাপ প্রচলিত বলিয়া ভারতসরকার স্থির করিয়াছেন যে, মুদ্রার ন্যায় ওজন এবং মাপও উপস্থিত পুরাতন এবং নূতন দুই হিসাবেই চালু থাকিবে এবং জনসাধারণ অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে ক্রমে অধিকতর সুবিধাজনক দশমিক ওজন ও মাপের হিসাবই ভারতে প্রচলিত হইবে।* তাঁহারা প্রাথমিকভাবে উভয় প্রকার ওজন ও মাপ চালু থাকার অন্তর্বর্তী সময় দুইবৎসর ধরিয়াছেন।

দশমিক হিসাবে মণ, সের, ছটাক, টন, হন্দর, পাউণ্ড, বা গজ, ফুট, ইঞ্চি উঠিয়া গিয়া তাহাদের স্থলে ওজনের ক্ষেত্রে গ্রাম, দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে মিটার এবং তরল পরিমাপের ক্ষেত্রে লিটার একক হইবে। এই গ্রাম, মিটার এবং লিটারের দশমিক ভগ্নাংশ এবং দশ-গুণিতক হিসাবে বিভিন্ন মাত্রার নামকরণ আছে। এইসব নামের আবার ভারতীয় পরিভাষা প্রস্তাবিত হইতেছে। মূল আন্তর্জাতিক নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

* ইতিপূর্বে 'ভারতীয় মুদ্রার দশমিকীকরণ' প্রবন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর যে বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ওজন-মাপের দশমিকীকরণের আশু সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত আছে। এই দশমিকীকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে শ্রীনেহেরু বলিয়াছেন :—

"The world today is one of science, technology and industry in their innumerable aspects. A cumbrous system of coinage and weights and measures is wasteful of time and energy and delays work. As our social life becomes more advanced and complex these petty delays and work mount up and add to a great deal. Therefore, it has become necessary to make this change now rather than at a later stage."

এককের দশ-গুণিতক, একক ও দশমাংশ অল্প-গুণিতক হিসাবে :—

ওজনের ক্ষেত্রে—

কিলোগ্রাম	=১০০০ গ্রাম
হেক্টোগ্রাম	=১০০ গ্রাম
ডেকাগ্রাম	=১০ গ্রাম
গ্রাম	=একক
ডেসিগ্রাম	=১/১০ গ্রাম
সেন্টিগ্রাম	=১/১০০ গ্রাম
মিলিগ্রাম	=১/১০০০ গ্রাম

তরলমাপের ক্ষেত্রে—

কিলোলিটার	=১০০০ লিটার
হেক্টোলিটার	=১০০ লিটার
ডেকালিটার	=১০ লিটার
লিটার	=একক
ডেসিলিটার	=১/১০ লিটার
সেন্টিলিটার	=১/১০০ লিটার
মিলিলিটার	=১/১০০০ লিটার

দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে—

কিলোমিটার	=১০০০ মিটার
হেক্টোমিটার	=১০০ মিটার
ডেকামিটার	=১০ মিটার
মিটার	=একক
ডেসিমিটার	=১/১০ মিটার
সেন্টিমিটার	=১/১০০ মিটার
মিলিমিটার	=১/১০০০ মিটার

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১০০০ কিলোগ্রাম ওজনে এক মেট্রিক টন এবং ভারী জিনিস ওজনের সুবিধার জন্য ১০০ কিলোগ্রামে কুইন্টাল অথবা টোন (Quintal or Tonne) শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। যে ব্রিটিশ টন ওজনের সহিত আমরা পরিচিত তাহা একটন=১·০২ মেট্রিক টন। এক মিটারের

দৈর্ঘ্য প্রায় ১'১ গজের সমান। এক লিটার জল ৮৬ তোলা বা এক সের ৬ তোলার সমান।

দশমিক ওজন ও মাপের একক ও এককের গুণিতকের যে আন্তর্জাতিক আর্যা উপরে উদ্ধৃত হইল তাহাদের যথাসম্ভব ভারতীয় পরিভাষা গ্রহণের জন্য কেহ কেহ আগ্রহান্বিত। প্রবীণ জননায়ক চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রস্তাব করিয়াছেন মিটার ও গ্রামের পরিবর্তে গজ ও সের এই দুটি প্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিলে ভারতের জনসাধারণ তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে এবং দশমাংশ গুণিতকের ক্ষেত্রে পরে হা শ দা (গজহা = মিলিমিটার, গজশ = সেন্টিমিটার ইত্যাদি) এবং দশ গুণিতকের স্থলে আগে দা শ হা (দাগজ = ডেকামিটার, শগজ = হেক্টোমিটার ইত্যাদি) বসাইলে তাহা সার্বজনীন ভাবে চালু করিতে অসুবিধা হইবে না। এইভাবে লিটারের পরিবর্তে লিতা শব্দটিকে ভারতীয় পরিভাষা রূপে গ্রহণের সুপারিশ করা হইয়াছে এবং ইহার হা, শ, দা দিয়া দশমাংশ গুণিতকের ক্ষেত্রে (লিতাহা = মিলিলিটার, লিতাশ = সেন্টিলিটার ইত্যাদি) ও আগে দা, শ, হা দিয়া দশ গুণিতকের ক্ষেত্রে (দালিতা = ডেকালিটার, শলিতা = হেক্টোলিটার ইত্যাদি) সর্বজন-বোধ্য ও গ্রহণযোগ্য রূপে কাজ চালানো যাইবে।

বলা বাহুল্য, ভারতের সর্বত্র একরূপ ওজন ও মাপের প্রচলন খুবই বাঞ্ছনীয় এবং সে হিসাবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বলিয়াই ধৈর্যের সহিত কিছুদিন অপেক্ষা করিলে দশমিকী ওজন ও মান ভারতে দশমিকী মুদ্রার মতই গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিবে। অবশ্য অপরিচিত শব্দ সমন্বিত ওজন ও মাপের হিসাবে প্রথম প্রথম দশমিক মুদ্রা চালু থাকার প্রথমাবস্থার মত কিছুটা বিশৃঙ্খলা স্বাভাবিক। এক সঙ্গে পুরাতন ও নূতন অবস্থা চালু থাকার জন্যও এইরূপ গোলমালের অধিক সম্ভাবনা।

ভারত সরকারের ও রাজ্য সরকারসমূহের করনীতি

(Tax System of the Union Government and State Governments)

বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া বা যথোপযুক্ত জামিনের অতিরিক্ত পরিমাণ নোট ছাপাইয়া কোন দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে আর্থিক সঙ্কট হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের আয়ের উৎস হইল কর ব্যবস্থা। অবশ্য এই কর সংস্থাপন শুধু সরকারী ব্যয় নির্বাহের উপায় হিসাবেই পরিচালিত হয় না, যাহাদের উপর কর বসিবে তাহাদের আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সাধারণ ভাবে বিভিন্নশ্রেণীর আর্থিক অবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব সমতা সাধনও ইহার লক্ষ্য।

ভারতের শাসনতন্ত্রের সপ্তম তপশীলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহ কোন্ কোন্ কর বসাইতে পারিবেন তাহার তালিকা আছে। এছাড়া কর হইতে লব্ধ অর্থ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কে আদায় করিবেন এবং কে কে নিজ প্রয়োজনে তাহা ব্যবহার করিবেন, তাহারও সুনির্দিষ্ট একটি নীতি আছে। উল্লিখিত সপ্তম তপশীলে দেখা যায় কৃষি ব্যতীত অন্য আয় কর, সংবাদপত্রের উপর কর, আমদানী রপ্তানী শুল্ক, মাদক দ্রব্য ব্যতীত অন্য দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক, কর্পোরেশন (প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত) কর, কৃষি ভিন্ন অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার কর ও মৃত্যু কর, ব্যয় কর, বিত্তকর, শেয়ার বাজারের উপর কর ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ করিবার অধিকারী। উল্লেখ করা বাহুল্য যে, রেলপথ, বিমানপথ (রাষ্ট্রীয়করণের পর), ডাকঘর, বেতার বিভাগ, টাঁকশাল প্রভৃতি হইতে আয় কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীন। পক্ষান্তরে রাজ্যসরকারসমূহ কৃষি-আয়ের উপর কর, কৃষিভূমির উত্তরাধিকারের উপর কর, জমি ও বাড়ীর উপর কর, পার্লামেন্টের বিধিনিষেধ সাপেক্ষভাবে খনিজ স্বত্বের উপর কর, পেশা বা ব্যবসায়ের উপর কর, বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় ও ব্যবহারের উপর কর, সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য পণ্য বিক্রয়ের উপর কর রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে বা রাজপথে বা জলপথে পণ্য বা যাত্রী চলাচলের উপর

কর, জন্তু ও নৌকার উপর কর, বিলাস পণ্যের উপর কর আমোদ-প্রমোদ, ও জুয়াখেলার উপর কর, পেশা বা ব্যবসায়ের উপর কর প্রভৃতি কর বসাইবার, আদায় করিবার ও লব্ধ অর্থ কাজে লাগাইবার অধিকারী। কোন কোন কর আছে যেগুলি হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করেন এবং রাজ্যসরকারসমূহ বা এইরূপ করের সহিত সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহ তাহার ভাগ পায়। আয়কর, কৃষিজমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার কর, পাট শুল্ক, সংবাদপত্রের উপর কর, রেল মাশুলের অন্তর্ভুক্ত টারমিনাল (যাত্রা সমাপ্তি) কর, শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত কর ইত্যাদি এই শ্রেণার কর। স্ট্যাম্পের উপর কর এবং ঔষধপত্র ও মাদক দ্রব্যের উপর কর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইলেও রাজ্যসরকারসমূহ নিজ নিজ এলাকায় তাহা আদায় করেন এবং এই হিসাবে প্রাপ্ত টাকা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করেন।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় সরকার কর নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী ছিলেন, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দেই কয়েকটি কর স্থাপনের অধিকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের হাতে আসে। বিখ্যাত মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড ঘোষণার পর (ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে শাসনতান্ত্রিক গুরুতর পরিবর্তন ঘটে (Government of India Act, 1919) তাহাতেই প্রাদেশিক সরকার-সমূহের হাতে আয়ের উৎস নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আসে। এই আইন অনুসারে প্রদেশসমূহ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার (Dyarchy) অধীন হইলেও বহুলাংশে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রচলন হয়। এই সময় হইতে প্রাদেশিক সরকার প্রমোদ কর, সেচ কর, ভূমি-রাজস্ব, রেজেস্টারী সংশ্লিষ্ট স্ট্যাম্পের উপর কর, অরণ্যকর প্রভৃতির দায়িত্ব লাভ করেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজ্যসমূহের মধ্যে রাজস্ব-উৎস এই ভাবে পৃথক হইয়া যাইবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অসুবিধা দেখা যায়। লর্ড মেস্টনের সভাপতিত্বে এজন্য যে কমিটি (Financial Relations Committee, 1920) বসে, তাঁহাদের সুপারিশে কিন্তু প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

ইহার পর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন (The Government of India Act, 1935)। এই যুগান্তকারী আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের করনীতি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সীমাবদ্ধ হয়:—(১) লবণ কর,

(২) আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, (৩) ভারতে প্রস্তুত মদ্য, আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্য এবং এই মাদক দ্রব্য সমন্বিত ঔষধপত্র ও প্রসাধন দ্রব্য বাদে ভারতে উৎপন্ন বাকী জিনিসের উপর কর, (৪) কৃষি-আয়কর ব্যতীত আয়কর, (৫) বীমাপত্র সহ বাণিজ্যিক লেনদেনের স্ট্যাম্প শুল্ক, (৬) রেল ও বিমান পথের প্রান্তীয় শুল্ক (Terminal tax), (৭) রেলের ভাড়া ও মাশুল, (৮) কর্পোরেশন কর ইত্যাদি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আদায়যোগ্য কর নির্ধারিত হয় নিম্নলিখিতগুলি :— (১) কৃষি আয়কর ; (২) ভূমি-রাজস্ব ; (৩) পানীয় মদ্য ও মাদকদ্রব্য সমন্বিত ঔষধ প্রসাধন দ্রব্যের উপর কর ; (৪) মাথাপিছু কর (Capitation tax) (৫) খনিজ স্বত্বের উপর কর ; (৬) ব্যবসায় ও পেশা কর ; (৭) স্থানীয় কর (Local Cesses) ; (৮) প্রমোদ কর ও জুয়া কর ; (৯) ভূমি, বাড়ী ও জানালার উপর কর ; (১০) কৃষিভূমি উত্তরাধিকার কর ; (১১) বিচার বিভাগীয় স্ট্যাম্প (Judicial stamp) ; (১২) নিজ এলাকায় জলপথে বাহিত যাত্রী ও পণ্যের উপর কর।

অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারের লব্ধ অর্থের একাংশ বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যুক্তিযুক্তভাবে বণ্টনের উদ্দেশ্যে স্যার অটো নিমেয়ারের নেতৃত্বে একটি কমিটি (১৯৩৬) বসে। অবশ্য নিমেয়ার কমিটির রোয়েদাদ্ বাংলার মত প্রদেশকে তাহার প্রাপ্ত আয়কর ও পাটশুল্কের অংশ হিসাবে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই।

দেশ বিভাগের পর প্রদেশগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের একাংশ বণ্টনের নীতি পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা যায় এবং এজন্য শ্রীচিন্তামন দেশমুখ পরিকল্পিত রোয়েদাদ ঘোষিত হয়। আয়করের অংশ হিসাবে কেন্দ্রের মোট বণ্টনযোগ্য আয়করের শতকরা মাত্র ১৩½ ভাগ (বোম্বাই ও মাদ্রাজ যথাক্রমে শতকরা ২১ ভাগ ও ১৭½ ভাগ) পাওয়ায় ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নগরী কলিকাতা সমন্বিত পশ্চিমবঙ্গ দুঃখিত হয়। এই রোয়েদাদে পাটশুল্কের অংশ হিসাবে আসাম ও বিহার যথাক্রমে ৪০ লক্ষ ও ৩৫ লক্ষ টাকা পায়, পশ্চিমবঙ্গ পায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।

শাসনতন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী (২৮০ ধারা) ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের রাজ্যসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবণ্টন সম্পর্কে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর সভাপতিত্বে গঠিত অর্থ কমিশন (Finance Commission) এক নূতন নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অনুসারে মোট বণ্টনযোগ্য আয়করের শতকরা

১১'২৫ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের ভাগে (বোম্বাই ও মাদ্রাজ যথাক্রমে শতকরা ১৭'৫ ভাগ ও ১৫'২৫ ভাগ) পড়ে। বলা বাহুল্য, দেশমুখ রোয়েদাদের চেয়ে কম এই পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কমিশন যে সুপারিশ করেন তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল, তাঁহারা তামাক, বনস্পতি ও দেশলাইয়ের উপর ধার্য উৎপাদন শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ বিভিন্ন রাজ্যসরকারের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন এবং সুপারিশ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ অতঃপর পাটশুল্কের অংশ হিসাবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাইবে। কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গ ৮০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রের নিকট হইতে সাহায্যমূলক দান হিসাবে লাভ করিবার অধিকারী হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, প্রথম অর্থ-কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গ যখন আবগারী করের হিসাবে কেন্দ্রের নিকট হইতে বণ্টনযোগ্য টাকার শতকরা ৭'১৬ ভাগ পাইবার অধিকারী হয়, তখন বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশ অধিকারী হয় যথাক্রমে শতকরা ১০'৩৭ ভাগ, ১৬'৪৪ ভাগ ও ১৮'২৩ ভাগের।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী গেজেট অফ ইণ্ডিয়ার এক বিশেষ সংখ্যায় ভারতসরকার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আয়করের বণ্টনযোগ্য অংশ নির্ধারণ করিয়া একটি নির্দেশনামা [Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1957] প্রকাশ করেন। ইহাতে বলা হয় যে মোট সংগৃহীত আয়করের শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে। ইহাতে ঘোষিত হইয়াছে যে, রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য মোট টাকার শতকরা ১১'৪৮ ভাগ পাইবে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ পাইবে ১৫'৫৯ ভাগ, বোম্বাই পাইবে ১৮'৯১ ভাগ এবং বিহার পাইবে ৯'৩১ ভাগ। এই নির্দেশে সাহায্যমূলক দান (**grants in aid**) হিসাবে কেন্দ্রের নিকট হইতে প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গ ৮৩ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাব ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, উড়িষ্যা ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, মধ্যপ্রদেশ ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা, বোম্বাই ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, বিহার ৮০ লক্ষ টাকা ও আসাম ১ কোটি টাকা পাইবে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৮০ ধারা অনুযায়ী শ্রী কে. এস. সান্তনমের সভাপতিত্বে ভারতের দ্বিতীয় অর্থ-কমিশন বা ফিনান্স কমিশন গঠিত হয় এবং এই কমিশনের রিপোর্ট ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে পাঁচ বৎসরের হিসাবে বৎসরে মোটামুটি প্রত্যেক রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ অর্থ পাইতেছে :—

কেন্দ্রীয় করসমূহের বণ্টনযোগ্য অংশে রাজ্যের প্রাপ্য (কোটি টাকায়)

রাজ্য	করের অংশ	শাসনতন্ত্রের ২৭৩ ধারা অনুযায়ী প্রাপ্তব্য অর্থ *	শাসনতন্ত্রের ২৭৫ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী প্রাপ্তব্য অর্থ	মোট	রেলভাড়ার উপর কর বাবদ
অন্ধ্র প্রদেশ	৮'৫০	—	৪'০০	১২'৫০	১'৩১
আসাম	২'৭৫	০'৪৫	৪'০৫	৭'২৫	০'৪০
বিহার	১০'০০	০'৪৩	৩'৮০	১৪'২৩	১'৩৯
বোম্বাই	১৪'৭৫	—	—	১৪'৭৫	২'৪১
কেরালা	৩'৭৫	—	১'৭৫	৫'৫০	০'২৭
মধ্যপ্রদেশ	৭'০০	—	৩'০০	১০'০০	১'২৩
মাদ্রাজ	৮'২৫	—	—	৮'২৫	০'৯৬
মহীশূর	৫'৫০	—	৬'০০	১১'৫০	০'৬৬
উড়িষ্যা	৪'০০	০'০৯	৩'৩৫	৭'৪৪	০'২৬
পাঞ্জাব	৪'২৫	—	২'২৫	৬'৫০	১'২০
রাজস্থান	৪'২৫	—	২'৫০	৬'৭৫	১'০০
উত্তরপ্রদেশ	১৬'২৫	—		১৬'২৫	২'৭৮
পশ্চিমবঙ্গ	৯'৫০	০'৯১	৩'৮৫	১৪'২৬	০'৯৪
জম্মু ও কাশ্মীর	১'২৫	—	৩'০০	৪'২৫	—
মোট	১০০	১'৮৮ *	৩৭'৫৫	১৩৯'৪৩	১৪'৮১

নিম্নে সংক্ষেপে রাজস্বখাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের সংশোধিত হিসাব এবং ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট লিপিবদ্ধ হইল। ইহা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সম্পর্কে ধারণা হইবে :—

(লক্ষ টাকার হিসাব)

রাজস্ব	১৯৫৮-৫৯ **(সংশোধিত হিসাবে)**	১৯৫৯-৬০ **(বাজেট,** প্রস্তাব পরিবর্তন সহ)
আমদানী রপ্তানী শুল্ক	১,৩৬,০০	১,৩২,৭৭
কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক	৩,০১,১৫	৩,২১,০৮

* পাঁচ বৎসরের হিসাবে ইহা এক বৎসরের অংশ। প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিন বৎসর দেওয়া হইবে। শাসনতন্ত্রের ২৭৩ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী সাহায্যের মেয়াদ শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর ১০ বৎসর।

কর্পোরেশন (প্রতিষ্ঠান) কর	৫৬,০০	৫৮,৭৫
আয়কর	১,৬২,৫০	১,৬৬,২৫
উত্তরাধিকার কর	২,৫০	২,৮৫
বিত্তকর	১০,০০	১৩,০০
রেল ভাড়ার উপর কর	১১,০০	১১,০০
ব্যয় কর	১,০০	১,০০
দান কর	১,২০	১,২০
আফিম	৩,৩১	৩,৯২
সুদ	৮,৩৬	১০,৭৫
অসামরিক শাসনকার্য	৪৫,৬৩	৩৫,৮০
মুদ্রাব্যবস্থা (Currency & Mint)	৩৪,৭৬	৫৫,৬০
রাজস্বের অন্যান্য সূত্র	২৯,২১	৪১,৯৩
ডাক ও তার বিভাগ	৫,৩৮	৪,২০
রেলবিভাগ (নিট প্রাপ্য)	৬,৪০	৫,৯৮
বাদ :—(১) রাজ্যসমূহকে দেয় আয়করের অংশ	৭৫,৮০	৭৮,৬২
(২) „ „ উত্তরাধিকার করের অংশ	২,৩৮	২,৭১
(৩) „ „ রেলভাড়ার উপর করের অংশ	১০,৮৯	১০,৮৯
মোট রাজস্বখাতে আয়	৭২৮,২০	৭৮০,৮৬
রাজস্বে ঘাটতি	৫৯,৯৫	৫৮,৩২

ব্যয় (লক্ষ টাকার হিসাবে)

	১৯৫৮-৫৯ (সংশোধিত হিসাবে)	১৯৫৯-৬০ (বাজেট)
রাজস্বের উপর সরকারী দাবী (Direct Demands)	৯৯,৬৩	১০১,৬৫
ঋণখাতে	৪২,০৬	৫৭,৮৮
অসামরিক শাসন কার্য	১৯৭,৭২	২২২,৭৩
প্রতিরক্ষা (Defence)	২৬৬,৮৭	২৪২,৬৮
বিবিধ	৯৯,০৯	১০০,৬২
বিভিন্ন রাজ্যকে সাহায্য দান	৪৬,৯৫	৪৯,০২
মোট রাজস্বখাতে ব্যয়	৭৮৮,১৫	৮৩৯,১৮

নিম্নে ভারতের সরকারী অর্থনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি পরিসংখ্যান সন্নিবিষ্ট হইল :

বিভিন্ন রাজ্যসরকারের রাজস্বখাতে আয়ব্যয়ের হিসাব—

(কোটি টাকায়)

	১৯৫৮-৫৯ (সংশোধিত হিসাব)		১৯৫৯-৬০ (বাজেট)	
রাজ্য	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬৮·২৩	৬৪·৭৯	৭১·২৯	৭১·৬৬
আসাম	৩১·৬২	২৯·৭০	৩৩·৯৫	৩০·৫৪
বিহার	৬২·০৫	৬২·৯৬	৭১·৮৭	৬৬·৩৩
বোম্বাই	১৩২·০১	১৩১·৫৮	১৩৬·৭৪	১৩৭·৭২
জম্মু ও কাশ্মীর	১১·১৮	৯·৪৩	১২·৯৯	১০·৮০
কেরালা	৩৫·৫২	৩৫·৮১	৩৮·৪৭	৩৯·২৫
মধ্যপ্রদেশ	৫৮·৭৭	৫৫·২৭	৫৯·৩৭	৫৮·৪৪
মাদ্রাজ	৬৯·৪৯	৬৬·৮৪	৭৩·০৮	৭১·৬৯
মহীশূর	৬৬·২৯	৬৩·৮৯	৭১·৬৭	৭১·১৯
উড়িষ্যা	২৭·১৮	২৬·৩৮	৩০·৬৫	৩০·৫৮
পাঞ্জাব	৫০·৩৪	৪৬·৫১	৫২·৮৮	৫৩·২০
রাজস্থান	৩৫·১৮	৩৫·৭৬	৩৯·২৭	৩৯·১৪
উত্তর প্রদেশ	১১০·৩২	১১০·৬৮	১১৯·৬১	১২১·৪৭
পশ্চিমবঙ্গ	৮১·৫৮	৮০·৭৭	৭৯·০৪	৮২·৬৭

ভারত সরকারের ঋণ (কোটি টাকায়)

	মোট ঋণ	বৈদেশিক ঋণ	
৩১ মার্চ পর্যন্ত		মোট	ডলার
১৯৩৭	৭০৭	৪৬৯	
১৯৫২	২,৪৭৪	১৪৫	১১২
১৯৫৬	৩,১৭১	১৪১	১১৮
১৯৫৭	৩৫১৪	১৬২	১৩৩
১৯৫৮	৪০০৫	২১১	১৬০
১৯৫৯	৪৪৩১	৪৮৮	৩৬২

আয়করের হিসাব (কোটি টাকায়)

১৯৫১-৫২	৯৩·৩৩	১৯৫৬-৫৭	৯২·৯৯
১৯৫৪-৫৫	৬৬·৩১	১৯৫৭-৫৮ (সংশোধিত হিসাব)	৮২·৪৭
১৯৫৫-৫৬	৭৬·২০	১৯৫৮-৫৯ (বাজেট)	৮৪·৫৩

কেন্দ্রের নিকট বিভিন্ন রাজ্যের ঋণ (১লা এপ্রিল, ১৯৫৯, কোটি টাকার হিসাবে)

পাঞ্জাব—	২২১.৩৪	মধ্যপ্রদেশ—	৭০.৭২
পশ্চিমবঙ্গ—	১৮৭.৯৪	রাজস্থান—	৪৭.৯৯
উত্তরপ্রদেশ—	১৪৪.২৩	জম্মু ও কাশ্মীর—	৪৩.৪৯
বোম্বাই—	১২০.৮২	মহীশূর—	৪১.৬৪
উড়িষ্যা—	১০৪.৭১	আসাম—	৩০.৪৩
বিহার—	৯৪.৪০	কেরালা—	২৩.১৪
মাদ্রাজ—	৮২.৯৬	**মোট—**	১২৯৫.০৮
অন্ধ্রপ্রদেশ—	৮২.০২		

বিভিন্ন রাজ্যের মোট ঋণ (কোটি টাকায়)

১৯৫১-৫২ — ৪৪৫.২৮
১৯৫৪-৫৫ — ৯১৪.৯৬
১৯৫৫-৫৬ (সংশোধিত হিসাব) — ১২৩১.৯৪
১৯৫৬-৫৭ (সংশোধিত হিসাব) ··· ১৪৭৬.৩৩
১৯৫৭-৫৮ (সংশোধিত হিসাব) ··· ১৭৪৮.৭৩

বিভিন্ন করের হার

(প্রথম খণ্ড)

(১) উত্তরাধিকার কর (Estate Duty)

মৃত ব্যক্তির প্রথম ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তিতে কোন কর দিতে হইবে না

পরবর্তী ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তিতে	—	শতকরা ৬ ভাগ
পরবর্তী ৫০ হাজার	—	শতকরা ৭ ভাগ
পরবর্তী ৫০ হাজার	—	শতকরা ১০ ভাগ
পরবর্তী ১ লক্ষ	—	শতকরা ১২ ভাগ
পরবর্তী ২ লক্ষ	—	শতকরা ১৫ ভাগ
পরবর্তী ৫ লক্ষ	—	শতকরা ২০ ভাগ
পরবর্তী ১০ লক্ষ	—	শতকরা ২৫ ভাগ
পরবর্তী ১০ লক্ষ	—	শতকরা ৩০ ভাগ
পরবর্তী ২০ লক্ষ	—	শতকরা ৩৫ ভাগ
অবশিষ্ট সম্পত্তিতে	—	শতকরা ৪০ ভাগ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

আইনের ২০ (ক) ধারা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার থাকিলে :—

(ক) শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চারের মূল্য ৫০০০ টাকার কম হইলে কোন কর লাগিবে না।

(খ) শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চারের মূল্য ৫০০০ টাকার বেশী হইলে—শতকরা ৭½ ভাগ।

(২) **বিত্ত কর** (Wealth Tax)

(প্রথম খণ্ড)

ব্যক্তিগত ভাবে এক জনের ক্ষেত্রে :—

(ক)	প্রথম ২ লক্ষ টাকার নীট সম্পদে		কোন কর লাগিবে না
(খ)	পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকার নীট সম্পদে	—	শতকরা ½ ভাগ
(গ)	পরবর্তী ১০ লক্ষ	—	শতকরা ১ ভাগ
(ঘ)	অবশিষ্ট নীট সম্পদে	—	শতকরা ১½ ভাগ

প্রত্যেক হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে :—

(ক)	প্রথম ৪ লক্ষ টাকার নীট সম্পদে কোন কর লাগিবে না		
(খ)	পরবর্তী ৯ লক্ষ টাকার নীট সম্পদে	—	শতকরা ½ ভাগ
(গ)	পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকার নীট সম্পদে	—	শতকরা ১ ভাগ
(খ)	অবশিষ্ট নীট সম্পদে	—	শতকরা ১½ ভাগ

প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের (Company) ক্ষেত্রে :—

(ক)	প্রথম ৫ লক্ষ টাকার নীট সম্পদে কোন কর লাগিবে না।		
(খ)	অবশিষ্ট নীট সম্পদে	—	শতকরা ½ ভাগ

(৩) **ব্যয় কর** (Expenditure Tax)

প্রত্যেক ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অথবা হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে করধার্য-যোগ্য ব্যয়ের অংশের উপর :—

(ক)	১০ হাজার টাকায় অনূর্ধ্ব	—	শতকরা ১০ ভাগ
(খ)	১০ হাজার হইতে ২০ হাজার টাকায়	—	শতকরা ২০ ভাগ
(গ)	২০ হাজার হইতে ৩০ হাজার টাকায়	—	শতকরা ৪০ ভাগ
(ঘ)	৩০ হাজার হইতে ৪০ হাজার টাকায়	—	শতকরা ৬০ ভাগ
(ঙ)	৪০ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকায়	—	শতকরা ৮০ ভাগ
(চ)	৫০ হাজার টাকার উর্ধ্বে	—	শতকরা ১০০ ভাগ

(৪) আয় কর (১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের হারে টাকার হিসাবে)

আয়	বিবাহিত ব্যক্তি		একটি সন্তানসহ বিবাহিত ব্যক্তি		ছুইটি সন্তানসহ বিবাহিত ব্যক্তি		অবিবাহিত ব্যক্তি	
	উপার্জিত আয়	অনুপার্জিত আয়	উপার্জিত আয়	অনুপার্জিত আয়	উপার্জিত আয়	অনুপার্জিত আয়	উপার্জিত আয়	অনুপার্জিত আয়
৩০০০	—	—	—	—	—	—	—	—
৩২০০	৬	৬	—	—	—	—	৬৬	৬৬
৩৬০০	১৮	১৮	৯	৯	—	—	৭৮	৭৮
৪২০০	৩৬	৩৬	২৭	২৭	১৮	১৮	৯৬	৯৬
৫০০০	৬০	৬০	৫১	৫১	৪২	৪২	১২০	১২০
৬০০০	১২০	১২০	১১১	১১১	১০২	১০২	১৮০	১৮০
৭২০০	১৯২	১৯২	১৮৩	১৮৩	১৭৪	১৭৪	২৫২	২৫২
৮৪০০	৩০৫	৩৪৯	২৯৬	৩৩৮	২৮৭	৩২৮	৩৬৯	৪২১
১০,০০০	৪৫৭	৫২২	৪৪৭	৫১০	৪৩৮	৫০০	৫২০	৫৯৪
১৫,০০০	১১১৩	১২৭২	১১০৩	১২৬১	১০৯৪	১২৫০	১১৭৬	১৩৪৪
২০,০০০	২০৫৮	২৩৫২	২০৪৮	২৩৪১	২০৩৯	২৩৩০	২১২১	২৪২৪
৪০,০০০	১০,৫২১	১২,০২৪	১০,৫২১	১২,০২৪	১০,৫২১	১২,০২৪	১০৫২১	১২,০২৪
১,০০,০০০	৫১,৪৭১	৫৮,৮২৪	৫১,৪৭১	৫৮,৮২৪	৫১,৪৭২	৫৮,৮২৪	৫১,৪৭১	৫৮,৮২৪
১০,০০,০০০	৭,৪৪,৪৭১	৮,১৪,৮২৪	৭,৪৪,৪৭১	৮,১৪,৮২৪	৭,৪৪,৪৭১	৮,১৪,৮২৪	৭,৪৪,৪৭১	৮,১৪,৮২৪
৩০,০০,০০০	২২,৮৪,৪৭১	২৪,৯৪,৮২৪	২২,৮৪,৪৭১	২৪,৯৪,৮২৪	২২,৮৪,৪৭১	২৪,৯৪,৮২৪	২২,৮৪,৪৭১	২৪,৯৪,৮২৪

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

(Indian Banking System)

উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক। প্রতি দশ লক্ষ লোকের হিসাবে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের (Banking office) সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে যখন যথাক্রমে ১২৭ ও ২৩০, ভারতে তখন এই সংখ্যা মাত্র ১১। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি আমানতের দিক হইতেও উপরোক্ত দেশসমূহের ব্যাঙ্কের তুলনায় অনেক ছোট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায় ও ব্রিটেনে অধিবাসী পিছু ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ যখন যথাক্রমে ৪৪৯৩ টাকা, ২৭৩৩ টাকা ও ১৬৩৬ টাকা, ভারতে তখন মাথাপিছু এই হিসাব মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও বড়জোর ৪০ টাকা মাত্র।

বর্তমানে অনুন্নত হইলেও ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সুপ্রাচীন। আগে ভারতের শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত বৈশ্যসম্প্রদায়ভুক্ত একদল লোক শাসনকর্তৃ-পক্ষের অনুমতি লইয়া এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাইতেন। ইঁহারা জন-সাধারণের নিকট হইতে অল্প সুদে টাকা জমা রাখিয়া অধিক সুদে ব্যবসাদার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এমন কি প্রয়োজন হইলে শাসনকর্তাদের সেই টাকা ধার দিতেন। দেশে ইঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ পরিবারের কথা বাংলার ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসার সূচনা হয়। প্রথম দিকে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ও জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছু কিছু কাজ কারবার করে এবং পরে সরকারী টাকাকড়ি লেনদেনের অধিকার সমেত প্রথম প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল' ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর অপর দুইটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্ক অফ বম্বে' এবং 'ব্যাঙ্ক অফ ম্যাডরাস' (মাদ্রাজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক তিনটির হাতে নোট ছাপাইবার ক্ষমতা ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় কোম্পানী আইন' (Indian Companies Act, 1882) প্রবর্তিত হইবার পর এদেশে আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসা প্রসারিত হইবার সুযোগ পায়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক একত্রিত করিয়া ১৯২১

খ্রীষ্টাব্দে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' গঠিত হয়। তারপর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মর্যাদা বহুলাংশে নষ্ট হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসার ইতিহাসে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে। কিছুদিন যাবৎ এদেশে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের আন্দোলন সুরু হইয়াছিল, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এই জাতীয়করণ সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের নাম হইয়াছে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank of India)।

যোগ্যতা বা শৃঙ্খলার দিক হইতে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ এখনও কিছুটা পিছনে পড়িয়া আছে। সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা এদেশে অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা পায় না। গ্রেট ব্রিটেনে মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, নর্থ অফ্ স্কটল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সহিত যেমন কর্মচারীদের শিক্ষাকেন্দ্র যুক্ত আছে, বৃহদাকার ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি অনুরূপ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। কাহারও কাহারও মতে ভারতে অত অধিক সংখ্যক ব্যাঙ্ক না থাকিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ব্যাঙ্কের শাখাবৃদ্ধি ঘটিলে ফল ভাল হইবে।*

ভারতীয় ব্যাঙ্ক আইন (১৯৪৯)

ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা যে উন্নতি লাভ করে নাই, ভাল একটি ব্যাঙ্ক আইনের অভাব তাহার অন্যতম কারণ। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি এই আইনের আবশ্যকতার উপর জোর দেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতেও এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্তনের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গলায় শোচনীয় ব্যাঙ্কসঙ্কট দেখা দিলে সকলেই এদেশে একটি ব্যাপক উন্নতধরণের ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। অবশ্য ইতিমধ্যে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ২টি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-সমূহের পরিদর্শনের ও নূতন শাখা স্থাপন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেন।

---

* অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডা ও ব্রিটেনের ব্যাঙ্কসংখ্যা যথাক্রমে ৮, ৮৪, ১১ ও ২০ এবং ইহাদের শাখা সংখ্যা যথাক্রমে ৩১৪১, ৫৬৫৭, ৩৯২৩ ও ১১৯২৩। পক্ষান্তরে ভারতে ব্যাঙ্কসংখ্যা ও তাহাদের শাখা সংখ্যা যথাক্রমে ৪০৯ ও ৪৩৭৬।

যাহা হউক, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্ক আইন (Banking Companies Act, 1949) পাশ হয়। এই আইনের ২নং ধারা অনুসারে কোন একটি মাত্র স্থানে ব্যবসা চালাইতে হইলেও আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল লইয়া ব্যাঙ্কের অন্ততঃ ৫০ হাজার টাকা থাকা চাই। যে প্রদেশে (রাজ্যে) বা যে এলাকায় ব্যাঙ্কের হেড অফিস অবস্থিত, তাহার বাহিরে কোথাও অবাধভাবে কাজ চালাইতে হইলে এই টাকার পরিমাণ ৫ লক্ষ হওয়া চাই। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে কাজ চালাইতে হইলে ব্যাঙ্কের হাতে এইরূপ ৫ লক্ষ টাকা থাকা চাই। আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া ১০ লক্ষ টাকা থাকিলে যে কোন ব্যাঙ্ক কলিকাতা ও বোম্বাই সহ ভারতের সর্বত্র ব্যবসা চালাইতে পারিবে। আইনের ২০নং ধারায় কোন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের বা তাঁহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে ঋণদান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯(২)নং ধারায় একটিমাত্র কোম্পানীতে ব্যাঙ্ক কিরূপ অর্থ দাদন করিতে পারে, তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ২১ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন ব্যাঙ্ক কারবার চালাইতে পারিবে না। ২৮নং ধারায় ব্যাঙ্কগুলিকে সুস্পষ্ট উদ্বর্তপত্র (ব্যালান্স সিট) রচনা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৫ (২) ধারায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর পর ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের উপর লভ্যাংশের হার শতকরা ৯ টাকার মধ্যে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল আইনে এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই আইনের যে সংশোধন [Banking Companies (Amendment) Act, 1950] হয় তদনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের ব্যাঙ্কগুলি পরিদর্শন করার, তথ্যানুসন্ধান করার এবং ভারতে ও ভারতের বাহিরে নূতন শাখা খোলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পায়।*

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাঙ্ক আইনে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হইলেও কেহ কেহ আইনটি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে বলিয়া মনে করেন এবং ইহার আরও সংশোধন ও সম্প্রসারণ দাবী করেন। অনেকের ধারণা ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের যা অবস্থা, তাহাতে এদেশে ব্যাঙ্ক আমানত বীমা করার জন্য

---

* ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাঙ্কিং কোম্পানীস্ এ্যাক্টের সংশোধন হয়। এই সংশোধিত আইন (Banking Companies Amendment Act, 1956) ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী হইতে কার্যকরী হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি প্রতিষ্ঠান (Deposit Insurance Corporation) গঠিত হওয়া দরকার। ইহাতে কোন কারণে ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের মত ভারতের ব্যাঙ্ক ও সাধারণ-বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের আন্দোলনও এদেশে শক্তি লাভ করিতেছে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের পরিচালনার ক্রটির কথা আগেই বলা হইয়াছে। প্রধানতঃ এই ক্রটির জন্যই ১৯৪৭ হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে ৯৩ কোটি টাকা আমানত সমেত ১৮০টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে।

ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক

(১) **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া**—১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' অনুসারে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক; পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank of Pakistan) স্থাপিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ইহা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপেও কাজ করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের পক্ষে নোট ছাপাইয়া থাকে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনার ভার গ্রহণ করে এবং এজন্য একটি 'ইস্যু বিভাগ' স্থাপিত হয়। এই বিভাগ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ব্রহ্ম সরকারেরও নোট ছাপা হইয়াছে। নোট ছাপিবার অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের মুদ্রা বিভাগের সমস্ত সম্পত্তিরও কর্তৃত্ব পাইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের সময় প্রতি একশত টাকার পূর্ণ প্রদত্ত শেয়ারে বিভক্ত ৫ কোটি টাকা ছিল। এই সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীতে ছিলেন—একজন গভর্ণর ও দুইজন ডেপুটি গভর্ণর (পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ইঁহারা নিযুক্ত হন), কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ জন পরিচালক, অংশীদারদের দ্বারা নির্বাচিত ৮ জন পরিচালক এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের ভিতর হইতে মনোনীত একজন পরিচালক। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হইয়াছে এবং অংশীদারদের ১০০ টাকার

শেয়ার ১১৮৷৷৶০ আনা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।* ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ৩ কোটি টাকা আদায়ীকৃত মূলধন (ইহার শতকরা ৫১ ভাগ সরকার ও ৪৯ ভাগ জনসাধারণ জোগাইয়াছে) লইয়া পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক বা 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের এবং এদেশের ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার। ইহা সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে সরকারী টাকাকড়ির লেনদেন করে এবং সরকারী ঋণসংগ্রহ নীতি পরিচালনা করে। সরকারী তহবিল রক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন সুদ দেয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারকে অনূর্ধ্ব ৯০ দিনের মেয়াদে টাকা ধার দেয় এবং সোনারূপা কেনা-বেচা করে। বৈদেশিক হুণ্ডির কারবারও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিতে পারে। ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারে সমতা রক্ষার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এবং এইজন্যই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্টার্লিং কেনাবেচার অধিকার আছে। এছাড়া টাকার বাজারে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-সমূহকে পরামর্শ দিবারও অধিকারী। তপশিলী ব্যাঙ্কগুলি (Scheduled Banks) প্রত্যেক কার্যকরী দিনের কর্মাবসানের হিসাবে অন্ততঃপক্ষে চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভারতে নোট ছাপিবার যে ক্ষমতা আছে তাহার নিরাপত্তা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিম্নপক্ষে ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ এবং ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক সিকিউরিটি রাখিয়া থাকে। ভারতীয় কৃষি ও সমবায় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষিঋণ দানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সক্রিয়তা যে এদেশে বিশেষ ফলপ্রসূ, তাহা লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। এই উদ্দেশ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাম্য ঋণ সম্পর্কে একটি (All-India Rural Credit Survey Committee) গঠন করেন। বৈদেশিক হুণ্ডি প্রভৃতি কেনা-বেচার সুবিধার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের সুদের হার (Bank rate) জানাইয়া দেয় এবং প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া ইসু বিভাগ ও ব্যাঙ্ক বিভাগের কাজকারবারের হিসাব প্রকাশ করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ১৯৪৯

* বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী নিম্নলিখিতভাবে গঠিত :—
(১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্ণর ও দুইজন ডেপুটি গভর্ণর; (২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত সাতজন ডিরেক্টর; (৩) লোকাল বোর্ড কর্তৃক মনোনীত চারজন ডিরেক্টর।

খ্রীষ্টাব্দের ব্যাঙ্ক আইনে (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধনসহ) এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ও ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনের [Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1951 & Reserve Bank of India (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1953] ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বহু প্রসারিত হইয়াছে।

(২) **রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক** (ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক)—ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল', 'ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে' ও 'ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ'কে একত্রিত করিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' অনুসারে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সরকারী টাকাকড়ি লইয়া কাজকারবার করিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ক্ষমতা অবশ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তবে ভারতের যে সব স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সে সব জায়গায় সর্তাধীনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট রূপে কাজ করিতে থাকে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, ইহার অর্ধেক আদায়ীকৃত মূলধন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ হইয়াছে এবং নাম হইয়াছে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank of India)। এখন বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সুবিধা বিস্তারের উদ্দেশ্যে (ক্ষুদ্র শিল্পে দাদনাদি) এই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক নূতন নূতন শাখা খুলিতেছে। রাষ্ট্রীয়করণের সময় এই ব্যাঙ্কের শাখা ছিল ৩৭৭টি, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই শাখার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬৩৯। আরও ১৩৮টি নূতন শাখা খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

যৌথ ব্যাঙ্কের সর্বপ্রকার কার্যই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে বৈদেশিক বিনিময়ের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে পারে। বিদেশী প্রভাব অত্যধিক ছিল বলিয়া বিপুল সম্ভাবনাময় এই বৃহদাকার ব্যাঙ্কটি ভারতের শিল্পবাণিজ্যে বিশেষ সহায়তা করে নাই। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিযাল ব্যাঙ্ক আইন সংশোধনের পর হইতে এই ব্যাঙ্কের উপর ভারতীয় অধিকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভারতের পল্লী অর্থনীতির উন্নয়ন কল্পে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক পল্লী-অঞ্চলে কতকগুলি শাখা খুলিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তিবদ্ধ (১৯৫১) হয়। রাষ্ট্রীয়করণের পর স্বভাবতঃই এই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব ও

সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হিসাবে আগে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক রূপে বর্তমানে এই ব্যাঙ্ক ভারতের বৃহত্তম যৌথ ব্যাঙ্ক। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২০ কোটি টাকা এবং বিলিকৃত মূলধন ৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বিলিকৃত মূলধনের শতকরা ৫৫ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ঋণ থাকিবেই এবং শতকরা ৪৫ ভাগ শেয়ার বেসরকারী মালিকানায় থাকিতে পারে। ইহার মোট আমানতের পরিমাণ ৩৭০ কোটি টাকার মত।

(৩) বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক বা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক—ভারতের বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত হুণ্ডি আদান-প্রদানের কাজ যে কয়টি ব্যাঙ্কের মারফৎ পরিচালিত হইয়া থাকে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের অধিকাংশ বিদেশী প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাঙ্কগুলি যৌথ ব্যাঙ্ক হিসাবেও কাজকারবার চালায়। ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত বিদেশী যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৭, ভারতের ৬৭টি শাখায় ইহাদের আমানতের পরিমাণ প্রায় ২০০ কোটি টাকা। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ইস্টার্ণ ব্যাঙ্ক, হংকং অ্যাণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ব্যাঙ্ক অফ চায়না, ফরাসী ব্যাঙ্ক (Comptoir National D'Escompte de Paris), আমেরিকান এক্সপ্রেস, ন্যাশানাল সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউইয়র্ক, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক অফ মিডল্ ইস্ট, নেদারল্যাণ্ডস্ ট্রেডিং সোসাইটি প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। ইহারা ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করে না। ভারতে ১৭টি তপশীলী বিদেশী ব্যাঙ্ক কারবার করে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি ভারতে কাজকারবার চালাইয়া ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা নিট লাভ করে। ইহাদের মোট আমানতের পরিমাণ ২১০ কোটি টাকার মত। ইহাদের ৬৭টি শাখা ভারতে কাজ করিতেছে।

(৪) ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'আউধ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক'ই প্রথম পূর্ণ ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক। ভারতের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির দায়িত্ব ও দান অসামান্য। ভারতে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, এই সময় দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির কাজ ক্রমেই প্রসারলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। অযোগ্য পরিচালনায় এবং দেশবাসীর অযৌক্তিক আতঙ্কে কতকগুলি যৌথ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় সাধারণ ভাবে এই ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার স্বাভাবিক অগ্রগতি এদেশে বারবার প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। পিপলস্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ

সিমলা, ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আগে ফেল পড়ে। ইহার প্রতিক্রিয়া কাটাইবার পর যুদ্ধোত্তর কালে পুনরায় দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির পতন ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার অগ্রগতি বিশেষ ভাবে প্রতিহত করিয়াছে।

যাহা হউক সংশোধন সহ ব্যাঙ্ক আইনের এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনের ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি হইয়াছে। ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশিলভুক্ত (Scheduled) এবং অ-তপশিলী (Non-scheduled) উভয় প্রকার ব্যাঙ্কই আছে। যে সব যৌথ ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিলের পরিমাণ অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা, সেগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে তপশীলভুক্ত হইতে পারে। যে সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত নয়, সেগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন হইলেও সমিতিবদ্ধ যৌথ প্রতিষ্ঠান (Incorporated Company) হিসাবে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রারের অধীন।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ভারতে ৭৩টি তপশীলভুক্ত এবং ২৯৮টি অ-তপশীলভুক্ত ভারতীয় ব্যাঙ্ক ছিল এবং ইহাদের আদায়ী মূলধন এবং মোট আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ও ৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা এবং ৮৫৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ও ৫১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির ৬৭টি শাখা সমেত ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট শাখার সংখ্যা ৩২৭৩টি দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা ছিল ২৯৬৬টি। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ভারতে অ-তপশীলী ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ছিল ৯৪৭টি।* ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের পরিমাণ ১৪৮৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় ওঠে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ মাইশোর, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি লক্ষণীয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, হুগলী ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন—এই চারিটি

---

* ভারতে অ-তপশীলী ব্যাঙ্কের কাজকারবার যে নিঃসন্দেহে কমিয়া যাইতেছে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবের সহিত উল্লিখিত হিসাবের পার্থক্য হইতেই অনুমিত হইবে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এ রূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা, ইহাদের শাখাসংখ্যা, আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৩২, ১২৬২, ৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ও ৬৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা।

ব্যাঙ্কের একত্রীকরণে গঠিত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াও এই রাজ্যের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে কিছুটা ভরসার সৃষ্টি করিয়াছে।

(৫) **দেশীয় ব্যাঙ্ক**—ভারতের গ্রামাঞ্চলে সাউকার বা গ্রাম্য মহাজনেরা এখনও আগেকার শ্রেষ্ঠীদের মত দেশীয় প্রথায় ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাইয়া থাকে, তবে এই দেশীয় মহাজনেরা খুব কম ক্ষেত্রেই অন্য লোকের টাকা আমানত হিসাবে জমা রাখে। ইহাদের সুদের হার অত্যন্ত বেশি এবং গ্রাম্য ভারতের দুর্গতির জন্য এই কুসীদজীবী মহাজনেরা বহুলাংশে দায়ী। তবু ইহারা হাতের কাছে আছে বলিয়া গ্রামবাসীদের কোন কোন সময় উপকারও হয়। গ্রাম্য ঋণদাতা ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক বা জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং এই সব ব্যাঙ্কের উপর গ্রামবাসীর বিশ্বাস জন্মাইলে তবেই এদেশ হইতে কুখ্যাত মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ আশা করা যায়। এজন্য গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার আবশ্যক। ভারতে ছোট বড় দেশীয় মহাজনেরা বৎসরে ২০০ কোটি টাকার মত ধার দিয়া থাকে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় মহাজনী আইনের (Bengal Money-lenders Act, 1940) মত আইনের সাহায্যে এইসব দেশীয় মহাজনকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

গ্রাম্য মহাজন ছাড়া 'শ্রফ' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লোক হুণ্ডির কারবার করে। হুণ্ডি-কারবারীদের ব্যাঙ্ক ও ব্যবসাদারের মধ্যস্থ ব্যক্তি বলা যায়। এইরূপ হুণ্ডির কারবার ভারতে যৌথ ব্যাঙ্ক ব্যবসা প্রসারের বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। হুণ্ডির সুদের হার ব্যাঙ্কের সুদের হারের তুলনায় কিছু বেশি হইলেও গ্রাম্য মহাজনদের সুদের হারের তুলনায় অনেক কম।

ভারতের মত গ্রাম-প্রধান বিশাল দেশে দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না বলিয়া ইহা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। ভারতের দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শ্রফ কমিটি (১৯৫৪) এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুপারিশ করিয়াছেন।

(৬) **সমবায় ব্যাঙ্ক ও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক**—ভারতীয় কৃষক ও গ্রাম্য শিল্পীদের ঋণভার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতে সমবায় আন্দোলন প্রবর্তিত হয় এবং এই শ্রেণীর গরীব লোকদের প্রয়োজনের সময় অল্প সুদে টাকা ধার দিবার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রাম্য ঋণদাতা ব্যাঙ্ক বা জমি-বন্ধকী

ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। শাসনকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হইলেও এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক সদস্য শ্রেণীভুক্ত জনসাধারণের দ্বারা মোটামুটি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। দুঃখের বিষয় ভারতে এই প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এখনও আশানুরূপ প্রসার হয় নাই। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রসারই এদিক হইতে অধিকতর নগণ্য। অথচ কৃষিসম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Agriculture in India, 1928) এবং গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee, 1930) গ্রামবাসীদের ঋণ লাঘবের উদ্দেশ্যে এই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রসারের উপর খুবই জোর দিয়াছেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি (The Rural Banking Enquiry Committee, 1950) গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট এলাকায় সমবায় সমিতি এবং পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক গ্রাম্য ঋণদান ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্য যে কমিটি (All India Rural Credit Survey Committee) গঠিত হয় তাঁহারাও তাঁহাদের ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত রিপোর্টে গ্রাম্য পরিস্থিতির উন্নতি-কল্পে সমবায় ঋণ ব্যবস্থার ও কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিভাগ ('State associated' sector of Commercial Banking) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছেন। 'ভারতে সমবায় আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধে ইতিপূর্বে দেখানো হইয়াছে, এ দেশের গ্রামাঞ্চলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি তবু কিছুটা কাজ করিতেছে। বলা বাহুল্য, যে দেশে শতকরা ৮২ জন গ্রামবাসী (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা দরিদ্র), সে দেশে সমবায় ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১৪২১টি শাখা সমন্বিত ৬৫২টি সমবায় ব্যাঙ্ক ভারতে কার্যকারবার চালাইয়াছে। ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ও মোট আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং ২২২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।

(৭) **পোস্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক**—ভারতের গ্রামাঞ্চলে যৌথ ব্যাঙ্কের প্রয়োজনানুযায়ী প্রসার হয় নাই বলিয়া পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ভারতের সর্বত্র জনপ্রিয় হইয়াছে। ডাকঘরের সহিত সংযুক্ত বলিয়া জনসাধারণ সর্বদাই এই ব্যাঙ্কগুলির সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে। তাছাড়া সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহার নিরাপত্তাও কম কথা নয়। ইহার আমানতের উপর সুদের

হার সাধারণভাবে যৌথ ব্যাঙ্কের হার অপেক্ষা কিছু বেশি। একবারে জমা দেওয়ার, টাকা তোলার এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ টাকা সঞ্চয় সম্বন্ধে পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে। পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা সরকারের কাজে লাগে, সাধারণ যৌথ ব্যাঙ্কের মত শিল্পবাণিজ্যে এই টাকা লগ্নী হয় না। পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানতকারীর সংখ্যা ৬৫ লক্ষের মত এবং ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইহাদের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

(৮) শিল্পীয় মূলধন সংস্থা—১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ কেন্দ্রীয় মূলধন সংস্থা আইন (Industrial Finance Corporation Act, 1948) পাশ হয় এবং ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন সহ ভারতের কেন্দ্রীয় মূলধন সংস্থা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা এবং ইতিপূর্বে 'ভারতীয় শিল্পের মূলধন' প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানীসমূহ, ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এই মূলধন যোগাইযাছে। এই সংস্থা অবশ্য সাধারণের আমানত জমা রাখে না, তবে ইহার মূলধন হইতে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপদের সময় ২৫ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে ঋণ দিয়া থাকে। এছাড়া এই টাকা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ডিবেঞ্চারেও লগ্নী হইতে পারে। এইভাবে সরকারী টাকা খাটে বলিয়া সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে স্বভাবতঃই জনসাধারণের ভরসা বাড়িয়া যায। কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থার শেযারের উপর নিম্নপক্ষে শতকরা ২$\frac{1}{2}$ টাকা লভ্যাংশের নিশ্চযতা দিযাছেন।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আইন (State Financial Corporation Act, 1951) অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যেও শিল্পীয মূলধন সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। জনসাধারণ এই রাজ্যিক শিল্পীয মূলধন সংস্থার শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত শেযার গ্রহণ করিতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধন যোগাইযা কেন্দ্রীয় শিল্প-মূলধন সংস্থার কার্যকরিতার পরিপূরণ করিযা থাকে বলা চলে।

(৯) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট্ এণ্ড ইন্ভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন—বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে সাহায্যদানের জন্য ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুযারী হইতে এই শিল্পীয় ঋণদান ও বিনিয়োগ সংস্থাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই

সংস্থার অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা এবং ইহাতে মার্কিন ও ব্রিটিশ লগ্নীকারকদের সহিত ভারতীয় লগ্নীকারকদের টাকা খাটিবে। বিশ্বব্যাঙ্ক বিদেশী মুদ্রায় এই প্রতিষ্ঠানে ১ কোটি ডলার লগ্নী করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারত সরকার বিনা সুদে ১৫ বৎসরে সমান বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধনীয় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এই সংস্থাকে ধার দিতেছেন।

(১০) রি-ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইনডাসট্রি প্রাইভেট লিমিটেড—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (৫ কোটি টাকা), স্টেট ব্যাঙ্ক (২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা), লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন (২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা) এবং ১৪টি বৃহদাকার তপশীলী ব্যাঙ্ক (২ কোটি টাকা) শেয়ার গ্রহণ করিয়া মোট ১২ কোটি ৫০ লক্ষ বিলিকৃত মূলধনে সদস্যব্যাঙ্কগুলির বেসরকারী শিল্পে ফলগ্রস্থ মাঝারি আকারের ঋণদানের বিপরীতে পুনঃঋণদানের সুবিধার্থে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৬ কোটি টাকা জমা রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারতে বীমা ব্যবসা

(Insurance in India)

সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন—"এক ভদ্রলোককে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, জীবনবীমা না করা একটা পাপ। যিনিই বলুন না কেন এটা অত্যন্ত বড় কথা। আমি বাস্তবিকই বিশ্বাস করি যে, কথাটা সত্য, কেননা ইহার তাৎপর্য পরস্পরের সহযোগিতা, মনের শান্তি, অপরের সহিত নিজের দুর্ভাগ্য বখরা করিয়া লওয়া। যে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে তাহার কল্যাণ হউক।"

সংসারী মানুষের জীবনে জীবনবীমার প্রয়োজন অপরিসীম। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক হইতে অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা প্রভৃতির গুরুত্ব যথেষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশে বীমা ব্যবসার প্রসার অত্যাবশ্যক হইলেও এখনও এ হিসাবে ভারত খুবই পিছাইয়া আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে মাথাপিছু জীবনবীমার পরিমাণ ছিল ১২ টাকা, পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও জার্মানীতে এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩০০ টাকা, ১৫৭৩ টাকা, ৯৭৩ টাকা, ৯৬০ টাকা ও ২৪০ টাকা। বর্তমানে ভারতে এই টাকার অঙ্ক ৪০ টাকার মত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও সাধারণ ভারতবাসীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। তবে এই মাত্র আশার কথা যে, আগে যেমন বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতবর্ষে ব্যবসা চালাইয়া প্রচুর মুনাফা লুটিত, এখন ভারতীয় বীমা-ব্যবসা কিছুটা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বিদেশী বীমা কোম্পানী-গুলির সেই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠার ও মুনাফার হার আনুপাতিকভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে ভারতের আর্থিক উন্নতির সহিত জাতীয় বীমা ব্যবসার সম্প্রসারণও স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে নিউ ইণ্ডিয়া, ওরিয়েণ্টাল, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ প্রভৃতি ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি জীবনবীমার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি করিয়াছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী ভারত সরকার এক অর্ডিনান্স [Life Insurance (Emergency Provisions) Ordinance, 1956] জারী করিয়া ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলির রাষ্ট্রীয়করণ (Nationalisation) ঘোষণা করেন। অতঃপর সরকার পক্ষ

হইতে একটি এই রাষ্ট্রীয়করণের আইন হিসাবে এবং রাষ্ট্রীয়করণের পর ভারতীয় বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য "জীবন বীমা কর্পোরেশন" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে দুইটি বিল আনীত হয় এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়া আইন দুইটি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে কার্যকরী হইয়াছে। ১৯শে জানুয়ারী অর্ডিনান্স জারী হইলেও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলি আপন আপন লোকজনের সাহায্যে পৃথক সংস্থা হিসাবে কাজ চালান, ১লা সেপ্টেম্বর হইতেই প্রকৃতপক্ষে ২৪৫টি সংস্থার (বীমা কোম্পানী ও প্রভিডেণ্ট সোসাইটি সহ) একত্রীকরণ হইয়াছে। এই সময় এই প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীসংখ্যা ছিল ২৭ হাজার এবং ৫০ লক্ষের মত বীমাপত্রে ১২৫০ কোটি টাকার কিছু বেশী বীমা চালু ছিল।

"লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন" আইন * অনুযায়ী সমগ্র ভারতকে মধ্য, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই পাঁচটি অঞ্চলে (zone) ভাগ করা হইয়াছে এবং এই অঞ্চলগুলির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে যথাক্রমে কানপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীতে। এখন ভারতে ৩৩টি বিভাগীয় অফিস (Divisional office) ও ১৮০টি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় জীবন বীমা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দুইটি কমিটি [কার্যকরী কমিটি (Executive Committee) ও বিনিয়োগ কমিটি (Investment Committee)] গঠিত হইয়াছে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগত পরিচালনার অবসানে সরকারী পরিচালনাধীনে পরিবর্তনকালীন সাময়িক অস্থিরতায় ভারতের জীবনবীমা ক্ষেত্রে নূতন কাজকর্ম কিছুটা স্তিমিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে আশা করা যায় জীবনবীমার গুরুত্ব দেশবাসী উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়া এবং সরকারী পরিচালনায় অনিশ্চয়তা কমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক বলিয়া এই কাজকর্ম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। জীবনবীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর সারা ভারতে মোট

* জীবন বীমা রাষ্ট্রীয়করণ সংক্রান্ত বিলটি পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিবার সময় ইহার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বলিয়াছিলেন :—

"The principal point about nationalisation is that the State does not have to make out a case that the private sector has failed. Nationalisation is justified on many other grounds of ideology, philosophy, on the objectives of a welfare State."

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও এ সম্পর্কে বলিয়াছেন :—
"It is an important step in our march towards a socialist society."

৩৩টি বিভাগীয় (Divisional) অফিস খোলা হইয়াছে এবং এই অফিসগুলির অধীনে ১৮০টি শাখা খোলা হইতেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা ব্যবসায়ে শিল্পাঞ্চলের ও কৃষিক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য জনতা পরিকল্পনা, গোষ্ঠীগত বীমা (Group Insurance) এবং বার্ধক্য বীমা (Superannuation scheme) ও বেতন সঞ্চয় পরিকল্পনা (salary savings scheme) চালু হইয়াছে। এই সকল বীমার প্রসার ঘটিলে বর্ধিত হারে জনকল্যাণের সুযোগ হইবে সন্দেহ নাই। এছাড়া কারখানা কর্মীদের জন্য আইনের সাহায্যে যে বীমা ব্যবস্থা হইয়াছে (Employees' State Insurance Corporation) তাহাও মালিক, সরকার ও শ্রমিকদের সমবেত সহযোগিতায় লক্ষণীয় প্রসার লাভ করিতেছে।

ভারতে জীবনবীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় দেশবাসীর মধ্যে আস্থার ভাব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশী বিদেশী বীমা কোম্পানী মিলাইয়া ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট ২৩৮ কোটি টাকা বীমাপত্র বিক্রীত হইয়াছিল, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শুধু মাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা প্রতিষ্ঠান (লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিযা) ৩০৯ কোটি ৪ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র বিলি করিয়াছেন।

জীবনবীমা ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত হইলেও নৌবীমা, অগ্নিবীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতির ব্যবসা এখনও রাষ্ট্রায়ত্ত হয নাই এবং এই সব বীমা ব্যবসায়ে ভারতীয় কোম্পানীর তুলনায় বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কাজকারবার কম নয়। অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সমৃদ্ধ বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি এইরূপ সাধারণ বীমার ব্যবসা অপেক্ষাকৃত কম খরচে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে বলিয়াই তাহাদের মুনাফার হার বেশী। অবশ্য ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনসহ পুনর্বীমা কর্পোরেশন (Re-insurance Corporation of India) গঠিত হইবার পর হইতে দায়ের চাপ কমিয়া যাওয়ায় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিরও সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে অধিকতর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বর্তমানে সরকারী নীতি যেরূপ, তাহাতে মনে হয় জীবন বীমার মত সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের শীঘ্র রাষ্ট্রীয়করণ হইবে না। কাজেই বেসরকারী পরিচালনাধীন এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি প্রয়োজন।

ভারতে জীবন বীমার কাজ কারবারের গত কয়েক বৎসরের হিসাবে নিম্নে দেওয়া হইল:—

বৎসর	ভারতের মধ্যে		ভারতের বাহিরে		মোট	
	বীমাপত্রের সংখ্যা	বীমার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	বীমাপত্রের সংখ্যা	বীমার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	বীমাপত্রের সংখ্যা	বীমার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১৯৫৩	৫৬১৩৩৬	১৫৫'২০	৩০৪৪১	১৪'৬৬	৫৯১৭৭৭	১৬৯'৮৬
১৯৫৪	৭২৪৩৬৫	২৪৬'৩৪	৩২৬৮২	১৭'৬৫	৭৫৭০৪৭	২৫৩'৯৯
১৯৫৫	৭৭০৬৮১	২৩৮'৩০	৩৫৪৬১	২০'৩৩	৮০৬১৪২	২৫৮'৬৩
১৯৫৬	৫৪৯৬৫২	১৮৭'৬৯	১৭৯৫৬	১২'৫৯	৫৬৭৬০৮	২০০'২৮
১৯৫৭	৭৮৯৫৩০	২৭৬'৫০	৫০৫৫	৫'৪০	৭৯৪৫৮৫	২৮১'৯০
১৯৫৮*	৮৬২২২৭	৩০৯'০৪	৪৮৮৭	৪'৮০	৮৬৭১১৪	৩১৩'৮৪

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের (L. I. C.) হিসাবে দেখা যায় ইহার মোট ৪০৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা তহবিলের মধ্যে ১৯৬ কোটি ৩ লক্ষ টাকা (শতকরা ৪৮'৪ ভাগ) ভারত সরকারের ঋণপত্রে, ৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা (শতকরা ১'৮ ভাগ) বিদেশী

* ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত হিসাব।

সরকারের ঋণপত্রে, ৫৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা (শতকরা ১৩'৭ ভাগ) ভারতীয় রাজ্য সরকার সমূহের ঋণপত্রে লগ্নী ছিল। এছাড়া বিভিন্ন দেশী বিদেশী সিকিউরিটি, শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে লগ্নী ছিল ৭৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা (শতকরা ১৮'৪ ভাগ)। বন্ধকী ঋণখাতে লগ্নী ছিল মাত্র ১৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা (শতকরা ৩'৫ ভাগ)। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ হিসাব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নিরাপত্তার স্মারক।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বীমা আইন রচিত হয়। ইহার পূর্বে ভারতের বীমাক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ স্থান ছিল না। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই ভারতীয় বীমা ব্যবসা ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে লোকের আয় বাড়ায় জীবন বীমা ব্যবসা এদেশে সম্প্রসারিত হইয়াছে।

ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারা অনুসারে এদেশের জীবন বীমা কোম্পানীগুলিকে তহবিলের শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী ঋণপত্রাদিতে ন্যস্ত করিতে হইত।

বীমাকারী মুনাফা সহ এবং মুনাফা হীন (with Profit and without Profit) উভয় প্রকার জীবন বীমাপত্রই গ্রহণ করিতে পারেন এবং মাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক অথবা এককালীন জমা হিসাবে দেয় অর্থ বা প্রিমিয়াম দিতে পারেন। আজীবন বীমা এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেয় বীমা, উভয় প্রকার বীমাই করা চলে এবং উভয় ক্ষেত্রেই বীমাকারীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বীমার টাকা বীমাপত্রে উল্লিখিত প্রাপকের বা বীমাকারীর আইন-সঙ্গত উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য হয়। এছাড়া বিবাহ বীমা, শিক্ষা বীমা, যুক্তবীমা (যেমন দম্পতীর ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর একজন বীমাপত্রের মেয়াদের পূর্বে মারা গেলে অপরজন প্রাপক হন), প্রভৃতি কয়েক প্রকার বীমারও কাজ হয়। কোন কোন বীমায় প্রাপককে এ্যান্থুয়িটি বা বার্ষিক বৃত্তি অথবা মাসিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের বীমা আইনে প্রাপ্য টাকা বাজে অজুহাতে বিলম্ব না করিয়া যথাসম্ভব মিটাইয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বীমাপত্র বিলির পর বীমাপত্রকে আর সহজে অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই।

সাধারণক্ষেত্রে দুই বা তিন বৎসর প্রিমিয়াম দিবার পর বীমাকারী ইচ্ছা করিলে বীমাপত্র প্রত্যর্পণ করিতে পারেন এবং আইনানুযায়ী প্রিমিয়াম

হিসাবে প্রদত্ত টাকার একাংশ প্রত্যর্পণ মূল্য হিসাবে (Surrender value) ফেরৎ পাইতে পারেন। আগে প্রিমিয়াম দিতে অনিয়ম হইলে অনেক সময় বীমাপত্র বাতিল হইয়া যাইত, এখন সাধারণতঃ বীমাপত্রের প্রত্যর্পণ মূল্য ফিরিয়া পাইবার অধিকারী হইলে বীমাকারী প্রিমিয়ামের টাকা দিতে না পারিলেও বীমাপত্রে সঞ্চিত টাকা হইতে প্রিমিয়াম কাটিয়া লইয়া (Automatic Non-forfeiture Scheme) বীমাপত্রটিকে বাঁচাইয়া রাখা হয়। তাছাড়া এখন সামান্য সুদ সহ বকেয়া প্রিমিয়ামের টাকা প্রদান করিয়া বীমাপত্র পুনরুজ্জীবিত করারও ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে। বীমা-পত্রের প্রত্যর্পণ মূল্য ফিরিয়া পাইবার অধিকার জন্মিবার পর বীমাকারী অল্পসুদে এই প্রত্যর্পণ মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বীমা আইন সংশোধিত হইবার ফলে বীমা কোম্পানীর ও প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীগুলির (ইহারা বীমাকারীকে হাজার টাকার কম মূল্যের বীমাপত্র বিক্রয় করে)* আর্থিক সাচ্ছল্য রক্ষার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষের কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রত্যেক সাধারণ বীমা কোম্পানীকে ২ লক্ষ টাকা, সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত বীমা কোম্পানীকে ৫০ হাজার টাকা এবং প্রভিডেন্ট কোম্পানীকে ১০ হাজার টাকা মূলধন হিসাবে সরকারের নিকট জমা রাখিতে হইত। আগেই বলা হইয়াছে, ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারা অনুসারে বীমা কোম্পানীগুলিকে তহবিলের অন্ততঃ অর্ধাংশ বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারী অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ঋণপত্রে লগ্নী করিতে হইত। ভারত সরকার ভারতীয় বীমা ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধোত্তর বীমা পরিকল্পনা কমিটি (Post-war Planning Panel of the Insurance Advisory Committee) গঠন করেন। বীমাব্যবস্থা জনপ্রিয় করিতে আয়করের হিসাবে বীমার প্রিমিয়ামের টাকা বাদ দেওয়ার বিধান আছে, তছাড়া ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের

* বড় কোম্পানীগুলির চাপে ভারতের প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীগুলির সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছিল, অথচ ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গতির হিসাবে এই প্রভিডেন্ট বীমার গুরুত্ব যথেষ্ট। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫০৬টি প্রভিডেন্ট বীমার স্থলে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৭৪ প্রভিডেন্ট বীমা চালু ছিল। জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই প্রভিডেন্ট বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রীয়করণ হইয়াছে এবং দুর্নীতি বা অন্য কারণে তহবিল আশঙ্কাজনক হইলে ভারত সরকার উদারতার সহিত বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার মোটামুটি দায়িত্ব লইয়াছেন।

অক্টোবর মাস হইতে প্রবর্তিত মৃত্যুকরের হিসাবে বীমার দরুণ কিছু টাকা আয়কর হইতে রেহাই দিবার (ধারা—৩২।১।এফ) ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রস্তাবিত ব্যয় করেও (Expenditure Tax) বীমার প্রিমিয়ামের টাকা করের আওতা হইতে বাদ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতে ডাক-তার ও প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য নিজস্ব বীমা ব্যবস্থা আছে। এই বীমাব্যবস্থা অনুসারে ঐসকল বিভাগের অসামরিক ব্যক্তি উধ্বর্পক্ষে ৩০ হাজার টাকা এবং সামরিক ব্যক্তি উধ্বর্পক্ষে ২০ হাজার টাকার পযন্ত জীবনবীমা পত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

ভারতে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান-কর্মীদের বীমা ব্যবস্থা (Employees' State Insurance Scheme) চালু হইয়াছে এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পর্যন্ত ৪০টি শিল্পকেন্দ্রে ১১ লক্ষের মত কর্মী এই বীমা ব্যবস্থার সুবিধা পাইয়াছে।

রাষ্ট্রীযকরণের পর সরকারের হাতে যাওয়ায় জীবন-বীমা ব্যবস্থার পরিচালনা ব্যয় হার হ্রাস পাওয়া উচিত এবং সেক্ষেত্রে বীমার প্রিমিয়ামের হার কমিলে বীমাকারীর যেমন সুবিধা হইবে, গুরুত্বপূর্ণ বীমা ব্যবসাও তেমনি জনপ্রিয় হইবে। সাধারণ বীমার কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয়করণ সম্ভব না হইলে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ-কারবার যাহাতে বাড়ে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই হওয়া দরকার।

মোটের উপর সমগ্রভাবে জনকল্যাণের ভিত্তিতে ভারতে সর্বপ্রকার বীমাব্যবস্থার জাতীয়করণ সকল দিক হইতে বাঞ্ছনীয়।

পাক-ভারত সম্পর্ক

(Indo-Pakistan Relations)

কংগ্রেস এবং লীগ কর্তৃপক্ষ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুনের প্রস্তাব মানিয়া লওয়ায় ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ (আসামের শ্রীহট্ট সমেত), পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে, ব্রিটিশ ভারতের বাকী অংশ পড়িয়াছে ভারতে বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র রাজ্য বাদে বাকী সবগুলিই ভারতে পড়িয়াছে। কাশ্মীর রাজ্য এখনও বিভক্ত ভাবে পাকিস্তান ও ভারতের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে।* বর্তমান ভারতের আয়তন ১২ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গমাইল এবং পাকিস্তানের আয়তন ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার বর্গমাইল। ভারত বিভাগের সময় ভারতের লোকসংখ্যা ৪১ কোটির মত ছিল, ইহার মধ্যে ভারতে ৩৪ কোটি ও পাকিস্তানে ৭ কোটির মত পড়ে।

অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে উপস্থিত পাকিস্তানের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকেই সমৃদ্ধতর রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে একথাও ঠিক যে, সুপরিচালিত হইলে পাকিস্তানেরও উজ্জ্বল অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ আছে। ভারতে শিল্পপ্রগতি কিছুটা হইয়াছে, পাকিস্তান এখনও শিল্পের দিক হইতে খুবই অনগ্রসর। তবে উভয় দেশেই যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচামাল এবং সুলভ শিল্পশ্রম আছে বলিয়া শিল্পের হিসাবে উভয়েরই দ্রুত উন্নতি আশা করা যায়। এদিক হইতে কর্তৃপক্ষও লক্ষণীয় সচেতনতা দেখাইতেছেন। খনিজ সম্পদের দিক হইতে অবশ্য পাকিস্তান ভারতের তুলনায় দুর্বল। কৃষির হিসাবে সমগ্রভাবে দেখিলে ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের অবস্থা কিছুটা ভাল। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড বা ডেনমার্কের দৃষ্টান্ত দিয়া কেহ কেহ বলেন যে, শিল্পের দিক হইতে যদি নাও হয়, কৃষির হিসাবে পাকিস্তানের যথেষ্ট সমৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

ভারত ও পাকিস্তান নানাভাবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী। পাট, তুলা, এন্টিমনি, ক্রোমাইট, চামড়া, বাঁশ, পেন্সিল তৈয়ারীর কাঠ, সোরা, তার্পিন

---

* কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য স্বস্তিপরিষদের সভাপতি মিঃ জারিং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সহিত বুঝাপড়া করিতে এই দুই দেশে আগমন করেন, কিন্তু তাঁহার এই সফরে সমস্যার মীমাংসা হয় নাই।

প্রভৃতি নানা পণ্যের হিসাবে পাকিস্তান অধিকতর সচ্ছল। পাকিস্তান হইতে গম এবং কিছু চাউলও ভারতে রপ্তানী হইতে পারে। এছাড়া পূর্ববঙ্গ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ ও শাকসব্জি পশ্চিমবঙ্গে রপ্তানী হওয়া সম্ভব। প্রায় সকল প্রকার শিল্পপণ্যের দিক হইতেই পাকিস্তান আবার ভারতের বিশেষ মুখাপেক্ষী।

মোটের উপর উভয় দেশের আর্থিক অবস্থা এমন যে, পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতীত কাহারো পক্ষেই আশানুরূপ বিকাশলাভ সহজ নহে। পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর উভয় দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্ভর করে। পাট পূর্ববঙ্গের প্রধান ফসল, কিন্তু ভারত বিভাগের সময় ভারতবর্ষের শতাধিক পাট কলের একটিও পূর্ববঙ্গে পড়ে নাই। এইজন্য ভারত ও পাকিস্তানের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থায়ী হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এই দুই দেশের মধ্যে এখনও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া পারস্পরিক বাণিজ্যাদির ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে এবং ফলে অনিবার্যভাবে উভয় দেশের বহু সাধারণ লোক বিপন্ন হইতেছে। পাক-ভারত অসম্প্রীতির জন্য উভয় দেশে প্রয়োজনীয় লেনদেন বা লোকচলাচল বারবার ব্যাহত হইতেছে, ইহাতে সরকার ও দেশবাসী উভয়েরই ক্ষতি। বিশেষ করিয়া এখন দুইটি দেশেই আর্থিক পুনর্গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। শিল্পাদির সম্প্রসারণ, নূতন খনিজসম্পদ খুঁজিয়া বাহির করা, কৃষির উন্নতি, নদনদীর সংস্কার ইত্যাদি কার্য ভালভাবে চালাইতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং সেজন্য দুই দেশেরই অর্থসচ্ছলতা আবশ্যক। এছাড়া দেশে শান্তিও দরকার, কারণ শুধু দেশবাসীর সহযোগিতার জন্য নয়, বিদেশী সাহায্যের জন্যও দেশে শান্তি শৃঙ্খলার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এ অবস্থায় পাক ভারত সম্পর্কের উন্নতি উভয় দেশের শ্রীবৃদ্ধিকামী সকলেরই কাম্য সন্দেহ নাই।

পাকিস্তানের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্বাভাবিক কারণে হৃদ্যতাপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স্বার্থবাদ ও ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাহা হইতে পারিতেছে না। সীমান্তে অবিরাম ছোটবড় অশান্তি এই সমস্যাকে তীব্রতর করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভারতীয় গ্রাম 'টুকেরগ্রাম' পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক বেআইনী ভাবে দখল এমনকি তথায় পাকিস্তানী কর ধার্যের চেষ্টা পাক-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটাইতে বাধ্য।

কাশ্মীর সমস্যা পাক-ভারত সম্প্রীতির পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক। এছাড়া

সিন্ধুনদের জল ও রাবি, চেনাব, ঝিলম, শতদ্রু প্রভৃতি নদনদী হইতে কাটা কয়েকটি খালের জল লইয়া এবং কোন কোন স্থানে সীমানা লইয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে গুরুতর মতদ্বৈধ সৃষ্টি হইয়াছে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে মঙ্গল-বাঁধ নির্মাণের প্রশ্ন লইয়া ভারতে প্রভূত উদ্বেগ দেখা দিয়াছে। দেশবিভাগের হিসাবে ভারতের পাকিস্তানের নিকট পাওনার হিসাব এবং আদায় লইয়াও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত যখন পাকিস্তানের নিকট তাহার পাওনার পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার উপর বলিয়া দাবী করিতেছে, পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষস্থানীয় কেহ কেহ তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ভারতের নিকটই পাকিস্তানের ১৮৩ কোটি টাকা পাওনা আছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।* ভারতের খালের জলের দরুন পাওনা পাকিস্তান সরকার পরিশোধ না করায় এই মনোমালিন্য স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য অবস্থার উন্নতির জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎই উভয় পক্ষের মধ্যে নানাভাবে কথাবার্তা চলিতেছে। পূর্ববঙ্গে হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইবার পর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল দিল্লীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলির এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই নেহরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তি উভয় রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। ইহার পর পাক-ভারত পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু করাচী যান। তারপর মূলতঃ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত এক সম্মেলনে মিলিত হন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত ছিটতালুকসমূহ লইয়া পাকিস্তান ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে এক চুক্তি হয়। ইহার পর ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই হইতে ২রা আগষ্ট পর্যন্ত দিল্লীতে পাক অর্থমন্ত্রী মিঃ মজিদ ও ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের মধ্যে দেশবিভাগের পর হইতে পাক-ভারত অর্থনৈতিক সমস্যাদি লইয়া এক আলোচনা বৈঠক চলে।

* পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মিঃ শোয়াইব ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তান বাজেটে ভারতের ঋণশোধের কোন ব্যবস্থা না হইবার কারণ হিসাবে বলিয়াছেন :—

"I did not think it necessary to provide for repayment of any debt while large repayments are due to us from India."

কার্যকরী সিদ্ধান্তের হিসাবে না হইলেও এইরূপ সম্মেলনে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রীতিভাবের ভিতর দিয়া পরস্পরের সমস্যা বুঝাপড়ার কিছুটা সুবিধা অবশ্যই হইয়াছে। উপরোক্ত মজিদ-মোরারজী দেশাই আলোচনার অব্যবহিত পরেই করাচী হইতে ঢাকা যাইবার পথে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের কর্ণধার জেনারেল আয়ুব খাঁন দিল্লীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ ও পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নতির বিধায়ক যে আলাপ আলোচনা করেন তাহাতেও আবহাওয়ার খানিকটা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। অবশ্য ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির ফলে এবং পাকিস্তান বাগদাদ চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করায় ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে মনে করিয়া ভারতে অনেকেই বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছেন।

পাকিস্তানের সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থায় মাঝে মাঝে লক্ষণীয় বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেও কিছুটা অপ্রীতিভাব বিদ্যমান। পূর্বপাকিস্তানের জন্য মিঃ আতাউর রহমান পরিচালিত কোয়ালিশন সরকারের মত দায়িত্বশীল মহল হইতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করায় পশ্চিম পাকিস্তানে এসম্পর্কে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। আজাদ (পাক) কাশ্মীর কর্তৃপক্ষও পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামীদের স্বভাবতই কিছুটা বিষণ্ণ করিয়া তুলিযাছে। এইভাবে নানাকারণে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কুয়াশাচ্ছন্ন হওয়ায় পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নতি সাধনের বাস্তব প্রচেষ্টা তেমন জোর পাইতেছে না। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে জনাব ফজলুল হকের প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির লক্ষণীয় উন্নতি হওযায ভারতবাসী বিশেষ আশান্বিত হইযাছিল, জনাব ফজলুল হক পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বাতিল হওয়ায় পুনরায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। অবশ্য জনাব আতাউর রহমানের নেতৃত্বাধীন কোযালিশন সরকারের আমলে অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে আসে। এছাড়া পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থার অবাঞ্ছনীয়তাও উভয় রাষ্ট্রের সম্প্রীতিবৃদ্ধির পরিপন্থী।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক পাক ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের ভারতকে তুলা ও পাট সরবরাহের কথা ছিল, কিন্তু সে চুক্তি যথাযথ প্রতিপালিত হয় নাই। অনুরূপ ভাবেই

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন স্বাক্ষরিত পাক-ভারত শরণার্থী সম্পত্তি চুক্তিও ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার পর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের সহিত ভারতের আর একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির কার্য-কাল প্রথমে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্যন্ত এবং পরে আবার ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, ভারত পাকিস্তানকে কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট, পাটজাত দ্রব্য, কাগজ প্রভৃতি যোগাইবে এবং পরিবর্তে পাকিস্তান ভারতকে কাঁচা পাট, তুলা, কাঁচা চামড়া, চাউল ও গম যোগাইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান ভারতের তুলনায় অপর দেশে রপ্তানীকৃত পাটের মূল্য কম লওয়ায় এবং ভারতের সহিত কয়লার চুক্তি করিয়া অষ্ট্রেলিয়া হইতে কয়লা আমদানীর ব্যবস্থা করায় এই চুক্তি ঠিক মত কার্যকরী হইতে পারে নাই। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী পুনরায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তিন বৎসর মেয়াদী এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ভারত কয়লা, পাথর, চুন, বক্সাইট, রাসায়নিক পণ্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সহ ৪৫ প্রকার পণ্য পাকিস্তানকে যোগাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে এবং বিনিময়ে পাকিস্তান কাঁচা পাট, চামড়া, মাছ, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি ১৮ প্রকার পণ্য ভারতকে যোগাইতে রাজী হইয়াছে।

পাক-ভারত বাণিজ্যের বহুল প্রসার সহজেই আশা করা যায়, কারণ এই দুই পাশাপাশি রাষ্ট্র নানাভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। মুদ্রামূল্য অসম থাকার জন্য এবং গুরুতর রাজনৈতিক মনোমালিন্য বর্তমান থাকার জন্য এই বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিতেছে না। আগেই বলা হইয়াছে, এই বাণিজ্যের প্রসার উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের আর্থিক স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহার ফলে উভয় দেশের সরকারই বিশেষ লাভবান হইবেন।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র

(India's New Constitution)

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটায় ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভ যখন নিশ্চিত হইয়া উঠিল, স্বাধীন ভারতের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন তখন সকলেই উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে মূল্যবান বিধান অবশ্যই কিছু কিছু ছিল, কিন্তু বিদেশী ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের রচিত সংবিধান বলিয়া সমগ্রভাবে ইহা ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল ছিল না। পণ্ডিত নেহরু পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকার কালবিলম্ব না করিয়া স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার আয়োজন করিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা শ্রী বি. এন. রাও রচিত শাসনতন্ত্রের খসড়ার আলোচনা সুরু হয়। অতঃপর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ইহার আরও পূর্ণাঙ্গ একটি রূপ গঠনের ভার দেওয়া হয় ভারত সরকারের আইনসচিব ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির উপর। আম্বেদকর কমিটি ৩১৫টি অনুচ্ছেদ ও ১৩টি তপশাল সমেত শাসনতন্ত্রের খসড়া গণপরিষদে পেশ করেন। দীর্ঘকাল পার্লামেণ্টে সমালোচিত ও সংশোধিত হইবার পর ইহা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বাক্ষর লাভ করে। স্বাধীন ভারতের যে শাসনতন্ত্র গৃহীত ও বিধিবদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে মোট ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তপশীল আছে।*

আলোচ্য শাসনতন্ত্রে ভারতের যে শাসনব্যবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল বলা হইলেও অনেক ক্ষেত্রে (বিশেষ করিয়া সঙ্কটকালে) কেন্দ্রকে এত বেশি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বপ্রধান অঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ সমগ্রভাবে এই শাসনতন্ত্রের দ্বারা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কংগ্রেস ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনী কার্যতালিকায় যে আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই প্রাদেশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি স্থান পাইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেণ্টের নামে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা তো

---

* ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ এই কয় বৎসরের মধ্যে শাসনতন্ত্রের সাতবার সংশোধন (Amendment) হইয়াছে। বলা বাহুল্য, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে শাসনতন্ত্রের মত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়।

চলিবেই, তাছাড়া কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টকেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে কোন প্রাদেশিক (রাজ্যিক) আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপক অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের সপ্তম তপশীলে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় তালিকায় যে ৯৭টি বিষয়ে কেন্দ্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলির জন্যই প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ অবাঞ্ছিতভাবে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হইবে। এই তপশীলেই কেন্দ্র ও প্রদেশের সহগামী বা যুক্ত তালিকায় ৪৭টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। বিষয়গুলিতে কেন্দ্রের ও রাজ্যের যুক্ত অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্র যদি ইহাদের কোনটি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে কেন্দ্রের বিধান চালু থাকিবার সময় এ সম্পর্কে প্রদেশ (রাজ্য) এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে না যাহাতে কেন্দ্রের অবলম্বিত ব্যবস্থার কোন ভাবে ব্যতিক্রম ঘটে (অনুচ্ছেদ -২৫১)। সপ্তম তপশীলে রাজ্য বা প্রাদেশিক তালিকায় (স্টেট লিস্ট) ৬৬টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থরক্ষার অজুহাতে শাসনতন্ত্রের ২৪৯ (১) অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্টকে হস্তক্ষেপের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের অষ্টাদশ খণ্ডে সঙ্কটকালীন বিধান হিসাবে প্রেসিডেণ্ট স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়া এই শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণের অধিকার পর্যন্ত পাইয়াছেন (অনুচ্ছেদ—৩৫৬)।* এই খণ্ডেই জরুরী অবস্থার অজুহাতে পার্লামেণ্টকে কেন্দ্রীয় তালিকা বহির্ভূত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে (অনুচ্ছেদ—৩৫৩)। অবশ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সমতা সাধনের দ্বারা ভারতের সামগ্রিক উন্নতির কথা বিবেচনা করিলে প্রাদেশিক ব্যাপারে এইভাবে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ সন্নিবেশের পক্ষে যুক্তিও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া আশা করা যায় যে, ক্ষমতা থাকিলেও, কেন্দ্র সেই ক্ষমতা বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া ব্যবহার করিবে না। ইতিমধ্যে ভারতের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষস্থানীয় অনেকেই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতে শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতি বা

---

* এছাড়া উনবিংশ খণ্ডের ৩৬৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে—'যদি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ বর্তমান শাসনতন্ত্রের কোন বিধানানুযায়ী কোন রাজ্যকে (প্রদেশকে) কোন নির্দেশ মানিতে বা কার্যকরী করিতে বলা সত্ত্বেও রাজ্য তাহা না করে, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্টের একথা ধরিয়া লওয়া বৈধ হইবে যে, এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যেক্ষেত্রে রাজ্যের শাসনকার্য বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী চলিতে পারে না'।'

প্রেসিডেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে অন্ততঃ যে সব বিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে প্রেসিডেণ্টকে প্রদত্ত হইয়াছে অনেকটা একনায়কের ক্ষমতা। ৬১ সংখ্যক অনুচ্ছেদে প্রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করা সম্পর্কে পার্লামেণ্টকে কিছুটা অধিকার দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে সর্ত আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যদের একাংশের আস্থাভাজন হইলেও প্রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করা অসম্ভব। এইসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রিটেনের রাজার ন্যায় ভারতের প্রেসিডেণ্ট পদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নয়, এদেশে প্রেসিডেণ্ট হইবেন অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা; তাঁহাকে সমস্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। কাজেই এমন পরিস্থিত সহজে আশা করা যায় না, যখন প্রেসিডেণ্ট তাঁহার সমস্ত সমর্থক হারাইয়া পদচ্যুত হইবার জন্যই স্বৈরাচারী সাজিয়া বসিবেন। প্রেসিডেণ্ট যদি প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সহিত হাত মিলাইয়া থাকেন ভালই, যদি তা না থাকেন তাহা হইলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছামতই ভারত শাসিত হইবার কথা, কারণ মন্ত্রিসভা প্রেসিডেণ্টকে মাত্র পরামর্শ দিবার জন্য সংগঠিত (অনুচ্ছেদ—৭৪)। প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করিলে পার্লামেণ্টের লোকসভা পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন (অনুচ্ছেদ—৮৫।২)। লোকসভার বা পার্লামেণ্টের উপর প্রেসিডেণ্টের এই হস্তক্ষেপের অধিকার গণতন্ত্রের অনুগ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে সে দেশের প্রেসিডেণ্টের ও কংগ্রেসের (আইনসভার) অধিকার সুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানে প্রেসিডেণ্ট ভারতের প্রেসিডেণ্টের মত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আইনসভার উপর হস্তক্ষেপের অধিকার পান নাই। ভারতে স্বৈরাচারী কোন প্রেসিডেণ্টের আবির্ভাব ঘটিলে পার্লামেণ্টের বা মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধা বিচিত্র নয় এবং সেই সংঘর্ষের সময় বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্যই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইবে।

তবে এখনও পর্যন্ত ভারতে যে আবহাওয়া বর্তমান রহিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, প্রেসিডেণ্টকে লইয়া ভারত হয়ত কোন দিনই এরূপ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইবে না। অবশ্য এ সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নাই, এখন কিছুদিন প্রেসিডেণ্টের কার্যকলাপে একটা রীতি গড়িয়া উঠিলে তাহাই ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়া স্বাভাবিক। ইতিমধ্যেই ভারতের

শাসনকর্তৃপক্ষ একাধিকবার প্রেসিডেণ্টের নিয়মতান্ত্রিক পদমর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভারতের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদের সভাপতি হিসাবে নূতন শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষরদান কালে বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রেসিডেণ্ট হইবেন ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি।* এছাড়া বর্তমান শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যে স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও পরোক্ষভাবে প্রেসিডেণ্টের নিয়মতান্ত্রিক পদমর্যাদার ইঙ্গিত দেয়। শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে—প্রেসিডেণ্টের কাজে সাহায্য করিবার ও তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী সহ একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে (অনুচ্ছেদ—৭৪), প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট অপরাপর মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করিবেন (অনুচ্ছেদ—৭৫।১), এবং প্রেসিডেণ্ট যতদিন ইচ্ছা করিবেন মন্ত্রিগণ ততদিন স্বপদে বহাল থাকিবেন (অনু—৭৫।২); অথচ ইহার পরই ৭৫ (৩) সংখ্যক অনুচ্ছেদে আছে যে, মন্ত্রিসভা সমবেতভাবে লোকসভার (House of the People) নিকট দায়ী থাকিবেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রেসিডেণ্ট এবং লোকসভা এই দুই প্রভু সত্যই যদি সক্রিয় হন, তাহা হইলে মন্ত্রিসভার পক্ষে কিছুতেই একসঙ্গে উভয়ের সেবা করা সম্ভব নয়।† এক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট যদি নামমাত্র সর্বময় কর্তা হন এবং ব্রিটেনের রাজার ন্যায় সব সময় মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে চলেন, তবেই জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত লোকসভা মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের সুশাসন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত করিতে পারে। এইভাবে প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রিসভার সহিত সহযোগিতার নীতি ক্রমে

* "We have had to reconcile the position of an elected President with an elected Legislature and, in doing so, we have adopted more or less the position of the British Monarch for the President. . . . They (Ministers) are, of course, responsible to the Legislature and tender advice to the President who is bound to act according to that advice. Although there are no specific provisions, so far as I know, in the Constitution itself making it binding on the President to accept the advice of his Ministers, it is hoped that the convention under which in England the King acts always on the advice of his Ministers will be established in this country also and the President, not so much on account of the written word in the Constitution but as a result of this very healthy convention, will become a Constitutional President in all matters."

† এসম্পর্কে অধ্যাপক উইলিয়াম বেনেট মুনরো তাঁহার—'The Governments of Europe গ্রন্থে (পৃঃ ৪২৬) বলিয়াছেন—

"A ministry must be responsible either to the chief executive or to the legislative body. It cannot be responsible to both, for no ministry can serve two masters."

অলিখিত বিধানে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টকে নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেন্টরূপে ঘোষণা করিলে হয়ত এই পদে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইত না; এ হিসাবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সংস্থান করিয়া শাসনতন্ত্র উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রেসিডেন্ট (এই পদ অস্থায়ী, ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় স্থায়ী ও বংশানুক্রমে ভোগ্য নয়) পদপ্রার্থী হইতে আগ্রহান্বিত করিবে। এই সঙ্গে যদি প্রথম প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে প্রচলিত প্রথানুসারে প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলাই রীতি হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সঙ্কটের সম্ভাবনাও অবশ্যই অনেকটা কমিবে।

শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে আলোচ্য শাসনতন্ত্রের বিধান পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থায় বহু সমস্যাপীড়িত ভারতের জন্য সবদিক হইতে সম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র রচনা একরূপ অসম্ভব। ইহার পর যেরূপ প্রয়োজন মনে হইবে, পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্র সেইভাবে পরিবর্তন করিয়া ভারতকে রাষ্ট্র হিসাবে অধিকতর শক্তিশালী করিবার সুযোগ পাইবে। অবশ্য এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে, উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ভার থাকিলে তবেই শাসনতন্ত্রের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। উপরোক্ত ৩৬৮ অনুচ্ছেদের সুযোগ লইয়া পার্লামেণ্ট সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতাও ভবিষ্যতে এমনভাবে সম্প্রসারিত করিতে পারেন যাহাতে সুপ্রীম কোর্ট অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে শাসনতন্ত্রের বিধানাদির বিশ্লেষণ সম্পর্কিত আপন গুরুতর দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবেন। বাস্তবিক বর্তমান শাসনতন্ত্রে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা একটু সীমাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসীদের ভোটে আইনসভার যেসব সদস্য নির্বাচিত হইবেন এবং প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপরিচালন-ব্যবস্থায় যাঁহাদের মতামতের গুরুত্ব হইবে অসীম, নির্বাচনের পর তাঁহাদের কোনদিন নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে নির্বাচকমণ্ডলীর সেক্ষেত্রে কিরূপ অধিকার থাকিবে, শাসনতন্ত্রে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই। ভবিষ্যতে প্রয়োজনের তাগিদে এদিক হইতেও হয়ত শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন হইতে পারে।*

* শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জরুরী অবস্থায় প্রেসিডেন্ট অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এজন্য শাসনব্যবস্থার হয়ত অচলাবস্থারও সৃষ্টি হইতে পারে। এই অর্ডিন্যান্স যথাসত্বর পার্লামেণ্টে আসা দরকার। কিন্তু শাসনতন্ত্রে কত তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্সটি অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্টে আনিতে হইবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান নাই। ইহাতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক-সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

শাসনতন্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি বর্ণিত হইয়াছে। এই মৌলিক অধিকারই রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের সম্পূর্ণতার ভিত্তি। উপরোক্ত তৃতীয় খণ্ডে আইনের চক্ষে সকলের সমানাধিকার (অনুচ্ছেদ—১৪-১৬), অস্পৃশ্যতা বিলোপ (অনুচ্ছেদ—১৭), অবাধে চলাফেরার, মতপ্রকাশের ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার (ইউনিয়ন গঠনের) অধিকার (অনুচ্ছেদ—১৯।১), বেগার-প্রথার বিলোপ (অনুচ্ছেদ ২৩।১), ধর্মগত স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ—২৫-২৮), ন্যায়সঙ্গত সম্পত্তি ভোগের অবাধ অধিকার (অনুচ্ছেদ—৩১), শাসনতন্ত্রের প্রদত্ত অধিকার সংরক্ষণে আদালতের সাহায্য লাভের সুযোগ (অনুচ্ছেদ—৩২।৩), ইত্যাদি যে সব মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হইয়াছে, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিকাশের হিসাবে সেগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট। অবশ্য এই খণ্ডে মৌলিক অধিকার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্র কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্কোচসাধন করিতে পারিবেন, তাহাও বলা হইয়াছে। এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের বিধানের জন্য, বিশেষ করিয়া নিরাপত্তামূলক কয়েদের (অনুচ্ছেদ—২২) বিধানের জন্য অনেকেই অল্পবিস্তর মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, তৃতীয় খণ্ডে নাগরিকদের একহাতে কতকগুলি মৌলিক অধিকার দিয়া শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণ অন্যহাতে সেগুলি ফিরাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য সাধারণতন্ত্রী ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা-নিরোধমূলক যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনই দুঃখের বিষয়, তবে এই বিধানের জন্য শাসনতন্ত্রের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ন্যায় বহু বিভিন্ন ধরণের ভূখণ্ডের সমবায় ও অসংখ্য প্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন অধিবাসীদের সম্মেলনের ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজনের কথাও মনে রাখিতে হইবে। শাসনতন্ত্রের ৪০নং অনুচ্ছেদে গ্রামপঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার প্রসারের, ৪৩নং অনুচ্ছেদে শ্রমিক কল্যাণের, ৪৫নং অনুচ্ছেদে শিক্ষা-প্রসারের, ৩১১নং অনুচ্ছেদে চাকুরিয়াদের নিরাপত্তার এবং ৩৪০-৪২নং অনুচ্ছেদে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা

(Education in India)

শিক্ষা জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। আধুনিক যুগে ব্যক্তি-জীবন রাষ্ট্র-জীবনের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছে, এখন দেশের সার্বজনীন সুবিধা-অসুবিধা, রাষ্ট্রীয় সমস্যা প্রভৃতির খোঁজখবর না রাখিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য সংবাদপত্রাদি পাঠ আবশ্যক। শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ অধিকতর জাগ্রত থাকে, সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করা তাহার পক্ষে অশিক্ষিত অপর কাহারও তুলনায় সহজ। উচ্চ শিক্ষার কথা নয়, সে সুযোগ কোন দেশেই সকলের অদৃষ্টে জুটে না। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমানে সব দেশের সব লোকেরই শিক্ষিত হওয়া উচিত। নিজের, নিজ পরিবারের, সমাজের, দেশের বা পৃথিবীর বড় বড় সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত থাকা আজ আর শুধু আনন্দের বিষয় নয়, আত্মরক্ষার জন্য এই জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। এইজন্যই পৃথিবীর যে কোন উন্নতিশীল দেশের শাসনকর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার না করিলেও সমগ্র দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। এই প্রাথমিক শিক্ষা আবার সাধারণ শ্রেণীর লোকও (যাহারা দরিদ্র অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ) পায় বলিয়া এই সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা অবৈতনিক করার উপর জোর দেওয়া হয়।

ভারতবাসী শিক্ষার দিক হইতে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ।* ব্রিটিশ আমলে শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই ভারতবাসীকে অশিক্ষার গভীর অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রাচীনকালের গ্রামকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া তাঁহারা যে শহরকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে শতকরা ৯০ জন অধিবাসী অধ্যুষিত পল্লীভারত একেবারে অবহেলিত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই সংকীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'গবাক্ষ লণ্ঠনের

* ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা অনুন্নত এবং যাঁহারা শিক্ষাদান করেন সেই শিক্ষক সম্প্রদায়ের অবস্থা শোচনীয়; ইন্দোরে ৬২তম কংগ্রেস অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নিজেই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন:—

"I am sorry to say that the condition of teachers who mould the character of children is not good and their place in our society is not high."

আলো' বলিয়াছেন, তির্যকভাবে প্রতিফলিত হইয়া মুষ্টিমেয় শহরবাসীকে শিক্ষিত করা ছাড়া দেশের চিত্ত আলোকিত করার ক্ষমতা ইহার নাই।

শিক্ষা বলিতে অক্ষর পরিচয়ের কথা বুঝাইয়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষে অখণ্ড ভারতে শতকরা মাত্র ৪ জন শিক্ষিত ছিল, ১৯৩১ ও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ৯.৫ ও ১২ জন দাঁড়ায়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ইহা আরও বাড়িয়া শতকরা ১৬.৬ জন (পুরুষ ২৪.৯%, স্ত্রীলোক ৭.৮%) হয়। বর্তমানে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৪০.৭ (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীর পূর্ব-প্রস্তুতি স্বরূপ পরীক্ষামূলক গণনায়) হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে বটে, তবে পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এই হারেও উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে ভারতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্থায়ী বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। বর্তমানে ভারতের ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী সহযোগিতায় মোটামুটি এদেশের শিক্ষানীতি পরিচালনা করিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাদান হয়, কলেজগুলিতে মাধ্যমিকোত্তর উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেও 'হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে' প্রাথমিক কলেজী শিক্ষামান সম্পন্ন উচ্চতর পাঠক্রমের ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য ভারতের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (Higher Secondary School) উন্নীত করা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্বে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত ভারতের মোট ১৩৫১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪২১টিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উঠান হইযাছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সময় ১৮৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫২১টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এইভাবে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিপরীতে প্রাক-স্নাতক (undergraduate) কলেজী শিক্ষা ব্যবস্থা তিন বৎসরে (Three Years Degree Course) সমাপ্ত হইবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আজকাল বৃত্তিশিক্ষাদানেরও চেষ্টা চলিতেছে। এদেশে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক স্তরের পর লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয় বলিয়া

তাহাদের জীবিকা সংস্থানের উপযোগী বৃত্তিশিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রাথমিক পর্যায়ে বৃত্তি শিক্ষা সমন্বিত বুনিয়াদি (Basic) শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাকে এখন বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপকভাবে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাও ক্রমেই গুরুত্ব লাভ করিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষানীতির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা ও সুযোগ এখন গুরুত্বের জন্য কোন দেশ-বিশেষে আর সীমাবদ্ধ নয়। ভারতে এখন উচ্চতর স্তরে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপকতর ব্যবস্থা হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা সরকারের নীতি হইলেও অর্থাভাবে এই ব্যবস্থা এখনও ভারতের সর্বত্র চালু হয় নাই।* উচ্চশিক্ষায় উপযুক্ত ছাত্রকে আজকাল অধিকতর পরিমাণে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে এবং গবেষণা কার্যে সুযোগ সুবিধার পরিমাণ এখন ক্রমেই বাড়িতেছে। দেশের আর্থিক পুনর্গঠনে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সরকারী বে-সরকারী নানা সংস্থা এখন নানাপ্রকার সুবিধা দিয়া প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চতম স্তরে ছাত্রছাত্রীকে কারিগরি শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের শিক্ষাজগতে সম্প্রতি অনুকূল ও উন্নততর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা এখনও একান্তই শোচনীয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ১৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই খাতে মোট ৩০৭ কোটি টাকা ধরিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের

* ভারতের প্রত্যেক পুনর্গঠন পরিকল্পনায় শিক্ষাসম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বোম্বাই পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে মোট ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল ৪৯০ কোটি টাকা; প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথাক্রমে ১৬৯ কোটি টাকা ও ২৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের পরামর্শদাতা মিঃ জন সার্জেন্ট ভারতের জন্য যে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন, তাহাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয় ধরা হইয়াছিল যথাক্রমে ১১৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ও ৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ডাঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ওয়ার্ধা পরিকল্পনা) রচনা করেন, তাহাতে বালক বালিকাদের বাধ্যতামূলকভাবে ৭ বৎসর বৃত্তি ও সাধারণ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জানান হয় যে, যথাসত্বর ভারতের শতকরা অন্ততঃ ৫০ জনকে শিক্ষিত করিয়া তোলা তাঁহাদের নীতি। ৬-১১ বৎসরের বালকবালিকাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের এক পরিকল্পনাও বর্তমানে কার্যকরী হইতেছে।

শিক্ষা এবং কারিগরী বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে যথাক্রমে ৯৩ কোটি, ২২ কোটি, ১৫ কোটি ও ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই চারিটি খাতে যথাক্রমে ৮৯ কোটি, ৫১ কোটি, ৫৭ কোটি ও ৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।*

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্বে ভারতে শিক্ষকের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৩০ হাজার ছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫৫ হাজারে উঠিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্বে এদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত (Trained) শিক্ষকদের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৫৯ ও ৫৪, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এই হার যথাক্রমে ৭৯ ও ৬৮ হইবার কথা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষণ খাতে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কিরূপ উন্নতি আশা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে :—

১। বিভিন্ন বয়সে (Age group) শিক্ষালাভের সুযোগ

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
(ক) বয়স—(৬-১১) এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের হিসাব	১,৮৬,৮০,০০০	২,৪৮,১২,০০০	৩,২৫,৪০,০০০
শতকরা হার	৪২·০	৫১·০	৬২·৭
(খ) বয়স—(১১-১৪) এই বয়সের ছেলেমেয়ের	৩৩,৭০,০০০	৫০,৯৫,০০০	৬৩,৮৭,০০০
হিসাবে শতকরা হার	১৩·৯	১৯·২	২২·৫
(গ) বয়স—(১৪-১৭) এই বয়সের ছেলেমেয়ের	১৪,৫০,০০০	২৩,০৩,০০০	৩০,৭০,০০০
হিসাবে শতকরা হার	৬·৪	৯·৪	১১·৭

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে মূলবরাদ্দ ছিল ৩০৭ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় সরকার ৯৫ কোটি টাকা, রাজ্যসরকারসমূহ ২১২ কোটি টাকা), সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৫ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় সরকার ৬৮ কোটি টাকা, রাজ্য সরকারসমূহ ২০৭ কোটি টাকা)।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
(ক) প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়	২,০৯,৬৭১	২,৭৪,০৩৮	৩,২৬,৮০০
(খ) নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১,৪০০	৮,৩৬০	৩৮,৮০০
(গ) মধ্য উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	১৩,৫৯৬	১৯,২৭০	২২,৭২৫
(ঘ) উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়	৩৫১	১,৬৪৫	৪,৫৭১
(ঙ) উচ্চ/উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭,২৮৮	১০,৬০০	১২,১১৫
(চ) বিবিধার্থক (Malti-purpose) বিদ্যালয়	—	২৫০	১১৮৭
(ছ) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তনযোগ্য উচ্চ বিদ্যালয়	—	৪৭	১,১৯৭
(জ) বিশ্ববিদ্যালয়	২৬	৩১	৩৮
(ঝ) ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয়*	৪১	৪৫	৫৪
(ঞ) কারিগরি বিদ্যালয়*	৬১	৬১	৬৫

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে বিদ্যালয়গত শিক্ষা ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এবং কলাকৃষ্টির বিকাশের জন্য উল্লেখযোগ্য নানা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ'এর কার্যধারা সম্প্রসারণের জন্য এই পরিকল্পনাকালে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ট্রম্বের আণবিক শক্তি প্রতিষ্ঠান, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লেয়ার ফিজিকস্, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান কেমিকেল সোসাইটি প্রভৃতির উন্নয়নও উল্লেখ করা

---

* প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি ক্ষেত্রে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাধারীদের মিলিত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০৪৬ ও ৮৩০, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা দুইটি যথাক্রমে ১৩৪৮০ ও ১২৫০ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

চলে। প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ভারতের বিশ্ববিদ্যালগুলির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী (Grants) কমিশনের হাতে ২৭ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। কলাকৃষ্টির ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র ও বারাণসীতে দুইটি সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন ভাষায় মূল্যবান গ্রন্থপ্রকাশের জন্য 'ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে। হিন্দী ভাষার উপযুক্ত প্রসারের জন্য একটি হিন্দী বিশ্বকোষ রচনার ও উপযুক্ত হিন্দী পাঠ্যপুস্তক রচনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এছাড়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে 'একাডেমি অফ লেটারস্', 'একাডেমি অফ ডান্স ড্রামা এণ্ড মিউজিক' এবং 'একাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এর প্রসারের প্রস্তাবও আছে। পরিকল্পনা কমিশন 'ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ণ আর্ট' ও কলিকাতা 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী' সম্প্রসারণের এবং দিল্লীতে একটি রেফারেন্স লাইব্রেরী স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে একটি জাতীয় গ্রন্থবিবরণী (Bibliography) প্রকাশিত হইবারও কথা আছে।

ভারতের জনস্বাস্থ্য

(India's Public Health)

ভারতের জনস্বাস্থ্য ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার মতই শোচনীয়। এদেশের লোক নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নবান নয় সরকারী কর্তৃপক্ষও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় আশানুরূপ আগ্রহ দেখান নাই। ব্রিটিশ আমলে কেন্দ্রে, প্রদেশে বা দেশীয় রাজ্যে সর্বত্রই জনস্বাস্থ্য বিভাগ সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সত্যকার জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এ বিভাগগুলি কাজ করিয়াছে যৎসামান্য। এখন ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের শাসনকর্তৃপক্ষ জনস্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনে অপেক্ষাকৃত তৎপর হইয়াছেন।

ভারতবাসীর গড়পড়তা আয়ু অন্যদেশের তুলনায় খুবই কম। গড়ে ভারতবাসী যখন বড়জোর ৩০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে, তখন নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়াবাসী ৬৭ বৎসর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও ইংলণ্ডবাসী ৬২ বৎসর, ইটালীবাসী ৫৬ বৎসর এবং জাপানবাসী ৫৬ বৎসর বাঁচে। ভারতে প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৬৭ ছিল, ইহা এখন কমিয়া ১০০ হইয়াছে, ইংলণ্ডে ইহা ৫২, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪২, কানাডায় ৫৪ এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৩৬। ভারতে প্রতি হাজার অধিবাসী পিছু মৃত্যুসংখ্যা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৩·৭ ছিল, লক্ষণীয় উন্নতি হইয়া এখন ১১·৬ হইয়াছে। ভারতের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় লিখিত এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, ভারতে বৎসরে ৬৬,০৮,৭২৬ জন লোক মারা যায়, ইহার মধ্যে শতকরা ৫০·৬ জন অর্থাৎ ৩৩,৪৬,৯১১ জন মারা যায় ২০ বৎসর বয়স হইবার আগেই এবং ইহার মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ শিশু। তাহার হিসাবে ভারতে বাৎসরিক মৃত্যু হার নিম্নরূপ :—

কলেরায় ২,৭৮,৪৯৮ জন, বসন্তে ১,৩৭,০৮৬ জন, প্লেগে ২৯,৭৫১ জন, জ্বরে ৩৮,৩২,৪৭৯ জন, আমাশয় ও উদরাময়ে ২,৩৮,৬০০ জন, শ্বাসরোগে ৪,৫৫,৬৬৯ জন ও অন্যান্য রোগে ১৬,৩৬,৬৪৯ জন,—মোট ৬৬,০৮, ৭২৬ জন।

বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, ভারতে প্রতিবৎসর ৭ কোটির মত লোকের ম্যালেরিয়া হয় এবং মারা যায় অন্তত ৩ লক্ষ লোক। সুস্পষ্টভাবে

প্রকাশ পাইয়াছে যে, এখন যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ভারতে বৎসরে ২৫ লক্ষ এবং ইহাদের মধ্যে ৫ লক্ষ প্রতি বৎসর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। অপুষ্টিকর বা অপ্রচুর খাদ্য-প্রাণযুক্ত খাদ্য, খারাপ পানীয় জল ও বাসস্থান, সংক্ষেপে আর্থিক কারণই প্রধানতঃ জনস্বাস্থ্যের এইরূপ শোচনীয়তার হেতু।* মুক্তবায়ু সত্ত্বেও ভারতের পল্লীঅঞ্চলের জনস্বাস্থ্য খুবই খারাপ। ভারতের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও উন্নয়নকারী সংস্থা (All-India Health Survey and Development Committee) তাঁহাদের ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখাইয়াছেন যে, ভারতে লোকসংখ্যার শতকরা ৬ ভাগ মাত্র শহরে বাস করে এবং মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৬·১৫ ভাগের পানীয় জল প্রয়োজন মত পরিস্কৃত হয়।

ভারতে রোগ দেখা যায় নানা প্রকারের, অথচ সবক্ষেত্রে রোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা নাই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে চিকিৎসা করিবার মত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হয়তো এদেশে ততটা অভাব নাই, কিন্তু এই চিকিৎসার ব্যয়ভার অতি অল্প ভারতবাসীই বহন করিতে পারে। ব্রিটেনে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে 'ন্যাশনাল হেল্‌থ ইনসিওরেন্স স্কীম' নামে একটি সরকারী পরিকল্পনা চালু হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় সেদেশের সকলেরই নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা লোকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারে একটি ব্যাপক কার্যকরী ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে সকলেই বিনা খরচে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে, ডাক্তারের পরামর্শ লইতে এবং প্রয়োজন মত বিধানপত্র বা প্রেসক্রিপসন লইতে পারে। বলা বাহুল্য, ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে সরকারী উদ্যোগে এইরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা কার্যকরী না হইলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি আশা করা যায় না।

ভারতের গ্রামাঞ্চল অত্যন্ত অবহেলিত। গ্রামবাসীরা দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে যাইতে চান না। অবশ্য এখন সরকার এসম্পর্কে কিছু কিছু সাহায্য দিয়া চিকিৎসকদের গ্রামে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। চিকিৎসকের উপস্থিতির

* ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ সম্পর্কে বলেন:—

"It is therefore important to remember that economics plays a prominent part in the control of Tuberculosis. This includes nutritional, housing and social factors."

অভাবে গ্রামবাসীরা অতি সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি লঙ্ঘন করে এবং ফলে রোগভোগ করিয়া থাকে। সহর অঞ্চলের অবস্থা তবু কিছুটা ভাল।

ভারতের আয়ুর্বেদের উন্নতিসাধনও দরকার। এদেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন এখনও দেশীয় প্রথায় চিকিৎসিত হয়। এই চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত চোপরা কমিটি (স্যার রামনাথ চোপরার নেতৃত্বে) তাঁহাদের ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত রিপোর্টে ডাক্তারী, কবিরাজী ও ইউনানী প্রথার সমন্বয় সাধন করিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এই চিকিৎসার খরচ কম হইবে বলিয়া ঔষধাদির দাম কমিবে এবং সকলে উপকৃত হইবে।

ভারত সরকার ভারতের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পরামর্শদানের জন্য স্যার জোসেফ ভোরের নেতৃত্বে যুদ্ধের শেষ দিকে একটি কমিটি (All-India Health Survey and Development Committee) গঠন করেন। এই কমিটির কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে (ডিসেম্বর, ১৯৪৫) কবিরাজী বা ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থার উপযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের এক দশবার্ষিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনা রচনা করেন। পরিকল্পনাটিতে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের কথা ছিল।* পরিকল্পনাটির গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও আর্থিক দায়িত্বের প্রশ্নে ইহা কার্যকরী হয় নাই।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে ১৪০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল, ইহা মোট বরাদ্দের শতকরা ৫·৯ ভাগ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এস্থলে মোট বরাদ্দের শতকরা ৫·৭ ভাগ বা ২৭৪ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ভারতে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও শয্যাসংখ্যা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৮,৬০০ ও ১,১৩,০০০ স্থলে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০,১৭৯ (৩১০৬টি হাসপাতাল ও ৭০৭৩টি ডিস্পেনসরী) ও ১,৫৫,৫৭২ দাঁড়াইয়াছিল; আশা করা হইতেছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে বা ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা যথাক্রমে ১২,৬০০ ও ১,৫৫,০৯০ দাঁড়াইবে। কর্মীদের সাচ্ছল্য সম্পাদন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার

* প্রতি গ্রামে ডিসপেন্সারী, ২০ হাজার লোক আছে এমন গ্রাম সমষ্টির জন্য একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ডাক্তার ও এইরূপ ৩টি সমষ্টির জন্য ৩০ শয্যার হাসপাতাল, ৫০ হইতে ৬০ হাজার অধিবাসী সমন্বিত মাধ্যমিক কেন্দ্রে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল ও গবেষণাগার এবং প্রতি জেলায় ২০০ শয্যা সমন্বিত উচ্চশ্রেণীর যন্ত্রপাতি সজ্জিত হাসপাতাল,—ভোর কমিটির রিপোর্টে এইসব সুপারিশ ছিল।

আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। পুরাতন মেডিকেল কলেজগুলির উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩০ হইতে ৪২ দাঁড়ায়। নূতন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এই পরিকল্পনার আমলে ২,১০০টি মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান খুলিবার জন্য ৩ কোটি টাকা ও পরিবার পরিকল্পনার (Family clinic) হিসাবে সহরাঞ্চলে ৩০০টি ও গ্রামাঞ্চলে ২,০০০টি ক্লিনিক খোলার জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে দন্ত-চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ২ কোটি টাকা, * স্বাস্থ্য কর্মীদের শিক্ষার প্রসারের জন্য ৬ কোটি টাকা, চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ৪ কোটি টাকা, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণাগারের জন্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, যৌনরোগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের জন্য ৫৮ কোটি টাকা (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সংক্রামক রোগের জন্য ২২ কোটি টাকা) বরাদ্দ হইয়াছে। শুধু যক্ষ্মার খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যক্ষ্মা হাসপাতাল, স্যানিটেরিয়াম ও ক্লিনিকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪, ৩১ ও ৯৫টি, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭১, ৬৯ ও ১৭৪ হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৪১ লক্ষ ২০ হাজার জনকে যক্ষ্মা নিরোধক বি. সি. জি. টীকা দেওয়া হইয়াছিল, ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৮ লক্ষ হইয়াছে। ভারতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বর্তমানে লক্ষণীয়ভাবে কমিয়াছে। ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে ম্যালেরিয়াগ্রস্তের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা ১ কোটি ৯৩ লক্ষে নামিয়া আসিয়াছে।

ভারতে ডাক্তার, নার্স প্রভৃতির সংখ্যার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল † :—

* ভারতে দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় চার হাজার।

† জাপান বা ব্রিটেনের লোকসংখ্যা ভারতের এক-চতুর্থাংশও নয় অথচ এই দুই দেশে ডাক্তার, দন্তচিকিৎসক ও ধাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮৩৩৭৪, ২৮৯৪১ ও ৫৪৬৪২ এবং ৪৪৪৫৭, ১০৯৩৫ ও ১১০৪৪ (১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব)।

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	প্রয়োজনীয় সংখ্যা
ডাক্তার	৫৯,০০০	৭০,০০০	৮২,৫০০	৯০,০০০
নার্স	১৭,০০০	২২,০০০	৩১,০০০	৮০,০০০
ধাত্রী (Midwives)	১৮,০০০	২৬,০০০	৩২,০০০	৮০,০০০
স্বাস্থ্য পরিদর্শক	৬০০	৮০০	২,৫০০	২০,০০৪
নার্স-দাই ও দাই	৪,০০০	৬,০০০	৪১,০০০	৮০,০০০
স্বাস্থ্য কর্মচারী (Health Assistant) ও স্যানিটারী ইনস্পেক্টার	৩,৫০০	৪,০০০	৭,০০০	২০,০০০

সহর ও গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার ও স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪২ কোটি টাকা ধরা হয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ হিসাবে মোট ৯১ কোটি টাকা (ইহার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের জন্য ২৮ কোটি টাকা) ধরা হইয়াছে।

চিকিৎসা বিষয়ক উন্নতির জন্য ভারতে নিম্নলিখিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান উল্লেখযোগ্য :—

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স (দিল্লী), সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (কসৌলী), অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ (কলিকাতা), সেণ্ট্রাল ড্রাগস্ লেবরেটরী (কলিকাতা), সেরলজিকাল লেবরেটরী (কলিকাতা), স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন (কলিকাতা), হফকিন ইনষ্টিটিউট (বোম্বাই), সেণ্ট্রাল লেপ্‌রসি টিচিং এ্যাণ্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (মাদ্রাজ), ইণ্ডিয়ান ক্যানসার রিসার্চ সেণ্টার (টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল, বোম্বাই), বি. সি. জি. ভ্যাকসিন লেবরেটরী (মাদ্রাজ), অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ সেণ্ট্রাল হেল্‌থ (বাঙ্গালোর), কিং ইনষ্টিটিউট অফ প্রিভেণ্টিভ মেডিসিন (মাদ্রাজ), কিং এডওয়ার্ড সেভেন মেমোরিয়াল পাস্তুর ইনষ্টিটিউট এ্যাণ্ড মেডিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (শিলং), পাস্তুর ইনষ্টিটিউট (কলিকাতা ও কুন্নুর), ম্যালেরিয়া ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া (দিল্লী), ভেরাস রিসার্চ সেণ্টার (পুণা), ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (বেরিলি), নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি (কুন্নুর), সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট ফর রিসার্চ অন ইনডিজেনাস মেডিসিন (জামনগর), বল্লভভাই প্যাটেল চেস্ট ইনষ্টিটিউট (দিল্লী), পেনিসিলিন—ডি. ডি. টি. ফ্যাক্টরি (পুণা ও দিল্লী), স্যার টাটা ইনষ্টিটিউট অফ সোসাল সারভিস (বোম্বাই)।

সংযোজন

ভারতে কৃষি-পণ্যের উৎপাদন—ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষ হিসাব অনুযায়ী ভারতে ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন শস্যের নিম্নরূপ উৎপাদন ধরা হইয়াছে :—

শস্য	হাজার একর হিসাবে		হাজার টন হিসাবে	
	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
চাউল	৭৯৪৪৭	৮১৫৯০	২৪৮৮৫	২৯৭২১
গম	২৯৩০০	৩০৯৬৬	৭৭৪১	৯৬৯৪
জোয়ার	৪২২০৩	৪২৬০৮	৮২৪৬	৮৬৮৯
বাজরা	২৭২৩৬	২৭৯০৫	৩৫২২	৩৭৯১
যব	৭৫৪৯	৮১৬৪	২২৩৮	২৬৪০
ভুট্টা	৯৮১৯	১০৩১৪	৩০৩৬	২৯৯০
রাগী	৫৭৩১	৫৯৩০	১৬৬৫	১৭২২
ছোলা	২২৮৬২	২৪৮৪০	৪৯৭৯	৬৮২৬
তুলা (প্রতি গাঁইট ৩৯২ পাউণ্ড)	২০১৫৮	—	৪৭৫৩	—
পাট (প্রতি গাঁইট ৪০০ পাউণ্ড)	১৭৪২	১৮২৭	৪০৫২	৫১৭৮
ইক্ষু	৫০২১	—	৬৪১৪২	—
তামাক	৯২৬	—	২৫২	—

ভারতে শিল্প-পণ্যের উৎপাদন—১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যের নিম্নরূপ উৎপাদন হইয়াছে :—**ইস্পাত**—১৮ লক্ষ ১৩ হাজার টন ; **বস্ত্র**—৪৯২ কোটি ৭০ লক্ষ গজ ; **সিমেণ্ট**—৬০ লক্ষ ৭০ হাজার টন ; **পাট**—১০ লক্ষ ৬২ হাজার গাঁইট ; **কাগজ ও বোর্ড**—২ লক্ষ ৫৩ হাজার টন ; **চিনি**—১৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টন ; **কস্টিক সোডা**—৫৭১৯২ টন ; **সালফিউরিক এ্যাসিড**—২২৬০১৬ টন ; **সুপারফসফেট**—১৬৬৮০০ টন ; **সাইকেল**—৯১২৬২৪ ; **মোটর-গাড়ী**—২৬৭৯৬ ; **এ্যালুমিনিয়াম**—৮১৮২ টন ; **স্বর্ণ**—১ লক্ষ ৭০ হাজার আউন্স।

ভারতের বহির্বাণিজ্য—১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার পণ্য পুনঃ-রপ্তানি সহ ভারত হইতে মোট **৫৭৮ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার**

পণ্য বিদেশে **রপ্তানী** হয় (চা—১৩৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা, পাটজাত দ্রব্য—১০৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, তুলাজাত দ্রব্য—৫২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, খনিজ—৩০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, তুলা—২১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, ফল ও শাকসব্জি—২১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা, তামাক—১৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা)। এই বৎসর ভারতে **আমদানী** হয় **৮৬৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার** পণ্য (যন্ত্রপাতি—১৮৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, লৌহ ও ইস্পাত—৯৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও পশুজাত তৈল—৮০ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, ঔষধপত্র—৬৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম—৪৯ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, যানবাহন (বিমান, জাহাজ ও নৌকা বাদে)—৫২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, তুলা—৩০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, ফল ও শাকসব্জি—১৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা, রং—৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, কাগজ ও বোর্ড—৮ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা)।

ভারতে দশমিক পদ্ধতি—১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম দশমিক পদ্ধতি চালু করিবার চেষ্টা হয়। পৃথিবীর ৭৭টি দেশে ইহা আইনসঙ্গতভাবে চালু আছে, ১৬টি দেশে ইহার প্রয়োগ ইচ্ছাধীন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ১৪৩ প্রকার ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি, ১৫০ প্রকার তরল পদার্থের পরিমাপ এবং ১৮০ প্রকার জমির আয়তন পরিমাপ প্রচলিত আছে। কর্তৃপক্ষ আশা করেন ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভারতে ওজন ও মাপের দশমিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রচলন সম্ভব হইবে।

ভারতে কৃষি হইতে আয় ও জাতীয় আয়—১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে কৃষি হইতে আয় হয় যথাক্রমে ৫০২০ কোটি টাকা, ৫২৫০ কোটি টাকা ও ৪০৩০ কোটি টাকা এবং এই তিন বৎসর জাতীয় আয় দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৪৮০ কোটি টাকা, ১১০০০ কোটি টাকা ও ১০৮৩০ কোটি টাকা। জাতীয় আয়ের অংশরূপে কৃষির আয় এই তিন বৎসরে হইয়াছে যথাক্রমে শতকরা ৪৭·৯ ভাগ, ৪৭·৭ ভাগ ও ৪৫·৫ ভাগ।

ভারতে শিল্পীয় বিরোধ—সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ১৬৩০টি ধর্মঘটে ৮৮৯৩৭৬ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে এবং ৬৪২৯৩১৯টি কাজের দিন নষ্ট হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যাসমূহ যথাক্রমে ১৫২৪, ৯২৮৫৬৬ এবং ৭৭৯৫৮৫ দাঁড়ায়।

ভারতে পাইকারী মূল্যের সূচকসংখ্যা—১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে

তাহাতে ভারতে বিভিন্ন পণ্যের পাইকারী মূল্যের সূচকসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :—খাদ্যদ্রব্য—১১৯.৬, জ্বালানী ও শক্তিসম্পদ—১১৬.৫, শিল্পীয় কাঁচা-মাল—১২০.১, শিল্পজাত পণ্য—১০৯.২, সর্ববিধ পণ্য—১১৬.১।

ভারতে নোটের প্রচলন—১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চালু নোটের পরিমাণ ছিল ১৬৬৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। ইহার জামিন হিসাবে ছিল ১১৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণবাট, ১৬৩ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র, ১৩৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার কাঁচা টাকা এবং ১২৭১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার এদেশের সরকারী ঋণপত্র।

বিদেশে ভারতের ঋণ—সরকারী ও বেসরকারী খাতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশে ভারতের পাওনা ছিল ২১৫ কোটি টাকা, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া পাওনার পরিবর্তে বিদেশে ভারতের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬৭ কোটি টাকা ও ৬৪৮ কোটি টাকা।

ভারতে সমবায় আন্দোলন—১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গ্রাম্য ঋণদান সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১,৭৯,০০০ এবং ইহাদের সদস্যসংখ্যা ছিল ১,৩৮,০০,০০০। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সমবায় কৃষি সমিতি ছিল ২০২০টি, কিন্তু ইহার মধ্যে ৬৬৩টি ছিল সেবা সমবায় (Service Co-operative)। যৌথ কৃষি পরিচালনাকারী সমিতির সংখ্যা এই বৎসর ১৩৫৭টি ছিল, ইহার মধ্যে ৯৬৬টি ছিল যৌথ কৃষি-খামার (Joint Farming Society) এবং ৩৯১টি ছিল সমবেত কৃষি সমবায় (Collective Farming Society)।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন—১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিসমূহের সংখ্যা ছিল ১২,৫৯১, ইহাদের সদস্য-সংখ্যা ছিল ৪,৬০,০০০ এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় খামারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি।

ভারতে সাধারণ বীমা ব্যবসায়—১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় বীমা আইন অনুসারে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সুরুতে ভারতে ৯১টি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৯৩টি অভারতীয় প্রতিষ্ঠান অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি সাধারণ বীমার (General Insurance) কার্য চালায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ, পত্রাবলী ও অর্থনৈতিক পরিভাষা

অনুবাদ

(বাংলা হইতে ইংরাজী)

(১)

বাঙ্গলাদেশের নূতন ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যাঙ্কগুলিকে কার্যক্ষেত্রে বর্তমানে যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহার প্রধান কারণ এই যে, এইসব ব্যাঙ্কের প্রায় সবগুলিই মধ্যবিত্ত সমাজের বেকার ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং একটা ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহার অতি সামান্য অংশও এইসব ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই প্রথম হইতে ব্যাঙ্ক চালাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য উহাদিগকে মধ্যবিত্ত সমাজের শেয়ার ক্রেতাদের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে এখন টাকার অভাব ঘটিয়াছে। যাহাদের কিছু সম্বল আছে তাহারাও অনিশ্চিত লাভের আশায় ব্যাঙ্কের শেয়ারে টাকা খাটাইতে রাজী নহেন। ফলে অধিকাংশ ব্যাঙ্কেরই পরিচালক-বর্গ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক চালাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। (C. U., B. Com., 1939)

The main reason underlying the difficulties faced by the new and small banks of Bengal in the practical field at present is that most of these banks were started by unemployed persons of the middle class who failed to supply even a small portion of the capital necessary for running a bank. So from the beginning they had to depend upon the middle class share-investors for the working capital. But, for various reasons, the middle class are now short of funds. Even those who have some means are shy to invest money in bank-shares against uncertain returns. The result is that the directors of most of the bank could not secure the necessary working capital from the market by selling shares.

(২)

বর্তমানে দেশে যে শ্রমিক বিক্ষোভ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে প্রধানতঃ যুদ্ধজনিত ভাতা ও বেতন বৃদ্ধির দাবীই নিহিত রহিয়াছে। যুদ্ধের

ফলে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদেশে সাধারণের নিত্যব্যবহার্য পণ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতে জিনিসপত্রের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে একটা বেশীরকম জল্পনাকল্পনা সুরু হয়। আর সে কারণেও ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের পণ্যের দাম চড়াইয়া দিতে থাকেন। গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দামের হার এইভাবে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় দেশের স্বল্প আয়-বিশিষ্ট লোকমাত্রকেই নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি কিনিতে বেশী পরিমাণ বেগ পাইতে হইতেছে। শ্রমিক সাধারণের আয়ের পরিমাণ সাধারণতঃ স্বল্প ও নির্দিষ্ট বলিয়া তাহারা জীবন যাত্রার বর্ধিত ব্যয় মিটাইতে পারিতেছে না। (C. U., B. Com., 1940)

The demand for war allowance and higher wages mainly lies at the root of the present labour unrest in the country. As a result of war prices of articles of daily necessity of the people have, till now, remarkably increased. Heavy speculations about the future demand and supply of commodities started even before the outbreak of the war. For this also dealers began to enhance the prices of their goods. Thus the price-level rose enormously till December last. Under the circumstances, persons with small income have to experience great difficulties in buying their daily necessaries. The income of labourers being generally low and fixed, they are not in a position to meet the increased cost of living.

(৩)

"যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে বিবিধপ্রকার নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচলিত শিল্পগুলির উন্নতি ও প্রসারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, একথা বলিলেই ভারতবর্ষস্থিত ব্রিটিশ স্বার্থের সমর্থকগণ এরূপ একটা মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বিপদের সুযোগে নিজের লাভের পন্থা খুঁজিতেছে। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ যাহাতে শিল্পের ব্যাপারে কোন উন্নতি লাভ করিতে না পারে এবং যুদ্ধাবসানে ব্রিটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে ভারতবর্ষের বাজারে পূর্বের মত মালপত্র বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারে, তজ্জন্যই যে বর্তমানে ভারতীয় শিল্প প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করা হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ বর্তমানে যুদ্ধে কোন সুবিধালাভ করিতে সমর্থ না হইলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশগুলি এই সুযোগ

পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অষ্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত উক্ত দেশে সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ, কলকব্জা প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি, এলয় স্টীল, কাঁচা লোহা, দড়ি, টায়ার প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য অগণিত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।" (C. U., B. Com., 1941

"Whenever it is said that opportunities for establishing various new industries and for developing and expanding the existing ones have arisen in India due to war, the champions of British interests in this country evince such an attitude as if India took advantage of England's danger and looked for her own gains. There is no doubt about the fact that Indian industrial enterprises are being discouraged at present so that India may not make any industrial progress during the war and, after the war, British industrial concerns may reap profits by selling their goods in the Indian market as before. But though India is unable to secure any benefit out of the present war, other countries of the British Empire are taking full advantage of the situation. The case of Australia may be cited as an example. Since the outbreak of the war till now, innumerable factories for the production of newsprints, machine tools, alloy steel, pig iron, ropes, tyres and many other goods have been established in that country."

(৪)

বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশের কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদের চরম দুঃখদুর্দশা দেখা দিয়াছে। নানাভাবে দেশে কাপড়ের যোগান কমিয়া যাওয়ায় ও দেশের বস্ত্রব্যবসায়ীরা সময় বুঝিয়া কাপড়ের জন্য বেশী দাম আদায়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই জটিল অবস্থার সূচনা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার একটা সময়োচিত প্রতিকার সাধন করিয়া দেশের জনসাধারণের দুঃখলাঘবের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করা হইতেছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এতদিন সে বিষয়ে কোন মনোযোগ দেন নাই। গত অক্টোবর মাসে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নূতন দিল্লীতে যে বৈঠক হয় তাহাতে ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার এদেশে "স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ" বা নির্ধারিত মূল্যে সাধারণের ব্যবহার্য কতিপয় নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাপড় প্রচলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু ঐ

বৈঠকের আলোচনায় সে সম্বন্ধে কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। গভর্ণমেণ্টও এতদিন সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি প্রকাশ ভারত সরকার 'স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রচলনের ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে এখন বিবেচনা করিতেছেন এবং শীঘ্রই এ সম্পর্কে সমস্ত প্রদেশে যুগপৎ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। (C. U., B. Com., 1942)

Extreme sufferings have come upon the cultivators, labourers and general middle class people of this country owing to excessive rise in the price of cloth. Fall in cloth supply in the country due to various causes and realisation of higher prices for cloth by the cloth-merchants who have seized the opportunity have given rise to this complicated situation. In order to relieve the masses of their miseries by finding out a timely remedy for the situation petitions are being submitted to the Government for a long time, but the Government has so long paid no attention to this matter. In the Price-Control Conference held in New Delhi last October, Sir Ramaswami Mudaliar, Commerce Member to the Government of India, mooted a proposal for the introduction of 'Standard Cloth' or 'a few specified varieties of cloth consumable by the masses at a fixed price' in this country, but no final decision in the matter emerged from the discussions in that Conference. The Government also were so long silent about it. However, it is recently reported that the Government of India have been considering the proposal for the introduction of 'Standard Cloth' and very soon simultaneous arrangements in this connection will be made in all the provinces.

(৫)

সকল সমস্যা আমাদিগকে এরূপ ভীষণভাবে ঘিরিয়াছে যে, তাহা হইতে মুক্তির কোন উপায় আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এদেশে নূতন ধান উঠে বলিয়া ধানচাউলের দাম কমিয়া যায়। এ বৎসর ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে চাউলের দাম বাড়িয়া ১০৲ টাকা মণের স্থানে ৪০৲ টাকা মণ হইয়াছে। মফঃস্বলে নূতন ধান ৮৲ টাকা মূল্য হইতে বাড়িয়া ১৮/২০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে; ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে

দুইবেলা ভাতের সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আটার দাম বাড়িয়াছে,—যে আটার দাম ছিল ৫৲ টাকা মণ তাহা ২০৲ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে ; তাহাও পয়সা দিয়া সকল দোকানে পাওয়া যায় না। কলিকাতায় বহু পশ্চিমা লোকের বাস, তাহারা শীতকালে ২ বেলা রুটি খাইত, তাহারা আটার অভাবে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ২ বেলা ভাত খাইয়া কোনরকমে জীবনধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। (C. U., B. Com., 1943)

We are hard pressed by all sorts of problems and can find no way out. Generally the prices of paddy and rice come down in the months of Agrahayan and Pous when the new paddy crop is harvested. This year the situation seems to be just the reverse. From the second week of Agrahayan the price of rice began to rise and from rupees ten it has gone up to rupees forty a maund. In the moffusil too the price of new paddy has gone up from rupees eight or nine per maund and now it sells at rupees eighteen or twenty. As a result it has been impossible for the middle-class and the poor people to procure two meals a day. With it the price of atta (coarse wheat flour) too has gone up. Atta, which was rupees five a maund, is being sold at rupees twenty, but that also is not available at all shops even against cash payment. Many up-country men live in Calcutta. They would take bread in both their meals in winter. They are getting emaciated without atta and are compelled to live anyhow on two rice-meals a day.

(৬)

বর্তমান যুদ্ধের অগ্রগতি ও পরিণতির ফলে যুদ্ধের অন্তর্দশা হইতে যে জগৎজোড়া মন্বন্তর ও মহামারীর নিদারুণ প্রাদুর্ভাব ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বিবেচক ও বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইবেন। সম্প্রতি বিলাতের ভূতপূর্ব খাদ্য ও বর্তমান পুনর্গঠন সচিব লর্ড উল্টন ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা জগৎজোড়া মন্বন্তরে দ্রুত প্রবিষ্ট হইতেছি। যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী সভাপতি ওয়ালেসও সতর্কবাণী প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালে খাদ্যসমস্যাই হইবে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রবল সমস্যা। এই বৎসরের উৎপাদন পরবর্তী বৎসরের প্রচণ্ড চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং পূর্ব হইতেই এই সার্বজনীন জগৎজোড়া খাদ্যসঙ্কটের

প্রতিবিধানমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন আমাদিগের পক্ষে জীবনমরণ সমস্যা সমাধানের সমতুল্য। নাৎসী অত্যাচারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইব। এই অদূরবর্তী অতি প্রচণ্ড সঙ্কটের প্রতি সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

(C. U., B. Com., 1944)

It is beyond doubt that a terrible world-wide famine and pestilence will follow as an outcome of the conditions created by the spread and effects of the present war. Any considerate and wise man may find ample evidence of it in the pages of history. Lord Woolton, Britain's ex-Food Minister and present Minister for Reconstruction, has recently declared that we are speedily getting into a world-wide famine. Wallace, the Vice-President of the U.S.A., has also given the warning that in 1944 food problem will be our greatest problem. The production of this year will not be able to meet the heavy demand of the next year. So steps taken in advance to prevent this world-wide food crisis that will affect everybody will be like solving a life and death question for us. With the end of the Nazi tyranny, we shall have to face a dreadful situation. Towards this impending terrible crisis the pointed attention of the United Nations has been drawn.

(৭)

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য স্যার লক্ষ্মীপতি মিশ্র কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে নিখিল ভারতীয় বেতারে এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধান্তে ভারত গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ের উন্নতির জন্য ৩২০ কোটি টাকা ব্যয়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে মরুভূমি ও পাহাড় ব্যতীত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানই কোন রেলপথ হইতে ২৫ মাইলের অধিক দূরবর্তী থাকিবে না। তিনি আরও বলেন যে, এই যুদ্ধে ভারতের একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রব্যাদি প্রেরণের অসুবিধা হইতে যে শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়া হইবে না এবং ভারতে যানবাহনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমগ্রভাবে বিবেচিত হইবে। দেশের উন্নতিতে রেলপথ, স্টীমারপথ ও বিমানপথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবে। যাহা হউক, ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫ হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণের জন্য জরিপ

করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের তালিকার বিস্তার সাধন সহজ হইবে। (C. U, B. Com., 1945)

In reply to certain questions Sir Laksmipati Mishra, a member of the Railway Board, expressed the hope over All India Radio that according to the Government of India's post-war railway-development plan of Rs. 320 crores all important places except those in deserts and mountains would come within a range of 25 miles from the railways. He added that the lesson derived from the difficulties in sending goods from one place to another in India during the war would not be forgotten and that the transport system of India as a whole would be taken into consideration. In the development of the country the railways, the waterways and the airways would take important part However, in the meantime, survey has been made for the construction of about fifteen thousand miles of railways and, if necessary, it will be easy to extend the programme of construction of new railways.

(৮)

মহাসমর আরম্ভ হইবার পূর্বে কাপড়ের দিক হইতে ভারতবর্ষ অনেকটা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এবং মুষ্টিমেয় সহরবাসী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের বাদ দিলে এদেশের অধিকাংশ লোকই এখনও আধুনিক সুসভ্য জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করে না। মোটের উপর ১৯৩৮-৩৯ সালে, অর্থাৎ যে বৎসর বিশেষ সামরিক প্রয়োজনে এক গজও বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় নাই, সেই বৎসর ভারতের মিল ও তাঁতগুলিতে উৎপন্ন কাপড়েই এদেশের শতকরা ৯০ ভাগের বেশী অভাব মিটিয়াছিল। উক্ত বৎসরে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৪ শত কোটি গজ ও তাঁতে দেড়শত কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং ৭০ কোটি গজ কাপড় জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হয়। এই ৬২০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ২০ কোটি গজ কাপড় সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি নিকটবর্তী নির্ভরশীল দেশে রপ্তানী করিয়া ভারতে উদ্বৃত্ত থাকে পূরা ৬০০ কোটি গজ— এবং ইহাই কিঞ্চিদধিক ৩৭ কোটি নরনারীর লজ্জা নিবারণ করে। পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহের তুলনায় এইভাবে কমবেশী ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নহে, কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত

বলিয়া এই সামান্ত পরিমাণ কাপড়েই ভারতবাসীর মোটামুটি চলিয়া গিয়াছিল। (C. U., B. Com., 1946)

As regards cloth India became mostly self-sufficient before the outbreak of the Great war. Of course, India is a poor country and if the handful of townsfolk and well-to-do persons are not taken into consideration, even now most of the people of this country do not use clothes in keeping with the standard of modern civilized existence. On the whole, in 1938-39, the year in which not even a single yard of cloth was required for special military purpose, cloth produced in Indian mills and hand-looms met more than 90 per cent. of the demand of this country. That year Indian mills produced 4,000 million yards and handlooms produced 1,500 million yards of cloth and 700 million yards were imported from Japan, Britain and other countries. Out of this 6,200 million yards practically 200 million yards of cloth were exported to Ceylon, Burma and other adjacent countries dependent on India and there was a net surplus of 6,000 million yards in this country with which a little over 370 million men and women covered themselves. In comparison with the civilized countries of the world this per capita consumption of about 16 yards of cloth is not worth mentioning, but because Indians are always accustomed to simple living, they somehow managed with this meagre quantity.

(৯)

যুদ্ধের পর সকল জাতির আর্থিক উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা এবং সকল জাতি যাহাতে সমভাবে পণ্যের উৎপাদন এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হইতে সিনেটর গিনেটী পর্যন্ত সকলেই একমত। প্রস্তাবটি স্থূল দৃষ্টিতে কতকটা নিরীহ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শিল্পকার্যে যে সকল জাতি পশ্চাৎপদ তাহাদের পক্ষে ইহাতে শঙ্কার কথা আছে। কারণ, অবাধ বাণিজ্য দ্বারা কৃষিপ্রধান জাতির শিল্প সেবার প্রবৃত্তিকে পঙ্গু করা সম্ভব। ভারতবর্ষকেও এই অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে শিল্পহীন করা হইয়াছে। কৃষিপ্রধান জাতির আর্থিক দুর্দশা

কখনও ঘুচে না। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে প্রত্যেক জাতি শিল্পসাধন বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এবার এই যুদ্ধের পর তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা হইবে বলিয়া শঙ্কা হয়। ইহার ফলে পরিণামে কোন পক্ষের হিতসাধন হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে ভবিষ্যৎ বিবাদের বীজ উপ্ত হইবে এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করিবে। (C. U., B. Com., 1947)

From President Roosevelt to Senator Ginette—everyone agrees that an arrangement should be made after the war so that all nations may get scope to improve their economic conditions, have access to raw materials and carry on trade and business on equal terms. The proposal may appear somewhat harmless on a superficial view, but for the industrially backward countries there is something to be afraid of in it. The reason is that by free trade the industrial aspirations of an agricultural country can be crippled. This free-trade doctrine has de-industrialised India too. The economic handicap of an agricultural country does never end. Since the last war every nation has been trying to be industrially self-sufficient, but it is apprehended that after the present war there will be an attempt to baffle such endeavour. It does not appear that any side would gain in consequence. The seeds of future conflicts would be sown in it and chaos would prevail in the world.

(১০)

ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে শ্রমিক সম্প্রদায় ও জাতীয় সরকার উভয়েই বর্তমান শ্রমসংক্রান্ত আইন পরিবর্তনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। খনি আইনের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা নিঃসন্দেহে সন্তোষ বোধ করিবেন; কারণ প্রধানত ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের জন্য কয়লার গুরুত্ব অসামান্য। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় খনি মজুরদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সালিশী বোর্ডের সুপারিশ মালিকেরা কার্যে পরিণত করায় কয়লা খনি শ্রমিকদের মজুরীর হারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর শ্রমিকই ইহার ফলে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। কয়লা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ছাড়া ভারতের অন্য কোন শিল্পের মজুরেরাই সম্ভবত বৎসরে চার মাসের বোনাস পায় না। (C. U., B. Com., 1948)

In the new environment that has come to prevail with the end of the British rule in India, both the labour community and the National Government are expressing their eagerness to change the existing labour laws. The attention of the Government of India has been first drawn towards the Mines Act and the trade union workers would undoubtedly feel satisfied; because, principally the importance of coal is immeasurable in regard to the future development of industries in India. Moreover, compared with other workers, the condition of the miners is the worst. The proprietors having given effect to the recommendations of the Adjudication Board appointed by the Government of India, there have been revolutionary changes in the rate of wages of the mine-workers. By it labourers of all classes have been benefited. Except the coal miners, workers belonging to no other industry in India probably enjoy bonus equivalent to four months' wages.

(১১)

পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র সংঘশক্তি, গণশক্তি। দল বাঁধিতে পারিলেই কাজ হাঁসিল। কিন্তু এ আমরা কি দেখিলাম? দল নাই, সম্প্রদায় নাই, সংঘ নাই—একক। কঠোরভাবে একক,—কেবল একখানি যষ্টিমাত্র সম্বল করিয়া দাণ্ডী-যাত্রা। মনে পড়ে? 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তুই একলা চলরে'? একবার কল্পনা কর—একাকী অর্ধনগ্ন ফকির নির্ভীক-ভাবে পথ চলিয়াছেন। দূরে দুর্ধর্ষ বিদেশী টাইর‍্যাণ্টের কামান নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করিতেছে, আর কাতারে কাতারে নরনারী বক্ষ প্রসারিত করিয়া সঙ্গী হইতেছে। মরণ তখন কোথায় ছিল? কোথায় ছিল মৃত্যু যখন মহাত্মা একাকী অগণিত রক্ত-লোলুপ সিংহব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্র, ভয়াল নর-পশুর মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন? (C. U., B. Com., 1949)

The motto of the Western world is the strength of organisation, the strength of the people. The formation of a group means the achievement of the object. But what do we see here? Here is only an individual and no group, community or organisation. He is severely alone—with only a staff he marches on towards Dundee. Do you remember: 'If no one comes at your call, move alone?' Just think,—the half-naked Fakir (mendicant) walks the way dauntlessly and all alone.

At a distance the cannon of the indomitable foreign tyrant thunders in impotent rage and rows of men and women join him with their bosoms expanded. Where was death then? Where was death when the Mahatma roamed alone amidst the countless beastly men, more fierce and terrible than blood-thirsty lions and tigers?

(১২)

বেকারেরা যাঁহাদের অভিশপ্ত করে, তাঁহারা ধনিক, পুঁজিপতি ও শিল্পপতি। তেমনি অভিশাপ দেয় শিল্পী, কৃষক, কেরাণী এমন কি শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যক্তিও। দাসবৃত্তি দ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জন করে, অভিশাপ দিতে তাহারা একটুও ইতস্ততঃ করে না। কাজ না থাকিলেই মানুষ হয় বেকার। পরিবারবর্গের ভরণপোষণ না করিতে পারিলেই বেকারের বিপ্লবপন্থী হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বেকার সমস্যা খুব বড় সমস্যা। এ সমস্যা প্রাচ্যেও আছে, প্রতীচ্যেও আছে। তবে প্রাচ্যের সমস্যা প্রতীচ্যের মত তীব্র নহে। ধনিক, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও সরকার বাহাদুর দেশ ও দশের কল্যাণে একমত হইয়া যদি শিল্প, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিক্ষাবিস্তারে প্রচেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমস্যার রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইতে পারে। (C. U., B. Com., 1950)

The unemployed curse rich men, capitalists and industrialists. So do the artists, peasants, clerks and even persons who have connection with education. Those who have to earn livelihood by servility do not hesitate in the least to curse. A man is unemployed when he has no work. If an unemployed person fails to maintain his family, it is natural that he will turn a rebel. So the problem of unemployment is a very big one. The problem exists both in the East and West. But the problem in the East is not as intense as it is in the West. The door leading to the solution of the problem may be opened if the rich, industrialists, capitalists and Government are unanimous about the welfare of the country and the people and they make endeavour to expand industry, agriculture, trade, commerce and education.*

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি কম. পরীক্ষার ১৯৫১-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রশ্ন 'অনুশীলনী' অংশে পাওয়া যাইবে।

অনুশীলনী

(EXERCISES)

(১)

স্বাধীনতা যারা এনেছে তাদের পুরোভাগে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা স্বভাবতঃই প্রত্যাশা করেছিল যে রাষ্ট্রীয় অধিকার তাদের সামনে আত্মোন্নতির সিংহদ্বার খুলে দেবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে তাদের সে প্রত্যাশা পেয়েছে রূঢ় আঘাত। আত্মোন্নতির সুযোগসুবিধা করা তো দূরের কথা, মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ আরও বিরূপ পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে। চোখ খুললেই এ দৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। দেড়শো টাকা মাইনের একজন অধ্যাপক, দুশো টাকা মাইনের একজন সাংবাদিক বা একশো টাকা মাইনের একজন কেরাণীর পক্ষে আজ পরিবারাদি নিয়ে বেঁচে থাকা যে কি কঠিন ব্যাপার তা সহজেই বুঝা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ জীবন যাত্রার মান বজায় রাখবার দুষ্প্রয়াস করতে গিয়ে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে—অথচ এদিকে কারও দৃষ্টি নেই বললেই চলে। (C. U., B. Com., 1951)

[**Hints :**—আত্মোন্নতি—Self-development ; সাংবাদিক—Journalist.]

(২)

বিগত মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইতে তদানীন্তন কালের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে বিদেশ হইতে স্বর্ণের আমদানী এবং ভারত হইতে বিদেশে স্বর্ণের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দেন ; তখন ভারতে যে স্বর্ণ ছিল এবং স্বর্ণ ক্রয়ের জন্য ভারতের হাতে যে বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা হস্তগত করিয়া ইংলণ্ডের প্রয়োজনে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সমর সরঞ্জাম ক্রয় করাই উপরোক্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সময় যদি ভারতকে বিদেশ হইতে স্বর্ণ-আমদানী করিবার সুযোগ দেওয়া হইত, তাহা হইলে ভারতে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ আমদানী হইত। কারণ তখন ভারতের কি স্টার্লিং কি ডলার সকল শ্রেণীর বিদেশী মুদ্রারই খুব বেশি সচ্ছলতা ছিল। ঐ সময় ভারতকে স্বর্ণ আমদানীর সুযোগ না দিয়া ভারতের অর্জিত সমস্ত

বিদেশী মুদ্রার বদলে ইংলণ্ডের স্টার্লিং মুদ্রা দেওয়া হয় এবং তাহাও ইংলণ্ডে আটক করিয়া রাখা হয়। (C. U., B. Com., 1952)

[Hints :—বিদেশী মুদ্রা—Foreign currency.]

---

(৩)

দেশে পণ্যদ্রব্যের তুলনায় দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতার যোগান বৃদ্ধি পাইলেই যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি অপরিহার্য হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। দেশে তখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে যখন দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত হিসাবে প্রভূত পরিমাণে ক্রয়-ক্ষমতা সঞ্চিত হইবে—অথচ সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে পণ্যদ্রব্য ও মজুরীর যোগান বাড়িবে না। কিন্তু এইরূপ একটা অবস্থার মধ্যেও টাকার সুদ বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের ধার দিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, শ্রমিকের মজুরী নিয়ন্ত্রণ, শিল্প ও বণিক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত লভ্যাংশের সীমা নির্দেশ ইত্যাদি বহু প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা দেশে মুদ্রাস্ফীতির কুফল নিবারণের নানা পন্থা বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বনেই বিগত মহাযুদ্ধের সময় জগতের বহু দেশ দেশবাসীর হাতে প্রচুর অর্থ ছড়াইয়াও দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

(C. U., B. Com., 1953)

[Hints :—মুদ্রাস্ফীতি—Inflation ; অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা—Surplus purchasing power ; বাধ্যতামূলক সঞ্চয়—Compulsory savings.]

---

(৪)

ব্যাঙ্ক সমূহের প্রধান কাজ জনসাধারণের অর্থের নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণ। কোন ব্যক্তির চলতি আয় যদি তাহার চলতি ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়, তাহা হইলে তাহার অর্থ সঞ্চিত হয় এবং সেই সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণ করা তাহার পক্ষে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাঙ্ক ও এতজ্জাতীয় অর্থ-নীতিক প্রতিষ্ঠান এই অর্থ নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জন-সাধারণকে সাহায্য করে। সপ্তম শতাব্দীতে যখন ইংলণ্ডের স্বর্ণকারগণ জনসাধারণের অর্থ নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিত, সেই সময়ে

উহারা এজন্য আমানতকারীদের নিকট হইতে একটা কমিশন আদায় করিত। পরে স্বর্ণকারগণ. যখন দেখিল যে আমানতী টাকার একটা সামান্য অংশ বাদে আর সকল টাকা সব সময়ে তাহাদের হাতে পড়িয়া থাকে এবং এই টাকা দাদন করিয়া উহারা লাভ করিতে পারে, তখন উহারা আমানতের জন্য কমিশন দাবী না করিয়া আমানতকারীকেই একটা সুদ দিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবেই আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। (C. U., B. Com., 1954)

[Hints :—নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণ—To keep in safe deposit.]

---

(৫)

বাঙ্গালীর গৃহে চিনির ব্যবহার অল্প নহে। আমরা যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করি, তাহা আমাদের দেশেই জন্মিতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কে করিয়াছে ? একদিন ভারতবাসী ভাবিত, জাভার সহিত চিনি প্রস্তুত ব্যাপারে তাহারা কখনই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। অথচ এখন জাভা হইতে চিনি তো এ দেশে একেবারেই আসে না। কেবল তাহাই নহে, এখন ভারতবর্ষ হইতে চিনি বাহিরে রপ্তানী হইবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে তাহারই চিনির কল হইতে সমস্ত বাংলা-দেশকেই চিনি সরবরাহ করিতে পারে। অতএব এ দেশে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর চাষ হওয়া প্রয়োজন। ইক্ষু হইতে কেবল যে চিনি প্রস্তুত হইবে তাহাই নহে, ইক্ষুর রস নিঙড়াইয়া লইলে যে ছিবড়া পড়িয়া থাকে, তাহাকেও কাজে লাগানো যায়। অবশ্য সাধারণ গুড়ের ব্যবসায়ীরা ঐ পদার্থটি পুড়াইয়া ইক্ষুরস জ্বাল দেয়, কিন্তু তাহা না করিয়া উহাকে কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থা। ইক্ষুর ছিবড়ার সহায়তায় মাঝারি আকারের কাগজের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। (C. U., B. Com., 1955)

[Hints :—ব্যাপকভাবে—Extensively ; ছিবড়া—Crushed refuse.]

---

(৬)

এদেশে কৃষির উপর যারা নির্ভর করে তাদের মধ্যে শতকরা ১৮ জনই কৃষি-শ্রমিক। এদের দুর্দশার অন্ত নেই। বৎসরের সব সময়ে এদের কাজ থাকে না, রোজগারও সামান্য। তা-ছাড়া এদের আরও অনেক অসুবিধা

ভোগ করিতে হয়। এদের এই দুরবস্থার জন্যই আমাদের গ্রাম্য-সমাজও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের অবস্থার উন্নতি করা দরকার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে এদের দুর্দশার অনেকটা লাঘব হবে। গ্রামের শিল্পসমূহ আবার চাঙ্গা হ'লে এবং সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা হ'লে এদের রোজগারের নূতন পথ খুলে যাবে। এছাড়া (মজুরী) আইনবলে এদের সর্বনিম্ন মজুরীও কম হবে না। বিশেষতঃ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সহরাঞ্চলের নানা কাজে এদের অনেককে নিয়োগ করা যাবে। (C. U., B. Com., 1956)

[Hints :—গ্রাম্য-সমাজ—Rural community ; সমবায় পদ্ধতি—Co-operative system ; সর্বনিম্ন (মজুরী) আইন—Minimum (Wages) Act.

(৭)

রূপার হইতে নাঙ্গাল পর্যন্ত নূতন রেল লাইন স্থাপন করা হইয়াছে। বাঁধ অঞ্চল হইতে নাঙ্গাল উপনগর পর্যন্ত আরও একটি রেল লাইন নির্মাণ সমাপ্ত হইয়াছে। দুই কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত এই উপনগরে পনের হাজার লোকের বসবাসের জন্য গৃহ, বিশ্রামাগার, হাসপাতাল, গবেষণাগৃহ, আপিস, বাজার, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এখানে যে কারখানা হইয়াছে তাহাতে নূতন যন্ত্রপাতি তৈয়ারি ও মেরামত করা হইতেছে। সেখানে ইতিমধ্যে ছয় হাজার টন ইস্পাত তৈয়ারি করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নাঙ্গালে পাঁচ হাজার কিলোওয়াটের বাষ্পচালিত যন্ত্র, পাঁচ শত কিলোওয়াটের দুইটি টার্বো সেট ও ডিজেলচালিত যন্ত্র এবং ভাকরাতে দুই হাজার চারিশত কিলোওয়াটের ডিজেলচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এ অঞ্চলের অভূতপূর্ব উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। (C. U., B. Com., 1957)

[Hints :—বাঁধ অঞ্চল—Dam area ; গবেষণা—Research ; কল্যাণকেন্দ্র—Welfare centre.]

(৮)

আমাদের ইহা দৃঢ় ধারণা যে আদ্রা-হাওড়া সেক্‌সনের মধ্যে বাঁকুড়া স্টেশন হইতে রেল কোম্পানীর যে আয় হয় সেরূপ আয় এই সেক্‌সনের মধ্যে অন্য কোন স্টেশনেই হয় না। কোম্পানীর হিসাবাদি দেখিবার সুযোগ আমাদের না থাকিলেও আমরা ইহা অনুমানের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, প্রতি মাসে বাঁকুড়া স্টেশন হইতে সর্বরকমে রেল কোম্পানীর প্রায় ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। মাসিক এইরূপ আয় হওয়া কথার কথা নহে। অথচ স্টেশনের অবস্থা যাহা তাহা মেদিনীপুর পুরুলিয়া হইতে শতগুণে নিকৃষ্ট। স্টেশনে উচ্চ প্ল্যাটফর্ম না থাকার জন্য মহিলা, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও শিশুদিগকে লইয়া যাত্রীদিগকে যে কি হয়রানিই হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারটির যখন সংস্কার করা হইল এবং অপর একটি নূতন শেড তৈয়ারী করা হইল তখন আশা হইয়াছিল যে এই সঙ্গে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উচ্চ করা হইবে। এই অসুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে নাই কেন? (C. U., B. Com., 1958)

[Hint :—নিকৃষ্ট—Inferior]

(৯)

সাত বন্ধু বেকার এবং শিক্ষিত, তাহাদের তিনজন বিবাহিত। তাহারা চাকুরীর জন্য নানাস্থানে দরখাস্ত করে, নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। চাকুরী কিন্তু হয় না। নিরাশ হইয়া তাহারা ঠিক করিল, চাকুরীর খোঁজে আর নয়—অন্নাভাব ঘুচাইবার সত্যকার পথের সন্ধানে এবার নামিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা কৃষিকার্যে নামিয়া পড়াই স্থির করিল। নিজেদের সোণারূপা বিক্রয় করিযা, হাওলাত করিয়া এবং নানাপ্রকারে তাহারা ১০,০০০ টাকা জোগাড় করিল। কাজ শুরু হইয়া গেল। তাহাদের প্রাথমিক সম্বল চারিটি গাই—প্রতিদিন সকাল-বিকালে পনর-ষোল সের দুধ পাওয়া যায়। নিজেদের জন্য পাঁচ সের রাখিয়া বাকি দুধ তাহারা বিক্রয় করে। তাহাতে গড়ে রোজ আট টাকা রোজগার হয়। জলতোলা ও ধান-ভানা কল আসিল। যখন জল তুলিবার দরকার হয় না তখন ঐ কল দিয়া

ধান ভানিয়া কিছু রোজগার হইতে লাগিল। ছয় ঘণ্টাতে গড়ে চব্বিশ মণ ধান ভানিয়া আঠারো টাকা মুনাফা আসিতে লাগিল।

(C. U., B. Com., 1959)

[Hint :—ধানভানা কল—Paddy-husking machine]

---

(১০)

ইতিপূর্বে ক্যাপিটালিজম, মার্কসীয় কম্যুনিজম, ডিমক্র্যাটিক সোশ্যালিজম এবং ফ্যাসিজম-এর স্বরূপ আলোচনা করিয়া ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহাদের কোনটাই দুনিয়ার কৃষক-শ্রমিক বা দুর্গত-বঞ্চিতদের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্যক্তিগত মুনাফা বা লাভের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। সস্তায় কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া চড়া দরে পাকা মাল বিক্রয়ের জন্য তাহার চাই কতকগুলি অধীন দেশ; মূলধন বিনিয়োগ ও নূতন নূতন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য, নামমাত্র মজুরী দিয়া অগণিত কুলীর জন্য চাই আফ্রিকা ও এশিয়ার দাস জাতি। আবার এইসব দাস জাতি ও পরাধীন দেশকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চাই চারিদিকে নৌ ও বিমানঘাঁটি; সুতরাং তাহার জন্যও চাই আরও তাঁবেদার দেশ। এইভাবে বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে চলিয়াছে অন্তহীন লোভ ও স্বার্থ-সংঘর্ষ, আর তাহার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়াইতেছে লড়াই। এই লড়াই আরও অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে এই কারণে যে, ধনতন্ত্র মানুষের মধ্যে যেমন দুই শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি তাহার সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়া জাতির মধ্যেও দুই জীবের সৃষ্টি করিয়াছে—দোজ-হ-হ্যাভ এবং দোজ-হুঁ-হ্যাভ-নট।

(অনাথগোপাল সেন—জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি)

[Hint :—স্বার্থ-সংঘর্ষ—Conflict of interests.]

(১১)

মহাত্মা গান্ধী এই সময়টিতে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক অভূতপূর্ব যাদু দেখিয়ে পঞ্জাবের পথে পাড়ি দিয়েছেন। পথে ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অবতরণ করেই তিনি যা শুনলেন ও দেখলেন, তাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়লেন। পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী সহরের প্রায়

৪০ মাইল পরিভ্রমণ ক'রে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করলেন এবং এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে তিনি জানালেন—দিল্লীবাসীরা তাদের উন্মত্ততা ত্যাগ ক'রে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনমতেই পঞ্জাবে যাচ্ছি না। প্রতিশোধ কখনই প্রতিকার নয়। এতে আসল ব্যাধিই আরও দুরারোগ্য হয়ে উঠবে। যারা নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যাপৃত, আমি তাদের নিবৃত্ত হ'তে একান্ত অনুরোধ করছি। কলকাতা ত্যাগ করবার কালে এই শোচনীয় কাণ্ডের কিছুই আমি জানতাম না। এখানে আসা অবধি আমি কেবলই এখানকার করুণ কাহিনী শুনছি। কয়েকজন মুসলমান বন্ধু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের মর্মান্তিক কাহিনীর কথা বলেছেন। দিল্লীর অবস্থা শান্ত করবার জন্য আমি 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' নীতির প্রয়োগ করব।

(গোপালচন্দ্র রায়—মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযান)

[Hint :—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—Do or die.]

---

(১২)

পুঁজিরূপে সম্পত্তির উৎপত্তি এবং সামাজিক প্রভাব প্রকটিত হয় কখন? দ্বাদশ শতাব্দীর পরে,—যখন ইয়োরোপে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় চলাচলের ফল ব্যবসা-বাণিজ্য ও সওদাগরী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সওদাগরী অনেক কারণে দিন দিন বিকাশ লাভ করিযাছে। তুর্ক কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল দখল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয়ানদের আমেরিকা আবিষ্কার তাহার অন্যতম। উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতে যাইবার পথ আবিষ্কারও এই নূতন জীবনকে পুষ্টিদান করিয়াছে। আমেরিকা হইতে সোনা-রূপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর আমদানীর ফলেও ইয়োরোপীয় সমাজে বাণিজ্যের প্রসার বাড়িতেছে। ইয়োরোপীয় রাজারাজড়াদের ভিতর বিবাহ-বন্ধনের সুযোগে কতগুলো বড় বড় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে মোটের উপর নানাদেশের বহুসংখ্যক নরনারী অনেকটা ঐক্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা ভোগ করিতে পারিয়াছিল। ইহার ফলেও ব্যবসা-সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকন্তু, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার-প্রভাবে লেখাপড়ার সুযোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বণিকেরা ইহার দ্বারাও অনেক প্রকারে লাভবান হইয়াছে।

[Hints :—সওদাগরী—Mercantilism ; উত্তমাশা অন্তরীপ—Cape of Good Hope.]

---

(১৩)

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর অন্তর্বাণিজ্যের জন্ম নূতন করিয়া শুল্ক ধার্য হয় এবং কোন কোন দ্রব্যের উপর উহা চতুর্গুণ পর্যন্ত উঠিয়া যায়। ফলে ঐ সকল দ্রব্যাদি অনতিবৃহৎ পরিসর স্থানে বিক্রীত হইতে থাকে এবং শুল্কের উপদ্রবে বিক্রয়ের বাজার সংকীর্ণ হইয়া আসে। ১৭৯৪ হইতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডে আমদানী শুল্কের হার পরিবর্তন হইতে হইতে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে ভারতীয় পণ্যের আমদানী বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বিনাশুল্কের বাণিজ্যের ব্যাপারে বিলাতী দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে ভারতে আসিতে পাইত, কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের জন্য বিদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ ভারতীয় কার্পাস বস্ত্রের উপর বিভিন্ন হারে শুল্ক নির্ধারিত হয়। বিলাতে আসিয়া দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া গেলে মসলিনের উপর শতকরা দশমাংশ, আর ইংলণ্ডে সেই দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে শতকরা ২৭ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স শুল্ক দিতে হইত। (কালীচরণ ঘোষ—ভারতের পণ্য)

Hint :—আন্তর্বাণিজ্য—Inland trade.]

---

(১৪)

ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের স্বর্ণমান ত্যাগের সহিত রুশিয়া বা জার্মানীর অবস্থার তখন কোন তুলনাই চলিতে পারে না। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিহার করিয়াছিল পূর্ব হইতেই অনেকটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে; তাহার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দেশের মধ্যে স্বর্ণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্বর্ণের অপচয় বা হস্তান্তর যথাসম্ভব বারণ করা। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, স্বর্ণভ্রষ্ট মুদ্রার মূল্যহ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদেশী পণ্যের আমদানী হ্রাস ও দেশী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা এবং বিদেশ হইতে স্বর্ণ আহরণ করা। কাজেই দেখা যাইতেছে ইঁহারা বাহ্যতঃ স্বর্ণ পরিত্যাগ করিলেও অন্তরে করেন নাই। নিজের দেশের বা সাম্রাজ্যের মধ্যে নোটের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দিবার আইনসঙ্গত দায়িত্ব হইতেই শুধু ইঁহারা নিজেদের মুক্ত করিয়া নিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণের ব্যবহার নিজেদের নিয়ন্ত্রিত গণ্ডির মধ্যে বন্ধ করেন নাই। (অনাথগোপাল সেন—যুদ্ধের দক্ষিণা)

[Hint :—আইনসঙ্গত দায়িত্ব—Legal liability.]

(১৫)

তবে ব্রিটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় শিল্পমিশন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই ভারতের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, একথা মনে করিলে বোকামি হইবে। কৃষিজীবনের অসহনীয় দারিদ্র্য হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভারতের জনসাধারণ এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কাঁচামাল ও সুলভ শিল্পশ্রমের কথা ধরিলে ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ দেশ বলা যাইতে পারে। অন্য বিষয়ে কোন অসুবিধা না থাকিলে কেবলমাত্র মূলধনের অভাবে ভারতের ন্যায় বিরাট ও সম্পদশালী দেশের শিল্পোন্নতি চিরকাল ব্যাহত হইতে পারে না। সুতরাং এখন ধীরগতিতে অগ্রসর হইলেও, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে এক বিরাট শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইবে। তাছাড়া বর্তমান টোরী গভর্ণমেণ্টের পতন হইলে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। মিঃ চার্চিলের ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাস্থ তাঁহার সহকর্মীদের রক্ষণশীল নীতির জন্যই ভারতীয় শিল্পমিশনের প্রতি লর্ড ন্যুফিল্ড ও অন্যান্য ব্রিটিশ শিল্পপতিগণের এতটা উদাসীনতা দেখানো সম্ভব হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই বিচিত্র ঔদাসীন্যের কোন ভাল ফল হইতে পারে না। এতকাল ব্রিটেন রপ্তানী বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে, ভবিষ্যতেও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাহাকে রপ্তানীর উপর নিঃসন্দেহে নির্ভর করিতে হইবে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংকীর্ণতার ফলে ব্রিটিশ বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া যাইতেছে।

[Hints :—ভারতীয় শিল্পমিশন—Indian Industrial Mission ; রক্ষণশীল নীতি—Conservative Policy.]

(১৬)

গত দু'মাস যাবৎ কলিকাতা ও সহরতলীতে এত অধিকসংখ্যক কারখানায় এত অধিকসংখ্যক শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে, এরূপ ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। যুদ্ধের সময় কারখানার মালিকগণ প্রচুর লাভ করিয়াছে ও ধনী হইয়াছে। সে সময় শ্রমিকদিগকে কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ায় কারখানার কাজ কমিয়া যাইতেছে।

কাজেই ধনীরাও বহু লোককে বিদায় দিতেছে ও লোকের মজুরীর হার কমাইয়া দিতেছে। কিন্তু অন্য পক্ষে খাদ্যদ্রব্যের দাম যুদ্ধান্তে না কমিয়া বরং বড়িয়াই যাইতেছে। এ অবস্থায় দরিদ্র শ্রমিকগণের পক্ষে ধর্মঘট করা ছাড়া অন্য গতি নাই। বিদেশী সরকার ধনীদের পক্ষে, কাজেই সে দিক দিয়াও শ্রমিকদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। এক্ষেত্রে দেশে ক্রমে অশান্তি ও অরাজকতা যে বাড়িয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্য সকল সভ্য দেশে সরকার পুনর্গঠন ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া বেকার লোকদিগকে অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দিতেছেন। এদেশে পুনর্গঠনের বড় বড় পরিকল্পনার কথাই শুধু শুনা গিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ কিছু হইতে দেখা যায় না। (ভারতবর্ষ)

[Hints :—গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ—Living wages; অরাজকতা—Lawlessness.]

---

(১৭)

এই সব কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করিতেছি না যে, গত দুই তিন মাসের মধ্যে বাংলার ক্ষুদ্রাবয়ব অথচ সাধারণের নির্ভরযোগ্য কোন ব্যাঙ্কের অবস্থার অবনতি ঘটে নাই। গত আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে দেশে যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই সব ব্যাঙ্ক যে সমস্ত উন্নতিশীল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে অর্থবিনিয়োগ করিয়াছিল, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জন্য সেই সব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানেরও লাভের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে এবং বাজার হইতে উহারা উহাদের পাওনা টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই অবস্থার জন্য জনসাধারণের মধ্যে অনেকে ব্যাঙ্ক হইতে আমানতি টাকা তুলিয়া লইয়া উহা নগদ হিসাবে হাতে রাখিতেছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ উহাদের ব্যাঙ্কসমূহে যে পরিমাণ টাকা জমা দিতেছে, তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে। উহার ফলে অনেক ব্যাঙ্কের নগদ টাকার সচ্ছলতা কমিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে নগদ টাকা প্রদানের দায় মিটানো অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

[Hints :—সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি—Communal situation; জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা—Security of life and property.]

(১৮)

বাংলার চাষী দরিদ্র। সামান্য কয়েক খণ্ড জমির উপর তার সারা বৎসরের জীবিকা নির্ভর করে। আবহমান কাল থেকে তারা একই উপায়ে সেই জমি চাষ করে আসছে। বর্তমান যুগের সমুন্নত কৃষিবিদ্যা তাদের স্পর্শমাত্র করেনি। এই শতাব্দীতে কৃষিবিজ্ঞানে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে, তার সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষক সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রভূত সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের চাষী যে গরীব সেই গরীবই রয়ে গেছে। যে কৃষি দ্বারা সে জীবন নির্বাহ করে তা অতি প্রাচীন এবং নিতান্ত কায়ক্লেশে দিন গুজরান ছাড়া সহজভাবে জীবনধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত। লোকসংখ্যাও অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু কৃষি সেই অনুপাতে প্রসার লাভ করে নি। এছাড়া দেশে শিল্পব্যবসায়ের অভাব থাকাতে উত্তরোত্তর বর্ধিত লোকসংখ্যা কৃষির আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে জমির উপর যারা নির্ভর করে তাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই কারণে জমির অভাব দেখা দিয়েছে এবং প্রত্যেক জোতের আয়তন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়েছে। (শান্তিপ্রিয় বসু—বাংলার চাষী)

[Hint :—বৈপ্লবিক পরিবর্তন—Revolutionary change.]

(১৯)

কি অবাধ চুক্তিবাদ, কি মালিকত্বের মায়াবাদ কোনটির প্রয়োগই কেবল শিল্পনেতাদের প্রয়োজনে বদ্ধ থাকল না। ওদের মেনে নেওয়া হয়েছিল উন্নতিশীল সমাজের আর্থিক উধ্বর্গতির দুটি অপরিহার্য মূলসূত্র ব'লে। সুতরাং যেখানেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানেই ওদের প্রয়োগ হ'তে লাগল। অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন দেশের জমির মালিক। তাদের অধীনে চাষীরা চাষ করত, অপর লোক অন্য রকমে জমিকে কাজে লাগাত। এই চাষীদের ও অন্য লোকদের জমিতে অনেক রকম স্বত্ব স্বীকৃত হ'য়ে আসছিল যাদের উৎপত্তি মালিকের সঙ্গে চুক্তিতে নয়, পূর্ব প্রচলিত প্রথায়। মালিক ইচ্ছা করলেই সে সব স্বত্ব রদ কি বদল করতে পারতেন না। জমির মালিকের জমিতে যদৃচ্ছা ব্যবহারের ক্ষমতার মধ্যে এ-সব স্বত্ব খাপ খায় না এবং চুক্তিবাদের মূলতত্ত্বের সঙ্গেও এদের

বিরোধ ; সে তত্ত্ব হচ্ছে উন্নতিশীল সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের আর্থিক সম্বন্ধের বনিয়াদ হয় চুক্তি, স্থিতিশীল সমাজেই তা হয় চুক্তি-নিরপেক্ষ প্রথা।

(অতুলচন্দ্র গুপ্ত—জমির মালিক)

[Hints :—অবাধ চুক্তিবাদ—Theory of free contract; মালিকত্বের মায়াবাদ—Theory of the magic of proprietorship; অভিজাত সম্প্রদায়—Aristocracy.]

---

(২০)

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং এদেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। এইজন্য ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাপন প্রণালীর উন্নতিসূচক যে কোন পরিকল্পনাতেই আগে কৃষিনীতির উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সহিত ভারতে অন্ততঃ ২৫ কোটি নরনারীর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, ভারত সরকার এতকাল সে সম্বন্ধে মোটেই মনোযোগ দেন নাই। কৃষিবিভাগ হইতে চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে যাহা কিছু করা হইয়াছে, সমস্তই হইয়াছে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিক হইতে, বণ্টনব্যবস্থার দিকটি একেবারেই অবহেলিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের (ইহাদের অধিকাংশই সামান্য চাষী) ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের কথা স্মরণ রাখিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, বণ্টননীতি অথবা কৃষিপণ্য বাজারজাত করিবার প্রশ্ন কোন ক্রমেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কৃষিবিভাগ সরকারের একটি পুরাতন বিভাগ, কিন্তু মাত্র গত দশ বৎসরের মধ্যেই কৃষিপণ্য বাজারজাত করিবার এই সমস্যার প্রতি কৃষিবিভাগের নজর পড়িয়াছে। পণ্য বাজারজাত করিবার অব্যবস্থার জন্য ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা কৃষিসংক্রান্ত রাজকীয় কমিশনের (১৯২৬-২৮) রিপোর্টে দেখানো হইয়াছে। ইহার পর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটিও এই সমস্যার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিছুতেই কিন্তু লক্ষণীয় ফল হয় নাই। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং পুনরায় এই জরুরী বিষয়টির প্রতি কৃষিবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

[Hints :—কৃষিসংক্রান্ত রাজকীয় কমিশন—Royal Commission on Agriculture; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি—Central Banking Enquiry Committee.]

(২১)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই শ্রমবিভাগ। সব মানুষ যেমন সব কাজ সহজে করতে পারে না, তেমনি সব দেশও সব কাজ সহজে করতে পারে না।......বাংলার জমিতে পাট যেমন সহজে উৎপন্ন হয় জগতে তা আর কোথাও হয় না,—আবার মালয় দেশে রবার যেমন সহজে উৎপন্ন হয় তেমন আর কোথাও হয় না। এখানে স্বাভাবিক ব্যবস্থাই হচ্ছে মালয়দেশে পাট চাষের চেষ্টায় এবং বাংলাদেশে রবার চাষের চেষ্টায় অনর্থক অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট না করে যেখানে যা সহজে তৈরী হয় তাই তৈরী করে ঐ জিনিসগুলি উভয়দেশের দরকারমত বিনিময় করে নেওয়া। তাতে উভয় দেশেরই লাভ। ফরাসী দেশের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ভাল মদের উপযুক্ত আঙ্গুর হয় আর ভারতবর্ষের গরম আবহাওয়ায় চমৎকার চীনাবাদাম হয়। এখন যদি ফরাসীদেশ চীনাবাদামের চাষ করতে চায়, তাহলে তাকে কৃত্রিম উপায়ে গরম আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, আর ভারতবর্ষ আঙ্গুর উৎপন্ন করতে চাইলে তাকে কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে।

(বিমলচন্দ্র সিংহ—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)

[Hint :—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—International trade.]

(২২)

কাগজের অভাবে ভারতবর্ষে কি দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই। ছাত্র, শিক্ষক, গ্রন্থকার, গ্রন্থপ্রকাশক সকলেই ইহা মর্মান্তিকভাবে অনুভব করিতেছেন। এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানাইতেছেন যে, তাঁহারা ভারতীয় কলে প্রস্তুত কাগজ ব্রহ্মদেশে চালানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র জনসাধারণের জন্য ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধের অজুহাত দেখাইয়া শতকরা ৭০ ভাগই গভর্ণমেণ্ট লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে তথাপি গভর্ণমেণ্ট আপনাদের গ্রাস কমাইতেছেন না। অথচ ভারত গভর্ণমেণ্টের যে এত কাগজের প্রয়োজন নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তাহা থাকিলে তাঁহারা ব্রহ্মে কাগজ পাঠাইতে অনুমতি দিতেন না। যুদ্ধের মধ্যে ভারতের কাগজ মিশরে পর্যন্ত পাঠানো আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। যে

সকল দেশে ব্রিটিশ রাজত্ব পুনরায় কায়েম করিবার জন্ম কাগজের প্রয়োজন, সে সকল দেশের সরবরাহের ভার ভারতের উপর না চাপাইয়া ব্রিটেন হইতে করিলেই ভাল হয় না কি? (আনন্দবাজার পত্রিকা)

[Hint :—বিজ্ঞপ্তি (সরকারী)—Press note]

(২৩)

বস্ত্র মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক বস্তু। ভারতবর্ষ মোটামুটি বস্ত্রের দিক হইতে আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি এ দিক হইতে শোচনীয়ভাবে পশ্চাৎপদ থাকিয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, ব্রিটিশ ভারতে এই বৎসর মোট কাপড়ের কল ছিল ৩৮৯টি। দেশীয় ভারতের লোকসংখ্যা ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সে হিসাবে দেশীয় রাজ্যসমূহে অন্ততঃ ১২৫টি কাপড়ের কল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪টি। হস্তচালিত তাঁতের দিক হইতে দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা আরও খারাপ। ব্রিটিশ ভারতের তাঁতের সংখ্যার হিসাবে দেশীয় রাজ্যসমূহে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ১ ভাগও হস্তচালিত তাঁত চালু ছিল না। একমাত্র রেশমের কারখানা এবং সিমেণ্ট ও দেশলাইয়ের কারখানার হিসাবেই ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের অবস্থাকে তবু আশাপ্রদ বলা যায়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভারতে মোট রেশমের কারখানা ছিল ১২০টি, তন্মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহে ২৫টি কারখামা ছিল।

[Hint :—দেশীয় ভারত—Indian States.]

(২৪)

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৯২০ সালের আইনে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ককে এক করে সৃষ্টি হয় এবং ১৯২১ সাল থেকে কাজ করে আসছে। যদিও আইনের বলে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত, তবু এর স্বত্বাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণাধিকার বে-সরকারী ব্যক্তিদের হাতে। ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন নিয়ে এর পত্তন হয়। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে এর কাজ হবে : সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মত নোট ইস্যু করা এবং সরকারী ব্যাঙ্কের দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবসা করারও

ক্ষমতা থাকবে। ১৯৩৪ সালের সংশোধিত আইনে আজকাল এই ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগে কাজ করে। অবশ্য ব্যাঙ্ক নিজস্ব ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজও করে থাকে। এই ব্যাঙ্কের দুশো শাখা-উপশাখা আছে। ভারতের যত টাকা ব্যাঙ্কে জমা হয় তার এক-তৃতীয়াংশ এই ব্যাঙ্কে আছে, ভারতের ব্যাঙ্কসমূহের উপর এর প্রবল আধিপত্য দেখা যায়। ১৯৩৬ সালে এই ব্যাঙ্কে ১২ জন ব্রিটিশ ও ৪ জন ভারতীয় ডিরেক্টর ছিল। (সুধী প্রধান—শিল্প ভারতের প্রতিরোধ)।

[Hints—স্বত্বাধিকার—Ownership ; ইস্যু—Issue.]

---

(২৫)

শিল্পশ্রমিকদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধির জন্য কিছু করা না হইলে আমরা ভারতে সন্তোষজনক শিল্পোন্নতি আশা করিতে পারি না। কাজটি কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা করা অসম্ভব নয়। এদেশের শিল্পশ্রমিক একেবারে অশিক্ষিত। তাহাদের অধিকাংশের ঘরবাড়ীর অবস্থাই শোচনীয় এবং দুঃখের দিনে তাহাদিগকে দেখিবার মত কেহই নাই। কাজেকাজেই সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, ভাল বাড়ীঘরের ব্যবস্থা এবং সাধারণ শ্রমিককল্যাণ সংক্রান্ত কার্যাদির সম্প্রসারণ শ্রমিকদের যোগ্যতাবৃদ্ধিতে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। এইসব দরিদ্র লোকেরা সাধারণতঃ নোংরা বস্তিতে বাস করে। এই বস্তিগুলিতে নর্দমার ব্যবস্থা অতি জঘন্য এবং বৈদ্যুতিক আলো, মুক্ত বাতাস ও পরিচ্ছন্ন পানীয় জল এইগুলিতে কদাচিৎ মিলিয়া থাকে। কারখানা এলাকার স্বাস্থ্যকর বিধিব্যবস্থা বা জনস্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি হইলে শ্রমিকসাধারণের শরীর অবশ্যই ভাল হইবে এবং তাহাদের কর্মকুশলতাও বৃদ্ধি পাইবে। খুবই দুঃখের বিষয়, এদেশের গভর্ণমেণ্ট এবং মিল মালিকেরা প্রসূতিকল্যাণ, বেকারত্ব বা অসুস্থতাজনিত বীমা প্রভৃতি শ্রমিকদের সাধারণ কল্যাণকর কার্যাদির প্রতি প্রায়ই মনোযোগ দেন না। তাহাদের বেতনহারের হাস্যকর স্বল্পতা সম্বন্ধেও তাঁহারা একইরূপ নির্মম।

[Hints :—নর্দমার ব্যবস্থা—Drainage system ; প্রসূতিকল্যাণ—Maternity benefits.]

(২৬)

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতের হিসাবে বিলাতে একশত কোটি স্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছে। সহজ কথায় বলা যায়, যুদ্ধের পাঁচ বৎসরে ব্রিটিশ সরকারের নিকট ভারতের পাওনা দাঁড়াইয়াছে একশত কোটি স্টার্লিং। ভারত তাহার এই পাওনা স্টার্লিং আদৌ পাইবে কি না এবং পাইলেও কিভাবে পাইবে তাহা লইয়া বিলাতে এবং ভারতে কম আলোচনা হয় নাই। ব্রিটেনের নিকট ভারতের এই বিপুল প্রাপ্য অর্থ কিভাবে জমিয়া উঠিল, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণামাত্র আমাদের আছে। সম্প্রতি ব্রিটেনের জাতীয় অর্থব্যয় কমিটির রিপোর্টে এ সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা জানি, ব্রিটিশ সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে এক চুক্তি অনুসারে ভারতে দেশরক্ষা ব্যয়ের একটি অংশ ব্রিটিশ সরকার বহন করিয়া থাকেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে যুদ্ধ বাবদ ভারতের যে ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে ব্রিটিশ সরকার বহন করিয়াছেন ১০৩ কোটি ১০ লক্ষ স্টার্লিং, এবং ৯৭ কোটি ৩০ লক্ষ স্টার্লিং ব্যয় করিয়াছেন ভারত সরকার। ভারতের যুদ্ধব্যয় শুধু ভারতরক্ষার ব্যয়ই নয়, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার ব্যয়ও বটে। ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার সহিত সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের যুদ্ধব্যয়ের খুব বড় একটা অংশ ব্রিটিশ সরকার বহন করিয়াছেন একথা বলা যায় না।

[**Hint** :—দেশরক্ষা ব্যয়—Defence Expenditure.]

---

(২৭)

দেশবাসীর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের কম বেশী টাকা ধৈর্যের সহিত সংগ্রহ করিয়া এক একটি তহবিল গড়িয়া তোলা এবং ঐ টাকা শিল্প-বাণিজ্যে খাটাইয়া দেশের বৈষয়িক উন্নতিসাধন করা ব্যাঙ্কের কাজ। বর্তমান যুগে নগদ টাকার কারবার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে, বড় বড় ব্যবসার অধিকাংশই আজকাল ধারে চলে এবং সেই ধারে কারবারের টাকার বেশীর ভাগ যোগান দেয় ব্যাঙ্ক। বর্তমান যুগে ব্যাঙ্কের সহিত শিল্প-বাণিজ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ব্যাঙ্কের মঙ্গলামঙ্গলের উপর সমগ্র দেশের বৈষয়িক উন্নতি নির্ভর করে। এই কারণে গত যুদ্ধের পর প্রত্যেক পাশ্চাত্য দেশে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যথাবিহিত সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে, হয় নাই শুধু আমাদের দেশে। ১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে

দেশের প্রায় ৬০০ ব্যাঙ্কের মধ্যে মাত্র ৪০টির একটুখানি তত্ত্বাবধানের ভার উহার উপর অর্পিত হয়। তপশীলভুক্ত এই ৫০টি ব্যাঙ্কের অর্ধেক ছিল বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং মাত্র দুইটি ছিল বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান। ইহার পর ১২ বৎসরে আর মাত্র ২৪টি ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত হইতে পারিয়াছে। (ভারত)

[Hints :—ব্যক্তিগত সঞ্চয়—Personal savings ; বৈষয়িক উন্নতি—Economic development ; তপশীলভুক্ত—Scheduled.]

---

(২৮)

বাংলাদেশের প্রতি কৃষক পরিবারের গড়ে বাৎসরিক আয় মাত্র ২২৫৲ টাকা। একটি পরিবার গড়ে পাঁচটি পরিজন দ্বারা গঠিত। সুতরাং বাংলাদেশের চাষীর মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৪৫৲ টাকা, মাসিক ৩৸০। এই আয়ে চাষীরা অতি কষ্টেই কালাতিপাত করিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক চাষীর লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, কি উপায়ে তাহার আয় বাড়িতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে সেই অনুপাতে জমি বাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাংলার কৃষক পরিবারের চাষের জমির পরিমাণ গড়ে প্রায় ১৪ বিঘা। এই ১৪ বিঘা জমি হইতে আমাদের চাষীরা যে আয় করে তাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অতিশয় কম। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যে, বাংলাদেশের চাষের জমির শতকরা মাত্র ১০ ভাগে রবিশস্যের আবাদ হয়, অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চারভাগ জমি বৎসরের অর্ধেক সময় পতিত থাকে। (সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী—জমি ও চাষ)

[Hints :—পরিজন—Member ; পতিত—Untilled.]

---

(২৯)

১৬৯৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তদানীন্তন জমিদারবর্গের কাছ থেকে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী ক্রয় করেন। কলিকাতায় জমিদারী চালনা করে কোম্পানী নানাভাবে লাভবান হলেন। এইভাবে জমিদারী কারবারে প্রলোভন বাড়ল এবং কোম্পানীর লুব্ধ দৃষ্টি ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করতে লাগল। ১৭৫৭ সালে চব্বিশ পরগণার জমিদারী কোম্পানীর হাতে অর্পিত হয়। ১৭৬০ সালে মীরকাশিম বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলার শাসনভার কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত করলেন। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী

বাংলার ও বিহারের অবশিষ্ট অংশের দেওয়ানী লাভ করলেন। চব্বিশ পরগণা ব্যতীত সর্বস্থানে জমিদারবর্গের মালিকানা স্বীকৃত হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জমিদারবর্গের প্রভাব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

(শচীন সেন—বাংলার রায়ত ও জমিদার)

[**Hint** :—দেওয়ানী—Dewani (charge of Revenue Department).]

---

(৩০)

ভারতের সমবায় আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে উপযুক্ত নির্দেশ প্রদানের জন্য ভারত সরকার বোম্বাই প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ আর, জি, সরাইয়ার নেতৃত্বে একটি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। সমবায় আন্দোলন প্রবর্তিত হইবার পর বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এদেশে আজ পর্যন্ত তাহার শৈশব কাটে নাই। উক্ত কমিটির মতে এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ জনসাধারণের শিক্ষার অভাব এবং এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের বিস্ময়কর উদাসীনতা। জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য এদেশে সমবায় নীতির ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এই প্রয়োজন বাড়িয়াই যাইবে। সুতরাং এই প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে সমবায় আন্দোলন প্রসারের পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইবে। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে এ সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশ দিয়াছেন। এখানে নির্দেশগুলি সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে, তবে আমরা তাঁহাদের মূল্যবান সুপারিশসমূহের দুইটির কথা উপস্থিত উল্লেখ করিতেছি।

[**Hint** :—সমবায় আন্দোলন—Co-operative movement.]

(৩১)

ইংরেজী ১৯৩৮ সালে ভারতে যত খনিজ তোলা হয়েছিল তার মোট মূল্য ৩৪ কোটি টাকার উপর। অনেক খনিজ কাঁচা মাল হিসাবেই বিদেশে চালান যায়। ভারতবাসীর স্বত্ববোধ তীক্ষ্ণ নয়, স্বত্বরক্ষার সামর্থ্যও কম, সেজন্য অনেক আকরের ইজারা বিদেশীর হাতে গেছে। এদেশের লোক ধান, পাট, সরষে,

গম, আখ, কার্পাস প্রভৃতি বোঝে, পাথুরে কয়লাও কিছু বোঝে, কিন্তু বকসাইট, ম্যাংগানিজ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের কোনও জ্ঞান নেই, ধনী ভূস্বামীরও বিশেষ কৌতুহল নেই। যাঁরা ভূবিদ্যায় শিক্ষিত তাঁরাও অবস্থা-গতিকে নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা মাত্র হয়ে আছেন। যদি বিষয়বুদ্ধি, অর্থবল, এবং খনি-কর্মে ও খনিজতত্ত্বে অভিজ্ঞতার সমবায় ঘটে তবেই খনিজের সৎপ্রয়োগ হ'তে পারে। এই সমবায় এদেশে এখনও দুর্ঘট, তথাপি আশার কথা এই যে, দেশের শিক্ষিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের দৃষ্টি ক্রমশঃ এদিকে পড়ছে এবং তার ফলে কয়েক স্থানে দেশী খনিজ থেকে শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন হয়েছে। (রাজশেখর বসু—ভারতের খনিজ)

[Hints :—ভূবিদ্যা—Geology ; খনিজতত্ত্ব—Mineralogy.]

---

(৩২)

ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব অর্থসচিব স্যার জেমস্ গ্রীগের হিসাব অনুসারে ভারতে মোট বার্ষিক আয় ১৬০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু বার্ষিক ৫৩'৫৪ টাকা। ইহার উপর বার্ষিক গড়ে ৮'৫৪ টাকা ট্যাক্স বাদ দিলে ভারত-বাসীর মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় বার্ষিক ৪৫৲ টাকা অথবা মাসিক ৩৸০ মাত্র। সুতরাং ভারতের কোটি কোটি লোক যে দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তাহারা অর্ধনগ্ন, স্বাস্থ্যহীন ও নিরক্ষর। মানুষের যাহা মৌলিক অধিকার—অন্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ভারতের অন্ততঃপক্ষে ৫ কোটি অধিবাসী বেকার, এতদ্ব্যতীত কয়েক কোটি লোক আছে যাহারা বৎসরের কয়েক মাস মাত্র কৃষিকার্যে নিযুক্ত ও অবশিষ্ট কাল কর্মহীন থাকে। বৈদেশিক শাসন ও শোষণের কুফলেই হউক অথবা আমাদের নিশ্চেষ্টতার দরুণই হউক এই কঠোর বাস্তবকে আমরা এড়াইয়া যাইতে পারি না। জীবনের মাপকাঠি আমাদের দেশে এত হীন, অথচ তাহাও উপার্জন করা অনেকেরই সাধ্যাতীত।

(চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য—অর্থতত্ত্ব, পরিভাষা ও অনুবাদ-শিক্ষা)

[Hints :—মৌলিক অধিকার—Basic right ; কঠোর বাস্তব—Stern reality ; জীবনের মাপকাঠি—Standard of living.]

---

(৩৩)

যানবাহন জাতীয়করণের পরিকল্পনা ব্রিটেন ও ভারত উভয় দেশেই গৃহীত হইতে চলিয়াছে। যানবাহন জাতীয়করণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির যে ব্যয় হইবে, ভারত সরকার তাহার একাংশ বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কিভাবে যানবাহন জাতীয়করণের কাজ সম্পন্ন হইবে তাহা এখনও বিস্তৃতভাবে জানা যায় নাই। ব্যাপারটি খুবই জটিল ও ব্যাপক। ট্রেণ, স্টীমার, বাস প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর যানবাহন জাতীয়করণের কাজ সহজসাধ্য নয়। কাজেই বলা-মাত্রই পরিকল্পনা চালু হইয়া যাইবে এমন কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মধ্য-কালীন গভর্ণমেণ্ট যখন জাতীয়করণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ইহা ক্রমে কার্যে পরিণত হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; আমরা আশা করি, এই জাতীয়করণ পরিকল্পনায় বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিতে ভারত সরকার অযথা বিলম্ব করিবেন না। বলা বাহুল্য, ভারত সরকারের বিবৃতি প্রকাশিত হইলে সমস্ত বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

[Hints :—জাতীয়করণের পরিকল্পনা—Nationalisation scheme ; মধ্যকালীন গভর্ণমেণ্ট—Interim Government]

---

(৩৪)

সাংহাইয়ের পতন ঘটিয়াছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সাংহাইয়ের পতন ঘটিল গত ২৫শে মে বুধবার প্রাতঃকালে—কিন্তু উহার পতন ঘটিয়াছে আরো পূর্বে। কমিউনিস্ট বাহিনী বিনাবাধায় সাংহাই অধিকার করিয়াছে। বিনা রক্তপাতে সাংহাই কমিউনিস্ট বাহিনীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। চীনের জাতীয় গবর্ণ-মেণ্টের সেনানায়কগণ সর্বশেষ সৈন্যটি পর্যন্ত নিয়োগ করিয়া সাংহাই রক্ষা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ঘোষণায় কোন আন্তরিকতা ছিল না। জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণ 'স্টালিনগ্রাড' যুদ্ধের মত যুদ্ধ চালাইবার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন। স্টালিনগ্রাডের প্রতিটি রাস্তায়—প্রতি গৃহে—প্রতিপদক্ষেপে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সাংহাইয়ের রক্ষকগণ একদিকে যখন সর্বশেষ সৈন্য বলি দিয়া সহর রক্ষার ঘোষণা করিতেছিলেন—অপরদিকে তখনই বিমানবহর তৈরী করিয়া

রাখিয়াছিলেন নিরাপদে পলাইবার জন্য। ইহা মৃত্যুজয়ী সংকল্পের পরিচয় নয়। মঙ্গলবার ২৪শে মে তারিখে রাত্রেই সাংহাইয়ের রক্ষক কর্তৃপক্ষগণ বিমানযোগে নিরাপদে সরিয়া পড়েন। ভোরে দেখা গেল পুলিশবাহিনী কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রাচীরপত্রগুলি সারারাত্রি জাগিয়া ছিঁড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, ঘরে ঘরে সাদা নিশান উড়িতেছে। কমিউনিস্ট সৈন্যদল আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী তাহাদের নগর রক্ষার দায়িত্ব বুঝাইয়া দিতে লাগিল। (সোনার বাংলা)

[Hints :—জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সেনানায়কগণ—Nationalist Army Officers ; বিমানবহর—Air force ; মৃত্যুজয়ী সংকল্প—Deathless determination.]

(৩৫)

বিভিন্ন দেশের মধ্যে যখন পণ্যের বেচাকেনা হয়, তখন তার স্বাভাবিক মূল্য দেওয়া হয় বিক্রেতার দেশের মুদ্রার দ্বারা। ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রীতি। ব্যক্তিগত দেনাপাওনা মিটাইবার সময়ও সেই নিয়মই প্রচলিত; কারণ যে বিক্রেতা সেই পাওনাদার, নির্দেশ দিবার অধিকার তাহারই। সুতরাং যে মুদ্রার সহিত তাহার পরিচয় নাই এবং যে মুদ্রা তাহার দেশে অচল, সে মুদ্রায় সে তাহার প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিতে কখনও রাজী হইতে পারে না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা প্রচলিত; এবং সকল মুদ্রাই নিজ নিজ দেশের এলাকার মধ্যেই শুধু সচল। সেইজন্যই বিলাত যাত্রা করিবার পূর্বে শুধু পোষাক বদলাইলেই চলে না, টাকার বদলে স্টার্লিং খরিদ করিয়া ট্রাউজারের পকেট ভরিয়া লইতে হয়।

(অনাথগোপাল সেন—যুদ্ধের দক্ষিণা)

[Hints :—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—International trade ; সচল—Legal tender.]

---

(৩৬)

চাষের জন্য বৃহৎ ক্ষেত্র গঠন করিলে বহু ব্যাপারে আশাপ্রদ ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে চাষী সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোন সম্ভাবনা

নাই। ফল ও সব্জীর চাষের ব্যাপারে উৎপাদন ক্ষেত্র বড় করিলে বিশেষ সুফল পাইবার আশা আছে। অরণ্য রক্ষা ও তাহার বন্দোবস্তের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী দায়িত্বেই হওয়া উচিত। পশুপালন ও পশুস্বাস্থ্য রক্ষা-বিভাগের কেন্দ্রগুলি এমনভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক গো-স্বামী তাহার সাহায্য পাইবার পুরোপুরী সুযোগ ভোগ করিতে পারে। সমবায় সমিতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দুগ্ধ-সরবরাহ কেন্দ্রগুলি বিশিষ্ট সহর হইতে ৩০ মাইল পরিধির মধ্যে হওয়া দরকার। সহরের দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য অন্ততঃ ৩০০টি দুগ্ধ সরবরাহ সমিতির প্রতিষ্ঠা পাঁচ বৎসরের মধ্যে করা প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রথমে যে ব্যয় হইবে তাহা সম্পূর্ণ ও পরে বাৎসরিক ব্যয়ের অর্ধেক সরকারকে দিতে হইবে। (প্রবাসী)

[**Hints** :—পশুপালন ও পশুস্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ—**Cattle rearing and Veterinary department**; দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি—**Milk Supply Society.**]

---

(৩৭)

বর্তমান সময়ে যদিও ভারতের বড় বড় নগরে ও বন্দরে বৃহৎ আধুনিক ব্যাঙ্ক ও তাহাদের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে জাঁকজমকের সহিত বহু টাকার কাজকর্ম করিতে আমরা দেখিতে পাই, তথাপি এখনো ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে দেশীয় মহাজনদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিতান্ত নগণ্য নহে। বিদেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ভারতের বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রায় ষোল আনাই যোগাইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক আজও তেমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতের ন্যায় পল্লীপ্রধান মহাদেশের অগণিত কাজ-কারবারের পক্ষে ইহাদের আয়োজন এবং ব্যবস্থা মোটেই প্রচুর ও যথেষ্ট নহে। কারণ বড় বড় নগর ও বন্দর ব্যতীত ভারতের অসংখ্য জনপদের সহিত ইহাদের কোনরূপ সংশ্রব নাই। তাই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের দাবী এইসব দেশীয় মহাজনরাই আজও পূরণ করিয়া আসিতেছে। (অনাথগোপাল সেন—টাকার কথা)

[**Hints** :—দেশীয় মহাজন—**Indigenous banker**; যৌথ ব্যাঙ্ক—**Joint-stock banks**; বহির্বাণিজ্য—**Foreign trade.**]

(৩৮)

কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ ব্যক্তির লাভ এবং সমাজের লাভ অনেক সময়েই এক নয়। যতদিন পর্যন্ত উৎপাদনকার্য ব্যক্তির হাতে, ততদিন ব্যক্তিগত লাভের আশা যেদিকে বেশী সেদিকেই শ্রম এবং মূলধন নিযুক্ত করা হবে, সমষ্টির লাভ হোক আর নাই হোক। ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমষ্টির স্বাচ্ছন্দ্যের বিরোধ নানাস্থানে। জমিদারের কাছ থেকে জমি নিয়ে যদি সে জমিতে আমি স্থায়ী কোন উন্নতি করি, তবে তাতে আমার ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সমাজের লাভ বেশী (অবশ্য সমাজের মধ্যে আমাকেও ধরে নিয়ে), সহরের ঘিঞ্জি গলিতে বাড়ী তৈরী করে সম্মুখে যদি আমি একটু খোলা জমি রাখি তবে তাতে যেমন আমি আলো-হাওয়া পাব, তেমনি আমার প্রতিবেশীরাও পাবে, সেক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সমাজের লাভ বেশী। আবার আমার বাড়ীতে আমি যদি ফ্যাক্টরি খুলি তবে তাতে আমার লাভ, কিন্তু প্রতিবেশীর হবে স্বাস্থ্যহানি। (ভবতোষ দত্ত—ধনবিজ্ঞান)

[Hints :—ব্যক্তি—Individual ; সমাজ—Society ; ঘিঞ্জি গলি—Narrow lane.]

(৩৯)

পশ্চিমবঙ্গের দামোদর নদীর বিপুল জলধারা প্রতি বৎসর নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি করে। রাঁচি ও হাজারিবাগের গিরিগাত্র বাহিয়া বাঙ্গলাদেশের সমভূমিতে অবতরণ করিবার পূর্বে যদি অন্ততঃ আংশিকভাবে ঐ জলরাশিকে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে হঠাৎ বন্যা নামিয়া বর্ধমান ও হুগলী জেলায় বাৎসরিক যে অনর্থ ঘটায়, তাহা আর ঘটাইতে পারিবে না। অথচ ঐ জলরাশি আবদ্ধ হইলে পরে উহাকে ইচ্ছানুরূপ বেগে দামোদরের বক্ষে নামিতে দিলে তাহার সাহায্যেও বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে নবীন বিদ্যুৎ ধারা উৎপাদিত হইতে পারে। অধিকন্তু এই বিপুল জলরাশির কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত নিম্নতর ভূমিতে আর একটি দ্বিতীয় জলাধারে আবদ্ধ করিলে দামোদরের অতর্কিত বন্যা যেমন বন্ধ করা যায়, তেমনি প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়া উহাকে পূর্ববঙ্গের ন্যায় একটি স্রোতস্বতী নদীতে পরিণত করিয়া উহার উভয় পার্শ্বের অপেক্ষাকৃত

উষর ক্ষেত্রকে সমস্ত বৎসর ব্যাপী কৃষিকার্যের উপযোগী করিতে পারা যায়।

(মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা—যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প)

[Hints :—আবদ্ধ—Stored ; জলাধার—Reservoir (dam).]

---

(৪০)

এদেশের জন্য একটি সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করা বর্তমানে ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যেরূপ মনে হইতেছে, শীঘ্রই ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়িয়া যাইবে। এদেশের অধিবাসীবৃন্দের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা তথা দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করাও কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের কৃষিনীতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পড়িয়া আছে। ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট দেশের কৃষিব্যবস্থারও আমূল সংস্কার করিতে হইবে। শুল্কনীতি নির্ধারণ সম্পর্কেও যথেষ্ট সাবধান হইতে হইবে। ভারতবর্ষের শিল্পপ্রসারের জন্য প্রচুর পরিমাণ যন্ত্রপাতি তো চাইই, অধিকন্তু ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য ভারতে কিছু পরিমাণ ভোগ্যপণ্য আমদানী করিতে হইবে। সুতরাং নূতন অর্থনৈতিক যুগ সুরু হইয়াছে বলিয়া শুল্কনীতিও নূতন করিয়া স্থির করা দরকার। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে বর্তমান শাসনতান্ত্রিক অনিশ্চয়তার অবসান না ঘটিলে সর্বপ্রকার সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা আশা করা যায় না।

[Hints :—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—Economic planning ; বহির্বাণিজ্য—Foreign trade ; অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র—Economic self-sufficiency ; শুল্কনীতি—Tariff policy ; মুদ্রাস্ফীতি—Inflation ; শাসনতান্ত্রিক অনিশ্চয়তা—Constitutional uncertainties.]

(৪১)

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণীতে দেখা যায়, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গালার জনস্বাস্থ্যের লক্ষণীয় অবনতি ঘটিয়াছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় কম লোক জন্মগ্রহণ করিলেও বেশী

লোক মরিয়াছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বাঙ্গালার জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫,৯৫,২৯১ ও ১১,৯০,৮৫০; ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৪,৪৮, ২৯৯, ও ১২,২২,১৬৪ হইয়াছে। একমাত্র জ্বরে এই বৎসর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় প্রায় ৫০ হাজারের বেশী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সকল প্রকার জ্বরে মৃত্যুর হিসাবে একমাত্র ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে শতকরা ৩৪.৯ ভাগ লোক এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর শতকরা ৯৯.৩ ভাগ ঘটিয়াছে পল্লী অঞ্চলে। তখন জাপানী যুদ্ধের প্রথম দিক, দেশে কুইনাইনের ততটা অভাব ছিল না, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হইলে এত লোকের ম্যালেরিয়ায় মরিবার কোন কারণ ছিল না। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলেরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় ৭৮,৩৯১ জন, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই সংখ্যা ১৭ হাজার বেশী। পূর্ববর্তী ৫ বৎসরের হিসাবে বাঙ্গালায় বৎসরে প্রতি মাইলে ০.৭ জন লোক কলেরায় মারা গিয়াছিল, কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার ন্যায় কলেরাতেও রোগীর মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি মাইলে ১.৩ জন হয়।

[Hint :—সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ—Public Health Department.]

(৪২)

ক্রমশঃ অর্থনৈতিক কারণে মানুষ অগ্রসর হইতে থাকে পশ্চিমদিকের ভূভাগে। কালক্রমে 'পশ্চিম যাত্রা'র অবসান হ'ল প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। এইভাবে মানুষ যখন একটি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে অপরটির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়, অপরটিকে চাষ করে এবং এইভাবে অগ্রসর হতে থাকে, তাকেই বলে ব্যাপক কৃষি। আজ জনসংখ্যা প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, খালি জমি আর পড়ে নেই বললেই চলে। তাই মানুষ তার ইচ্ছামত এক জমি ছেড়ে অন্য জমি চাষ করতে পারবে না। তার যা আছে তাই নিয়েই তাকে থাকতে হয়, বছরের পর বছর একই জমি চাষ করতে হয়। ক্রমহ্রস্বমান উৎপাদনহারের জন্যই মানুষ এক জমি ছেড়ে অন্য জমির চাষ করেছে। কিন্তু যতদিন জমির পরিমাণ অফুরন্ত ছিল ততদিন বাস্তবিকপক্ষে কেউই এই চাপ বোধ করেনি। তারপরই উর্বর জমির পরিমাণ নিঃশেষ হ'ল। এখন থেকে একই জমি বছরের পর বছর চাষ করতে হয়। ক্রমহ্রস্বমান উৎপাদনহার দেখা

দিল পূর্ণ আকারে, আপন তীব্রতা নিয়ে। তাই চেষ্টা আরম্ভ হ'ল কিভাবে এর প্রভাব রোধ করা যায়। (কস্তুরচাঁদ লালওয়ানী—অর্থশাস্ত্রের রূপরেখা)

[Hint :—ক্রমহ্রস্বমান উৎপাদন—Diminishing returns.]

(৪৩)

সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গলাদেশ ১৩ চাকলায় এবং ১,৬৬০ পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরগণাগুলি কোন-না-কোন জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা বাহুবলে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া, বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, যথাকালে নবাব সরকারে রাজস্ব দিতে পারিলে তাঁহাদের স্বাধীন শক্তির প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চাহিত না। চাকলায় চাকলায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান "ফৌজদার" অর্থাৎ শাসনকর্তা থাকিতেন; তাঁহারা যথাকালে রাজস্ব সংগ্রহের সাহায্য করা ভিন্ন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালীর বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিত; সে বাণিজ্যে জেতৃ-বিজিত বলিয়া শুল্কদানের কোনরূপ তারতম্য ছিল না। মুসলমান নবাব কোন কোন নির্দিষ্ট সময়ে পাত্রমিত্র লইয়া দরবার করিতেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে প্রায়ই মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতেন না। জগৎশেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাদশাহের নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা মুদ্রিত হইত, পরগণাধিপতি জমিদারগণ জগৎশেঠের কোষাগারে রাজস্ব ঢালিয়া দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ করিতেন। (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—সিরাজদ্দৌলা)

[Hint :—আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য—Internal administration.]

(৪৪)

ভারতীয় রাষ্ট্রিক আদর্শের ঘোষণাপত্র

এই গণপরিষদ ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিবার এবং ভারতের ভাবী শাসনব্যবস্থার জন্য এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার দৃঢ় ও পবিত্র সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেছে :

……যে শাসনতন্ত্রে সার্বভৌম স্বাধীন ভারতের, ইহাতে যোগদানকারী সমস্ত অংশের এবং শাসনব্যবস্থার অঙ্গসমূহের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস হইবে জনসাধারণ ; এবং—

যে শাসনতন্ত্রে ভারতের সর্বশ্রেণীর লোকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সুবিচার, মর্যাদা, সুযোগ ও আইনের সমানাধিকার, চিন্তায় ও বাক্যে, উপাসনায় ও ধর্মবিশ্বাসে এবং নীতি ও আইনসম্মত-ভাবে সঙ্ঘ-গঠনে ও কার্য অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া হইবে , এবং—

যে শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ, অনুন্নত ও উপজাতি এলাকাসমূহ এবং অনুন্নত ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে : এবং—

যে শাসনতন্ত্রের বলে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষিত হইবে, সভ্য জাতিসমূহের ন্যায় ও নীতি অনুযায়ী জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের উপর ইহার সার্বভৌম অধিকার থাকিবে ; এবং—

এই প্রাচীন দেশ জগতে ইহার যথাযোগ্য সম্মানজনক স্থান লাভ করিবে এবং বিশ্বের শান্তি ও মানবজাতির কল্যাণ-বিধানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিবে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

[Hints :—প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র—Republic ; শাসনতন্ত্র—Constitution , উপজাতি এলাকা—Tribal area.]

(৪৪)

সাম্প্রতিক পাক-মার্কিন চুক্তির পটভূমিকায় ভারতের বৈদেশিক নীতি কি রূপ গ্রহণ করিবে তাহা সংসদে আলোচিত হইয়াছে এবং সাধারণ দেশবাসী ইহার মোটামুটি গুরুত্ব ও সারমর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন। দেশের এই সমস্যা-সঙ্কুল অবস্থায় পাক-মার্কিন চুক্তি ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তনের সূচনা করিল। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়ন সূচীতে কলম্বো পরিকল্পনা, ইঙ্গ-মার্কিন কারিগরী সাহায্য ও ব্যক্তিগত বৈদেশিক মূলধন প্রবাহে যে জোয়ারের টান ধরিয়াছিল, উক্ত চুক্তির পরে ভারতের

বৈদেশিক নীতিতে যে ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইল, তাহাতে যে মূলধন ও মূলধনী দ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ভাটার টান ধরিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, ভারতের যে সকল শিল্পপতি ইঙ্গ-মার্কিন মূলধনে উৎসাহিত হইয়া অনুরূপ ধনতান্ত্রিক কাঠামো গঠনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও ভারতের বৈদেশিক নীতির তথাকথিত নিরপেক্ষতার এবং অজ্ঞাতসারে রুশ-চৈনিক সম্ভাব্য মৈত্রী বন্ধনের পটভূমিকায় আশঙ্কিত হইয়া উঠিবে। তাহাতে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেমন কতকটা ব্যাহত হইতে পারে, তেমনি স্বদেশী শিল্পপতিদের মূলধন বিনিয়োগে আশঙ্কিত উদ্বেগ দেখা দিবে। (আর্থিক প্রসঙ্গ)

[Hints :—সংসদ—Parliament ; উন্নয়ন সূচী—Development Programme.]

(৪৬)

ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারুণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই। ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ নহে, একটি মহাদেশ বিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কতবড়ো অধর্ম, যাহারা এককালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল, তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্র পশুর নিকট শঙ্কিত ও নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে-চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্মের দোহাই একেবারেই নিষ্ফল—কারণ জগতে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মাহাত্ম্যকে বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করাই ইহারা চরম ধর্ম বলিয়া জানে, সেজন্য ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতে চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয়, তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দয়ামায়া নাই। (রবীন্দ্রনাথ—আত্মশক্তি)

[Hint :—নিরস্ত্র—Unarmed.]

(৪৭)

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, তার সমাজের গঠন ও রাষ্ট্রজীবনের রূপ, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ-বিস্তারের গতি, আদর্শের অনুপ্রেরণা বা ধর্মের উন্মাদনা, এ সব কিছুরই মানব

সমাজের বৈষয়িক জীবনের উপর প্রভাব আছে; এবং অর্থতত্ত্ব আলোচনার মধ্যে এ সবগুলিরই যথোপযুক্ত স্থান আছে। অতএব এরকম মনে করলে ভুল হবে যে, অর্থতত্ত্বে একটি কল্পনায় গড়া মানুষকে নিয়েই বিচার বিবেচনা করা হয়—যার সমস্ত কাজ ও ব্যবহারের পেছনে স্বার্থসিদ্ধির তাগিদ্ ছাড়া আর কোন রকম উদ্দেশ্য বা অনুপ্রেরণা নাই। আবার, এ রকম মনে করলেও ভুল হবে যে অর্থতত্ত্বের আসল কাজ হচ্ছে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজ-ব্যবস্থার কল্পনা করা এবং যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করা, কেন এইটি অন্য সব রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থার চেয়ে ভাল। যেমন পদার্থবিদ্যায় বা রসায়নশাস্ত্রে দেখতে পাই, কি ঘটছে এবং কেন ঘটছে এই নিয়েই অনুসন্ধান করা হয়, অর্থতত্ত্বেরও কাজ মুখ্যত: তাই। (সতীশ সেন ও প্রশান্ত রায়—অর্থতত্ত্ব)

[Hint :—সহজাত প্রবৃত্তি—Inherent propensity.]

(৪৮)

প্রাক্-বৃটিশ যুগের সমাজ-সংস্থায় ব্যক্তির স্থান ছিল গৌণ। সামাজিক রীতি-নীতি-বিধির প্রকরণ ছিল সামাজিক। এক একটি পরিবারকে সমাজ-কাঠামোর সর্বনিম্ন অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত, এবং সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ সর্বাংশে পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। আর স্বয়ং-সম্পূর্ণ অন্য-নিরপেক্ষ সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন ইত্যাদির জন্য ছিল সমাজের সুনির্দিষ্ট বিধান। সর্বোপরি ছিল বর্ণপ্রথার অনুশাসন। বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ, বিভিন্ন বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিধি, বর্ণ এবং গ্রাম্য গোষ্ঠীসমাজ বা পঞ্চায়েতের বিধানের সহিত পূর্ণ সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই ব্যক্তির মানস পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিত। সেখানে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি ছিল অচল।

(অরবিন্দ পোদ্দার—বঙ্কিম-মানস)

[Hint :—বর্ণপ্রথা—Caste system.]

(৪৯)

কিন্তু বঙ্গবিভাগ যেমন হয়েছিল এক সমস্যা মেটাতে, বিভাগ আবার তেমনি জন্ম দিয়েছে হাজার সমস্যার, আর এদের প্রায় প্রত্যেকটির সংগে সারা ভারতের ব্যাপক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। সমস্যা অবশ্য বিভক্ত পঞ্জাবেও আছে। কিন্তু যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতের ভাগ হয়েছে তারই চরম পরিণতি

পঞ্জাবে। তাই আজ আর সেখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নেই। কিন্তু সেই সমস্যা বাংলায় আজো রয়েছে; পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম আজো পূর্ব ও পশ্চিমকে একেবারে আলাদা হতে দেয়নি। ফলে, সমস্যাও যেমন, আশাও তেমনি। তবে এটা ঠিক যে বৃটিশ শিকারী ভারত-বিহঙ্গের পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি পক্ষ ছেদ করে তার ওড়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে; আর দুই ডানার দুটি টুকরো হয়েছে পাকিস্তান। (প্রবোধ ঘোষ—বাঙালী)

[Hint :—সাম্প্রদায়িক ভিত্তি—Communal basis.]

(৫০)

বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবন-সাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশি করেই দিয়েছেন। এজন্য এই দেশকে আজ পর্যন্ত কম দুঃখ সইতে হয়নি। প্রাণের নামে, মানবতার নামে দাবী করলে এখানে সাড়া মিলবে। উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনা ক্ষেত্রে। কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নেই। বাংলা দেশের এই উদার বিস্তৃতির ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে—তার শিল্পে সংগীতে সাহিত্যে সাধনায়। প্রাণী যেমন নানা খাদ্য হতে নানা প্রাণরস নিয়ে জীবনে সমীকৃত করে, তেমনি নানা উপকরণ দিয়ে বাংলা দেশ তার শিল্প ও কলাকে জীবন্ত করে তুলেছে। বাংলা দেশের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে সুকুমার সূক্ষ্মতা বোধ। যে দরদী হাতে সমলিন সূতোর সৃষ্টি সেই হাতে বাংলার বহু সুকুমার শিল্প গড়ে উঠেছে। মাধুর্যের সংগে এদেশের চির যোগ।

(ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা)

[Hint :—মানবতা—Humanity.]

অনুবাদ

(ইংরাজী হইতে বাংলা)

(১)

In most of the Japanese industries with the exception of the spinning of cotton yarn and the making of heavy iron and steel products, the unit of production is small, and most of the industrial sections are made up of small establishments. The Honjo section, situated along the Sumida river, is one of large factories, but most of the establishments are little more than domestic workshops making a great variety of products from paper lanterns to iron nails. There were in Honjo some 300 glass factories in 1926, each with two or three furnaces and employing not more than 40 workers. (C. U., B.Com., 1939).

কার্পাসসূতা উৎপাদন এবং লৌহ ও ইস্পাতজাত গুরুভার দ্রব্যাদি নির্মাণ ছাড়া জাপানের অধিকাংশ শিল্পেরই উৎপাদনকেন্দ্র ক্ষুদ্রাকার এবং অধিকাংশ শিল্পবিভাগই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত। সুমিদা নদীর তীরবর্তী হোঞ্জো অঞ্চল টোকিও সহরের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র। ইহাতে কয়েকটি বৃহদাকার কারখানা থাকিলেও ইহার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই গৃহসংলগ্ন কারখানা অপেক্ষা সামান্য বড় এবং এইগুলিতে কাগজের লণ্ঠন হইতে লোহার পেরেক পর্যন্ত বহুবিধ জিনিস তৈয়ারী হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হোঞ্জোতে ৩০০টির মত কাঁচের কারখানা ছিল। এই কারখানাগুলির প্রত্যেকটিতে চুল্লী ছিল দু'টি অথবা তিনটি এবং ইহাদের কোনটিতেই ৪০ জনের বেশী শ্রমিক কাজ করিত না।

(২)

The Reserve Bank's Report on Currency and Finance for 1937-38 dealt with a period, the latter part of which witnessed a general recession in world economic conditions. In the year 1938-39 there were signs of a recovery which would probably have been more pronounced but for growing uncertainties of the international situation which dominated the financial markets during the latter part of the year. The five years of

increasing economic activity beginning with 1932 were followed by a downward trend early in 1937-38. This downward movement which had its origin in the U.S.A. appears to have been arrested in that country, about June, 1938.

(C. U., B.Com., 1940.)

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা ও অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্যবিবরণীতে যে সময়ের কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহার শেষ দিকে পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থায় একটা সাধারণ মন্দাভাব দেখা গিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উন্নতির লক্ষণ সূচিত হয় বটে, তবে বৎসরের শেষদিকে টাকার বাজারের উপর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা প্রভাব বিস্তার না করিলে ইহা হয়তো আরও প্রত্যক্ষ হইতে পারিত। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসর ব্যাপী ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাঞ্চল্য ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে নিম্নাভিমুখী হয়। এই নিম্নগতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম দেখা যায় এবং ঐ দেশেই ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস নাগাদ ইহা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(৩)

Under the stimulus of high prices, production was expanded in most industries after the outbreak of the war, according to the Review of Trade in India in 1939-40. The output of jute manufactures increased by 5% as compared with 1938-39. The iron and steel industry was fully booked with order resulting in a considerable increase in its output, production of finished steel rising to 804,000 tons, which was 11% higher than in the preceding year. Production of paper attained a new record amounting to 1,416,000 cwt. which exceeded the previous year's figures by 232,000 cwt. Coal raisings increased to 25,056,000 tons, a level which was not reached at any time during the past ten years.

(C. U., B.Com., 1941.)

১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় বাণিজ্যের পর্যালোচনাপত্র (রিভিউ অফ ট্রেড) অনুসারে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বর্ধিত মূল্যের সুযোগে অধিকাংশ শিল্পেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ বাড়িয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত-

শিল্প করমাশী কাজে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত থাকায় উৎপাদন লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং পরিমার্জিত ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৮,০৪,০০০ টনে পৌঁছায়। ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ১১ ভাগ বেশী। কাগজের উৎপাদন একটি নূতন রেকর্ড (অভূতপূর্ব নিদর্শন) সৃষ্টি করে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ২ লক্ষ ৩২ হাজার হন্দর বৃদ্ধি পাইয়া উহা ১৪ লক্ষ ১৬ হাজার হন্দরে পৌঁছায়। কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধি পাইয়া ২,৫০,৫৬,০০০ টন পর্যন্ত হইয়াছিল, গত দশ বৎসরের মধ্যে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ আর কখনও এত বেশী হয় নাই।

(৪)

The growth of Trade Unionism was very slow in its early stages and had only reached a million members in 1874. Before the Great War it had reached four millions and in 1920 the number had swollen to 8½ millions. Since then there had been a decline of membership due to a variety of causes, the general strike of 1926, perhaps, being the principal factor. Nevertheless, trade unions to-day are powerful bodies and the principle of collective bargaining is recognised by the public as a wise means of settling disputes. No one with a knowledge of the historical facts in regard to wages paid during the last hundred years could arrive at any other conclusion than this: that the workers have not received a fair share of profits of the industry during that period. Now-a-days, a much more enlightened view in regard to payment of workers is generally taken by employers of labour, and the standard of living has certainly been raised since the Great War.

(C. U., B.Com., 1942.)

প্রথমদিকে ট্রেড ইউনিয়ন (শ্রমিকসঙ্ঘ) নীতির প্রসার অত্যন্ত মন্থরগতিতে হইয়াছিল এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকসঙ্ঘসমূহের সভ্যসংখ্যা মাত্র ১০ লক্ষে পৌঁছায়। মহাযুদ্ধের পূর্বে এই সংখ্যা ৪০ লক্ষ হয় এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৫ লক্ষ দাঁড়ায়। তাহার পর হইতে নানাকারণে সভ্যসংখ্যা হ্রাস পায়, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ ধর্মঘটই সম্ভবতঃ ইহাদের সর্বপ্রধান কারণ। যাহা হউক, বর্তমানে শ্রমিকসঙ্ঘগুলি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং দলবদ্ধভাবে আলোচনা চালাইবার নীতিকে বিবাদ মিটাইবার যুক্তিযুক্ত পন্থা হিসাবে

জনসাধারণও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শ্রমিকদের মজুরী প্রদান সম্পর্কিত গত একশত বৎসরের ঐতিহাসিক তথ্যাদির সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদিগকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, এই সময়ের মধ্যে শিল্পে যে লাভ হইয়াছে, শ্রমিকেরা তাহার ন্যায্য অংশ পায় নাই। আজকাল শ্রমিক নিয়োগকারীরা সাধারণতঃ শ্রমিকদের মজুরী প্রদান সম্পর্কে অনেক বেশী উদার মনোভাব দেখাইয়া থাকেন এবং মহাযুদ্ধের সময় হইতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই উন্নীত হইয়াছে।

(৫)

The French Revolution of 1789 swept away the ancient but corrupt dynasty of Bourbon, and the First Republic was set up, based upon the declaration of the Rights of Man of Jean Jacques Rousseau, a document which was the Bible of the extreme Left until the issue of Karl Marx's Communist Manifesto. This Republic, like modern Communism, aimed at the international brotherhood of man, but, unlike the institute in Russia, revolutionary France set out to achieve the brotherhood of the workers by war. From 1789 the ragged revolutionary hordes of France poured over Europe into Germany, the Netherlands, and Italy, to subdue and dethrone the surrounding princes. They succeeded; but the success destroyed the Revolution, for from it sprang up the military dictatorship of Napoleon Bonaparte. (C. U., B.Com., 1943.)

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব প্রাচীন ও কলঙ্কিত বোরবণ রাজবংশের বিলোপসাধন করে এবং কার্ল মার্ক্সের 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত চরম বামপন্থীদের নিকট বাইবেল সদৃশ জিন জ্যাক রুশো'র 'মানুষের অধিকার' সংক্রান্ত ঘোষণার উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক সাম্যবাদের ন্যায় মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা এই সাধারণতন্ত্রেরও লক্ষ্য ছিল, তবে রুশ আদর্শের অনুরূপ না হইয়া বিপ্লবী ফ্রান্স যুদ্ধের দ্বারা শ্রমিকদের মধ্যে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে থাকে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অনিয়ন্ত্রিত ফরাসী বিপ্লবীর দল চতুষ্পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি ইয়োরোপের নানাদেশে ছড়াইয়া পড়ে। তাহারা

সফল হইয়াছিল; কিন্তু এই সাফল্যের জন্যই বিপ্লব ধ্বংস হয়, কারণ ইহার ফলেই নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সামরিক একনায়কত্বের উদ্ভব হইয়াছিল।

(৬)

For waging war on the scale and with the intensity demanded in these days, the first requirement of economic policy is to make the fullest possible use of productive resources of the nation, in man-power, equipment and command over materials. This in itself is problem enough, especially in view of the absorption of men into the armed forces, the unavoidable impairment of equipment, and the physical difficulty of keeping up the necessary inflow of materials. It is scarcely less necessary, however, to ensure that the goods and services produced shall be of the kinds most urgently required. So great are the demands, direct and indirect, imposed by modern war that little margin is left for producing the ordinary luxuries of peaceful times or for accumulating assets which makes for a rising level or social welfare.

(C. U., B.Com., 1944.)

আধুনিক কালের উপযোগী আয়োজন ও তীব্রতার সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইলে অর্থনীতির দিক হইতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনবল, সাজসরঞ্জাম ও পণ্যাদির উপর কর্তৃত্বাধিকার সমেত জাতির সমগ্র উৎপাদিকা শক্তির যথাসম্ভব পূর্ণ ব্যবহার। সশস্ত্র বাহিনীতে লোকসংগ্রহ, সাজসরঞ্জামের অনিবার্য ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রয়োজনমত পণ্যসরবরাহ ব্যবস্থা অটুট রাখার প্রাকৃতিক অসুবিধা,—বিশেষ করিয়া এইসব দিক হইতে এবং এমনিই ইহা একটি বড় সমস্যা। যাহা হউক, অতি অল্পক্ষেত্রেই একথা জোর করিয়া না বলিলেও চলিবে যে, যে সব পণ্য ও কাজের অবিলম্বে প্রয়োজন, উৎপন্ন পণ্য বা অনুষ্ঠিত কার্যাদি সেই শ্রেণীর হওয়া চাই। আধুনিক যুদ্ধ এত বেশী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাহিদার সৃষ্টি করে যে, শান্তিকালীন সাধারণ বিলাসপণ্যসমূহ উৎপাদন করিবার অথবা সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের উপযোগী জিনিসপত্র সঞ্চয় করিবার খুবই কম সুযোগ পাওয়া যায়।

(৭)

Statistics of unemployment mean rows of men and women, not of figures only. The three million or so unemployed in 1932 means three million lives being wasted in idleness, growing despair and numbing indifference. Behind these three million individuals seeking an outlet for their energies and not finding it, are their wives and families making hopeless shift with want, losing their birthright of healthy development, wondering whether they should have been born? Unemployment in the ten years before this War meant unused resources in Britain to the extent of at least £500,000,000 per year. That was the additional wealth we might have had if we had used instead of wasting our powers. But the loss of material Wealth is the least of the evils of unemployment. The greatest evil of unemployment is not the loss of additional material wealth which we might have with full employment. There are two other greater evils: first that unemployment makes men seem useless, not wanted; second that unemployment makes men live in fear and from fear springs hate.

(C. U., B.Com., 1945).

বেকারদের সংখ্যা নিরূপণ বলিতে নরনারীর সারি বুঝায়, শুধু সংখ্যা বুঝায় না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ লক্ষের মত লোকের বেকার থাকিবার অর্থ—এই সময় আলস্যে, ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্যে এবং অনুভূতিহীন উদাসীনতায় ৩০ লক্ষ জীবনের অপচয় ঘটিতেছিল। কর্মোৎসাহ নিয়োগের পথসন্ধানে ব্যর্থমনোরথ এই ৩০ লক্ষ লোকের পিছনে তাহাদের স্ত্রী এবং পরিবারবর্গ ছিল এবং তাহারা অভাবের তাড়নায় অসহায়ভাবে ছটফট করিয়া ও সুস্থ বিকাশ লাভের জন্মগত অধিকার হারাইয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছে যে, তাহাদের জন্মানোই উচিত হইয়াছে কি না? ব্রিটেনে এই যুদ্ধের আগেকার দশ বৎসরের বেকারত্বের অর্থ—বৎসরে অন্তত: ৫০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সম্পদ অব্যবহৃত থাকিয়া যাওয়া। আমাদের শক্তি অপচয় করিবার পরিবর্তে ব্যবহার করিতে পারিলে আমরা এই পরিমাণ বাড়তি সম্পদের অধিকারী হইতে পারিতাম। কিন্তু পার্থিব সম্পদহানি বেকার অবস্থার তুচ্ছতম ক্ষতি। বাড়তি জাগতিক সম্পদ হারাইলে বেকারত্বের সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয় না, কারণ এই সম্পদ আমাদের পক্ষে সার্বজনীন কর্মসংস্থান দ্বারা ফিরিয়া পাওয়া

সম্ভব। আরও দুইটি বৃহত্তর ক্ষতি আছে,—প্রথমতঃ, বেকার অবস্থায় মানুষকে অপদার্থ ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, বেকার থাকার জন্য মানুষ ভয়ে ভয়ে বাঁচে ও ভয় হইতে ঘৃণার উদ্ভব হয়।

(৮)

The internal situation in Australia after the war will be dominated by the requirements of reconstruction. The absorption into civilian employment of men discharged from the services, and the transfer of many people now engaged in war occupations to civilian activities will be an immense task. It is clear that one of the conditions conducive to the successful solution of the post-war employment problem will be the continued maintenance of a high level of industrial activity. This implies that the reduction of industry to civilian production must be enlarged, when necessary, to absorb any surplus capacity left by declining war production. Some labour and materials will need to be allocated to undertake the necessary preparatory work, particularly in connection with housing and certain phases of manufacturing industry. In the immediate post-war period there will be no lack of effective demand for both goods and services. Plant and equipment have deteriorated, the supply of durable consumption goods in the hands of consumers will need to be replenished, the demand for housing will be urgent. The amount of purchasing power already available to the community, in the hands of institutions and individual consumers, is extremely high.

(C. U., B.Com., 1946).

যুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা পুনর্গঠনের প্রয়োজন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে। সেনাবাহিনী হইতে কর্মচ্যুত লোকদের অসামরিক চাকুরীতে নিয়োগ এবং বর্তমানে সমরসংক্রান্ত কার্যাদিতে নিযুক্ত বহুসংখ্যক লোককে অসামরিক কার্যাদিতে ফিরাইয়া আনা বিরাট ব্যাপার। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধোত্তর নিয়োগ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় অবিচ্ছিন্নভাবে ও উচ্চাহারে শিল্পাদি চালু রাখা। ইহার অর্থ, সমর-পণ্য উৎপাদন কমিবার ফলে যে সব লোকজন উদ্বৃত্ত হইবে, তাহাদিগকে প্রয়োজন

মত কাজ দিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অসামরিক পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অধিকতর সম্প্রসারিত করিতে হইবে। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাথমিক কার্যাদির জন্য, বিশেষ করিয়া পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য কতকগুলি কাজের জন্য কিছু শ্রমিক ও জিনিসপত্র নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। যুদ্ধ শেষ হইবার অল্পদিনের মধ্যে মালপত্র বা লোকজনের কার্যকরী চাহিদা কিছুমাত্র কমিবে না। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, পণ্য-ব্যবহারকারীদের হাতে দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যসমূহ পুনরায় পুরাইয়া দিতে হইবে, বাসগৃহের চাহিদা মিটাইতে বিলম্ব করা চলিবে না। সমাজের, অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানসমূহের ও ব্যক্তিগতভাবে পণ্যব্যবহারকারীদের হাতে ইতিমধ্যেই অত্যধিক পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা জমিয়া উঠিয়াছে।

---

(৯)

The main trends in the world production and distribution of gold noticed in 1943 continued during 1944. The production of gold which had been rising, particularly since 1934 partly as a result of the rise in its dollar value from $20·67 to $35 an ounce in February 1934 reached the peak of 41 million ounces in 1940 and stood at 40 million ounces in 1941; during the seven years 1934 to 1940 production had expanded by about 50 per cent. There has been a continuous decline in production during the three years ended 1944 owing mainly to the need to direct man-power and equipment from gold mines to the more pressing requirements of the War. The total world output declined by 10 per cent. in 1942, 17 per cent. in 1943 and 7 per cent. in 1944. Production in 1944 was lower than the record output of 1940 by about 32 per cent. the largest decline occurring in the United States where the output fell to as low a level as 20 per cent. of 1940. Production in South Africa showed a relatively small decline of about 14 per cent. compared with the country's record output in 1941. The estimated production of gold in India amounted to 1,87,918 ounces as compared with 2,52,228 ounces in the previous year. (C. U., B.Com., 1947).

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পরিলক্ষিত পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদন ও বন্টনের প্রধান প্রধান গতি (ঝোঁক) ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দেও বজায় ছিল। বিশেষ করিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বর্ণ উৎপাদনে যে বৃদ্ধি ঘটে, তাহার অন্যতম কারণ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বর্ণের ডলার-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি আউন্স ২০'৬৭ ডলারের স্থলে ৩৫ ডলার হইয়া যাওয়া। ইহা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪ কোটি ১০ লক্ষ আউন্সে উঠে এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৪ কোটি আউন্স দাঁড়ায়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সাত বৎসরে স্বর্ণ উৎপাদন শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রধানতঃ শ্রমিক ও যন্ত্রপাতি স্বর্ণের খনি হইতে যুদ্ধের প্রবলতর প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবার আবশ্যকতার জন্যই ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসর উৎপাদন ক্রমাগতই কমিতে থাকে। পৃথিবীর মোট স্বর্ণ উৎপাদন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ১০ ভাগ, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ১৭ ভাগ এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ৭ ভাগ হ্রাস পায়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের উৎপাদন তাহার তুলনায় শতকরা ৩২ ভাগ কম ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাধিক উৎপাদন হ্রাস ঘটে, এখানে উৎপাদন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত নামিয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপাদনে অবনতি অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে এবং এই দেশে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সর্বোচ্চ উৎপাদনের তুলনায় শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ উৎপাদন কমিয়াছে। ভারতবর্ষে আনুমানিক স্বর্ণ উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের ২,৫২,২২৮ আউন্সের তুলনায় ১,৮৭,৯১৮ আউন্স দাঁড়াইয়াছে।

(১০)

Unfortunately, we are accustomed in these days all over the world to budget-deficits, and familiarity breeds contempt in spite of the fact that more than one awful example is before us among the nations of Europe of the chaos which continued budget-deficits inevitably induce. The inidvidual who lives beyond his income year by year does not escape the penalty and the same is true of a State. The individual who makes this mistake quickly finds himself compelled to a ruthless cutting down of his expenditure or is driven either to sell or mortgage a part or the whole of his possessions: or, in the worst event,

to cheat his creditors. A State is in the same position but the position is frequently obscured by the fact that the State's creditors are in another capacity the citizens of the State and its tax-payers. (C.U., B.Com., 1948).

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আজকাল পৃথিবীব্যাপী বাজেট (আয়-ব্যয় বরাদ্দ) ঘাটতিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে অবিরাম বাজেট ঘাটতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বিশৃঙ্খলার একাধিক আতঙ্কজনক দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও অত্যধিক পরিচিতির জন্য ব্যাপারটা তাচ্ছিল্য করিতেছি। কোন লোক যদি বছরের পর বছর তাহার আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে থাকে, তজ্জন্য দুঃখ তাহাকে পাইতেই হয়। একথা রাষ্ট্রের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ব্যক্তিবিশেষ এই ভুল করিলে অল্পকালের মধ্যে তাহাকে নির্মমভাবে ব্যয়সঙ্কোচে বাধ্য হইতে বা তাহার সম্পত্তির একাংশ বা সবটা বিক্রয় করিতে কিম্বা বন্ধক দিতে হয়। আর সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থায় তাহাকে পাওনাদারদের করিতে হয় প্রবঞ্চনা। রাষ্ট্রের অবস্থাও একইরূপ, তবে রাষ্ট্রের পাওনাদারগণই অন্য হিসাবে রাষ্ট্রের নাগরিক এবং ইহার করদাতা হওয়ায় এই অবস্থা প্রায়ই অস্পষ্ট থাকিয়া যায়।

(১১)

The general attitude towards abolition of the zamindari system in India seems somewhat more cautious than a year ago. In an inflationary period it is important to preserve sources of revenue, especially when, as now, provinces are finding it difficult to reduce expenditure, are for some purposes having to increase it and have been warned by the Centre not to weaken its borrowing powers. These are not the only practical difficulties. Moreover, at least as important as abolition itself is a policy to be adopted after it. On this the Agrarian Reforms Committee has yet to report, and it may be held that the merits of provincial legislation cannot be properly judged until what is to replace zamindari has been broadly settled.

(C.U., B Com., 1949).

এক বৎসর আগের তুলনায় ভারতে জমিদারী প্রথা বিলোপ সম্পর্কে সাধারণ মনোভাব কিছুটা বেশী সতর্ক বলিয়া বোধ হইতেছে। মুদ্রাস্ফীতির যুগে, বিশেষ

করিয়া বর্তমানের মত যখন প্রদেশগুলিকে ব্যয়সঙ্কোচে অসুবিধা বোধ করিতে হইতেছে ও কতকগুলি কারণে ব্যয় বাড়াইতে হইতেছে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যখন তাহাদের ঋণসংগ্রহ ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না করিবার জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছেন, তখন রাজস্বের উৎসসমূহ রক্ষা করাই দরকার। আসল অসুবিধার এখানেই শেষ নয়। এছাড়া বিলোপের পর কি নীতি গ্রহণ করা হইবে, তাহাও অন্ততঃ জমিদারী প্রথা বিলোপের সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে ভূমি-সংস্কার কমিটি এখনও রিপোর্ট দেন নাই এবং বলা যাইতে পারে যে, জমিদারী প্রথার পরিবর্তে কোন ব্যবস্থা চালু হইবে তাহা মোটামুটি স্থিরীকৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক আইনের গুণাগুণ যথোচিতভাবে নির্ণয় করা যাইবে না।

(১২)

With the war an era of industrial expansion dawned upon the country. The lessons taught by the war brought about a remarkable change in the industrial position of the country as also in the outlook of the businessman as compared with those of 1913. Government experienced a great shortage of materials required for munitions and the industries were handicapped on account of interruptions in the supply of machinery and stores. The Munition Board was started with the object of applying manufacturing resources of India to war purposes. But the industrial boom was shortlived. (C.U., B.Com., 1950).

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক শিল্পপ্রসারের যুগ সুরু হইয়াছিল। যুদ্ধের শিক্ষা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় দেশের শিল্প পরিস্থিতিতে এবং ব্যবসাদারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনিয়াছিল। সরকার সমরসরঞ্জাম তৈয়ারীর মালমসলার প্রচণ্ড অভাব অনুভব করেন এবং যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্রের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় শিল্পসমূহ অসুবিধায় পড়ে। ভারতে শিল্পপণ্যাদি যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে "সমর-সম্ভার সংসদ" (মিউনিশন বোর্ড) গঠিত হয়। কিন্তু এই শিল্প-প্রগতি অল্পস্থায়ী হইয়াছিল।*

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম. পরীক্ষার ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রশ্নগুলি 'অনুশীলনী' অংশের শেষে পাওয়া যাইবে।

অনুশীলনী

(EXERCISES)

(১)

Divorce between intelligence and labour has resulted in criminal negligence of the villages. And so, instead of having graceful hamlets dotting the land, we have dung-heaps. The approach to many villages is not a refreshing experience. Often one would like to shut one's eyes and stuff one's nose; such is the surrounding dirt and offending smell. If the majority of Congressmen were derived from our villages, as they should be, they should be able to make our villages models of cleanliness in every sense of the word. But they have never considered it their duty to identify themselves with the villagers in their daily lives. A sense of national or social sanitation is not a virtue among us. (Mahatma Gandhi—Constructive Programme).

[**Hints :—Divorce—বিচ্ছেদ ; Social sanitation—সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা।**]

---

(২)

The decisive difference between India and the European countries is not in the rate of growth of population, which has been more rapid in the European countries. What makes the difference between the conditions of India and Europe is that the economic development and expansion of production which have taken place in the European countries, and have facilitated a more rapid growth of population, have not taken place in India, and have, as we shall see, been artificially arrested by the workings and requirements of British capitalism, driving an increasing proportion of the population into a dependence on primitive and overburdened agriculture. (R. Palme Dutt—India To-day).

[**Hints :—Artificially arrested—কৃত্রিমভাবে প্রতিরুদ্ধ ; Capitalism—পুঁজিবাদ।**]

---

(৩)

So far as I know, there is not in history record of anything so disgraceful to the human intellect as the modern idea that the commercial text 'buy in the cheapest market and sell in the dearest', represents, or under any circumstances could represent, an available principle of national economy. Buy in the cheapest market?—yes; but what made your market cheap? Charcoal may be cheap among your roof timbers after a fire, and bricks may be cheap in your streets after an earthquake; but fire and earthquake may not, therefore, be national profits. Sell in the dearest?—Yes, truly; but what made your market dear? You sold your bread well to-day: Was it to a dying man who gave his last coin for it and will never need bread more? (Ruskin—Unto This Last).

[Hints :—Commercial text—ব্যবসায়িক মূলসূত্র ; National economy—জাতীয় অর্থব্যবস্থা ।]

(৪)

With reference to the purposes for which public debts are contracted, we have found that loans for temporary deficits are desirable and economical. Loans for emergencies have better economic effects than heavy taxation, because they cause less disturbance in the business relations of the people and because they encourage production much more than do heavy taxes. We have emphasised the fact, however, that resort to loans alone is dangerous because the credit of the Government would thereby be destroyed or, at least greatly impaired. Loans for public investments are advantageous, first, because the undertaking in question can be carried on uninterruptedly, while, at the same time, the business relations of the people are not disturbed; and second, because the revenues derived from the investments could repay or support the expenditures. (Shutaro Matsushita—The Economic Effects of Public Debts).

[Hint :—Public debts—সরকারী ঋণ ।]

(৫)

In the textile, jute and sugar industries. India has registered impressive progress. The textile trade has a pre-eminent position in the country and is the one big industry mainly controlled by Indians. India has long excelled in the manufacture of textiles. Many people forget that until 1787 this country was exporting manufactured cotton goods to France, Britain and Holland. Indian silks and muslins were world famous, and it was the proud boast of the Dacca weavers that the muslin they produced was so delicate that a strip a yard wide could pass through a wedding ring. Robert Clive in the year of Plassey (1757) described the city of Murshidabad in Bengal as equal in extent, population and richness to London. India had a flourishing handicraft trade when the British first established themselves here, and for a time the country's cottage crafts competed with the new machine industry of Britain. (Moraes and Stimson—Introduction to India).

[Hint :—Handicraft trade—হস্তনির্মিত (হস্তশিল্প) পণ্যের ব্যবসা ।]

(৬)

The general trend in the Near East is towards industrialisation. This will go parallel with the improvement and rationalisation of often outdated agricultural methods. With the equipment of the new industries, the technical assistance rendered in the execution of Public Works and the supply of agricultural machinery, the great industrial exporting countries may assist the Near East in achieving a higher standard of living and thereby securing a market which, ultimately, will be different from that of the past based mainly on consumer goods. The process of transition could be assisted, to the advantage of both sides, with suitable technical assistance in the form of education and personnel. The ultimate result will be a transformation of trade with the Near East, specialising on the more profitable, higher-class capital goods. By an intelligent and sympathetic adaptation to this process of transformation suppliers of the Near East can support the healthy economic and social development of the entire region, thereby serving

reciprocal interests and diminishing the dangers inherent in a strategically and economically important, but perpetually depressed area. (Mark Abrahams—Britain and Her Export Trade).

[**Hints** :—Rationalisation—সংস্কার ; Transformation—রূপান্তর ; Reciprocal interests—পারস্পরিক স্বার্থ ।]

---

(৭)

The depression in Europe following the French wars, after 1815, gave a new impetus to emigration. Moreover, after the American War of 1812 it seemed desirable to people Canada with soliders and Englishmen who could defend it against annexation. There was the usual problem of disbanding the army after 1816 and the idea grew up of settling the ex-soldiers along a route leading from the Ottawa to Kingston, which would avoid the St. Lawrence and so give an alternative route of communication in case of further war with the United States. The Rideau Canal was projected, the Ottawa River was to be improved and soldiers and loyal persons settled along the banks. Emigrants from Scotland were brought in, and, having started in May, were landed at Quebec in September, which shows the time sometimes taken on the voyage. They settled at Perth and to them came the disbanded soldiers of the Glengarry Fencible Regiment and others from Scotland and Ulster. The military authorities granted them rations, clothes and tools. Each settler had a hundred acres and had to clear part of it and live on it to obtain the title. Here again rations and settlement were organised by officers. (L. Knowles and C. Knowles —Economic Development of the British Overseas Empire).

[**Hint** :—Emigrants—স্বদেশত্যাগী ।]

---

(৮)

But if the Nile takes all its water from the lakes, that does not explain what feeds the lakes. And if the lakes are fed less by rivers than by rain, that still does not explain where the rain comes from. These questions are still unsettled. At

present the rain of the Nile basin is believed to come mainly from the South Atlantic. Evaporation and condensation caused by the tension between sea and land remains even on the whole, but not in the detail. Thus over this basin there goes on the tug-of-war of evaporation, the formation of rivers and their departure for the sea. In this cycle, which holds a third of the rainfall of the earth captive, the depth of the basin plays an important part. As Lake Victoria is not three hundred feet deep, so that more water evaporates than is received, this constant diminution, as we shall see later, presents the Nile engineers with a very grave problem. In accordance with its configuration, the lake, as the source of the Nile, has a climate, and even a wind system of its own. The alternation of land and sea winds, the frequency of thunderstorms, the high temperature of the water, which reaches nearly 79°, the absence of dry months, and the evaporation from the gigantic surface are the basic factors of its climate. (Emil Ludwig—The Nile).

[Hints :—Evaporation and condensation—বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন ; Configuration—গঠনপ্রণালী ।]

(৯)

Throughout the entire northern region the countryside is subordinated to the seaports. The first settlement of Brazil was along the eastern part of this coast, and much of the colonial character remains. Here arose the great plantations, which, for three centuries, made enormous profits for their owners from export trade in sugar, tobacco, cocoa beans, and cotton. Their agricultural system was founded upon slavery, their trade upon the exportation of tropical products grown by slaves and upon the importation of more slaves and of luxury goods bought with their profits. Each plantation usually produced the commodities used by its own slaves, so that, except for a traffic in meat and leather, there was very little domestic trade in food or in handicraft products. The export trade consisted in the scale of a succession of tropical products under boom conditions and without substantial competition from other areas. Each product became the basis of prosperity until other

tropical areas invaded the market and brought about a collapse of Brazil's monopoly, whereupon the Brazilian plantations turned to new products. (Morris Llewellyn Cooke—Brazil on the March)

[**Hints :—Handicraft .products—হস্তশিল্প পণ্য ; Collapse of monopoly—একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান।**]

(১০)

The constitution of these ancient communities varies in different parts of India. In those of the simplest form, the land is tilled in common, and the produce divided among the members. At the same time spinning and weaving are carried on in each family as subsidiary industries. Side by side with the masses thus occupied with one and the same work, we find the 'chief inhabitant' who is judge, police and tax-gatherer in one: the book-keeper who keeps the accounts of the tillage and registers everything relating thereto; another official, who prosecutes criminals, protects strangers travelling through, and escorts them to the next village: the boundary man, who guards the boundaries against neighbouring communities; the water-overseer, who distributes the water from the common tanks for irrigation . . . This dozen of individuals is maintained at the expense of the whole community. (Karl Marx—Capital).

[**Hints :—Constitution—নিয়মতন্ত্র (গঠনরীতি); Book-keeper—হিসাবরক্ষক ; Overseer—তত্ত্বাবধায়ক।**]

(১১)

It is stupid to say "wait until the war is won." Any sensible man who fights, fights to win; that goes without saying. And he has an Aim. A man who fights to win without any Aim before him, can find a readier relief for his pugnacity than the laborious restraints, discomforts and uncertainties of modern warfare. Most modern men have no set craving for fighting, and they are asking now with an increasing querulousness why their private lives are being disorganised and why

they are being dragged, pushed, extorted, compelled into a vast war effort, with no assurance whatever that any worth-while results at all are to come out of it.' (H. G. Wells—The Rights of Man).

[Hints :—Pugnacity—যুদ্ধপ্রিয়তা ; Querulousness—বিরক্তি ।]

(১২)

Most Indian cities can be divided into two parts; the densely crowded city proper, and the widespread area with bungalows and cottages, each with fairly extensive compound or garden, usually referred to by the English as the 'Civil Lines'. It is in these Civil Lines that the English officials and businessmen as well as many upper middle class Indians, professional men, officials, etc., live. The income of the municipality from the city proper is greater than that from the Civil Lines, but the expenditure on the latter far exceeds the city expenditure. For, the far wider area covered by the Civil Lines requires more roads, and they have to be repaired, cleaned up, watered and lighted; and the drainage, the water-supply and the sanitation system have to be more widespread. The City part is always grossly neglected, and, of course, the poorer parts of the city are almost ignored. (Pandit Jawaharlal Nehru—Autobiography).

[Hints :—Densely crowded—অত্যধিক জনাকীর্ণ ; Officials—উচ্চপদস্থ কর্মচারী ; Professional men—ব্যবসায়ী ।]

(১৩).

Of what use is it that scientists should devise means of making human labour more productive, if the result is to be that the increase of productive power becomes a positive cause of unemployment and distress. Of what use is it to devise means for the lightening of labour, if these means will only throw more and more people out of work and income? And what are we to say of a world in which a farmer, when he sows his crop, has to pray for a bad harvest in order to rescue him from financial difficulties? We live in an old world and no

mistake. (Prof. Cole—The Intelligent Man's Guide through World Chaos).

[Hint :—Productive power—উৎপাদিকা শক্তি ।]

(১৪)

It is the failure to recognize this fact that has led some persons to assume that a country with a large population affords a great market. But numbers of persons do not make a market. The human resource is something more than a count of people. It involves their capacity for production, and this in turn depends upon a number of human qualities as well as the type of equipment with which they work, and the system of economic organization under which they exist. The Far East, as we have indicated on a former occasion, is the most populous section of the world, but it ranks far below Europe as a market for imported articles. On our side of the globe, the consuming power in Latin America has risen to large proportions only in recent years with the improvement of systems of production which has made possible larger returns for labour and invested capital. (Issac Lippincott—The Development of Modern World Trade).

[Hints :—Populous section—জনবহুল অঞ্চল ; Consuming power—পণ্যব্যবহারের ক্ষমতা ; Returns—আয় ।]

(১৫)

The statement has often been made that currencies divorced from gold have always come to grief in the past and suffered damaging depreciation through excessive over-issue. Spectacular instances of unrestrained inflation, especially during post-war years, are usually cited as evidence. But the fallacy of the notion that free standards must necessarily get out of control can easily be exposed. It is supported by neither English nor American experience. During the periods when England has been off gold, from 1797 to 1821, from 1914 to 1925, and again since 1931, 38 years in all out of 138, the paper currency was

never abused by inflationary war. (Arthur D. Gayer—Monetary Policy and Economic Stabilisation).

[Hints :—Unrestrained inflation—অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি; Free standards—অবাধ মুদ্রামান; Off gold—স্বর্ণসম্পর্কহীন।]

(১৬)

We now know that the development of the forces of production (which for its part, in the last resort, determines the development of all social relations) itself primarily depends upon the peculiarities of the geographical environment. But as soon as specific social relations have come into existence, they, in their turn, exercise a marked influence upon the development of the forces of production. Hence that which primarily was a consequence, becomes in its turn a cause; between the evolution of the forces of production, on the one hand, and the social regime, on the other, there occurs a play of action and reaction which assumes, at various epochs, the most divergent forms. (G. Plekhanov—Fundamental Problems of Marxism.)

[Hints :—Geographical environment—ভৌগোলিক পরিবেশ; Evolution—ক্রমবিকাশ।]

(১৭)

The law (Neutrality Act of 1939) passed on Nov. 4, 1939, in U.S.A. which stipulated that as soon as the President has issued a proclamation describing certain countries as belligerent, American arms, ammunition, implements of war and other materials may be sold to such countries only on a cash-and-carry basis. Transports cannot leave before any right or title therein has been transferred to a foreign Government or person. It is forbidden for any person in the U.S.A. to buy bonds or other obligations of a belligerent Government, issued after the outbreak of war, or to extend any credits to such Governments, with the exception of certain commercial credits of a character customarily used in peacetime. American ships were forbidden to carry supplies to belligerents, the latter must fetch the goods

themselves. American ships were also forbidden to enter combat zones. (N. C. Tandon—Political Dictionary).

[Hints :—Neutrality Act—নিরপেক্ষতা আইন; Belligerent—যুধ্যমান; Cash-and-carry—নগদ মূল্যে সংগ্রহ; Commercial credits—ব্যবসাসংক্রান্ত ঋণ; Combat zones—যুদ্ধের এলাকা।]

(১৮)

The Committee is of opinion that no new factory should be allowed to be established and no existing factory should be allowed to be extended or to change control without the previous permission in writing of the Provincial Government. In granting such permission the Provincial Government should take into consideration such factors as desirability of location of industries in a well distributed manner over the entire province, prevention of monopolies, discouragement of the establishment of uneconomic units, avoidance of over-production and general economic interest of the province and the country. The various Provincial Governments should secure for themselves requisite powers for the purpose, if necessary, by undertaking suitable legislation. (Handbook of the National Planning Committee).

[Hints :—Monopoly—একচেটিয়া অধিকার; Uneconomic unit—অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।]

(১৯)

Though it is impossible to foresee future decisions, it is possible to see present tendencies and trends. The last chapter revealed a very definite trend of opinion and action from the Ottawa Agreements of 1932 to the trade treaties of 1938. During these six years, the ideal of imperial self-sufficiency was tried and found wanting. The sheltered markets of the British Empire failed to shelter many important sections of the British Empire's productions. At the close of the period, Great Britain and the Dominions deliberately surrendered some of the narrower advantages of imperial preference in order to

join with the United States in a new drive for wider economic expansion. This revision of policy was not the product of abstract doctrine; it emerged gradually and emphatically from the struggle of interests and the teaching of experience. (Hancock—Empire in the Changing World).

[Hints :—Imperial self-sufficiency—সাম্রাজ্যিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা; Imperial preference—সাম্রাজ্যিক সুবিধা।]

(২০)

The reference to industrial expansion in India behind a protective tariff with some consequent reduction of foreign trade naturally brings us to a consideration of certain vital questions. What is the proper place of foreign trade in the national economy of India? Where is a compromise to be effected between a policy of finding wider markets for Indian exports abroad and industrial expansion at home? How is the industrial development likely to affect the volume of foreign trade and the degree of economic touch with the outside world? To what extent is the volume of international trade a measure of the aggregate economic prosperity of this country? Wherein consists the special urgency of fostering the industrial development of a country like India? No review of foreign trade, however brief, can be fruitful without a reference to these fundamental aspects.

[Hints :—Protective tariff—সংরক্ষণ শুল্ক; Economic touch—অর্থনৈতিক সম্পর্ক।]

---

(২১)

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are established among men, deriving their just powers from the consent of the Governed. That whenever any form of Government becomes destructive to these ends, it is

the Right of the people to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organising its powers in such forms, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. (The Declaration of Independence of U.S.A , 1776).

[**Hint :—Self-evident**—স্বতঃসিদ্ধ ; **Unalienable Rights**—অবিচ্ছেদ্য অধিকার।]

(২২)

From morning till night work goes on in the Institute. Thousands of engineers calculate, draw, then calculate again. Here are builders of houses and builders of ships, experts in coal and experts on steel, mining engineers, river engineers, æronautic engineers. Last year they prepared estimates for 107 factories; this year they are working on 170 factories. And these are not small enterprises. There are giants among them. For the workers of each of these giants, not villages but cities with thousands of houses and tens of streets will have to be built. Nine of the largest factories will produce iron. There are only nine, but they will produce more iron than all the old factories put together. There are seven somewhat smaller factories. They will build, tractors, motor cars, trucks, harvesters, turbines, electric motors.

(M.Ilin—Moscow has a Plan).

[**Hints :—Aearonautic**—বিমানবিদ্যাসংক্রান্ত ; **Harvesters**—শস্যচ্ছেদন যন্ত্র ; **Turbines**—শয়ানচক্র (নদীপ্রবাহের জলের পতনজনিত চাপ দ্বারা চালিত জলচক্র ।]

---

(২৩)

In every industry, in every factory, in every department of a factory, there is a leading group of more or less skilled

workers who must first of all, and particularly, be retained in industry if we really want to secure for the factories a permanent personnel. These leading groups of workers are the chief link in production. By retaining them in the factory, in the department, we can retain the whole personnel and put an end to the heavy turnover of labour power. But how can we retain them in the factories? We can retain them only by promoting them to higher positions, by raising the level of their wages, by introducing a system of payment that will give the worker his due according to his qualification. And what does promoting them to higher positions and raising their wage level imply? It implies, apart from everything else, opening up prospects for the unskilled worker and giving him a stimulus to rise higher, to rise to the category of a skilled worker. (J. Stalin—Problems of Leninism).

[Hints :—Permanent personnel—স্থায়ী কর্ম্মিমণ্ডলী ; Turnover—স্থান পরিবর্ত্তন ।]

(২৪)

Objections to this bank have been raised by some bankers and a few economists. The institutions proposed by the Bretton Woods conference would indeed limit the control which certain private bankers have in the past exercised over international finance. It would by no means restrict the investment sphere in which bankers could engage. On the contrary it would greatly expand the sphere by enlarging the volume of international investment and would act as an enormously effective stabilizer and guarantor of loans which they might make. The chief purpose of the Bank for International Reconstruction and Development is to guarantee private loans made through the usual investment channels. It would make loans only when these could not be floated through the normal channels at reasonable rates. The effect would be to provide capital for those who need it at lower interest rates than in the past and to drive only the usurious money lenders from the temple of international finance. (Henry Morgenthau, Secretary of the Treasury, U.S.A., at the Bretton Woods Conference, July, 1944).

[**Hints :—International finance—আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা ; Stabilising—সামঞ্জস্যকারী ; Investment channel—অর্থ বিনিয়োগের উপায় ।**]

---

(২৫)

The objective of the community development movement is to assist the people living in India's villages in their efforts to bring about a substantial improvement in their social, economic and cultural conditions. In a democratic country, these efforts should be based on the widest possible application of the cooperative principle. The foundation for this should be in the village community—all families united in a Co-operative should undertake, through their own efforts and, as free and equal partners, the programmes of improvement they have appeared of themselves. The values aimed at are human—to enthuse men and women "with a sense of both individual and joint responsibility, so that they may rise individually to a full personal life and collectively to a full social life." Co-operation is thus inextricably linked up with community development. (V. T. Krisnamachari. AICC Economic Review, January, 9, 1959).

[**Hint :—Community Development Movement—সমাজ উন্নয়ন আন্দোলন ।**]

(২৬)

During the war years our foreign trade has been determined by many extraneous circumstances. In the first place, the shortage of transport facilities has reduced the volume of our exports as well as imports. In the early period of the war, ships had to go round the Cape of Good Hope and this longer journey increased the cost. Moreover, a large number of vessels were commandeered for war work and, therefore, the shipping space available for private trade was greatly reduced. As the war progressed, more ships were built and with the fall of Italy in 1943 the Mediterranean was also restored to allied traffic but even then the shortage of transport continued. Secondly, the Government of India, like Governments in other

countries, was compelled to impose restrictions both on exports and imports. (P. C. Jain—Industrial Problems of India).

[**Hints :—Extraneous—বহিরঙ্গ ; Transport facilities—যানবাহনের সুবিধা ; Restrictions—বিধিনিষেধ ।**]

---

(২৭)

The object of planned economy for India is neither economic autarky and national aggression, as sought in the Fascist countries, nor economic imperialism based on the power and prosperity of a small capitalistic and directive class, as in the democratic countries, nor again, a bare materialistic and regimented culture as in Soviet Russia The ideology behind economic planning in India is the broadening of the economic base of a peaceful agricultural civilisation for the purpose of national self-defence, on the one hand, and the full and free expression of her ancient moral and social virtues in the changed economic world, on the other. (Dr. Radhakamal Mukherji—Economic Problems of Modern India).

[**Hints :—Planned economy—নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা ; Economic autarky—অর্থনৈতিক স্বৈরতন্ত্র ; Materialistic and regimented culture—বস্তুতান্ত্রিক ও প্রণালীবদ্ধ সংস্কৃতি ।**]

(২৮)

The Congress has stood for equal rights and opportunities for every citizen of India, man or woman. It has stood for the unity of all communities and religious group and for tolerance and goodwill between them. It has stood for full opportunities for the people as a whole to grow and develop according to their own wishes and genius; it has also stood for the freedom of each group and territorial area within the nation to develop its own life and culture within the larger framework, and it has stated that for this purpose such territorial areas or provinces should be constituted, as far as possible, on a linguistic and cultural basis. It has stood for the rights of all those who suffer from social tyranny and injustice and for the removal for them of all barriers to equality. (Congress Election Programme of 1946).

[**Hints :—Terriorial area—**সীমাবদ্ধ অঞ্চল (রাষ্ট্রের); **Linguistic and cultural—**ভাষাগত ও কৃষ্টিগত ; **Social tyranny—** সামাজিক উৎপীড়ন ; **Barriers to equality—**সাম্যের পথে অন্তরায়।]

(২৯)

Returning to the public property and enterprises as a source of public income, we may repeat that such income is of two kinds, first, the equivalent of taxation, where a public authority deliberately changes monopoly prices for its services and, second, the equivalents of profits from ordinary competitive prices, such as a private proprietor or business firm might charge, under competitive conditions, for the use of property or the supply of services. A large public income of the second kind is easily obtainable, without any serious risk of economic loss to the community, by public authorities which retain the ownership of minerals and other natural resources and, subject, if necessary, to long private leases of land, both agricultural and urban. If such obvious opportunities, not to speak of others which are more debatable, had been taken in the past, modern communities would be able both to spend more freely on desirable public objects, and to escape part of their present heavy burden of taxation. (Dr. Hugh Dalton, Principles of Public Finance).

[**Hints :—Public income—**সরকারী আয় ; **Natural resources—**প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ।]

---

(৩০)

The Indian Industrial Commission which reported in 1918, formulated a comprehensive scheme for State Co-operation in industrial advance. In this scheme a large and, indeed, vital part was to be played by the Central Government. But before the scheme could be put into operation, the transfer to Provincial Ministers in 1920 of responsibility or the development brought about a situation which the Commission had not envisaged and which rendered it impracticable to proceed with substantial parts of it. While the constitutional reforms were

under consideration, the Government of India urged strongly that the Centre should not be divested of powers in the manner proposed by the Montague-Chelmsford Report. (C. U., B.Com., 1939).

[**Hint :—Constitutional reforms—শাসনসংস্কার।**]

(৩১)

The Government of Bengal accept the proposals contained in paragraph 17 of the Niemeyer Report in regard to the assistance to be given to certain provinces on the introduction of provincial autonomy. They regard the proposals as in the nature of an award given after a determination of the amount immediately available for distribution among the provinces and after an examination of the budgetary position of the several claimants to that amount. Looked at in this light they cannot but accept them as fair and reasonable, though they are deeply disappointed that the immediate assistance to be given to Bengal falls far short of their original expectation. (C. U., B.Com., 1940).

[**Hint .—Provincial autonomy—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।**]

(৩২)

Despite the trade recession, the Central Government have succeeded, by means of economies in administration and the postponement or abandonment of schemes involving heavy new expenditure, in presenting a series of balanced budgets. In consequence, the credit of the Government was well maintained and it was able to meet its commitments towards the Provincial Governments under the Niemeyer Award. In 1937-38, the first year of provincial autonomy, it was able to distribute Rs. 1¼ crores to the Provinces as their share of income-tax in addition to the various aids and subventions and this amount was increased to Rs. 1·50 crores in 1938-39. (C. U., B.Com., 1940).

[**Hint :—Trade recession—বাণিজ্য-মন্দা।**]

---

(৩৩)

No less than £426,021 was remitted to the United Kingdom in the seven months from April to October, 1940, in consequence of the British war savings movement. Magnificent though the total is—and it consists as to 90% of remittances from Europeans—it is not sufficient. It is often forgotten that in this great country with a population exceeding 350 millions, the European community is less than one-seventieth of 1%, say 50,000 persons. Thus from April to October, 1940, the total remitted represents a little over £8 per head of the European population or about £1-3-0 per month per head, a figure which falls far short of the community's real saving capacity. (C. U., B.Com., 1941).

[**Hint :—British war savings movement—ব্রিটিশ সমর সঞ্চয় আন্দোলন।**]

(৩৪)

Vagaries in the rain supply have done much damage to Bengal's winter rice crop. A return issued by the Director of Agriculture summarizes the situation. Seven districts only had favourable or fairly favourable weather. Twenty-two show a harvest below the previous year's. Howrah alone whose percentage of the normal yield was 42 in the previous year shows a 100% return. It was the prolonged drought that did the harm and reduced the average out-turn throughout the province to an estimate of 72% of the normal as against the 88% of the preceding year. The area under winter rice showed a drop of about 9% and the out-turn, a drop of nearly a third. The crop gives Bengal some 1,60,000 tons less to eat than it had a year ago. (C. U., B.Com., 1941).

[**Hints :—Normal yield—স্বাভাবিক ফলন ; Prolonged drought—দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি।**]

(৩৫)

The health of the community is of utmost importance everywhere and Corporations have to supervise all services affecting the health of the public at large. Under the direc-

tion of the Ministry of Health, a large staff of sanitary inspectors, inspectors of nuisances, and medical officers, safeguard the public health as far as they can by seeing that proper drainage is maintained, that no food unfit for consumption is sold, and that all infectious diseases are notified to the Medical Officer of Health. Persons suffering from infectious diseases are immediately isolated, and their homes are disinfected to prevent the spread of the disease. Children are periodically examined while in attendance at school, and where necessary, free medical and dental treatment is given at clinics specially provided for the purpose. (C. U., B.Com., 1942).

[**Hint :—Infectious diseases—সংক্রামক রোগসমূহ ।**]

(৩৬)

At various times in modern history the horror and destructiveness of war have caused thinking men to point the way to peace. During the Thirty Years War which destroyed the earlier Germany, Grotius had in a great book (1625) laid the basis of international law. Others at different times and after other great wars made pleas for 'perpetual peace'. After the bitter struggles for national freedom in the nineteenth century, meetings were held at the Hague (1899, 1907) to discuss the peaceful solution of national quarrels by arbitration in order to bring about the reign of law between nations, as it had, after centuries of trials, been brought about between individual citizens. Yet the World War came and it wasted untold wealth and lives. No wonder that statesmen and others once again turned to schemes of peace in the hope of winning mankind against war. The outcome of the intense desire to end war was that the Covenant of the League of Nations became part of the Treaty of Versailles (1919) which ended the Great War. (C. U., B.Com., 1942).

[**Hint :—Arbritration—সালিশী ।**]

(৩৭)

The capital of a joint-stock company is owned by a large number of shareholders by whom the management is made

over to a Board of Directors and paid officers. The step is short but very important, and it often alters the whole character of the business. Most of the shareholders have, probably, no knowledge whatever of the difficulties and needs of the enterprise; they have invested in it because somebody told them that it was a good thing, or have inherited shares in it, and never troubled to enquire whether it was, or was not judicious to keep them. Some of the Directors are, perhaps, equally ignorant, but most Boards contain a leaven of knowledge and understanding, and their real business is generally done by a small minority, who save the rest from the consequences of their inexperience. (C.U., B.Com., 1943 & 1950).

[**Hint :—Leaven of knowledge and understanding—** বিচক্ষণ ও বিবেচক প্রভাবশালীদের দল (বিচক্ষণতা ও বিবেচনার সক্রিয় প্রভাব) ।]

(৩৮)

All Governments have three branches: The *Legislative*, which makes laws, the *Executive*, which carries out the laws. and the *Judicial*, which punishes those who break the laws. In Britain, these branches are represented as follows: the Legislative by Parliament, the Executive by the Cabinet, and the Judicial by the King's Courts and Justices. In theory, the laws are made by the King on the advice of Parliament, but actually laws are made by Parliament alone. Parliament sits in two Houses: the House of Lords, the members of which sit by hereditary right and the House of Commons whose members are elected by the votes of the people. The House of Commons is by far the more important of the two. (C. U., B.Com., 1943).

[**Hints :—Executive**—শাসনবিভাগ; **Judicial**—বিচারবিভাগ ।]

(৩৯)

The Mysore Durbar set up the first central hydro-electric installation in India on the Cauvery river at Sivasamudram in 1903. Beginning with 4,000 horse-power, the central generating station has been gradually enlarged till at the present time its capacity is about 18,000 horse-power, the major portion of

which is transmitted at 70,000 volts over a distance of 90 miles to the Kolar gold fields. The irregular flow of the Cauvery has been overcome by the construction of a dam across the river at Kannambadi near Seringapatam, which stores sufficient water to maintain a minimum flow of 900 cubic feet per second. The Kashmir Durbar subsequently established a hydroelectric station on the Jhelum river near Shrinagar, but in this instance, the anticipated demand for power has as yet been partly realised. In Western India, attention was drawn to the potentialities existing in the heavy rainfall on the country fringing the Ghats and the facilities offered for the construction of hydro-electric installations by the very steep drop to the plains. (C. U., B.Com., 1944).

[**Hint :—Hydro-electric station—জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র।**]

(৪০)

The cement industry continued to make steady progress during the year under review. The agreement between the Associated Cement Companies and the Dalmia group referred to in the last issue of this Review functioned satisfactorily during 1941-42 also. Although internal competition was thus not entirely eliminated, the combined organisation was well equipped to hold its own. There was increased international demand for cement due mainly to enhanced military and industrial requirements chiefly for war purposes. Despatches against internal demand were also very satisfactory and would have been even greater but for the shortage of railway wagons which presented a serious problem to the industry. Export demand was also on the increase though it was conditioned by the limitation of freight space. (Review of the Trade of India in 1941-42). (C. U., B.Com., 1944).

[**Hint :—Freight space—পণ্যবাহী জাহাজে জায়গা।**]

(৪১)

The Reserve Bank of India was established on the 1st April, 1935, in accordance with the provisions of the Reserve

Bank of India Act, 1934. Although sporadic suggestions had, from time to time, been put forward previously that some sort of central bank should be established for India, they did not assume definite shape until 1926 when the Royal Commission on Indian Currency and Finance (1925) recommended that India should perfect her currency and credit organisation by setting up a central bank with a charter framed on lines which experience had proved to be sound. A bill giving effect to the recommendation was introduced in the Legislative Assembly by Sir Basil Blackett, the then Finance Member of the Government of India, on the 25th January, 1927. It passed through several stages but was ultimately dropped for constitutional reasons. A fresh bill introduced by Sir George Schuster on the 8th September, 1933 was enacted in due course and received the assent of the Governor-General on the 6th March, 1934. (C. U., B.Com., 1945).

[**Hints :—Charter—সনদ ; Constitutional reason—নিয়মতান্ত্রিক কারণ।**]

---

(৪২)

In village India this is time of expectancy. Will the monsoon keep its appointment on the normal date? Will it bring plentiful rain properly spread over the season? How will rivers behave? These are questions momentous for the countryside and any one gifted with the eye of imagination can see thirsty fields watching the heavens for the answer. The last fortnight before monsoon is a testing time for living creatures. The ploughman goes more slowly to the field, the village artificer prolongs his mid-day rest taken on the floor of his place of work or under a V-shaped roof of straw. Tanks have dwindled, well give water reluctantly, crops look pitifully at their possessors, and there is in village lanes a fiercer glare from the sunshine and a heat that strikes harder, while sounds, even birds' songs seem harshly metallic. It is not the nicest time of the year, but it holds the promise of a cooler season. (C. U., B.Com., 1945).

[**Hint :—Monsoon—বর্ষা।**]

---

(৪৩)

Even in peace-time the State plays an extremely important part in modern industrial life. By its laws it maintains that security of life and fulfilment of contract without which no business could be undertaken. Most modern states educate their citizens providing free elementary schools and subsidizing higher education. Insurance schemes and public assistance preserve the sick, old and unemployed from absolute starvation and thus assist in maintaining markets for goods and keep in existence, if not full health and vigour, a reserve of labour. By legislation or by the influence of the scale of wages paid by the State a minimum standard of living is secured for workers. Factory laws, currency regulations, exchange restrictions and many other forms of state interference limit or assist the activities of manufacturers and merchants. In time of war, State intervention is naturally greatly increased.

(C. U., B.Com., 1946).

[Hints :—Fulfilment of contract—চুক্তি পূরণ ; Currency regulation—মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ ।]

(৪৪)

The Government of India have agreed to supply to U. N. R. R. A. commodities worth about Rs. 6,50,00,000, states as Associated Press of India message from New Delhi dated August 1, 1945. The balance of roughly Rs. 1,50,00,000 out of Rs. 8 crore contribution which the Government of India have decided to make will be paid in cash. The supply of the commodities will spread over a period between four months and a year depending on shipping being made available by the U. N. R. R. A. authorities These are some of the results of the discussion which the Government of India had with the U. N. R. R. A. Mission lasting from July 10 to July 29, on questions connected with supplies from India and procedure for procurement of supplies. It is announced that on both these questions the Government of India's views with which the mission agreed formed the basis of the conclusions which resulted from the discussions. As regards

supplies, while expressing their sympathy with the humanitarian aims of U. N. R. R. A. and their readiness to render all possible help for the relief of distress, the Government of India indicated that their policy was that purchase should be restricted to those goods, whether raw or manufactured, which were not in short supply and could be safely spared without causing hardship to the Indian consumer or adversely affecting Indian economy. (C. U., B.Com., 1946).

[Hint :—U. N. R. R. A.—ইউ. এন. আর. আর. এ. (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্তত্রাণ ও পুনর্গঠন সমিতি।]

---

(৪৫)

The season of the 'aman' crop of 1942, that is the crop which would provide the main supply of rice for the year 1943, did not open propitiously. In June, rain was needed in most parts of the province, the monsoon having been late in establishing itself, and although rain was more plentiful in July, still more was needed. Cultivation had been delayed and the aman seedlings were suffering from drought in many places. The prospects however improved in August, and in September rain benefited the crops throughout the province. Taking the season as a whole the weather was not favourable, Particularly in West Bengal—the most important rice producing area in the province. It was at this stage that West Bengal was visited by a great natural calamity which took in heavy toll of life and brought acute distress to thousands of homes. On the morning of October 16, 1942, a cyclone of great intensity accompanied by torrential rains, and followed late in the day by three tidal waves laid waste a strip of land 7 miles wide along the coast in the districts of Midnapore and 24 Parganas. (C. U., B.Com., 1947).

Hint :—Drought—অনাবৃষ্টি।]

---

(৪৬)

While India has been spared the material destruction that has befallen many other countries, she has suffered in full

measure, and in some directions in greater measure than others, the economic consequences of War. Her industrial equipment has been worked to the very edge of breakdown and there is a large backlog of maintenance and replacement to be made good; more than that the development of her economy and even her reconstruction are being delayed through her inability to obtain the necessary capital equipment owing to destruction and unsatisfied demands in the supplying countries. Civilian building has been almost entirely neglected for over five years, and this presses heavily on a country where the large annual increase in population and where growing industrial development require a continually expanding building programme. In India, as elsewhere, there have occurred large shortages of consumer goods caused on the one hand by the failure of supplies from overseas and on the other by the diversion of a large part of her productive capacity to war purposes. Outstanding examples are textiles and foodgrains, though there are many other examples. (C. U., B.Com., 1947).

[**Hint :—Industrial equipment—শিল্প-সরঞ্জাম ।**]

---

(৪৭)

The advances in the science of nutrition within recent years have been comparable in importance to the earlier discoveries in bacteriology which open the way to control many deadly or handicapping diseases. Chemistry and Physiology have given us a vast amount of new knowledge regarding the relation of food to human well-being. We know that certain diseases, which affect immense numbers of people, are caused solely by failure to get right kind of food. We know what foods the human body needs not only to prevent diseases but to build resistance to many others, lengthen the span of life, favour the birth of healthy children, and raise the power of many individuals to do physical and mental work formerly thought to be beyond their innate capacity. (C. U., B.Com., 1948).

[**Hints :—Bacteriology—জীবাণুবিদ্যা ; Physiology—শারীর-বিজ্ঞান ।**]

(৪৮)

There are certain elements of mental outlook and character which participation in large mechanised industries is calculated to promote, such as alertness, application, decision and resourcefullness. Agriculture, to the extent that it depends so largely on the forces of nature, tends to produce a passive outlook and long periods of seasonal unemployment, incidental to it, create an attitude of general lethargy. There are undoubtedly valuable traits of character which an agricultural environment helps to produce and much of what is often described as the spiritual heritage of our people is to be traced to the agricultural environment in which we live and work. But in the work-a-day world in which we are placed, this needs to be supplemented and corrected by habits associated more directly with an industrial environment.

(C. U., B.Com., 1948).

[**Hints :—Passive outlook—**নিষ্ক্রিয় মনোভাব ; **Seasonal unemployment—**মরসুমী বেকারত্ব ।]

(৪৯)

In 1830 Rammohan Roy went to England, where the Charter of the East India Company, which was to determine the method of the East India Company's rule in India for a long period, was again to come up for discussion. In Europe Rammohan was received with respect and appreciation. His explanations of the judicial and taxation systems in India and of the conditions in which the Indian people lived awoke great interest. He unfortunately died during his stay in England, so that this Indian who is undoubtedly one of the makers of the spiritual history of mankind, whose efforts at enlightenment are part of the universal heritage was buried in Europe. (C. U., B.Com., 1949).

[**Hint :—Universal heritage—**বিশ্বজনীন সংস্কৃতিধারা ।]

(৫০)

The vast majority of the people of Ceylon live in windowless, mud-walled huts, thatched with plaited cocoanut leaves

or straw. Under their own kings none but the nobles were allowed to live in tiled or white-washed houses. Each hut is usually embowered in a little garden containing a few cocoa-nut trees, clumps of broad-leaved plantain and sugarcane, with a few coffee bushes, custard apples, pine-apples and other fruit trees and plants scattered about. Many houses have pumpkin vines growing over the roofs. Fruits and vegetables form a large part of the food of the people. For condiments and relishes they have chillies, turmeric, tama-rinds and other pungent fruits and roots. (C. U., B.Com., 1949).

[Hint :—Condiments and relishes—চাটনী ও সুস্বাদ।]

(৫১)

The commercial value of mica is greatly affected by the ease with which it can be split into flat sheets, hardness, flexibility, colour, freedom from specks, stains and inclusions and size of the sheets. After the removal of broken flawed pieces, the sheets are trimmed, the product being then known as "dressed block". The wastage in this process alone amounts to between 70 to 80 per cent. The dressed mica is next sorted into various market sizes. After sizing comes the grading process in which the sheets are classified according to their freedom or otherwise from stains and inclusions. Over 80 per cent of the exports, however, consists of splitting made by separating the smaller sizes into the thinnest possible films to the inch being the usual standard. (C. U., B.Com., 1950).

[Hint —Trimmed—সজ্জিত ; Dressed Block—সাজানো থাক।]

(৫২)

In ordinary speech a wealthy man is a man with a large income. How do we state a man's income? Usually in pounds, dollars and francs, and in the same way we state a country's income in terms of money. But the pounds, shillings and pence are not the wealth. No one except the

miser desires them for their own sake; they are wanted only for their purchasing power. The real wealth consists of the things that the money will purchase, and of those things we think when we try to realise what wealth is; the precious metals and precious stones, the materials and implements of manufacture, foodstuffs, land and buildings, these and not their money-prices are what we mean by wealth.

(C.U., B.Com., 1951).

[**Hints :—Purchasing power—ক্রয়শক্তি ; Materials and Implements of manufacture – শিল্পের উপাদান ও যন্ত্রপাতি ।**]

(৫৩)

The most serious difficulty which confronts the wage-earner is unemployment. The failure of our economic organization to utilize fully all the labour power at its disposal constitutes one of its most glaring defects. If the economic process were perfectly efficient, every ablebodied adult whose time was not needed in the home would be kept fully employed. Unfortunately such a state of full employment is far from actual attainment. There is always a considerable amount of unemployment which in recent years has reached alarming proportions. (C.U., B.Com., 1951).

[**Hint :—Wage-earner – শ্রমজীবী (বেতনভোগী কর্মী)**]

(৫৪)

A bank renders many valuable services to the public as well as to the trade and industry of a country. Its most important service is that it pulls together the scattered savings of a community and makes them available to those who need funds for her productive purposes. The ease with which money can be obtained from banks by businessmen acts as a stimulus to productive enterprise. They are also benefited by the advice and information which banks are always ready to place at their disposal. (C.U., B.Com., 1951).

[**Hint :—Productive enterprise—ফলপ্রসূ প্রয়াস (ব্যবসায়িক)**]

(৫৫)

It is commonly asserted that to take from the rich part of their incomes in the form of income taxes or other taxes such as inheritance tax tends to retard the accumulation of capital and to dissipate the capital accumulations of the past. Undoubtedly if taxation of the rich is carried to an extreme such undesirable results will follow. Heavy taxation of the wealthy accompanied by low taxation, or exemption from taxation of the poor may retard the accumulation of capital or dissipate past accumulations. But there is reason to believe that progressive taxation applied in moderation is not likely to bring these evil consequences in any marked degree. Sound public policy justifies a moderate amount of taking from the rich to give to the poor through the process of taxation and public expenditure. (C. U., B.Com., 1952).

[**Hint :—Exemption from taxation—কর-অব্যাহতি ।**]

(৫৬)

Since insolvency means a disagreement between assets and liabilities, often leaning heavily on the side of the latter, nothing can be done until the real financial position of the debtor has been accurately gauged. And this cannot be accomplished until a proper financial statement has been prepared. The law compels the debtor to make a statement of his affairs and his failure to do so renders him liable to be severely dealt with. As soon as possible the statement of affairs has been drawn up, the creditors are called together and the position of matter is explained to them.

(C. U., B.Com., 1952).

[**Hint :—Insolvency—দেউলিয়াভবন (ঋণপরিশোধে অক্ষমতা ।**]

(৫৭)

If human beings are to enjoy more consumers' goods than the comparatively small quantity of goods provided free by nature, they must labour to produce them. Now, although most persons have laboured to produce goods many do not understand clearly what just is meant by production. When

we say that a man has produced something, we do not mean that he has created something out of nothing, since a man can neither create nor destroy matter. All that man can do is to produce some change in matter in such a way that it becomes more useful. So production consists in so changing things as to increase their utility. (C. U., B. Com., 1952).

[**Hints :—Consumers' goods**—ভোগ্যপণ্য ; **Matter**—মূলপদার্থ; **Utility** উপযোগিতা ।]

---

(৫৮)

A striking feature of the present structure of taxation in India is the relatively narrow range of the population affected by it. About 28 per cent of the total tax revenue comes from direct taxation (land revenue being treated as indirect tax) which directly affects only about half of one per cent of the working population. Another 17 per cent is accounted for by import duties which are derived to a large extent from consumers of commodities like motor vehicles, high quality tobacco, silk and silk manufactures, liquors and wines and affect only a relatively small section of the population. On the other hand land taxation contributes now only about 8 per cent of the total tax revenue compared with about 29 per cent in 1939. (C. U., B.Com., 1953).

[**Hints :—Direct taxation—প্রত্যক্ষ কর ; Land revenue—ভূমি রাজস্ব** ।]

(৫৯)

The level of production and the material well-being of a *community depends mainly on the stock of capital at its* disposal—the amount of land per capita and of productive equipment in the shape of factories, locomotives, machinery, irrigation facilities, power installations and communications. An increase in the stock of capital accompanied by knowledge *of how to use it to best advantage will lead to an increase in* the community's output of goods and services and so to a rise in its material well-being. This may be put shortly in

the sentence that "the key to economic progress is capital formation." (C. U., B.Com., 1953).

[Hints :—Power installations—শক্তি-উৎপাদনকেন্দ্র ; Services—শ্রম।]

---

(৬০)

Inequalities of wealth can be reduced by fiscal measures. Death duties which are now an integral part of the system of taxation in advanced countries are an important equaliser. Over a period of years they can reduce inequalities to an extent that could be achieved straightaway only by the disruption of society. Direct taxation falling mainly or more heavily on the rich, can also be made to have an increasingly levelling effect, but here there is need for balancing the advantage of greater equality of incomes against the disadvantages of a possible fall in private savings and capital formation and general discouragement of productive activities.

(C. U., B.Com., 1953).

[Hint :—Fiscal measures—রাজস্ব ব্যবস্থা।]

(৬১)

No country which depends mainly on other countries for her progress and general well-being can hope to go far in achieving anything substantial. Apart from the fact that such a thing completely weakens that country receiving this outside aid it prevents the creation of that atmosphere in which a country can begin to develop and grow on its inherent strength. Ultimately it is the inherent strength of the country which can take it forward. This is the most vital thing from which all progress must spring. If a country lacks this strength it is surely a sign of disease. A diseased country cannot grow. It must be healthy and be able to live on its own strength.

(C. U., B.Com., 1954).

[Hint :—Inherent strength—সহজাত শক্তি।]

(৬২)

Practically everyone is vitally interested in prices, because under present economic conditions the welfare, even the life of almost everyone depends upon goods that are brought and sold for a price. All persons except dependents are constantly buying and selling goods, either material objects or services. How many goods a man may enjoy depends largely upon the prices he gets for the things he sells and prices he pays for the things he buys. Obviously, if he sells his goods at low prices and buys the goods he wants at high prices he can buy fewer goods than if he sells at high prices and buys at low prices.

(C. U., B.Com., 1954).

[Hints: Dependents—পরাশ্রয়ী ; Services—কাজ।]

(৬৩)

"Credit", says an old proverb, "supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged." But if credit is sometimes "fatal" it is often indispensable to the cultivator. An Indian proverb in verse tells him that only that village is fit to live in which has "a money-lender from whom to borrow at need, a Vaid to treat in illness, a Brahmin priest to minister to the soul and a stream that does not dry up in summer." Agricultural credit is a problem when it can't be obtained; it is also a problem when it can be had—but in such a form that on the whole it does more harm than good. It may be said that, in India it is this two-fold problem of inadequacy and unsuitability that is perennially presented by agricultural credit. (C. U., B.Com., 1955).

[Hints :—Hangman—ঘাতক (ফাঁসিদার); Perennialy—স্থায়ীভাবে।]

(৬৪)

The unemployment problem is not new in West Bengal. But its magnitude and acuteness have largely increased in recent years on account of certain socio-economic changes.

Firstly, West Bengal's economy has suffered dislocation on account of increasing effect of the transition from the use of hand-driven to power-driven machines. Secondly, the middle class economy in the state has been dislocated by the loss of its support from land and by the disintegration of the joint family. Almost every family had a home and some income from land. This together with the joint family system provided insurance against sickness and unemployment. But it is common experience of all that under the stress of economic circumstances this joint family is breaking down fast and the family home and the family land are also disappearing quickly. (C. U., B.Com., 1955).

[Hints : Economy--অর্থব্যবস্থা ; Joint Family System—যৌথপরিবার ব্যবস্থা ।]

(৬৫)

Indian agriculture has been a gamble of rains. Every year the monsoon fails in some part of the country imposing untold sufferings on the poor peasants. The importance of irrigation cannot, therefore, be over-emphasised. Irrigation ensures regular water supply to agriculturists and protects them from the vagaries of the monsoon. It thus prevents famines and also helps to raise the yield from land. By diverting the flow of river waters it often prevents floods. The prosperity of the agriculturists also confers benefits on the economy of the country as a whole. Because of the nature of the investment the financing of the construction of the irrigation works cannot be entrusted or undertaken by private enterprise. The experiment was tried by the Canal Companies took up the Tungabhadra and Orissa Canal projects, but it failed. (C. U., B.Com., 1956).

[Hints :—Irrigation—সেচব্যবস্থা ; Private Enterprise—বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (প্রয়াস)]

(৬৬)

The Defence expenditure of India has increased since Independence for various reasons. This increase is partly due to increased pay and allowance to Defence Services personnel and partly due to rise in prices that has followed Independence. The partition of the country also necessitated the movement of troops and stores in connection with the reconstitution of the armed forces. The communal disturbances that took place in the Punjab and elsewhere also imposed additional expense on the army. The air-force and the army also helped in the evacuation of refugees from Pakistan. The partition of the country also deprived us of our greatest advantage in defence strategy of an impregnable land frontier. We have now a long frontier with no natural barriers in which large forces have to be employed for ensuring peace and safety. (C. U., B.Com., 1956).

[**Hints : – Defence expenditure—প্রতিরক্ষা ব্যয় ; Impregnable—দুর্ভেদ্য ।**]

---

(৬৭)

It is sometimes stated that a man's wants are unlimited; that however much he has there is always something more than he desires to possess or in other words, that man is never completely satisfied. This is no doubt true in a general sense, but it is far too vague and needs a good deal of qualification. The wants we deal with in Economics are the wants which a person satisfies if he has the means of doing so; they are in fact the wants which give rise to *effective demand* which implies three things: the desire to possess a thing, the means of possessing it, and the willingness to use these means for this particular purpose. (C. U., B.Com., 1957).

[**Hint :—Effective demand—কার্যকরী চাহিদা ।**]

---

(৬৮)

Great Britain in 1908 passed its Old Age Pension Law. This provided free payment by the Government, as compared

with the old-age insurance plan of Germany, in which employer, employee and Government all contributed. At the age of seventy a pension was to be paid to any needy individual provided he or she had been a British subject for twenty years and had never been either a pauper or a criminal. The maximum pension was a little over a dollar a week. For many years old-age insurance programmes have been introduced in the United States for teachers and other Governmental employees. (C. U., B.Com., 1957).

[Hints :—Old Age Pension Law—বার্ধক্য ভাতা আইন।]

---

(৬৯)

The first direct challenge to the Government's declared determination not to give way to further wage claims by the nationalized industries has come from London's busmen, who have demanded a 25 *s.* increase in their weekly pay. Nobody is in the least surprised. The demand was foreseen by most people last summer, when 177,000 provincial busmen were awarded an increase of 11 *s.* a week—an award framed deliberately to reduce the differential between rates in London and the provinces. The Government's dilemma is apparent to all. To admit the London men's claim might simply mean that the whole process of "leap-frogging" is set in motion again. Once that happens the floodgates will be wide open. (C. U., B.Com., 1958).

[Hints—Nationalised—রাষ্ট্রীয়কৃত ; Leap frogging—ব্যাঙের লাফ।]

(৭০)

Acharyya Vinoba Bhave stated here today that the Gramdan movement and the land reforms contemplated by Governments were not opposed to each other. If that were so, he told Pressmen, then the Yelwal (Mysore) conference would not have accepted the ideal of Gramdan. The leaders who participated in the conference had agreed that the Gramdan movement would not come in the way of the Govern-

ment's land legislation. The movement he had started was not idealistic but realistic. He was only propagating the demand of the times. Even Mr. Nehru had stated that the Gramdan movement had come to stay, and Mr. Nehru was a hard realist. Gramdan would not interfere with the ryot's initiative. If necessary, in a Gramdan village the available land could be cultivated on a co-operative basis or divided into blocks and then cultivated. (C. U., B.Com., 1958).

[**Hints :—Land reform**—ভূমি সংস্কার ; **Realist**—বাস্তব-বাদী ।]

(৭১)

The newly formed Small Savings Board will meet at Lucknow to-morrow as a result of the substantial shortfall in the target of small savings, to which attention was recently drawn by the Standing Committee of the National Development Council. Importance will therefore attach to the decisions that the Board may take to simply the procedure for sale, transfer and cashing of National Plan Savings certificates and Postal savings coupons, for the small savings sector will in future have to be relied on more and more to raise internal resources for the Second Five Year Plan. With the information of this board all the Agencies responsible for fostering small savings have been brought under unified control. (C. U., B.Com., 1959).

[**Hints :—Target**—লক্ষ্য ; **Standing**—স্থায়ী ; **Internal resources**—আভ্যন্তরীণ সম্পদ ।]

(৭২)

Market was very much disturbed by the increased accumulation of cloth stocks with mills. The value of sold and unsold stocks with mills were placed around Rs. 57·2 crores at the end of September. Some idea of the magnitude of the problem could be had if one were to compare this figure with the paid-up capital of the industry which is placed around Rs. 115 crores. Reports are current in the market that the matter of giving relief in excise duty will be taken up when

the Finance Minister returns. On the export front the in-dustry has been doing well and during the first eight months exports amounted Rs. 648·22 million yards as against 563·38 million yards during the corresponding period last year. But the export target of 1,000 million yards may elude the grasp of India in 1957 also. (C. U., B.Com., 1959).

[**Hints :—Stocks—মজুত মাল ; Elude—এড়ান।**]

পত্রাবলী

[ব্যবসায়িক পত্রের সহিত সাধারণ বা পারিবারিক পত্রের প্রভেদ আছে। এইরূপ পত্রে ভাবোচ্ছ্বাসের অবকাশ নাই এবং বক্তব্যটুকু অল্প কথায় সুস্পষ্ট করিয়া বলার উপর ইহার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। ব্যবসায়িক পত্রে সাধারণতঃ আর্থিক স্বার্থগত উদ্দেশ্য থাকে, সুতরাং পত্র-প্রেরকের বক্তব্য স্পষ্ট বা আবেদনশীল হওয়া দরকার। এ ছাড়া পত্রে সর্বপ্রকার অসঙ্গতি বা এলোমেলোভাব বর্জনীয়। ইহাতে পত্রলেখকের ক্ষতিরই সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, কোন চাকুরীপ্রার্থী আবেদনপত্র শেষ করিয়া 'পুনশ্চ' দিয়া তাঁহার একটি গুণের উল্লেখ করিলেন। এই গুণটি জানানোর গুরুত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু 'পুনশ্চ' দিয়া জানাইবার ফলে নিয়োগকর্তার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় সকল কথা গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতার অভাব আছে। ব্যবসায়িক পত্র হস্তলিখিত হউক বা টাইপ করা হউক, তাহা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও নির্ভুল হওয়া চাই। হাতে লেখা পত্রে সুন্দর হস্তলিপির নিজস্ব মূল্য আছে।

ব্যবসায়িক পত্রে কতকগুলি সৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করিবার রীতি আছে। এই রীতি মানিয়া চলা উচিত। পরিষ্কার নাম-ঠিকানা ও তারিখ, পত্রের ক্রমিক সংখ্যা, কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত পত্র বা পত্রোত্তর হইলে শিরোনামা হিসাবে সেই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ইত্যাদি ব্যবসায়িক পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পত্রের উপর দিকে দক্ষিণপার্শ্বে অথবা তলায় বামপার্শ্বে পত্রপ্রেরকের ঠিকানা ও তারিখ লিখিতে হয়। যাঁহাকে পত্র লেখা হইতেছে, উপরে বামপার্শ্বে ব্যক্তিগত পত্রে মূল প্রতিষ্ঠান ও পদমর্যাদার উল্লেখসহ তাঁহার নাম এবং প্রতিষ্ঠানগত হইলে পদমর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পত্রের তলায় দক্ষিণপার্শ্বে পত্রপ্রেরকের নাম (পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখসহ) লিখিতে হয়। ব্যবসায়িক পত্রে সম্বোধনের ক্ষেত্রে অধিকাংশস্থলে 'মহাশয়' বা 'মহাশয়গণ' এবং পরিশেষে পত্রপ্রেরকের নামের ঠিক আগে 'ভবদীয়', 'আপনার বিশ্বস্ত' বা 'আপনাদের বিশ্বস্ত' ব্যবহৃত হয়। পত্রের লেফাফার (খাম) উপরে পত্রপ্রাপকের নাম, পদমর্যাদা, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং তলায় বামপার্শ্বে পত্রপ্রেরকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দেওয়াই নিয়ম। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা অনেক সময় যথাক্রমে খামের মাথায় এবং তলায় বামদিকে ছাপানো থাকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি কম পরীক্ষার্থীদের চাকুরীর আবেদনপত্র, অনুসন্ধান পত্র, প্রচার পত্র, প্রতিবাদ পত্র, পণ্যের মূল্য ও অর্ডার সংক্রান্ত পত্র, দাবী সংক্রান্ত পত্র, এজেন্সী সংক্রান্ত পত্র, ব্যাঙ্ক ও বীমা সংক্রান্ত পত্র এবং সরকারী পত্র বা সরকারের নিকট আবেদন পত্র বিশেষ করিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে।

নিদর্শন হিসাবে কয়েকখানি পত্রের নমুনা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেওয়া হইল :]

(১)

হিসাব-রক্ষক পদপ্রার্থীর দরখাস্ত

রঙ্গিলা টি এস্টেট,
পোঃ অফিস—রঙ্গিলা,
জেলা—কাছাড়, আসাম।
৬ই মার্চ, ১৯৫৯

সেক্রেটারী,
থানাবাড়ি টি কোম্পানী,
থানাবাড়ি, আসাম।

মহাশয়,

বিগত ২৯।২।৫৯ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় আপনি আপনার চা বাগানের জন্য একজন হিসাবরক্ষক চাহিয়া যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, আমি ঐ পদের প্রার্থীরূপে এই আবেদনপত্র পেশ করিতেছি।

আমি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি. কম. পাশ করিয়াছি। এ্যাডভান্সড্ এ্যাকাউন্টেন্সি ও অডিটিং আমার বিশেষ (ঐচ্ছিক) বিষয় ছিল। কলিকাতার বিখ্যাত হিসাব পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান এন. কে. বসু এণ্ড কোম্পানীতে আমি চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেণ্টশিপ্ পরীক্ষার জন্য ২ বৎসর শিক্ষা-নবীশী করিয়াছি। হঠাৎ পিতৃবিয়োগে অর্থাভাবের জন্য আমি শিক্ষানবীশীর মেয়াদ শেষ করিয়া পরীক্ষা দিতে পারি নাই। এই সময় আমি অনেকগুলি বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরীক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং ফলে আমার প্রভূত অভিজ্ঞতা হইয়াছে। আমি গত দুই বৎসর আসাম ভ্যালী টি সিণ্ডিকেটের অধীনস্থ রঙ্গিলা টি এস্টেটে হিসাব-রক্ষকের কাজ করিতেছি।

আমার যোগ্যতা সম্পর্কে আমার বর্তমান কর্তৃপক্ষের মনোভাব কিরূপ, তাহা এই দরখাস্তের সঙ্গে প্রেরিত তাঁহাদের অভিজ্ঞানপত্র পাঠেই আপনি বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমার সম্বন্ধে আপনারা তাঁহাদের নিকট কোন তথ্য জানিতে চাহিলে তাঁহারা সাধ্যমত তাহা জানাইবেন। আমার বর্তমান চাকুরী সিণ্ডিকেটের অধীন বলিয়া স্থানান্তরযোগ্য। ইহাতে উন্নতির সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া

এই সিণ্ডিকেটের অনেকগুলি চা-বাগান অস্বাস্থ্যকর অরণ্য অঞ্চলে অবস্থিত। আপনারা যে পদটির বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহার বেতনের হারও আমার বর্তমান বেতনের প্রায় দ্বিগুণ। এই সব কারণে আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে ইচ্ছুক এবং আমার ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া রঙ্গিলা টি এস্টেটের ম্যানেজার মহোদয় আমাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে জলপাইগুড়ি সহরের বেঙ্গল ক্রেডিট কর্পোরেশনের ম্যানেজার শ্রীবঙ্কিমবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত। তিনিও আপনাকে আমার সম্বন্ধে খোঁজখবর জানাইতে পারেন।

আপনি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, পদপ্রার্থীকে ১,০০০৲ টাকা নগদ জামিন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমি ইহা দিতে রাজী আছি। আমার বর্তমান চাকুরীতেও সমপরিমাণ টাকা জমা আছে।

আমার বর্তমান বয়স ২৫ বৎসর। আমার শরীর নীরোগ এবং আমার সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল।

আমাকে বহাল করা হইলে আমি আমার সাধ্যানুযায়ী বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতা দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব।

আশা করি আমার দরখাস্তটি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

শ্রীঅনাথবন্ধু ঘোষ দস্তিদার

সেক্রেটারী,

থানাবাড়ি টি কোম্পানী,

পোঃ অফিস—থানাবাড়ি,

জেলা—জলপাইগুড়ি,

পশ্চিমবঙ্গ।

(২)

কোন ব্যাঙ্কের নিকট জমাতিরিক্ত-গ্রহণ (ওভারড্রাফ্‌ট) ব্যবস্থার আবেদন পত্র

কান্তি ব্রিক ওয়ার্কস,
খড়দহ, ২৪ পরগণা।
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

ম্যানেজার,
নর্দার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড,
বারাকপুর শাখা—বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

মহাশয়,

আমি আপনাদের ব্যাঙ্কের একজন পুরাতন আমানতকারী। আপনার বারাকপুর শাখায় আমার 'কান্তি ব্রিক ওয়ার্কস' নামক কারবারের নামে (এই প্রতিষ্ঠানের মালিক আমি একাই, আমার কোন অংশীদার নাই) একটি চলতি হিসাব গত ৭ বৎসর যাবৎ চলিতেছে।

আমার ইঁটের ব্যবসা। খড়দহে গঙ্গার ধারে আমার একটি ইঁটখোলা আছে। সম্প্রতি এই খোলার লাগোয়া অপর একটি ইঁটখোলা মালিকের অসুস্থতার জন্য নীলাম হওয়ায় আমি বিশেষ সুবিধাজনক দরে ঐটি কিনিয়া লইয়াছি। এই ইঁটখোলাটি কিনিবার জন্য আমার হাতের নগদ টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে, অথচ দুইটি ইঁটখোলা চালু রাখার জন্য চলতি খরচ দ্বিগুণ হইয়াছে। বর্ষা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, এখন নূতন ইঁট পোড়াইবার সময়। নূতন ইঁট না উঠিলে বাহির হইতে টাকা আসা কঠিন। পরিচালনার ব্যয়নির্বাহ করিয়া ব্যবসা চালান বর্তমানে আমার পক্ষে সত্যই অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে।

এ অবস্থায় মহাশয়ের নিকট নিবেদন, আপনি যদি আমার কারবারের উল্লিখিত চলতি হিসাবের উপর মাসে উর্ধ্বপক্ষে ৫ হাজার টাকা জমাতিরিক্ত গ্রহণের অনুমতি দেন, তাহা হইলে এই দুঃসময়ে আমার প্রভূত উপকার হয়। এই সুবিধা ছয় মাসের জন্য দিলেই যথেষ্ট হইবে, কারণ নূতন ইঁট বাজারে বাহির হইলে ক্রেতাদের টাকাতেই ব্যবসা চালান যাইবে। আমাদের এই অঞ্চলে বহু নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে, ইঁটের চাহিদা এখনও বেশ কিছুদিন বর্তমান থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইঁটের কারবার যথেষ্ট লাভজনক, কাজেই আমার ব্যবসায়ে আপনার ব্যাঙ্কের টাকা নিঃসন্দেহে নিরাপদ থাকিবে। তাছাড়া আমার একটি ইঁটখোলা আপনার ব্যাঙ্কের নিকট আইনসঙ্গতভাবে জামিন হিসাবে দায়বদ্ধ করিতে রাজী আছি। ইঁটখোলাটির দাম কমপক্ষে ৩০ হাজার টাকা হইবে, সুতরাং আমার প্রতিষ্ঠানকে ধার দিতে আপনাকে কোন আর্থিক ঝুঁকি লইতে হইবে না।

এই জমাতিরিক্ত গ্রহণের হিসাবে গৃহীত টাকার উপর আমি ব্যাঙ্কের নিয়মমত সুদ দিব। টাকা লেনদেনের ও ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আমি আপনার ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

আমাদের কারবারের সহিত আপনার ব্যাঙ্কের দীর্ঘকালের অবিচ্ছিন্ন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক, এই বিপদের সময় আমি একান্তভাবে আপনাদের সহযোগিতা আশা করিতেছি। কর্তব্যশীল ব্যাঙ্ক হিসাবে আপনারা দেশের ব্যবসায়িক প্রয়াসে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন, আমার ব্যবসাটিকে বাঁচাইবার জন্য আমি আপনাদের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া রহিলাম।

যথাসম্ভব এই আবেদনপত্রের উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়,
মালিক, কান্তি ব্রিক ওয়ার্কস,
খড়দহ।

(৩)

কারবার বন্ধের সংবাদ জ্ঞাপন

ক্যালকাটা টিম্বারস্,
১০৭।৩ রবিশঙ্কর রোড,
কলিকাতা।
৮ই জুন ১৯৫৮

ম্যানেজার,
হরিলাল জানকীদাস এণ্ড্ কোম্পানী
রেঙ্গুন।

মহাশয়,

আপনার অবগতির জন্য অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের কারবারের আর্থিক অবস্থা একান্ত শোচনীয় হইয়া উঠায় হিসাব পরীক্ষকের

পরামর্শ অনুসারে গতকল্য, ৭ই জুন, ১৯৫৮ হইতে আমরা আমাদের কারবারের লেনদেন বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের দেনাপাওনা এবং সম্পত্তির হিসাব বিশেষ সাবধানতার সহিত লওয়া হইয়াছিল; দেখা গিয়াছে যে বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যবসা চালাইয়া আর দায় বাড়ানো সঙ্গত নয়। এ অবস্থায় অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারেই কারবার বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল। অতঃপর অনুগ্রহ করিয়া আমাদের ফরমাশী মালপত্র পাঠানো বন্ধ রাখিবেন।

দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা এখন যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমাদের মত অল্প মূলধনী কারবারের পক্ষে টিকিয়া থাকা দুঃসাধ্য। তবু গত দুই বৎসর যাবৎ আমরা দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ক্রেতার অভাবে মজুত কাঠ বিক্রয় করিতে না পারায় এবং আমাদের ক্রয়-মূল্যের হিসাবে কাঠের দর সম্প্রতি অত্যন্ত পড়িয়া যাওয়ায় আমরা শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের হিসাব পরীক্ষক মহোদয় হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া কারবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুমাত্র আশা দিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া সত্যই কোন পথ ছিল না।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত উত্তমর্ণ ও পাইকারী কাষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসাবে আপনাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিবে বলিয়া আমরা একান্ত দুঃখিত। অবশ্য আগামী দুই মাসের মধ্যে আমরা পাওনাদারদের সহিত মিলিত হইয়া দেনা পরিশোধের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছি। ঠিক কতটা দায় পরিশোধ সম্ভব হইবে তাহা এখন নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না, তবে আমাদের যে সকল সম্পত্তি ছড়াইয়া আছে, সুবন্দোবস্ত হইলে তাহা হইতে সমস্ত পাওনাদারের মোট পাওনার শতকরা ৬০ ভাগের মত পরিশোধিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। এই সম্পর্কে আপনাদেরও যথাসময়ে জানানো হইবে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সহযোগিতা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

আশা করি আপনারা বিশ্বাস করিবেন যে, কারবার বাঁচাইয়া রাখিতে যাহা কিছু করা সম্ভব, আমরা সবই করিয়াছি। পাওনাদারদের আমরা বন্ধু বলিয়াই মনে করি, তাঁহারা আমাদের সততা ও দায় পরিশোধের

আগ্রহ সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করিলে আমরা উভয় পক্ষই তবু কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিব।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
ভবেশচন্দ্র নন্দী,
কার্যকরী পরিচালক,
ক্যালকাটা টিম্বারস্,
কলিকাতা।

(৪)

নূতন শাখা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত পত্র

বেঙ্গল ডেয়ারিস্ লিমিটেড,
৩, রামসদয় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২ই জুন, ১৯৫৮

ম্যানেজার,
বেঙ্গল ক্যান্টিন,
এলাহাবাদ।

মহাশয়,

আমাদের কারবার বর্তমানে সম্প্রসারিত হওয়ায় এবং ঘৃত ও মাখনের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা কলিকাতার বাহিরে কয়েকটি শাখা খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। এলাহাবাদ সহরেও গত ২রা জুন হইতে আমাদের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীবনমালী দত্ত আমাদের এলাহাবাদ শাখার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত দুগ্ধজাত পণ্যাদির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি দীর্ঘকাল আলিগড়ের মডার্ণ ডেয়ারীর উৎপাদন-বিভাগে কাজ করিয়াছেন। এলাহাবাদ সহর ও নিকটবর্তী অঞ্চলে তিনিই আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ফরমাশ (অর্ডার) সংগ্রহ করিবেন এবং মাল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের বিশ্বাস আছে বনমালী বাবু যে সব ক্ষেত্রে ঘৃত বা মাখন সরবরাহের দায়িত্ব লইবেন, সেখানে পণ্যসরবরাহে অযথা কোন বিলম্ব হইবে না এবং বাজারের উৎকৃষ্টতম জিনিসই সরবরাহ করা হইবে। হাতে কলমে অভিজ্ঞতা

আছে বলিয়া মাল খারাপ হইয়া গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিবেন এবং কারবারের সুনাম রক্ষার জন্য তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

আশা করি আপনারা অবগত আছেন যে, ঘৃত, মাখন, পনীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত পণ্যবিক্রেতা হিসাবে কলিকাতায় আমাদের প্রভূত সুনাম আছে। বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ আমরা এই কারবার চালাইতেছি। কলিকাতা ও সহরতলীতে আমাদের সর্বসমেত ১০টি পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র আছে। কলিকাতা হইতে ১৮ মাইল দূরবর্তী রাজদীঘি গ্রামে আশি একর জমিতে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় আমাদের নিজস্ব ডেয়ারী পরিচালিত হইয়া থাকে।

আপনি যদি আপনাদের প্রয়োজনীয় মাখন, ঘৃত ইত্যাদি আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পাইকারী ক্রেতা হিসাবে আমরা আপনাদিগকে যথাসাধ্য সুবিধা দিতে প্রস্তুত আছি। এইসঙ্গে প্রেরিত আমাদের মূল্যতালিকা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের জিনিসের দাম অন্য প্রতিষ্ঠানের সমশ্রেণীর জিনিসের তুলনায় অনেক কম। ইচ্ছা করিলে আপনি আমাদের পণ্য ও দর বাজারে যাচাই করিতে পারেন।

আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নূতন শাখা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমরা প্রথম তিনমাস এলাহাবাদের পাইকারী ক্রেতাদের ক্রয়মূল্যের উপর শতকরা ২০ ভাগ কমিশন দিব। এছাড়া এই তিনমাসের মধ্যে যাঁহারা আমাদের পাইকারী স্থায়ী খরিদ্দার হইবেন, তাঁহাদের বরাবর আমরা নির্ধারিত শতকরা ১০ ভাগ কমিশনের স্থলে শতকরা ১২½ ভাগ কমিশন দিয়া যাইব। আশা করি আপনারা এই সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

আমাদের এলাহাবাদ শাখার ম্যানেজার শ্রীবনমালী দত্তের নিকট ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ পাওয়া যাইবে।

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কার্যকরী পরিচালক,
বেঙ্গল ডেয়ারিস্ লিমিটেড।

(৫)

বাড়ী ভাড়া লওয়ার চুক্তিপত্র

২।এ বনমালী দত্ত লেন,
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫।
২রা মে, ১৯৫৯

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রায়,
১৩।২, আনন্দ মুখার্জি লেন,
কলিকাতা ৪।

মহাশয়,

ইতিপূর্বে আপনার সহিত আমার যে মৌখিক কথাবার্তা হইয়াছে, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া আমি আপনার ১৩।১, আনন্দ মুখার্জি লেন, কলিকাতা-৪ ঠিকানায় অবস্থিত দ্বিতল বাড়ীখানি সম্পূর্ণ ভাড়া লইবার উদ্দেশ্যে এই চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতেছি। বাড়ীখানি আমি আগামী ১লা জুন, ১৯৫৯ হইতে তিনবৎসরের জন্য মাসিক একশত টাকায় আপনার পূর্ণ সম্মতিক্রমে ভাড়া লইতেছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি প্রতি মাসের ভাড়া পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অবশ্যই শোধ করিব এবং আপনার আর্থিক নিরাপত্তার জন্য দুই মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ ২০০৲ টাকার এক খানি চেক আপনার নিকট জমা রাখিবার জন্য এই সঙ্গে প্রেরণ করিতেছি। এই দুইশত টাকা শেষ দুই মাসের বা ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসের ভাড়া বাবদ কাটা যাইবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর হিসাবে আপনাকে মালিকের অংশ দিতে হইবে, আমি ভাড়াটিয়ার অংশ যথাসময়ে মিটাইয়া দিব।

আমি আপনার বাড়ীখানি বসবাসের জন্য গ্রহণ করিতেছি। প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই বাড়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে ব্যবহার করিব না। আপনার লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে আমি এই বাড়ী সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোন উপভাড়াটিয়াকে ভাড়া দিব না। চুক্তির সময় অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি সাপেক্ষে আপনার বাড়ীখানি অক্ষত ও ব্যবহার্য অবস্থায় আপনাকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিব। লিখিত রহিল যে, যদি আমি উপরোক্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ পালন না করি, আপনি আমার নিকট আইনসম্মত ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন।

আপনার বাড়ীখানি পরীক্ষা করিবার অথবা দেখিবার প্রয়োজন হইলে আমি দিনের বেলা আমার সুবিধামত সময়ে আপনাকে বা আপনার প্রতিনিধি-স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিব। আমাদের পারস্পরিক চুক্তির শেষ মাসে বা ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে হইতে ৩১শে মে পর্যন্ত একমাস আপনি এই বাড়ীর জন্য সংবাদপত্রাদিতে ভাড়া দিবার বিজ্ঞাপন দিতে ও এই বাড়ীর বাহিরের দেয়ালে "বাড়ী-ভাড়া" বিজ্ঞপ্তি দর্শাইতে পারিবেন এবং এই সময় ভাড়া গ্রহণেচ্ছু কেহ আসিলে তাঁহাকে আপনি দিনের বেলা আমার সুবিধা সাপেক্ষে বাড়ীখানি দেখাইতে পারিবেন।

নমস্কারান্তে,

ভবদীয়,

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

(৬)

এজেণ্ট বা পাইকার হইবার আবেদন

ভারতীয় বস্ত্র প্রতিষ্ঠান,
১৮, গোলক বসু রোড,
কলিকাতা ৪।
২১শে মে, ১৯৫৮

ম্যানেজার,
ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইলস্ লিমিটেড
১৩, ব্যালার্ড ষ্ট্রীট, বোম্বাই।

মহাশয়,

কলিকাতায়, উপরোক্ত ঠিকানায়, আমরা গত দশ বৎসর যাবৎ সুনামের সহিত কাপড়ের কারবার চালাইতেছি। এতদিন আমরা পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন কাপড়ই কেনাবেচা করিতাম, এখন ব্যবসা সম্প্রসারিত হইতেছে বলিয়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যের, বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ের ভাল কাপড় দোকানে মজুত রাখিতে চাই। আপনারা বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট বস্ত্রব্যবসায়ী, বোম্বাই ও আমেদাবাদের প্রথম শ্রেণীর অনেকগুলি কাপড়ের কলের আপনারা আড়তদার। আমরা আপনাদের প্রতিনিধি বা এজেণ্টরূপে কলিকাতায় কাজ করিতে চাই। যদি ইহাতে আপনাদের অসুবিধা থাকে, আমরা আপনাদের নিকট হইতে পাইকারী হারে কাপড় কিনিয়া এখানে বাজারে বিক্রয় করিতে রাজী আছি।

প্রথমোক্তভাবে কারবার করিতে হইলে জামিন হিসাবে কত টাকা আপনাদের নিকট জমা রাখিতে হইবে এবং বিক্রয় বাবদ আপনারা কিরূপ বাটা (কমিশন) দিতে পারেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। এইরূপ এজেন্সি দেওয়া সম্ভব না হইলে ব্যবসাদার পাইকারী ক্রেতাদের আপনারা কি দরে বিভিন্ন শ্রেণীর কাপড় বেচিয়া থাকেন, তাহা সুস্পষ্টভাবে জানাইবেন। এইসঙ্গে ব্যবসার অন্যান্য সর্তের সহিত ফরমাশ (অর্ডার) পাওয়ার পর মাল পাঠাইতে আপনাদের মোটামুটি কতদিন লাগিবে এবং দাম কিভাবে পরিশোধ করিতে হইবে, তাহাও জানাইয়া দিবেন। আমাদের ব্যবসায়িক সুনাম সম্পর্কে আপনারা ইচ্ছা করিলে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পাইকারী বস্ত্র ব্যবসায়ী মেসার্স আগরওয়ালা এণ্ড সন্স, ৭২, এজমালিয়া ষ্ট্রীট, বড়বাজারে খোঁজ খবর লইতে পারেন। আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে আমাদের কারবারে বর্তমানে ২ লক্ষ টাকার বেশি খাটিতেছে এবং লয়েডস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতার নেতাজী সুভাষ রোডস্থ শাখায় আমাদের কারবারের নামে চলতি আমানত গত আট বৎসর যাবৎ চালু আছে।

আমাদের প্রয়োজন জরুরী বলিয়া আপনাদের যথাসত্বর বিস্তারিত উত্তর আশা করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
ভারতীয় বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে,
শ্রীবরুণকুমার মুখার্জি,
ম্যানেজার।

(৭)

সুপারিশ পত্র

১১ রাধাকান্ত বসু রোড,
কলিকাতা।
১২ই এপ্রিল, ১৯৫৯

শ্রীসত্যজিৎ সরকার,
সহকারী ম্যানেজার,
বড়হাজারী কোল্ মাইনস্,
বড়হাজারী,
আসানসোল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

পত্রবাহক শ্রীগণেশচন্দ্র দাস আমার নিকট প্রতিবেশী। ইনি দীর্ঘ ২০ বৎসর বৌবাজার ষ্ট্রীটে, 'অক্ষয় স্টেশনার্স' নামে একখানি দোকান চালাইতেছিলেন,

সম্প্রতি দোকানটি নানাকারণে উঠিয়া যাওয়ায় বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। বরাবরই বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করিতে হইয়াছে বলিয়া গণেশ বাবু এমন কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, যাহাতে বর্তমান দুর্দিনে বেশি দিন বসিয়া খাইতে পারেন। ইঁহার পরিবারে ইনি একাই উপার্জনক্ষম। কলিকাতায় বর্তমানে চাকুরীর বাজার খুবই মন্দা, তাছাড়া গণেশবাবু লেখাপড়া বেশি শেখেন নাই, মাত্র ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছেন। নিকট প্রতিবেশী বলিয়া আমাদের পরিবারের সহিত দাস মহাশয়ের পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠতা এবং সেই জন্যই ভদ্রলোকের বিপদে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

কলিকাতায় কিছু সুবিধা হইবার আশা না থাকায় আমি গণেশবাবুকে আপনার সহিত দেখা করিবার পরামর্শ দিয়াছি। আপনি একটি বড় কোলিয়ারীর অন্যতম কর্মকর্তা, আপনাদের ওখানে বহু লোকজন কাজ করে। আপনি চেষ্টা করিলে হয়তো গণেশবাবুর একটি চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন।

যদি চাকুরী দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া সম্ভবপর সর্বোচ্চ কমিশনে গণেশবাবুকে ওয়াগনে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, ইহাই অনুরোধ। আপনাদের নিকট হইতে সুবিধাদরে কয়লা আনিয়া ইনি যদি কলিকাতায় কয়লার ব্যবসা করেন, তাহাতে লাভ ভালই হইবে বলিয়া মনে হয়। গণেশবাবু আমাকে বলিয়াছেন, সুবিধাজনক কারবার হইবার আশা থাকিলে ইনি মূলধন হিসাবে ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করিতে পারিবেন। কলিকাতায় গণেশবাবুর নিজ বাড়ী এবং বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উপর খানিকটা খালি জমি পড়িয়া আছে। ইনি সেখানে কয়লার দোকান করিতে পারেন।

আগেই বলিয়াছি গণেশবাবু আমার নিকট প্রতিবেশী, তিনি একজন সত্যকার সৎ লোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার সহিত কারবার করিলে কেহ প্রতারিত হইবে না।

আপনি আমার বহুকালের বন্ধু। আশা করি একজন বিপন্ন সংসারী ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার এই সুপারিশপত্র আপনি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন।

আপনার শারীরিক কুশল কামনা করি। কলিকাতায় আসিলে অনুগ্রহ করিয়া পূর্বাহ্ণে সংবাদ দিবেন, সাক্ষাতে সকল কথা হইবে।

ইতি

প্রীতিবদ্ধ

শোভাময় চক্রবর্তী

(৮)

সরকারী কর্মচারীর নিকট লিখিত আবেদনপত্র

কলিকাতা ৪ (২) জেলার

আয়কর সমাহর্তা মহোদয় সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার নির্দেশমত আমার দেয় ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আয়কর আমি কলিকাতার কালেক্টর মহোদয়ের অফিসে জমা দিয়াছি এবং জমার যথারীতি রসিদও পাইয়াছি।

এই ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কর নির্ধারণ ব্যাপারে আমার প্রতি কিছু অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি এবং সে বিষয়ে আপনার সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই পত্র লিখিতেছি।

আলোচ্য বৎসরে আমার মোট আয় হইয়াছিল ৮১০০৲ টাকা। এই টাকার মধ্যে ২১১৲ টাকা ব্যাঙ্কের সুদ ছাড়া বাকী সবটাই আমার স্বোপার্জিত এবং সে হিসাবে আমার আয়করের যে ছাড় পাওয়ার কথা, আমার ধারণা আপনার নির্ধারিত হিসাবে ছাড় তদপেক্ষা কম ধরা হইয়াছে। তাছাড়া আমি হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে যে ৩০০০৲ টাকার জীবন বীমা করিয়াছি, তাহার প্রিমিয়াম রসিদগুলি আমার আয়ের হিসাবের সহিত জমা দিতে পারিলেও মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে যে পাঁচ হাজার টাকার জীবনবীমা করিয়াছি, তাহার এই বৎসরের প্রিমিয়ামের রসিদগুলি হারাইয়া যাওয়ায় সেগুলি জমা দিতে পারি নাই এবং সে সম্বন্ধে লিখিত ঘোষণা সন্নিবদ্ধ করিয়াছি। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আয়কর নির্ধারণের সময় আপনি আমার প্রদত্ত প্রিমিয়াম রসিদগুলিই বিবেচনা করিয়াছেন, মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর প্রিমিয়ামের কথা বিবেচনা করেন নাই।

এ অবস্থায় আমার নিবেদন এই যে, আপনি আপনার সুবিধামত আমার ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আয়করের বিবরণীটি (রিটার্ণটি) পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং আমার আয়কর বেশি ধরা হইয়া থাকিলে দয়া করিয়া অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এ সম্পর্কে আপনার সন্তোষ বিধানের জন্য আমি যে কোন দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।

২নং সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্ট্রীট,
কলিকাতা।
২৭শে মে, ১৯৫৯

ইতি
ভবদীয়
সুকুমার মুখোপাধ্যায়

(৯)

চুক্তিমত মাল সরবরাহের দাবী প্রত্যাখ্যান

হিন্দুস্থান কেমিকেল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
রাসায়নিক পণ্য উৎপাদক ও বিক্রেতা

পত্র সংখ্যা—স-১০৭।৫৮
৭২।২, সেণ্ট্রাল রোড,
কলিকাতা।
১৫ই মে, ১৯৫৮

ম্যানেজার,
বাঁকীপুর সোপ ওয়ার্কস লিমিটেড,
বাঁকীপুর, পাটনা, বিহার।

মহাশয়,

আপনার ৯।৫।৫৮ তারিখের পত্রে অবগত হইলাম যে, আমাদের হিন্দুস্থান কেমিকেল ওয়ার্কস্ লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার রায় মহাশয় আপনাদের নিকট ১০ টন কষ্টিক সোডা বিক্রয় করিয়াছেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে মাল পৌঁছাইয়া দিবার সর্তে একশত টাকা অগ্রিম লইয়াছেন। আমাদের সহিত আপনাদের দীর্ঘদিনের কারবার বলিয়া এবং অচিন্ত্যবাবু আমাদের পুরাতন প্রতিনিধি বলিয়া আপনারা বরাবরের মত এবারও তাঁহাকে রসিদ লইয়া অগ্রিম দিয়াছেন। প্রতিশ্রুতি মত ১৫ দিনের স্থলে দেড় মাস অতীত হইয়া গেলেও নির্দিষ্ট মাল আপনাদের হস্তগত না হওয়ায় আপনারা অগত্যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনারা শ্রীঅচিন্ত্যকুমার রায়ের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন। অচিন্ত্যবাবু বহুকাল আমাদের হিন্দুস্থান কেমিকেল ওয়ার্কস লিমিটেডের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সততার অভাবের জন্য গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি কর্মচ্যুত হইয়াছেন। আমাদের

প্রতিষ্ঠানের সহিত বর্তমানে তাঁহার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। তিনি বিদায়-গ্রহণের সময় অন্য সব কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেও একখানি রসিদ বহি (সংখ্যা ১২৫১ হইতে ১৩০০) প্রত্যর্পণ করিতে পারেন নাই এবং এই বহিখানি হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন। আমরা শ্রীঅচিন্ত্যকুমার রায়ের সহিত আমাদের সম্পর্কচ্ছেদের কথা এবং উপরোক্ত হারানো রসিদ বহির কথা কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃত-বাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও যুগান্তরে বিজ্ঞাপিত করিয়াছি এবং সর্ব-সাধারণকে জানাইয়া দিয়াছি যে, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারীর পরবর্তী কালে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার রায়ের সহিত অথবা আমাদের প্রতিষ্ঠানের হারানো ১২৫১ হইতে ১৩০০ সংখ্যা রসিদে কেহ কোন কাজকারবার করিলে তজ্জন্য হিন্দুস্থান কেমিকেল ওয়ার্কস লিমিটেড দায়ী হইবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিজ্ঞাপন আপনাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে বলিয়াই আপনারা এভাবে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

আপনারা আমাদের পুরাতন খরিদ্দার, আমাদের দীর্ঘকালের সম্প্রীতি এই অপ্রীতিকর ঘটনা সত্ত্বেও অটুট থাকিবে বলিয়া আশা করিতেছি।

নমস্কারান্তে,

ভবদীয়
শ্যামাচরণ সেন,
ম্যানেজার,
হিন্দুস্থান কেমিকেল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্

(১০)

প্রেরিত মাল নিম্নশ্রেণীর হওয়ায় প্রতিবাদপত্র

বসুমাতা ভাণ্ডার
সর্বপ্রকার স্টেশনারী পণ্য বিক্রেতা

নবগ্রাম বাজার,
পোঃ অঃ—বাসুদেবপুর
জেলা—বর্ধমান।
১২ই জানুয়ারী, ১৯৫৯

এস. কে. বসু এণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজার
মহোদয় সমীপেষু,
১২, ললিত মুখার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা।

মহাশয়,

আপনারা সংবাদপত্রে গোল্ডেন হেয়ার টনিকের যে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন তাহাতে বলা হয় যে, এই কেশতৈল ব্যবহারে পাকা চুল স্থায়ীভাবে কালো

হয় এবং ইহাতে চুলের কোন ক্ষতি হয় না। আপনাদের হেয়ার টনিক ব্যবহার করিয়া যাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতনামা কয়েক-জনের প্রশংসাপত্রও আপনারা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আপনাদের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে আমরা বিক্রয়ের জন্য ১২ শিশি গোল্ডেন হেয়ার টনিক আনাইয়াছি। ইহার মধ্যে ৬ শিশি ইতিমধ্যে বিক্রীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যাঁহারা এই তৈল ব্যবহার করিয়াছেন, আপনাদের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী তাঁহারা সন্তুষ্ট তো হনই নাই, অধিকন্তু সুস্পষ্টভাবে আমাদের সততায় সন্দেহ করিয়া তাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই হেয়ার টনিক ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের চুল কালো হইবার পরিবর্তে বিশ্রী লাল্‌চে হইয়া গিয়াছে এবং চুলও উঠিয়া যাইতেছে। আমাদের এই পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় খরিদ্দারদের অসন্তুষ্ট করিয়া ব্যবসা করা চলে না, আশা করি ইহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। স্বদেশী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আপনাদের সহিত সহযোগিতা করিতে গিয়া আপনাদের বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করিয়া আমরা বিনাদোষে অপদস্থ হইলাম।

যাহা হউক এই নিকৃষ্ট কেশতৈল আমরা আর খরিদ্দারদিগকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহি এবং তজ্জন্যই পত্রবাহকের সঙ্গে অবিক্রীত ৬ শিশি গোল্ডেন হেয়ার টনিক ফেরৎ দিলাম। দয়া করিয়া মাল বুঝিয়া লইয়া এই ৬ শিশি তৈলের জন্য আমাদের প্রদত্ত মূল্য আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলে বাধিত হইব।

নমস্কারান্তে,

ভবদীয়
রাসবিহারী দাস,
মালিক,
বসুমাতা ভাণ্ডার।

(১১)

মূল্য পরিশোধে অস্বাভাবিক বিলম্বে আদালতের শরণাপন্ন হইবার চরমপত্র

এস্ মুখার্জি এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৬, নবগোপাল দাস লেন,
কলিকাতা।
১২।৫।৫৭

আনন্দ ভূষণ রায়,
মালিক
বান্ধব লাইব্রেরী,
ফিডার রোড, কটক।

মহাশয়,

গত ১২।১।৫৭ তারিখে আমাদের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি শ্রীহেমচন্দ্র বসাক মারফৎ আমাদের প্রকাশিত ৩০খানি হ্যাণ্ডবুক অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমিকস্ ও ৩০খানি বুক অফ মডার্ণ ভার্সের যে অর্ডার আপনারা দিয়াছিলেন, তাহা আমরা ২০।১।৫৭ তারিখে প্রেরণ করিয়াছি। আপনাদের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র যথাসময়ে আসিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দীর্ঘ ৪ মাস অতিক্রান্ত হইলেও উক্ত পুস্তকগুলির জন্য আপনাদের দেয় মূল্য এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমাদের ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী পুস্তক বিক্রেতা হিসাবে আপনাদের শতকরা ২০ টাকা দস্তুরি বাদ দিলেও প্রেরিত পুস্তকগুলির মূল্য হয় ২৪০ টাকা। ইহার মধ্যে অগ্রিম হিসাবে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীহেমচন্দ্র বসাককে প্রদত্ত ২৫ টাকা বাদ দিলে আপনাদের নিকট আমাদের নিট্ পাওনা দাঁড়ায় ২১৫ টাকা।

পুস্তক হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা বড় জোর এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা প্রেরিত পুস্তকের মূল্য আশা করিয়া থাকি। আপনাদের ক্ষেত্রে যেরূপ বিলম্ব হইতেছে, তাহা আমাদের ব্যবসায়ের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আপনাদের সহিত আমাদের এই প্রথম কারবার, প্রথম পরিচয়ে আপনাদের নিকট হইতে আমরা আরও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার আশা করিয়াছিলাম।

পাওনার তাগিদ দিয়া আপনাদিগকে ইতিপূর্বে ১৭।২।৫৭ ও ১৯।৪।৫৭ তারিখে দুখানি পত্র দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা আপনারা সেই পত্র দুইখানির কোনটিরই উত্তর দেন নাই। নিরুপায় হইয়া বর্তমান পত্রখানি

রেজিষ্ট্রি করিয়া পাঠাইতেছি এবং এই পত্রপ্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আপনারা আমাদের সম্পূর্ণ পাওনা (২১৫ টাকা) পাঠাইয়া না দেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব জানিবেন।

আমাদের পাইকার বা এজেণ্টদের সহিত প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করাই আমাদের কাম্য এবং নেহাৎ নিরুপায় না হইলে পাওনা আদায়ের জন্ম আদালতের শরণাপন্ন হওয়া আমাদের নীতি নহে। আশা করি এই পত্র অনুযায়ী আমাদের প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া আপনারা আমাদিগকে আপনাদের সহিত সম্প্রীতি বজায় রাখিবার সুযোগ দিবেন।

ইতি
ভবদীয়
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ম্যানেজার,
এস্. মুখার্জি এণ্ড কোং।

(১২)

পূর্ব-পত্রে উল্লিখিত কারবারের খোঁজখবর

পত্রাঙ্ক : বি ১৪৭।৫৯

ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইলস্ লিমিটেড্
১৩, ব্যালার্ড ষ্ট্রীট, বোম্বাই।
২৮শে মে, ১৯৫৯

ম্যানেজার,
মেসার্স আগরওয়ালা এণ্ড সন্স,
কলিকাতা।

মহাশয়,

১৮, গোলক বসু রোড, কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ী মেসার্স ভারতী বস্ত্র প্রতিষ্ঠান আমাদের কলিকাতার এজেণ্টরূপে অথবা পাইকাররূপে কাজ করিতে চান। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের ব্যবসায়িক সুনাম সম্পর্কে আপনাদের নিকট খোঁজ খবর পাওয়া যাইবে।

আপনারা আমাদের বহু পুরাতন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্বস্ততার সহিত আমরা পরস্পরকে সাহায্য করিয়া আসিতেছি। আমরা আশা করি যথাসত্বর উপরোক্ত ভারতী বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের আথিক সঙ্গতি ও ব্যবসায়িক সততা সম্পর্কে আপনাদের অভিমত জানিতে পারিব। বলা

বাহুল্য, আপনাদের এই অভিমতের উপরই আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ যোগাযোগ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এসম্পর্কে আপনাদের বক্তব্যের গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

কাপড়ের এজেন্সি কারবারে তো বটেই, পাইকারী কারবারেও ব্যবসায়িক সততার মূল্য যে অত্যন্ত বেশি, আপনাদের সে সম্পর্কে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। লেনদেনে অঙ্কের পরিমাণ প্রচুর হয় বলিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতির দিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সুদূর বোম্বাই হইতে কলিকাতার কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানের খবর নেওয়া সহজ নহে। ভারতী বস্ত্র প্রতিষ্ঠান আবেদন-পত্রে আপনাদের নাম উল্লেখ না করিলেও আমাদের পুরাতন সৌহার্দ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমরা আপনাদের নিকট আবেদন-কারীর পরিচিতি সম্পর্কে খোঁজ লইতাম।

অনুগ্রহ করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব এই পত্রের উত্তর পাঠাইবেন। আপনাদের মতামত অনুসারে আমরা ভারতী বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিব।

আপনাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আশা করি ভবিষ্যতে আমরাও আপনাদের কোন না কোন প্রয়োজনে আসিতে পারিব।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইলস্ লিমিটেডের পক্ষে,
আর, জি, শর্মা,
ম্যানেজার।

(১৩)

সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন-পত্র

বসুগ্রাম কলোনী,
রহিমপুর, চব্বিশ পরগণা।
২৩শে আগস্ট, ১৯৫৮

মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়,
চব্বিশ পরগণা।

মহাশয়,

আমরা, আপনার জেলার রহিমপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বসুগ্রাম কলোনীর অধিবাসীবৃন্দ, নিদারুণ বিপন্ন হইয়া আজ এই আবেদন-পত্র লইয়া আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায়

আপনি অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

আমরা, বসুগ্রাম কলোনীর প্রায় পাঁচশত অধিবাসী, আজ একমাস যাবৎ প্রকৃতপক্ষে বহির্জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দুঃসহ জীবন যাপন করিতেছি। আমাদের উপনিবেশটি রহিমপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অথচ উপযুক্ত পথঘাটের অভাবে রহিমপুর ইউনিয়নের সহিত ইহার যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে। এই কলোনীর তিনদিকে রহিমপুর ইউনিয়নভুক্ত বিস্তৃত জঙ্গল ও মাঠ এবং শুধুমাত্র উত্তরদিকে বারদুয়ারী খাল ও তাহার পরপারে আমবাড়ী ইউনিয়নের জগৎপুর গ্রাম। এ যাবৎ খালের উপর একটি কাঠের সেতু ছিল এবং সেতুটি জগৎপুর তেগাছা পাকা রাস্তার সংলগ্ন ছিল বলিয়া বসুগ্রাম কলোনীর আমরা সকলেই উক্ত সেতু ও পথ ব্যবহার করিতাম। সেতুটি খুবই পুরাতন, দুর্ভাগ্য-ক্রমে গত ২৫শে জুলাই বৈকালে সেতুটি অকস্মাৎ ভাঙিয়া পড়ে। বারদুয়ারী খালে এখন বর্ষার সময় যথেষ্ট পরিমাণ জল আছে. সেতুটি ভাঙিয়া যাওয়ায় আমাদের কষ্টের আর সীমা নাই। বাঁশ দিয়া সাময়িক বিপজ্জনক একটি সেতু তৈয়ারী করিয়া সক্ষম পুরুষেরা কোনক্রমে চলাচল করিতেছে, কিন্তু নারী, বৃদ্ধ বা শিশুরা গত একমাস কলোনীর বাহিরে যায় নাই। বাঁশের এই সাঁকো দিয়া মাল চলাচল প্রায় অসম্ভব। অন্য সময় খালটি শুকাইয়া যায় বলিয়া এখানে নৌকারও ব্যবহার নাই।

আমাদের বিপদ এবং অসহায় অবস্থা জানাইয়া আমরা রহিমপুর ও আমবাড়ী ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি মহাশয়দের নিকট বারদুয়ারী খালের কাঠের সেতুটি পুনর্গঠনের জন্য বারবার আকুল আবেদন করিয়াছি, কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাতে রহিমপুর ইউনিয়নের সভাপতি মহাশয় এবং 'বসুগ্রাম কলোনী আমবাড়ী ইউনিয়নের এলাকাভুক্ত নয়'—এই অজুহাতে আমবাড়ী ইউনিয়নের সভাপতি মহাশয় আমাদের বিমুখ করিয়াছেন। এ অবস্থায় সরকারী বদান্যতা ছাড়া আমাদের বাঁচিবার আর কোন উপায় না থাকায় আমরা মহাশয়ের শরণ লইতেছি। আমাদের একান্ত আবেদন, দরিদ্র পাঁচশত নাগরিকের চরম সঙ্কট দূরীকরণে আপনি সত্বর অগ্রসর হইবেন। বসুগ্রাম কলোনীবাসী সকলেরই অবস্থা শোচনীয়, আমরা পূর্ববঙ্গের নিঃস্ব শরণার্থী, সরকারী সাহায্য ও ঋণ লইয়া অতি কষ্টে এই উপনিবেশটি গড়িয়া তুলিয়াছি,

এ অবস্থায় বিনামেঘে বজ্রপাতের মত এই নিদারুণ বিপদ উপস্থিত হওয়ায় আমরা চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি। সেতুটি সংস্কার করিতে প্রায় চারিশত টাকা লাগিবে। এত টাকা দূরের কথা, দশ টাকা সংগ্রহ করাও আমাদের সাধ্যাতীত। রহিমপুর ইউনিয়ন বোর্ড আমাদের নিকট হইতে করগ্রহণ করেন। এ কাজ তাঁহাদেরই করিবার কথা, আমরাও সেইরূপই আশা করিয়া দিন গণিতেছিলাম, তাঁহারা অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় আমরা সম্পূর্ণ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। এসময় আপনি আপনার দুর্গত-কল্যাণ-তহবিল হইতে যদি সেতুটি সংস্কার করিয়া না দেন, তাহা হইলে পাঁচশত লোকের জীবন বিপন্ন হইবে এবং আমাদের পুনর্বাসিত করিতে জাতীয় সরকারের লক্ষাধিক টাকা ব্যয় নিষ্ফল হইবে। নিয়মিত কাজকারবার করিতে না পারায় আমাদের প্রায় সকলের অবস্থাই এখন একান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আর কিছুদিন এইরূপ চলিলে আমাদের অনাহারে মরিতে হইবে।

আপনি মহানুভব সরকারের উপযুক্ত প্রতিনিধি, আমাদের এই আবেদন-পত্রের উত্তরে আপনার সক্রিয় সহানুভূতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

আপনার বিশ্বস্ত,
বসুগ্রাম কলোনীর অধিবাসীবৃন্দ

প্রাপ্তিস্বীকার সর্তে রেজেষ্ট্রিকৃত।
চব্বিশ পরগণা জেলার
মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়,
আলিপুর, কলিকাতা-২৭

---

(১৪)

সদ্য বি. কম্ পাশ বন্ধুকে ব্যবসায়ে নামিবার পরামর্শদান

বেঙ্গল ইনসিওরেন্স কোম্পানী,
শাখা অফিস, মজঃফরপুর।
১৭ই জুলাই, ১৯৫৮

প্রিয় শচীন,

কাল অফিস হইতে ফিরিয়া তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার বি. কম্ পাশের সংবাদে খুবই আনন্দিত হইলাম।

অতঃপর কি করিবে সে সম্পর্কে আমার পরামর্শ চাহিয়াছ। আমার অভিজ্ঞতা কম, তবু যেটুকু ধারণা তদনুসারেই তোমাকে আমার অভিমত জানাইতেছি।

আমার মনে হয় আর তোমার পড়াশুনার প্রয়োজন নাই। তুমি বি. কম্ পাশ করিয়াছ, এম্. কম্ পাশ করিয়া তোমার বিশেষ লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। খুব ভাল ফল হইলে এম্. কম্ পাশে অধ্যাপক হওয়া যায়, সে আশা যখন কম, তখন চাকুরী বা ব্যবসার ক্ষেত্রে বি. কম্ ও এম্. কম্ ডিগ্রির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। এম্. কম্ পড়িতে অন্ততঃ ২ বৎসর লাগিবে, সে সময় অন্যভাবে কাজে লাগাইলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারিবে।

চাকুরীর জন্য চেষ্টা না করিয়া তুমি অবিলম্বে ব্যবসায়ে নামিয়া পড়, ইহাই আমার ইচ্ছা। শুনিয়াছি, গত বৎসর তোমার বাবার মৃত্যুতে তুমি তাঁহার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও বীমা পত্রের দরুণ প্রায় ২৬ হাজার টাকা পাইয়াছ। সেই টাকার এক-তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ে ন্যস্ত করিবার ঝুঁকি তুমি লইতে পারিবে বলিয়াই আশা করিতেছি। যদি একটু দাঁড়াইয়া যাও, চাকুরীর চেয়ে ইহাতে তোমার ভবিষ্যৎও ভাল হইবে; তাছাড়া চাকুরীর চেষ্টা করিলেই আজকাল উপযুক্ত চাকুরী মিলে না। তুমি চাকুরীর চেষ্টা করিয়া যদি বার বার ব্যর্থকাম হও, তাহাতে তোমার কর্মোৎসাহ নষ্ট হইতে পারে। জীবন-সংগ্রামের হিসাবে ইহা ক্ষতিজনক এবং এরূপ হইলে ভবিষ্যতে কোন শ্রমসাধ্য বা দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হওয়াও তোমার পক্ষে কঠিন হইবে।

সময় নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে ব্যবসায়ে নামিলে তুমি এখন কিছুদিন লাভ না পাইলেও ব্যবসাটি দাঁড় করাইবার সুযোগ পাইবে। তুমি বি. কম্ পাশ করিয়াছ, হিসাবপত্র বোঝ, দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা, বাজারে পণ্যের চাহিদা ও যোগান ইত্যাদি সম্পর্কে তোমার ধারণা অনেকটা স্পষ্ট। কাজেই তুমি ব্যবসা করিলে সাধারণ লোকের তুলনায় অল্পায়াসে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে।

আমার মনে হয় সোদপুর স্টেশনের নিকট একটি ঔষধের দোকান এখন খুবই ভাল চলিবে। এক্ষেত্রে কলিকাতার ভাড়া বাড়ী ছাড়িয়া তুমি পানিহাটিতে তোমার গ্রামের বাড়ীতে থাকিয়াই ব্যবসা চালাইতে পারিবে। ইহাতে

তোমার সংসার খরচও অনেকটা বাঁচিবে। তোমার মামার কলিকাতায় অতবড় ঔষধের কারবার, তিনি তোমায় নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন।

সোদপুর ষ্টেশনের কাছে ঔষুধের দোকান করিলে আশেপাশে ৪।৫ মাইল এলাকা হইতে তুমি খরিদ্দার পাইবে। নাটাগড়, ঘোলা, সোদপুর, পানিহাটি, সুখচর প্রভৃতি জনবহুল পুরাতন গ্রাম ছাড়াও এখন আশ্রয়প্রার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় এবং সরকারী সাহায্যে চারিদিকে অসংখ্য উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তোমাদের অঞ্চলে ডাক্তারের অভাব নাই, তুমি কমিশনের ভিত্তিতে কয়েকজন ডাক্তারের সহিত ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা তোমার দোকানে নিয়মিত কিছুক্ষণ করিয়া বসিতেও পারেন এবং রোগীদের তোমার দোকান হইতে ঔষধ কিনিবার নির্দেশ দিতে পারেন। যতদূর জানি ওই অঞ্চলের অধিকাংশ চিকিৎসকেরই নিজস্ব ঔষধালয় নাই। ঔষধের কারবারে যে অন্যায় মুনাফাবৃত্তি চলে, তুমি যদি তাহা হইতে সংযত হইয়া ন্যায্য লাভ কর এবং ভেজাল ঔষধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া শুধু খাঁটি ঔষধ বিক্রয় কর, বর্তমান দুর্নীতির দিনে তোমার খরিদ্দারের অভাব হইবার কথা নয়।

আমার অভিমত জানাইলাম। তোমার নিজের বুদ্ধি যথেষ্ট, তাছাড়া বাণিজ্যিক শিক্ষায় কিছুটা অভিজ্ঞতাও তুমি লাভ করিয়াছ। তুমি নিজে সবদিক বিবেচনা করিয়া তবে কাজে নামিও। যদি ঔষধের ব্যবসা কর, পূর্বাহ্ণে তোমার মামার সঙ্গে ভাল করিয়া পরামর্শ করিও। তাঁহার ঔষধের বড় কারবার, তোমার অবশ্যই অনেক সুবিধা হইবে।

শীঘ্রই আমার কলিকাতায় যাইবার সম্ভাবনা আছে, তখন আরও কথা হইবে।

প্রীতিমুগ্ধ
(স্বাক্ষর)

শ্রীশচীন্দ্র কুমার ঘোষ, বি. কম্.,
পোঃ অফিস ও গ্রাম—পানিহাটি,
জেলা—২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ।

অনুশীলনী

(১) তোমার বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়া বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ চাহিয়া দরখাস্ত কর।

(২) কোন বিদেশী কোম্পানীকে পণ্যের অর্ডার দিয়া একখানি পত্র লিখ।

(৩) বিদেশে মালপত্র পাঠাইবার জন্য কোন বিশেষ কোম্পানীর জাহাজে স্থান ভাড়া লইবার দরখাস্ত কর।

(৪) কোন দুর্ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বীমা কোম্পানীর পক্ষ হইতে বীমাকারীকে দায় মিটাইবার অস্বীকৃতি জানাইয়া একখানি পত্র লিখ।

(৫) আমদানীকৃত পণ্যের ক্ষতিতে রেল কোম্পানীর নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিয়া একখানি পত্র লিখ।

(৬) আমানতকারী হইতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পক্ষ হইতে সুযোগসুবিধা বর্ণনা করিয়া একখানি পত্র লিখ।

(৭) কোন সরকারী করব্যবস্থার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাইয়া দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে একখানি পত্র লিখ।

(৮) কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কের নূতন শাখার ম্যানেজার চাহিয়া ব্যাঙ্কের কার্যকরী পরিচালকের পক্ষ হইতে বিস্তারিত বিজ্ঞাপন রচনা কর।

(৯) বিশেষ কোন উপযুক্ত স্থানে আশ্রয়প্রার্থী উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট জমি দখল করিয়া দিবার একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর।

(১০) কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পুস্তক-ব্যবসায়ী হিসাবে লণ্ডনের কোন পুস্তক-ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহিয়া একখানি পত্র লিখ।

(১১) জমার জন্য তোমার প্রেরিত চেক ভাঙ্গাইতে বিলম্ব করিয়া ব্যাঙ্ক তোমার হিসাবে প্রয়োজনীয় টাকা না থাকার অজুহাতে তোমার প্রদত্ত চেক প্রত্যাখ্যান (dishonour) করিয়াছে। কৈফিয়ৎ চাহিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নিকট একখানি পত্র লিখ।

(১২) তোমার কারবারের কোন কর্মচারী খরিদ্দারের সহিত অভদ্র আচরণ করিয়াছে। ক্ষমা চাহিয়া ও অপরাধীর শাস্তিবিধানের আশ্বাস দিয়া খরিদ্দারের প্রতিবাদ পত্রের উত্তর দাও।

(১৩) কাস্‌টম হইতে মালখালাস করিবার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ চাহিয়া পত্র লিখ।

(১৪) কারবারের ম্যানেজার রূপে এজেন্টের সাম্প্রতিক অমনোযোগিতার ও পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাসের উল্লেখ করিয়া এজেন্টকে সতর্ক করিয়া এক-খানি পত্র রচনা কর।

(১৫) তোমাদের পাড়ার তেলকলে ভেজাল দেওয়া হইতেছে সন্দেহ করিয়া সন্দেহের কারণ বর্ণনা পূর্বক স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে একখানি পত্র লিখ।

(১৬) কলা বা বিজ্ঞান না পড়িয়া তুমি বাণিজ্যিক (Commerce) শিক্ষা লইতে আসিলে কেন, তাহা যুক্তিসহ বুঝাইয়া তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

(১৭) নিউইয়র্কে তোমার কলিকাতাস্থ ভারতীয় শিল্পকলার দোকানের একটি শাখা স্থাপনের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে পরামর্শ চাহিয়া আমেরিকা প্রবাসী তোমার বন্ধুর নিকট একখানি পত্র লিখ।

(১৮) ভারতে তাঁহাদের উৎপন্ন পণ্যের সোল্ এজেন্ট হইবার আবেদন জানাইয়া অষ্ট্রেলিয়ার কোন নবগঠিত 'গুঁড়া দুধ' উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি পত্র লিখ।

অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক পরিভাষা *

A

Abatement—ছুট, বাদ

Abbreviation—সংক্ষেপণ

Ab initio—প্রথমাবধি

Abrasion—মুদ্রায় ধাতুক্ষয় বা ধাতু ঘাটতি

Absolute—পরম

Acceptance of bill—হুণ্ডি স্বীকার

Above par—সমমূল্যোত্তর, অধিহারে

Accepting house—হুণ্ডি সাকরাণী ঘর (ব্যাঙ্ক)

Acceptance qualified—সর্তাধীন সাকরাণ বা স্বীকৃতি

Acceptor—সকারু (সাকরাণকারী)

Accessio—আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি

Accommodation, temporary—সাময়িক ব্যবস্থা

Account, abstract—চুম্বক হিসাব

Account of assessment, receipts and balances—জমা, ওয়াশীল ও বাকীর হিসাব

Account, bad debts—নাজাই (অনাদায়ী পাওনা) খাত

Account book—হিসাব বহি

Account cash—রোকড় খাতা

Account, current—চলতি হিসাব

Account, dead—বাতিল (তামাদি) হিসাব

Account, drawing—স্বহিসাবে টাকা লওয়া (ব্যবসায়ে)

Account, joint—যৌথ হিসাব

Account, miscellaneous—বিবিধ হিসাবে, হরজাই দফে

Account, nominal—প্রাথমিক হিসাব, নামিক হিসাব

Account, profit and loss—লাভ লোকসানের হিসাব

Account, rough—কাঁচা খাতা

Account, sales—বিক্রয় বিবরণী

Account, suspense—নামে হিসাব, প্রলম্বিত হিসাব

Account, transfer—পাল্টা জমাখরচ

Account, travelling—রাহা খরচ

Account, written off—বাতিল হিসাব

Accountant—হিসাবনবিশ

Accumulated—সঞ্চিত, মজুত

Acknowledgement—প্রাপ্তিস্বীকার

Acquittance— ফারখতি (মুক্তিপত্র), ঋণপরিশোধ

Actuary—বীমাসংক্রান্ত গণনাকুশল ব্যক্তি, বীমা পরতালক

Ad interim—অন্তর্বর্তীকালীন

Adjudication—আইনসঙ্গত মীমাংসা

Adjustment—নিষ্পত্তি, মিলকরণ

Admeasure—পরিমাপ করা

Administration—পরিচালন

Advalorem duty—মূল্যানুযায়ী শুল্ক

---

* অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল শব্দটিকে প্রথমে রাখিয়া শব্দগুলি সাজানো হইয়াছে ; যেমন—Capital, authorised = Authorised capital.

Advance—দাদন, বায়না
Affidavit—হলফনামা
After sight—মেয়াদ অন্তে, মুদ্দতি
Agency—আড়তদারী, কারপরদাজী
Agent—প্রতিনিধি, মুৎসদ্দী কারপরদাজ
Agio—মুদ্রামূল্যের তারতম্য, মুদ্রাবাট্টা
Agreement—চুক্তি, চুক্তিপত্র
„ co-lateral—আঙ্গিক চুক্তি
„ contingent—আনুষঙ্গিক চুক্তি
„ standstill—স্থিতাবস্থা চুক্তি
Agrarian—ভূমি-সম্পর্কিত
Agriculture, extensive—ব্যাপক চাষ
Agriculture, intensive—আত্যন্তিক চাষ
Agricultural credit society—কৃষি ঋণদান সমিতি
Alienation of land—জমি হস্তান্তর
Allocation—বণ্টন
Allodial land—নিষ্কর (লাখেরাজ) ভূমি
Allonge—হুণ্ডী-পত্রী
Allotment—বিলিকরণ
Allowance, compensatory—ক্ষতিপূরণ ভাতা
Allowance, conveyance—যান-বাহন ভাতা
Allowance, dearness—মাগ্‌গী ভাতা
Allowance, halting—বিরাম অধিদেয়
Alloy—খাদ (মিশ্রধাতু)
Amalgamation—একত্রীকরণ
Amortisation—ক্রমশোধ (ঋণ)
Anarchism—নৈরাজ্যবাদ
Annuity—বার্ষিক বৃত্তি, সালিয়ানা
Annuity fund—বৃত্তি (বার্ষিক) তহবিল
Antecedents—প্রাক্-পরিচয়
Anticipation—পূর্বানুমান
Appendix—পরিশিষ্ট
Appraiser—যাচনদার, মূল্যনির্ধারক
Appreciation—মূল্যবৃদ্ধি, উপচয়
Apprentice—শিক্ষানবিশ
Appropriation—উপযোজন
Appropriation account—লাভ বণ্টন (বিভাজন) খাত
Approval—অনুমোদন
Approximate—কাছাকাছি
Approximation—সন্নিকর্ষ, আসত্তি
Arable—কর্ষণোপযোগী (জমি)
Arbitrage—পরোক্ষ হুণ্ডি ভাঙ্গান (হুণ্ডি মূল্যান্তর লাভের জন্য ক্রয় বিক্রয়)
Arbitration—সালিশী
Aristocracy—অভিজাত সম্প্রদায়
Arrear—বাকী, বকেয়া
Articles of Association—অনুষ্ঠান-পত্র (কোম্পানীর বিধানপত্র)
As per—অনুযায়ী
Artisan—কারিগর, শিল্পী
Assay—যাচাই
Assessment—নির্ধারণ (কর)
Assets—সম্পত্তি
Assets, blocked—আটক সম্পত্তি
Assets, fictitious—অবাস্তব সম্পত্তি
Assets, floating or circulating—চলতি সম্পত্তি
Assets, immovable—স্থাবর সম্পত্তি

Assets, liquid—নগদ বা নগদাস্বরূপ সম্পত্তি
Assets, movable—অস্থাবর সম্পত্তি
Assignment—হস্তান্তরকরণ
Assignee—মনোনীত ব্যক্তি (স্বত্ব হস্তান্তরে)
Assignee, Official—সরকারী তত্ত্বাবধায়ক (দেউলিয়া সম্পত্তির)
Assort—বাছাই করা
Association—সঙ্ঘ
Association, memorandum of—পরিমেল, প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপি
At call—তলবমতে, চাহিবামাত্র দেয়
At par—সমমূল্যে
At premium—অতিরিক্ত মূল্যে, বাড়তি দামে
At sight—দর্শনী, দৃষ্টিমাত্রে
Attachment—ক্রোক
Attestation—প্রমাণ, প্রত্যায়ন
Attorney, power of—আম্‌-মোক্তারনামা
Auctioneer—নিলামদার (লাইসেন্স প্রাপ্ত)
Audit—হিসাব পরীক্ষা
Authentic—প্রামাণিক
Autonomy—স্বায়ত্তশাসনাধিকার
Auxiliary—সহায়ক
Average general (A.G.)—সমষ্টি-গত ক্ষতি (জাহাজী বীমা সংক্রান্ত)
Average, successive—ক্রমিক গড়
Aviation, civil—অসামরিক বিমান চলাচল
Award, interim—অন্তর্বর্তী রোয়েদাদ

B

Bail bond—জামানতনামা, জামিন নামা
Bailment—ফেরতের নির্দিষ্ট সর্তে হস্তান্তর
Balance—উদ্বৃত্ত, তুলাদণ্ড
Balancing an account—কৈফিয়ৎ কাটা
Balance, cash—নগদান উদ্বৃত্ত
Balance, closing—অন্তিম উদ্বৃত্ত, সর্বশেষ হিসাবের জের
Balance, credit—জমার জের, জমা বাকি
Balance, debit—ফাজিল বাকি, খরচের জের
Balance, opening—পূর্ববর্তী হিসাবের জের, প্রারম্ভিক স্থিতি
Balance of Payments —দেনা-পাওনার বকেয়া
Balance of trade—বাণিজ্যিক গতি, বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত
Balance sheet—উদ্বর্ত পত্র, পাকা চিঠি
Balance, trial—রেওয়া মিল
Balancing the scale—পাষাণভাঙ্গা
Bale—গাঁইট
Bank—ব্যাঙ্ক (অধিকোষ)
Bank acceptance—ব্যাঙ্কের অনুমোদন
Bank bill—ব্যাঙ্কের হুণ্ডি
Bank charges—ব্যাঙ্কের পাওনা বা পারিশ্রমিক
Bank reconciliation—ব্যাঙ্কের হিসাব মিল
Bank, indigenous—দেশীয় ব্যাঙ্ক, মহাজনী কারবার

Bank note—ব্যাঙ্কের নোট (ঋণ-স্বীকৃতি পত্র)
Bank rate—ব্যাঙ্কের হার
(অনুমোদিত ব্যবসায়ী হুণ্ডি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টা হার)
Bank rebate—ব্যাঙ্কের ছাড়
Bank reference—ব্যাঙ্কের সুপারিশ (অভিমত)
Bank return—ব্যাঙ্কের বিবরণ
Bank, co-operative—সমবায় ব্যাঙ্ক
Bank, scheduled—তপশীলী ব্যাঙ্ক
Bankrupt—দেউলিয়া
Barred by limitation—তামাদি হওয়া
Bargain—সুবিধাজনক চুক্তি
Barter—পণ্যবিনিময়
Bear—নিম্নগ, মন্দীওয়ালা
Bid—ডাক (নিলামের)
Bill—হিসাবপত্র, হুণ্ডি, আইনের খসড়া
Bill, acceptance of—হুণ্ডি স্বীকার
Bill, accommodation—উপযোজক হুণ্ডি, সুপারিশী হুণ্ডি
Bill at sight—দর্শনী হুণ্ডি
Bill, back a—হুণ্ডি পিছসহি
Bill broker—হুণ্ডির দালাল
Bill, clean—শুদ্ধ হুণ্ডি (বিল)
Bill collection rate—হুণ্ডির আদায়ী হার
Bill, contingent—মূল্যপত্র (নৈমিত্তিক)
Bill of store—শুল্ক ছাড়পত্র
Bill on demand—দর্শনী হুণ্ডি
Bill, discounting of—হুণ্ডি ভুক্তান
Bill, dishonoured—ফিরতা (প্রত্যাখ্যাত) হুণ্ডি
Bill, documentary—দলিলী হুণ্ডি
Bill, duplicate of—পৈঠ
Bill, triplicate of—অরপৈঠ
Bill of entry—দাখিলী পণ্যের তালিকা
Bill of exchange—হুণ্ডী (ব্যবসায়ী), বরাত-চিঠি
Bill, inland—দেশী বরাত-চিঠি
Bill, foreign—বিদেশী বরাত চিঠি
Bill of lading—চালানী রসিদ (জাহাজের)
Bills payable account—দেয় বিলের হিসাব
Bill of right—অধিকার পত্র
Bill of sale—কবালা (বিক্রয়পত্র)
Bill of sight—নিদর্শনপত্র (আমদানী মাল সম্পর্কে আমদানী কারকের)
Bill on sight (payable after date)—মুদ্দতী হুণ্ডি
Bill of store—শুল্ক ছাড়পত্র
Bill, usance or time—মুদ্দতী বা মেয়াদী হুণ্ডি
Bill, treasury—সরকারী হুণ্ডি
Bimetallism—দ্বিধাতুমান
Birth register—জন্ম খতিয়ান
Black market—চোরাবাজার
Blockade—অবরোধ
Blue book—সরকারী কার্যবিবরণী (নিয়মতান্ত্রিক রিপোর্ট)
Board—মণ্ডলী, পর্ষদ্
Board, debt settlement—ঋণ সালিশী বোর্ড
Bond—চুক্তিপত্র, বন্ধকীপত্র, তমসুক, একরারনামা

Bond, active—চলৎপাট্টা
Bond, passive—সুদহীন তমসুক
Bondholder—উত্তমর্ণ
Bondman—প্রতিভূ
Bond, indemnity—ক্ষতিপূরণ পত্র (দস্তাবেজ)
Bond, mortgage—বন্ধক পাট্টা (রেহেনী খত)
Bond security—জামিননামা
Bonded goods—শুল্কাধীন (অদত্ত-শুল্ক) পণ্য (সরকারী গুদামে জমা)
Bonded store, warehouse or godown—শুল্কবাকী মালগুদাম
Bonus—লভ্যাংশ
Book, abstract—চুম্বক (সংক্ষিপ্ত) হিসাব বহি
Book of original entry—হিসাবের প্রাথমিক বহি
Book-keeping—হিসাব রক্ষণ
Book-purchases, daily—দৈনিক খরিদা বহি
Book-sales daily—দৈনিক বিক্রয় বহি
Book, returns—ফিরতা বহি
Boom—হঠাৎ বাজার গরম করা, তেজী বাজার
Borrower—অধমর্ণ
Bottomry—জাহাজ বন্ধকী ঋণ
Bounty—সরকারী বৃত্তি (অর্থসাহায্য)
Bought note—ক্রয়পত্র
Bourgeoisie—পরশ্রমজীবী
Brassage—মুদ্রা-বাণি (মুদ্রণের)
Broker, sole—বাঁধী দালাল
Brokerage—দালালী
Brought forward—জের
Budget—আয়ব্যয় বরাদ্দ, আয়ব্যয়ক,
Budget estimate—আয়ব্যয় বরাদ্দ অনুমান
Bull—ঊর্ধ্বগ, তেজীওয়ালা
Bulletin—ইস্তাহার
Bullion—বাট বা পিণ্ড
Bureaucracy—আমলাতন্ত্র
Business—কারবার
Business cycle—ব্যবসায় চক্র
Bye-law—উপবিধি
Bye-product—উপজাত পণ্য

C

Cabinet—মন্ত্রিসভা
Cadastral survey—দেশব্যাপী জরিপ
Call—কিস্তির তলব (অংশীদারকে অপরিশোধিত অর্থ প্রদানের আহ্বান)
Cambist—হুণ্ডি ব্যবসায়ী (মুদ্রা বিনিময় বিশেষজ্ঞ)
Canal, perennial—নিত্যবহ খাল
Cancellation—বাতিল করণ
Canon of convenience—সুবিধার সূত্র
Canvasser—উপার্থক
Capacity—ধারণশক্তি
Capital—মূলধন, পুঁজি
Capital, authorised—অনুমোদিত মূলধন
Capital, auxiliary—সহায়ক মূলধন
Capital, borrowed—ঋণীকৃত মূলধন
Capital, called up—তলবী মূলধন
Capital, circulating or floating—চলতি মূলধন
Capital, consumption—ভোগ-পুঁজি

Capital, fixed—স্থায়ী (বদ্ধ) মূলধন
Capital, foreign—বৈদেশিক মূলধন
Capital formation—মূলধন গঠন
Capital, indigenous—দেশীয় মূলধন
Capital, instrumental—সহায়ক মূলধন
Capital, investment of—মূলধন লগ্নীকরণ
Capital, issued—বিলিকৃত মূলধন
Capital, joint—সম্মিলিত মূলধন
Capital outlay (investment)—মূলধন বিনিয়োগ
Capital, paid up—আদায়ীকৃত (প্রাপ্ত) মূলধন
Capital, subscribed—প্রতিশ্রুত মূলধন
Capital, sunk—ব্যয়িত মূলধন
Capital, working—কার্যকরী মূলধন
Capital, glut of—মূলধন-প্রাচুর্য
Capital goods—মূলপণ্য (যন্ত্রপাতি)
Capitalism—ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ
Capitalist—পুঁজিপতি
Cargo—জাহাজী মাল
Carriage charge—বহনী খরচ
Carry forward—জের টানা
Cartel—মূল্যনিয়ন্ত্রক ব্যবসায়ী সঙ্ঘ (পণ্যমূল্য চড়া রাখিবার উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদনকারীদের সংস্থা)
Cash—নগদ টাকা, রোকড়
Cash book or register—রোকড় বহি বা নগদান খাতা
Cash entry—রোকড়বন্দ
Cash, hard—নগদ টাকা
Cash credit—রোকড় হিসাব (ব্যক্তিগত জামিনে বা গচ্ছিত টাকার জামিনে ব্যাঙ্ক হইতে স্বল্পমেয়াদে টাকা তুলিবার অধিকার)
Cash transaction—নগদ লেনদেন
Cashier—খাজাঞ্চী
Caution money—জামানতী টাকা
Caveat emptor—ক্রেতার দায়িত্ব
Census—আদমসুমারী
Central Bank—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক
Certificate—প্রশংসাপত্র, অভিজ্ঞানপত্র
Certificate of identity—অভিজ্ঞাপত্র
Certificate of incorporation—সমিতিভুক্ত হওয়ার নিদর্শন পত্র
Certificate of origin—জন্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞানপত্র, প্রভবলেখ
Certificate, sale—বয়নামা
Certificate, succession—উত্তরাধিকার পত্র
Cess—কর (বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত)
Chamber of Commerce—বণিক সমিতি
Chancellor of Exchequer—অর্থসচিব
Charge, contingent—সম্ভাব্য ব্যয়
Charge, direct—প্রত্যক্ষ ব্যয়
Charges, overhead—পরিচালনা ব্যয় (গড়পড়তা)
Charter—সনদ
Chattel—নিষ্কর (লাখেরাজ) ব্যতীত অন্য সম্পত্তি, জায়দাদ
Cheap money—সস্তা টাকা

Cheque, account payee—নির্দিষ্ট হিসাবে দেয় চেক
Cheque, bearer—বাহক-প্রদেয় চেক
Cheque, payable to order—আদিষ্ট দেয় চেক
Cheque, crossed—ব্যাঙ্কের হিসাবে প্রদেয় চেক
Cheque, dishonoured—ফিরতা বা প্রত্যাখ্যাত চেক, অস্বীকৃত চেক
Cheque, out of date—মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক
Cheque, post-dated—মেয়াদী চেক
Cheque-book—চেকবহি
Circular—পরিপত্র
Civic—পৌর
Civil—দেওয়ানী
Civil supply—অসামরিক সরবরাহ, জনসংভরণ
Claimant—দাবীদার
Classification—বর্গীকরণ, শ্রেণীভুক্তি
Clearing bank—নিকাশী ব্যাঙ্ক
Clearing house—চেক বিনিময় কেন্দ্র, নিকাশ ঘর
Clearance sale—নিকাশ বিক্রয়
Client—মক্কেল
Closing entries—আখেরী হিসাব
Closing stock—শেষ মজুত মাল
Code—সঙ্কেত
Coinage, restricted—সঙ্কুচিত মুদ্রা মুদ্রণ
Coin, artificial—কৃত্রিম মুদ্রা
Coin, bad, false or counterfeit—জাল মুদ্রা
Coin, base—হীন মুদ্রা
Coin, standard—আদর্শ বা মানমুদ্রা
Coin, subsidiary—আনুষঙ্গিণী মুদ্রা
Coin, token—নিদর্শক মুদ্রা
Collective bargaining—যৌথ দর কষাকষি সওদা
Collective security—সম্মিলিত নিরাপত্তা
Collectivism—সঙ্ঘক্রিয়াবাদ, সমূহ-তন্ত্র
Colony—উপনিবেশ
Columnar Cash-book—পৃথক-ঘরা নগদান বহি
Combination—একার্থ সঙ্ঘ
Combination, horizontal—সম-শিল্প সমবায়
Combination, vertical—ভিন্নশিল্প সমবায়
Commerce—বাণিজ্য
Commercial—ব্যবসায়িক
Commission—মজুরি
Committee, executive—কার্য-করী সমিতি
Commodity—পণ্য
Communalism—সাম্প্রদায়িকতা
Communism—সাম্যবাদ
Community development—সমাজ উন্নয়ন
Communication—সমাযোজন
Commutation—লঘুকরণ, পরিবর্তন
Company, joint stock—যৌথ কারবার
Company, private limited—গণ্ডীভুক্ত যৌথ কারবার
Compensation—ক্ষতিপূরণ, খেসারৎ
Competition—প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগ
Complementary—অনুপূরক

Compromise—নিষ্পত্তি, রফা
Concession—রেয়াৎ
Condition—সর্ত
Confederation—সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্রমণ্ডল, সংরাষ্ট্র
Confidential—গোপনীয়
Confiscated—বাজেয়াপ্ত
Confirm—মঞ্জুর করা, বহাল করা
Consequential loss —পরোক্ষ (পরিণামভূত) ক্ষতি
Conservation—সংরক্ষণ
Consideration—প্রতিলাভ, ক্ষতিপূরণ
Consignment—চালান
Consignee—প্রাপক
Consignor—প্রেরক
Consols or consolidated annuities—একত্রীভূত বার্ষিক বৃত্তি
Consolidated—থোক, সম্মিলিত
Consolidation of holdings—জমি একত্রীকরণ
Constituent assembly—গণপরিষদ
Consumer—পণ্যব্যবহারকারী
Consumer's goods—ভোগ্যপণ্য
Consumer's surplus—ভোগোদ্বৃত্ত
Consumption—ব্যবহার, ভোগ (খাদন)
Contango—অগ্রিম চুক্তির দক্ষিণা, হর্জানা
Contingencies—সম্ভাব্য ব্যয়
Contra-Entry—পাল্টা হিসাব
Contract, breach of—চুক্তিভঙ্গ
Contract, legal—বৈধ চুক্তি
Contract note—চুক্তিপত্র
Contract, contingent—আনুষঙ্গিক চুক্তি
Contract, co-lateral—আঙ্গিক চুক্তি
Contract, forward—অগ্রিম চুক্তি
Contract, unilateral—একতরফা চুক্তি
Control—নিয়ন্ত্রণ
Controller, export and import—আমদানী রপ্তানী নিয়ামক
Conventional—প্রথানুযায়ী
Conversion—রূপান্তর
Conversion of debt—কর্জরূপান্তর
Convertible paper money—বিনিমেয় (পরিবর্তনীয়) কাগজী মুদ্রা
Co-operation—সমবায়, সহযোগ
Co-operative movement—সমবায় আন্দোলন
Co-operative credit society—সমবায় ঋণদান সমিতি
Co-operative store—সমবায় ভাণ্ডার
Co-partnership—সহ-মালিকানা, ভাগী কারবার
Corporation—বিধিবদ্ধ যৌথ প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা, সঙ্ঘ, সমবায়
Corporation rate—নিগম করহার
Copyright—গ্রন্থস্বত্ব
Copy, spare—অতিরিক্ত প্রতিলিপি
Corner—একচেটিয়া, একায়ত্ত (পূর্ণায়ত্ত পণ্য যথেচ্ছ দরে বিক্রয়)
Corvee—বেগার
Co-relation—পারস্পরিক সম্পর্ক
Cost, comparative—আপেক্ষিক ব্যয়, পড়তা
Cost, establishment—সংস্থারক্ষার ব্যয়, সরঞ্জামী ব্যয়
Cost, marginal—প্রান্তিক ব্যয়

Cost, overhead—পরিচালনা ব্যয় (গড়পড়তা)
Cost, prime ; cost price—আসল দাম, ক্রয় মূল্য, পড়তা
Cost, preliminary—প্রাথমিক ব্যয়
Cost of production—উৎপাদন ব্যয়
Cost sheet—উৎপাদন ব্যয়ের হিসাব (নির্দিষ্ট সময়ের)
Cottage industry—কুটিরশিল্প
Counteract—প্রতিক্রিয়া
Counter-balance—ভারসাম্য
Counter signature—প্রতিস্বাক্ষর
Counterfeit—জাল, মেকি
Counterfoil—প্রতিপত্র, মুড়ি (চেকমুড়ি)
Countermand—প্রত্যাহার
Counterpart—মুড়ি, প্রতিমান
Countervailing duty—সমকারী শুল্ক (দেশী বিদেশী পণ্যসম্পর্কে)
Covenant—চুক্তি
Craftsman—কারিকর, শিল্পী
Craft guild—কারুসঙ্ঘ
Credit—ধার, বাজার সম্ভ্রম, জমা (খাত)
Credit account—জমার হিসাব
Credit entry—জমার দাখিলা
Credit balance—উদ্বৃত্ত তহবিল, জমাবাকী
Credit, firm's—কারবারের সুনাম
Credit money—আস্থাসাপেক্ষ গ্রহণযোগ্য মুদ্রা
Credit note—খরচ চিঠা, নামে জমা (প্রথম চালানের ভুল সংশোধনার্থক)
Credit purchase—ধারে ক্রয়
Credit side—জমার খাত
Creditor—উত্তমর্ণ
Crisis, constitutional—নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কট
Criterion—নির্ণায়ক
Crop, cash or money—অর্থকরী শস্য
Crop, mixed—মিশ্র ফসল
Crown land—খাসমহল
Cultivation, extensive—ব্যাপক ভূমিকর্ষণ
Cultivation, intensive—নিবিড় বা আত্যন্তিক ভূমিকর্ষণ
Cum-dividend—লভ্যাংশসহ
Cumulative—স্তূপীকৃত
Currency—মুদ্রা
Currency note—কাগজী মুদ্রা
Currency, contraction of—মুদ্রাসঙ্কোচন
Currency, deflation of—মুদ্রাসঙ্কোচন
Currency, devaluation—মুদ্রামূল্য হ্রাস
Currency, expansion of—মুদ্রাসম্প্রসারণ
Currency, hard—দুর্লভ মুদ্রা
Currency, soft—সুলভ মুদ্রা
Currency, inflation of—মুদ্রাস্ফীতি
Currency, managed—নিয়ন্ত্রিত (রাষ্ট্র কর্তৃক) মুদ্রাব্যবস্থা
Currency system—মুদ্রানীতি
Customs duty—শুল্ক (বহির্বাণিজ্যিক
Custom-house—মাশুল ঘর
Cycle, trade—ব্যবসায়-চক্র, বাণিজ্য-চক্র

Cyclical fluctuation—চক্রানুক্রমিক আবর্তন

D

D.A. (Documents on acceptance)—দায়স্বীকার, দলিল সাপেক্ষ
Dam—বাঁধ
Data —তথ্য
Day book (Journal)—জাবেদা, টোকচা খাতা
Day labourer—দিনমজুর
Days of grace—অনুগ্রহজ সময়, রেয়াতী সময়
Day, man—কাজের দিন
Day of maturity—হুণ্ডি চুকাইবার দিন
Dead loss—পূরা লোকসান
Dead rent—নিম্নতম নির্দিষ্ট খাজনা
Dealer—ব্যবসায়ী
Dealer, retail—খুচরা বিক্রেতা
Dealer, wholesale—পাইকারী বিক্রেতা
Death duty—মৃত্যুকর
Death rate—মৃত্যুহার
Debenture—ঋণপত্র, তমসুক
Debenture, naked—বন্ধকহীন তমসুক
Debenture, mortgage—প্রতিষ্ঠানের বন্ধকী তমসুক
Debenture, redeemable—মেয়াদী ঋণপত্র
Debit—খরচ, দেয় খাত
Debit, balance—ফাজিল বাকী
Debit note or voucher—জমা চিঠা, নামে বাকী (প্রথম চালানের ভুল সংশোধনার্থক)
Debit side—খরচ খাত (হিসাবে)
Debt, bad—অনাদায়ী দেনা
Debt, book—পাওনা টাকা (কোম্পানীর)
Debt, conciliation of—ঋণ মীমাংসা
Debt, funded—মেয়াদী (স্থায়ী) ঋণ (কোন দেশ বা জাতির)
Debt, floating—চলতি (চাহিদামাত্র পরিশোধনীয়) ঋণ
Debt, liquidation of—ঋণ পরিশোধ
Debt, national—জাতীয় ঋণ
Debt, public—জাতীয় (সরকারী) ঋণ
Debt, recovery of—ঋণ উশুল (আদায়)
Debt, redemption of—ঋণমুক্তি
Debt, repudiation of—ঋণ অস্বীকার
Debt, unfunded—স্বল্পকালীন ঋণ (দেশ বা জাতির)
Debtor—অধমর্ণ, দেনাদার
Decentralisation—বিকেন্দ্রীকরণ
Declared value—ঘোষিত মূল্য
Deed of agreement—চুক্তিপত্র
Deed of acquittance—মুক্তিপত্র
Deed of assignment—অর্পণ নামা
Deed of gift—দানপত্র
Deed of mortgage—বন্ধকী খত
Deed of conditional sale—কটকবালা
Deed of sale—কবালা
Defalcation—তহবিল তছরূপ
Deferred pay—স্থগিত বা বিলম্বিত (অবসর গ্রহণকালে বা মৃত্যুকালে প্রদেয়) বেতনাংশ

Deferred rebates—ফেরৎ ভাড়া (রপ্তানী মালের) ভবিষ্যতে প্রত্যর্পণীয় মূল্য বা মাশুলের অংশ
Deferred expenditure—স্থগিত ব্যয়
Deferred shares—ঘরের শেয়ার (প্রতিষ্ঠাতা বা পরিচালকের অংশ, অন্য সর্বপ্রকার শেয়ারের পর ইহার লভ্যাংশ দেওয়া হয়)
Deficiency or Deficit—ঘাটতি, ঊনতা
Deflation—সঙ্কোচন (মুদ্রাসঙ্কোচন)
Del credere—ক্রেতার জামিন (এজেন্টদের)
De jure—আইনতঃ
Delivery, express—দ্রুত বিলি
Demand, alternative—বিকল্প চাহিদা
Demand, competitive—প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা
Demand, composite—মিশ্র চাহিদা, মিলিত চাহিদা
Demand, continuous—অবিরাম চাহিদা
Demand, contraction of—চাহিদার সঙ্কোচ
Demand, curve—চাহিদা রেখা
Demand, definite—নির্দিষ্ট চাহিদা
Demand, direct—প্রত্যক্ষ চাহিদা
Demand, derived—উদ্ভূত চাহিদা
Demand, effective—কার্যকরী চাহিদা
Demand, elasticity of—চাহিদার নম্যতা বা পরিবর্তনশীলতার হার
Demand, genuine—প্রকৃত চাহিদা
Demand, inelastic—স্থিতিস্থাপক বা অপরিবর্তনীয় চাহিদা
Demand, intensity of—চাহিদার প্রাবল্য
Demand, joint—মিলিত চাহিদা
Demand, loans—প্রার্থিত কর্জ
Demand, marginal—প্রান্তীয়, সীমান্ত বা পার্যন্তিক চাহিদা
Demand price—চাহিদা মূল্য
Demand, reciprocal—পারস্পরিক চাহিদা
Democracy—গণতন্ত্র
Demonetisation—মুদ্রাবিচ্যুতি, মুদ্রার প্রচলন রদ
Demurrage—বিলম্বে মালখালাসের ক্ষতিপূরণ
Depopulation—জনশূন্যকরণ
Deposit—গচ্ছিত, আমানত, ন্যাস
Deposit account—আমানতের বা জমার হিসাব
Deposit, cash—নগদ আমানত
Deposit, current—চলতি আমানত
Deposit, fixed—স্থায়ী আমানত
Deposit receipt—জমার রসিদ
Deposit, time—মেয়াদী আমানত
Depositor—আমানতকারী
Depreciation—মূল্যহ্রাস, মূল্যাপকর্ষ, অবচয়
Depression—মন্দা
Differentiation—বিভেদন
Diminishing returns—ক্রমিক আয়হ্রাস, নিম্নগ আয়
Diminishing utility—উপযোগিতার ক্রম হ্রাস
Director—পরিচালক, অধিকর্তা
Director, board of—পরিচালকসঙ্ঘ

Director, managing—কর্মাধ্যক্ষ, কার্যকরী পরিচালক
Disbursing officer—ব্যয়াধিকারিক
Discount, cash—নগদান বাট্টা
Discount broker—হুণ্ডির দালাল
Discount, at a—বাজার দরের কমে
Discount, bill—বিল (হুণ্ডি) ভাঙ্গানো
Discount, market rate of—চলতি বাজারের বাট্টাহার
Discount rate—বাট্টাদর
Discrimination—তারতম্য
Discount, trade—ব্যবসায়িক বাট্টা
Dishonoured cheque or bill of exchange—প্রত্যাখ্যাত (অস্বীকৃত) চেক বা হুণ্ডি
Distribution, qualitative—গুণানুসারে বণ্টন
Dividend—লভ্যাংশ
Dividend, cum—লভ্যাংশ সমেত
Dividend, ex—লভ্যাংশ বাদে
Dividend, interim—মধ্যবর্তী-কালীন লভ্যাংশ
Dividend, national—জাতীয় আয় (নির্দিষ্ট সময়ের)
Dividend, warrant—লভ্যাংশপত্র
Division of labour—শ্রমবিভাগ
Document on acceptance (D.A.) দায় স্বীকারে দলিলছাড়
Document on Payment (D.P.)—আদায় সাপেক্ষ দলিলছাড়
Domestic— গার্হস্থ্য
Domiciled—স্থায়ী বাসিন্দা
Dose—মাত্রা
Double entry—তকরারী নিয়ম, দোতরফা দাখিলা
Double standard—দ্বিমান
Draft—বরাতি হুণ্ডি, ব্যাঙ্কের নির্দেশপত্র (টাকা দিবার)
Draft, demand or sight—দর্শনী হুণ্ডি
Draft, telegraphic—তার হুণ্ডি
Drawer—হুণ্ডিপ্রেরক (যিনি হুণ্ডি কাটেন)
Drawee—হুণ্ডি-প্রাপক(যাঁহার নামে হুণ্ডি কাটা হয়)
Drawback—রেয়াইত নগদ, শুল্ক ফেরৎ
Due—বাকী
Dumping—ক্ষতি স্বীকারে পণ্য-বিক্রয় (বিদেশের বাজারে)
Duplicate—প্রতিরূপ
Duty, ad valorem—মূল্যানুযায়ী শুল্ক
Duty, customs—বন্দর-শুল্ক
Duty, death—মৃত্যুকর
Duty, discriminating—প্রভেদাত্মক শুল্ক
Duty, excise—আবগারী শুল্ক, উৎপাদন শুল্ক
Duty, export—রপ্তানী শুল্ক
Duty, import—আমদানী শুল্ক
Duty, preferential —পক্ষপাত-মূলক শুল্ক
Dynamics—গতিবিজ্ঞান
Duty, protective—সংরক্ষণ শুল্ক

E

E. & O. E.—ভুল বাদে
Earmarked—নির্দিষ্ট
Easy market—স্তিমিত (অনুকূল) বাজার

Earnest money—বায়না, দাদন
Economic activity—আর্থিক সক্রিয়তা
Economics, applied—ব্যবহারিক অর্থতত্ত্ব বা ধনবিজ্ঞান
Economic backwardness—আর্থিক অনুন্নতি
Economic freedom—আর্থিক স্বাধীনতা
Economic planning—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
Economic reconstruction—আর্থিক পুনর্গঠন
Economic rent—ঔপযোগিক কর
Economic rehabilitation—আর্থিক-পুনঃসংস্থাপন
Economic self-sufficiency—অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য
Economic structure—আর্থিক বনিয়াদ
Economic welfare—আর্থিক কল্যাণ
Economy, internal—আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচ
Efficiency—দক্ষতা
Ejectment—উচ্ছেদ
Elasticity—পরিবর্তনশীলতা
Elasticity of demand and supply—যোগান ও চাহিদার নম্যতা
Electorate—নির্বাচকমণ্ডলী
Elimination—অপসারণ, বাদ
Embargo—বন্দরে জাহাজ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা, রোক, আটক
Embarkation permit—আরোহণ পত্র
Emergency—জরুরী অবস্থা
Emigration—প্রবসন
Employment bureau—নিয়োগ সংস্থা
En bloc—একযোগে
Endorsement—দস্তখৎ, সহি
Endorsement, restrictive—প্রতিবন্ধক স্বাক্ষর
Enfranchisement—নির্বাচনাধিকার
Enterprise—প্রচেষ্টা
Entrepreneur—উদ্যোক্তা
Entry, cashbook—রোকড় দাখিলা
Entry, credit—জমার দাখিলা
Entry, debit—ব্যয় দাখিলা
Entry, double—তকরারী জমাখরচ
Entry, single—একতরফা বা একহারা জমাখরচ
Entries, closing—হিসাবান্ত জমাখরচ
Environment—পরিবেশ
Equation—সমীকরণ
Equilibrium—ভারসাম্য
Equilibrium price—স্থিরীকৃত মূল্য
Equalization—সমীকরণ
Equimarginal—সমসীমান্তক
Equity—ন্যায়
Estimate, revised—সংশোধিত অনুমান (আয়ব্যয়ক)
Estimated value—অনুমিত মূল্য
Evacuee—বাস্তুহারা (ত্যাগী)
Excess fare—অতিরিক্ত ভাড়া
Excess profit tax (E.P.T.)—অতিরিক্ত মুনাফাকর
Ex-dividend—লভ্যাংশ বাদে

Exchange, dislocated—অনির্দিষ্ট বিনিময়
Exchange, foreign—বৈদেশিক বিনিময়
Exchange ratio—বিনিময় হার
Exchange at par—সম মূল্যে বিনিময়
Exchange, the rupee-sterling rate of—টাকা ও স্টার্লিংয়ের বিনিময় হার
Exchequer—রাজকোষ
Execution—সংসাধন, পরিচালন
Ex-officio—পদাধিকার বলে
Ex parte decree—একতরফা রায়
Expenditure, recurring—পৌনঃপুনিক ব্যয়
Exploitation, economic—অর্থনৈতিক শোষণ
Export—রপ্তানী
Expropriation—অধিকারচ্যুতি
External trade—বহির্বাণিজ্য

F

F.P.A. (Free of particular average)—আংশিক ক্ষতির দায়শূন্য
Face value—লিখিত মূল্য
Facsimile—প্রতিরূপ
Factory—কারখানা
Fair cash—পাকা রোকড়
Fair trade—ন্যায্য বাণিজ্য
Fair ledger—পাকা খাতা
Fallow land—পতিত জমি
Farming, mixed—মিশ্র কৃষি
Favourable—অনুকূল
Federal Union—সংযুক্ত রাষ্ট্রমণ্ডল
Federation—সঙ্ঘ
Fee—পারিশ্রমিক, দর্শনী
Fertilizer—সার
Feudalism—সামন্ততন্ত্র
Fidelity—বিশ্বাসপরায়ণতা
Fiduciary issue—বিশ্বাসাত্মক মুদ্রা
Financier—পুঁজি-যোগানদার
Finance, deficit—ঘাটতি ব্যয়
Finance minister—অর্থসচিব
Financial year—আর্থিক বৎসর
Fine—জরিমানা
Finished goods—তৈয়ারী মাল
Firm's credit—কারবারের সুনাম
Fiscal—রাজস্ববিষয়ক
Fiscal policy—রাজস্ব নীতি
Flexibility—নমনশীলতা
Floating (of a Company) পত্তন (কারবারের)
Fluctuation—সঙ্কোচপ্রসার
Folio—পৃষ্ঠা
Forced labour—বেগার
Formula—সূত্র, পদ্ধতি
Forward contract—অগ্রিম চুক্তি
Fragmentation—বিখণ্ডন
Franco—পণ্যার্পণ মূল্য (সর্বব্যয় সাকুল্যে)
Free coinage—অবাধ মুদ্রামুদ্রণ
Freehold (land)—নিষ্কর জমি
Free trade—অবাধ বাণিজ্য
Freight—মাশুল, ভাড়া, জাহাজে বোঝাই মাল
Freight note—চালানী রসিদ
Freight, dead—জাহাজে অধিকৃত স্থানের খালি অংশের ভাড়া
Fundamental—মূল
Funded debt—দীর্ঘকালীন ঋণ

Fund, Consolidated—সমষ্টিগত তহবিল
Fund, reserve—মজুত তহবিল
Fund, sinking—কর্জশোধক তহবিল
Fund, contingency—নৈমিত্তিক তহবিল
Fund, redemption—ঋণমুক্তি

G

Gain—লাভ
Gambling—জুয়া
Garbling—বিকৃতকরণ
General acceptance—সর্তহীন সাকরাণ
General meeting—সাধারণ অধিবেশন
General price level—পণ্য সাধারণের মূল্যস্তর
Generalisation—সাধারণীকরণ, সামান্যীকরণ
Gilt-edged—স্বর্ণতুল্য
Growing concern—উঠতি কারবার
Gold bullion standard—স্বর্ণ-পিণ্ড মান
Gold exchange standard—স্বর্ণবিনিময় মান
Gold pledging—স্বর্ণবন্ধকী ঋণের দলিল
Gold specie standard—স্বর্ণমুদ্রা মান
Gold standard—স্বর্ণমান
Gold, sterilisation of—স্বর্ণের বন্ধ্যাত্ব বিধান
Gold, mint price of—টাঁকশালের স্বর্ণহার
Goods, consumption—ভোগ্যপণ্য
Goods durable—দীর্ঘস্থায়ী (টেকসই) পণ্য
Goods, economic—উপযোগিক পণ্য
Goods, perishable—অস্থায়ী পণ্য
Goods, second hand—পুরাতন মাল
Goodwill—সুনাম, প্রতিষ্ঠাধিকার
Government, centralised—কেন্দ্রীভূত শাসন
Government, federal—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন
Government, interim—অন্তর্বর্তী সরকার
Government promissory note—সরকারী ঋণপত্র
Government, unitary—কেন্দ্রীভূত শাসন
Grade—পর্যায়
Granary—শস্যভাণ্ডার
Graph—লেখ, চিত্র
Gratuitous coinage—নিঃশুল্ক মুদ্রাঙ্কন
Gratuity—আনুতোষিক (অবসর গ্রহণকালে এককালীন পুরস্কার)
Gross receipts—মোট আয় (খরচ বাদ না দিয়া)
Guarantee—নিশ্চয়তাদান, প্রত্যয়-প্রতিভূ
Guild organisation—কারু সমবায়
Guild socialism—শ্রেণীগত সমাজতন্ত্র
Gunny bag—থলে

H

Handicraft—হস্তশিল্প, কারুকলা
Handbill—ইস্তাহার
Handnote—হাতচিঠা
Harvest—ফসলকাটা
Hawker—ফেরিওয়ালা
Hedging—ক্ষতি এড়াইবার দ্বিপাক্ষিক বন্দোবস্ত
Hereditament—মৌরস, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি
Heterogeneous—বিবিধজাতিক
Higgle—দর কষাকষি করা
Hire-purchase—ঠিকা-সওদা পদ্ধতি (যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কয়েকবার টাকা দিলে ভাডা করা জিনিষ নিজস্ব হয়)
Holding—জোত
Home industry—গৃহশিল্প
Home trade—অন্তর্বাণিজ্য
Homogeneous—সমজাতিক
Honour—গ্রহণ করা
Honoured bill—সাকরাণ হুণ্ডি
Horticulture—উদ্যানবিদ্যা
Husbandry—কৃষিকার্য
Hush money—ঘুষ
Hydroelectric—জলবিদ্যুৎ
Hypothecation—বন্ধক
Hypothecation, letter of—বন্ধক পত্র

I

Identical—অভিন্নরূপ
Identification—সনাক্তকরণ
Illegal contract—অবৈধ চুক্তি
Immigration—অধিপ্রবাস
Immovable—স্থাবর
Immunity from taxation—কর অব্যাহতি
Impact—অগ্রভার
Impact of a tax—করসংঘাত
Imperialism—সাম্রাজ্যবাদ
Imperial preference—সাম্রাজ্যিক সুবিধা
Implements—যন্ত্রপাতি
Imprest money—জিম্মা (স্থায়ী) তহবিল
Income, real—বাস্তব আয়
Income, unearned—অনুপার্জিত আয়
Incidence of taxation—করভার
Incidental—প্রাসঙ্গিক
Income, annual—সালিয়ানা
Inconvertible—অপরিবর্তনীয়
Incorporated—সমিতিবদ্ধ, বিধিবদ্ধ
Increment, unearned—অনুপার্জিত মুনাফা
Increasing return—ক্রমিক আয়বৃদ্ধি
Indemnity—ক্ষতিপূরণ
Indent, direct—সরাসরি মাল চালান
Indent, indenter's—আমদানী-কারক বা দালাল মারফৎ মাল চালান
Index number—সূচক সংখ্যা
Indian Companies Act—ভারতীয় কারবার (যৌথ) বিষয়ক আইন
Indirect—পরোক্ষ
Individualism—ব্যষ্টিবাদ
Indo-British Trade Agreement—ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি
Indorsement—দস্তখৎ

Industry—শিল্প
Industry, basic—মূলশিল্প
Industry, key—মৌলিক শিল্প
Industry, subsidiary—উপজাত শিল্প
Industrial bank—শিল্পীয় ব্যাঙ্ক
Industrial credit corporation —শিল্পীয় ঋণদান সঙ্ঘ
Industrial crisis—শিল্পসঙ্কট
Industrial finance corporation—শিল্পীয় অর্থসাহায্য সংসদ
Industrialisation—শিল্পপ্রসার
Industrial revolution—শিল্প বিপ্লব
Industrial school—কারুশিক্ষালয়
Industrial Tribunal—শিল্প অধিকরণ (ন্যায়পীঠ)
Industrialist—শিল্পপতি
Inflation—স্ফীতি (মুদ্রাস্ফীতি), উৎসার
Ingot—ধাতুপিণ্ড
Inheritance tax—উত্তরাধিকার কর
In lieu of—পরিবর্তে
Inundation—প্লাবনাত্মক
Insolvent—দেউলিয়া
Instalment—কিস্তি
Installation—স্থাপন
Insurance—বীমা
Insurance, accident—দুর্ঘটনা বীমা
Insurance, disability—অসামর্থ্য বীমা
Insurance, fidelity—বিশ্বস্ততা বীমা
Insurance, fire—অগ্নিবীমা
Insurance, health—স্বাস্থ্যবীমা
Insurance, old age—বার্ধক্য বীমা
Insurance, life—জীবনবীমা
Insurance, whole life—আজীবন বীমা
Insurance, marine—নৌবীমা
Insurance, riot—দাঙ্গা বীমা
Insurance policy—বীমাপত্র
Insurance, workmen's—শ্রমিক বীমা
Interest—সুদ
Interest, compound—চক্রবৃদ্ধি সুদ
Interest, vested—কায়েমী স্বার্থ
Inter alia—যোগে
International court of justice—আন্তর্জাতিক বিচারালয়
International Secretariat—আন্তর্জাতিক দপ্তরখানা
Interim—মধ্যবর্তী
Intrinsic value—ধাতুমূল্য, নিহিত মূল্য, স্বকীয় মূল্য
Inward returns account—অন্দর ফিরতা হিসাব
Inverse ratio—বিপরীত হার
Investment—ধনবিনিয়োগ, লগ্নী
Invoice—চালান, চালানীমাল
Irrigation department—সেচবিভাগ
Irrigation project—সেচপরিকল্পনা

J

Job work—খুচরা কাজ
Jobber—ঠিকাদার, দালাল
Joint liability—যৌথ দায়িত্ব
Joint Stock company—যৌথ কারবার
Jointure—স্ত্রীধন
Journal or day book—জাবেদা খাতা

Journal debit and credit—জাবেদা বহির জমাখরচ
Journalising—জাবেদান
Journeyman—ঠিকা কারিগর
Judgement creditor—ডিক্রী পাওনাদার
Judiciary—বিচার বিভাগ
Jurisdiction—এলাকা
Jurisprudence—ব্যবহার শাস্ত্র
Jute future market—পাটের ফটকা বাজার
Jute, rejected—ছাঁটাই পাট

K

Kartel (cartel)—মূল্যনিয়ন্ত্রক ব্যবসায়ী সঙ্ঘ (পণ্যের দর চড়া রাখিবার জন্য উৎপাদনকারীদের সম্মিলনী)
Keelage—বন্দরস্থ জাহাজী শুল্ক
Kite—সুপারিশী হুণ্ডি
Kite-flying—সুপারিশী হুণ্ডি কাটা
Payment in kind—পণ্যে দায় মিটান

L

Labour—শ্রম, শ্রমিক
Labour bureau—শ্রমিকসঙ্ঘ
Labour, mobility of—মজুর চলাচল গতি
Labour, division of—শ্রমবিভাগ
Labour, productive—ফলপ্রসূ শ্রম
Labour union—শ্রমিক সঙ্ঘ
Labour mobility—শ্রমের গতিশীলতা
Labour, unproductive—নিষ্ফল শ্রম
Labour saving machine—মিতশ্রমিক যন্ত্র
Labour, skilled—নিপুণ বা দক্ষ শ্রমিক
Labourer, day—দিনমজুর
Laissez-faire—অবাধ নীতি (বাণিজ্য সংক্রান্ত)
Land acquisition collector—ভূমি গ্রহ সমাহর্তা
Land Alienation Act—ভূমি হস্তান্তর আইন
Land, alluvial—চর জমি
Land, arable—কর্ষণযোগ্য জমি
Land fallow—পতিত জমি
Land mortgage bank—জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক
Land tenure—প্রজাস্বত্ব
Land tenure system—ভূমি প্রথা
Land, rent-free—নিষ্কর জমি
Land, waste—বোরান (অকর্ষণীয়) জমি
Landing—মাল নামান, অবতরণ
Lapse—অতিপত্তি (দায়কের ক্রটিতে বাজেয়াপ্ত)
Large scale production—বহুল উৎপাদন
Law of demand and supply—চাহিদা ও যোগানের নিয়ম
League—সঙ্ঘ
Lease—ইজারা, পাট্টা
Lease-holder or Lessee—পাট্টাদার, ইজারাদার
Ledger, balancing of—খতিয়ানের বাকি কাটা
Ledger—খতিয়ান

Ledger entry—খতিয়ানে হিসাব তোলা
Ledger-book, rough—জাবেদাবহি
Ledger, fair—পাকা খাতা
Legacy—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, উত্তরদান
Legal tender—আইনসঙ্গত বিহিত মুদ্রা
Legislative assembly—ব্যবস্থা পরিষদ
Legislature, unicameral—এক-কোষ্ঠিক ব্যবস্থাপক সভা
Leisured class—পরশ্রমজীবী
Letter of allotment—বিলিকরণ পত্র
Letter of credit—প্রতিশ্রুতিপত্র (আমদানীকারকের বাজার সম্ভ্রমের)
Letter, covering—সূচকপত্র
Letter, follow-up—ক্রমিক পত্র
Letter of hypothecation or lien—বন্ধকীপত্র (রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যসম্পর্কে)
Letter, instruction—নির্দেশপত্র
Liability—দায়, দেনা
Liability, demand—চলতি দায়
Liability, time—স্থায়ী বা মেয়াদী দায়
Liability, contingent—সম্ভাব্য দায়
Liability, limited—সীমাবদ্ধ বা সসীম দায়
Liabilities, outstanding—অপরিশোধিত দেনা বা বাকী দায়
Liability, unlimited—নিঃসীম দায়
Liaison officer—সংযোজক কর্মচারী
License—অনুজ্ঞা
Life annuity—আজীবন বৃত্তি
Link—সংযোগ
Liquid asset—চলতি (সহজে নগদ টাকায় পরিবর্তনীয়) সম্পত্তি
Liquidity preference—ঝোঁক-বৃত্তি (নগদের দিকে আপেক্ষিক ঝোঁক)
Liquidation—দেউলিয়া
Liquidator—দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক
Livestock—গবাদি পশুসম্পদ
Living, cost of—জীবন যাত্রার ব্যয়
Loan, long term—দীর্ঘমেয়াদী ঋণ
Loan, short term—স্বল্পমেয়াদী ঋণ
Loan, secured—নিরাপদ দাদন (ঋণ)
Loan, unsecured—শুধু হাতে ধার
Localisation—স্থানীয়করণ, একদেশতা
Lock out—কারবার স্থগিত, বহিষ্কার
Loss, consequential—পরোক্ষ ক্ষতি
Luxuries—বিলাসপণ্য
Lot-money—নীলামকারীর পারিশ্রমিক

M

Machinery—কলকব্জা
Magnitude—পরিমাণ
Mail order business—ডাকে কারবার
Malpractice—অবৈধ কার্যকলাপ
Management, Corporate—যৌথ বা সংঘবদ্ধ পরিচালন
Manager—কর্মকর্তা

Managing—নির্বাহী
Managing director—কার্যকরী পরিচালক
Manifesto—ঘোষণাপত্র
Mandate—আজ্ঞাপত্র
Manipulation—কৌশলে হেরফের
Manorial system—মহলদারী প্রথা
Manufactures—শিল্পজাত পণ্য
Manual—কায়িক
Margin—সীমা
Marginal dose—প্রান্তীয় (পার্যন্তিক) মাত্রা
Margin of profit—মুনাফার সীমা
Marginal profit—প্রান্তীয় মুনাফা
Marginal utility—প্রান্তীয় উপযোগিতা (যাহা সীমাবিশেষের ঊর্ধ্বে বা নিম্নে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়)
Marine, mercantile—পণ্যবাহী নৌবহর
Market, firm—তেজী বাজার
Market, weak—স্তিমিত (নরম) বাজার
Marketable goods—পণ্য (বাজার জাত হইবার উপযোগী)
Marketing problem—পণ্যবিক্রয় সমস্যা
Market fluctuation—বাজার উঠানামা
Market rate, price, value—বাজার দর
Market-rate discount—বাজারের বাট্টাহার
Market, steady—স্থির বাজার
Mart—বাজার
Mass—জনসাধারণ
Mate's receipt—জাহাজী মাল রসিদ
Material prosperity—পার্থিব উন্নতি
Material, raw—কাঁচামাল
Maturity—মেয়াদ (মুদ্দতি হুণ্ডির)
Maximum—সর্বাধিক, বৃহত্তম, চরম
Mean, arithmetic—যোগোত্তর গড় (মাধ্যম)
Mean, geometric—গুণোত্তর গড়
Means of subsistence—জীবিকার উপায়
Means of transportation—পরিবহন মাধ্যম
Medium of exchange—বিনিময়ের মাধ্যম (বাহন)
Memo—স্মারক
Memorandum—স্মারকলিপি
Mercantilism—বাণিজ্যতন্ত্র, সওদাগরী
Merchandise—বাণিজ্যপণ্যসম্ভার
Metayer system—আধিয়ার ব্যবস্থা
Middleman—মধ্যস্থ ব্যক্তি, দালাল
Migration of labour—শ্রমিক-স্থানান্তর
Milling—মুদ্রাপ্রান্তে খাঁজ কাটা
Mineral resources—খনিজ সম্পদ
Minimum—নিম্নতম
Ministry—মন্ত্রক
Minute book—কার্যবিবরণী বহি
Mint—টাঁকশাল
Misappropriation—আত্মসাৎ
Mobility—গতিশীলতা, চলনশীলতা
Modus operandum—কার্যপ্রণালী
Monarchy—রাজতন্ত্র
Money, appreciation of—অর্থের উপচয়
Money- call—চাহিবামাত্র প্রদানের সর্তযুক্ত অর্থ

Money, consideration—প্রতিলাভের টাকা, বায়না
Money, convertible—স্বর্ণ-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা
Money, depreciation of—মুদ্রার অবচয়
Money, earnest—বায়না
Money, fiat—প্রতিশ্রুতিহীন কাগজী মুদ্রা
Money, hard—কাঁচা টাকা
Moneyed interest—আর্থিক স্বার্থ
Money in circulation—প্রচলিত অর্থ (টাকা)
Money, ready—নগদ টাকা
Money, retention—জামানতের টাকা
Monger—ব্যাপারী, বিক্রেতা
Monometallism—একধাতুমান
Monopoly—একচেটিয়া
Monopoly, absolute—পূর্ণ একাধিকার
Mortality—মৃত্যুসংখ্যা
Moratorium—সাময়িক ঋণ রেহাই (রাজবিধিবলে ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার সময়)
Mortgage—বন্ধক (স্থাবর সম্পত্তি)
Movables—অস্থাবর সম্পত্তি
Multipurpose—বিবিধার্থক
Mutation—নাম জারী

N

National—জাতীয়
National economic structure—জাতীয় অর্থনৈতিক বনিয়াদ
National dividend—জাতীয় আয় (নির্দিষ্ট সময়ের)
National-debt—জাতীয় ঋণ
Nationalisation—রাষ্ট্রীয়করণ (জাতীয়করণ)
Naturalisation—দেশীয়করণ
Navigation law—সামুদ্রিক বিধি
Necessaries—অত্যাবশ্যক পণ্যাদি, জীবনীয়
Negotiable instrument—সম্প্রদেয় পত্র (ব্যাঙ্ক-সংশ্লিষ্ট)
Net—নিট, আসল, পাকা
Neutral—নিরপেক্ষ
Night fund or loans—এক রাত্রির জন্য ঋণ (ব্যাঙ্কের)
Nominal—নামমাত্র, নামিক
Nomination—মনোনয়ন
Non-business day—ছুটির দিন
Non-recurring—অনাবর্তক
Non-resident—অনাবাসিক
Normal—স্বাভাবিক
Notification, Notice—বিজ্ঞপ্তি
Null and void—বাতিল

O

Obsolescence—মূল্যহ্রাস (পুরাতন যন্ত্রের)
Occupancy right—দখলীস্বত্ব
Occupation, regional—স্থানিক পেশা
Occupation, seasonal—মৌসুমী পেশা
Octroi—চুঙ্গী, পুরশুল্ক
Official or officer—আধিকারিক
Official assignee—সরকারী তত্ত্বাবধায়ক
On cost—উপরি খরচ, পরোক্ষ খড়তা

Onerous Tax—দুর্বহ কর
Open account—চলতি হিসাব
Operating cost—কার্য পরিচালনার ব্যয়
Optimum—লক্ষ্য, আদর্শ
Organizer—সংগঠনকারী
Original—মৌলিক
Out-agency—মোকাম
Outlay—বিনিয়োগ
Output—উৎপন্ন বস্তু
Out of date—খারিজি
Overdraft—জমাতিরিক্ত গ্রহণ
Overhead charge—পরোক্ষ পড়তা
Over-population—লোক-বাহুল্য, অতিপ্রজন
Over-production—উৎপাদন-বাহুল্য, অত্যুৎপাদান
Outstanding—বাকী
Over-valued—অতিমূল্যীকৃত
Ownership, private—বে-সরকারী মালিকানা

P

Paid-up—আদায়ী
Panic—উদ্বেগ
Paper currency, Paper money—কাগজী মুদ্রা
Par—বরাবর, সমান
Par, above—অতিরিক্ত মূল্য, অধিহার
Par, at—সমমূল্যে
Par, below—উন মূল্যে, উন হারে
Parity—সমতা
Parity of exchange—বিনিময়ে সমমূল্য
Parity of prices—মূল্য-সমতা
Parity, purchasing power—ক্রয়শক্তির সমতা
Parallel—সমান্তরাল
Partition—ভাগ
Partner, dormant or sleeping – নিষ্ক্রিয় অংশীদার
Partnership agreement —অংশীদারী চুক্তি
Partner, quasi—বেনামা অংশীদার
Patronage—আনুকূল্য
Payment of balance—হিসাব শোধ
Pay order—দায় মিটাইবার নির্দেশ
Pay day—বেতনের দিন
Payee—প্রাপক, প্রাপ্তা
Payment, part—আংশিক পরিশোধ
Payable at sight—দর্শনী (দর্শন মাত্র দেয়)
Pawn—বন্ধকী দ্রব্য
Pawnee—বন্ধকগ্রহীতা
Pecuniary—আর্থিক
Pegging of exchange—বিনিময় হার বাঁধা
Pending—অপেক্ষমান
Pension, old age—বার্ধক্য ভাতা
Per capita—মাথাপিছু
Per cent—শতকরা
Perennial—বারমেসে
Periodicity—পর্যাবৃত্তি
Permit—আজ্ঞাপত্র
Permanent advance—স্থায়ী দাদন
Per pro—আমমোক্তার সহি
Perpetual debenture—চিরস্থায়ী* ঋণপত্র
Petition—যাচ্ঞাপত্র, আবেদন পত্র

Petty cash book—খুচরা নগদান
Phased plan—ত্বরান্বিত পরিকল্পনা
Plaint—আর্জি
Plaintiff—বাদী
Planned economy—নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা
Planning, economic—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
*Pledge—বন্ধক
Policy, mineral—খনিজ নীতি
Policy—বীমাপত্র, নীতি
Policy, endowment—মেয়াদী বীমাপত্র
Policy, valued marine—নির্দিষ্ট মূল্যের জাহাজী বীমা
Pool—ব্যবসায়ী সঙ্ঘ
Population, density of—জনসংখ্যার ঘনত্ব
Populace—জনসাধারণ
Possession—দখল
Posting—লিখন (খতিয়ানে)
Posting check—হিসাব পরিদর্শন
Potential—সম্ভাব্য
Practical—প্রায়োগিক
Preamble—ভূমিকা
Preference—পক্ষপাত
Preference share—সর্বাগ্রে লভ্যাংশযোগ্য শেয়ার
Pre-emption—ক্রয়ের অগ্রাধিকার
Preference, imperial—সাম্রাজ্যিক সুবিধা

Prejudice, without—অপ্রতিরোধনীয় ভাবে
Premium—বীমার কিস্তির টাকা, প্রকৃত মূল্যাপেক্ষা অধিক মূল্য
Premium, at—অতিরিক্ত মূল্যে
Prerogative—বিশেষ অধিকার
Price, ceiling and floor—সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর
Price, demand—চাহিদা মূল্য
Price fluctuation—দর উঠানামা
Price level—মূল্যস্তর
Price, preferential—পক্ষপাতমূলক দাম
Price, supply—যোগান মূল্য
Principal—মূলধন, আসল
Prime cost or cost price—মুখ্য খরচ, ক্রয়মূল্য,
Primary factor—প্রাথমিক উপাদান
Priority—অগ্রাধিকার
Produce exchange—পণ্যবিনিময় কেন্দ্র
Production, cost of—উৎপাদন ব্যয়
Production, mass—বহুল উৎপাদন
Productivity, canon of—উৎপাদনের সূত্র
Pro-forma account—খসড়া হিসাব
Producers' surplus—ভোগোদ্বৃত্ত
Profit, margin of—লাভের পরিমাণ

---

* Mortgage ও Pledge-এর মধ্যে তফাৎ এই যে, Mortgage-এর ক্ষেত্রে সম্পত্তি অধমর্ণের দখলে থাকিলেও আইনসঙ্গত মালিকানা বা আনুপাতিক সুদ উত্তমর্ণ পাইয়া থাকে, পক্ষান্তরে Pledge-এর ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত মালিকানা অধমর্ণের থাকিলেও উত্তমর্ণ সম্পত্তির দখলাধিকার পায়।

Profit, marginal—প্রান্তীয় মুনাফা
Profit, windfall—আকস্মিক মুনাফা
Profiteer—মুনাফাখোর
Proletariate—পরার্থশ্রমী
Promissory note—করারী তমসুক, কোম্পানীর কাগজ, প্রতিজ্ঞাপত্র
Promoter—প্রবর্তক
Proportion—সমানুপাত
Proportional—আনুপাতিক
Proprietary rights—মালিকানা স্বত্ব
Prospectus of a company—যৌথকারবারের অনুষ্ঠানপত্র
Protection policy—সংরক্ষণনীতি
Protection, discriminating—প্রভেদাত্মক সংরক্ষণ
Protocol—দলিলাদির খসড়া, আদিলেখ
Provident fund—ভবিষ্য নিধি, ভবিষ্যৎ সংস্থান তহবিল
Public company—সাধারণী যৌথ প্রতিষ্ঠান
Public credit or debt—রাষ্ট্রীয় ঋণ
Public finance—জাতীয় অর্থব্যবস্থা
Public monopoly—সরকারী একচেটিয়া
Public revenue—জাতীয় আয়
Publicity bureau—প্রচার বিভাগ
Purchasing Power—ক্রয়শক্তি
Put and call—নির্দিষ্ট সময়ে শেয়ার সমর্পণ বা দাবী করিবার স্বাধীনতা
Provision—বিধান
Proviso—অনুবিধি

Q

Quantity theory of money—অর্থের প্রসার (পরিমাণ) বাদ
Quantum—পরিমাণ
Quasi-partner—উপ-অংশীদার (যাহার অংশীদারিত্ব বাতিল হইয়াছে; অথচ যিনি নিয়োজিত মূলধনের জন্য সুদ পান)
Quasi-rent—উপকর (খাজনার অনুরূপ)
Quayage—ঘাটের খাজনা (পোস্তা ব্যবহারের জন্য শুল্ক)
Quid pro quo—অদলবদল
Quinquennial—পঞ্চবার্ষিক
Quire—দিস্তা (কাগজের)
Quota—বরাদ্দ
Quotation—বাজার দর, মূল্য জ্ঞাপন
Quoted—উদ্ধৃত

R

Range—অঞ্চল
Rapidity of circulation—প্রচলন গতি
Rate—হার, দর
Rate of exchange—বিনিময় হার
Ration card—বরাদ্দ পত্র
Rationalisation—সংবদ্ধ (যুক্তিসিদ্ধ) সংস্কার
Rationalisation of Industry—শিল্পসংস্কার (সর্বাত্মক উন্নয়নে)
Ratio—অনুপাত
Raw material—কাঁচামাল
Re :—বিষয়
Realisation—আদায়, উশুল
Rebate—ছাড়
Receipt, deposit—জমার রসিদ
Representative—প্রতিনিধি
Reciprocity—পারম্পর্য, ব্যতিহার
Reciprocal demand—পরম্পরানুবর্তী চাহিদা

Reclamation—উদ্ধার
Reconciliation—মিলকরণ
Reconstruction, rural or village —পল্লী উন্নয়ন
Records, original—মূল দলিলপত্র
Recurring expenditure—আবর্তক ব্যয়
Redemption—পরিশোধ
Reference—পরিচয় সূত্র
Referendum—সাধারণের মতগ্রহণ
Reflation—নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি
Refund—ফেরৎ
Register—খতিয়ান
Registered with A.D.—প্রাপ্তিস্বীকার সর্তে রেজিষ্ট্রীকৃত
Rehabilitation—পুনর্বাসন
Relative—আপেক্ষিক
Remission—ছাড়
Remuneration—পারিশ্রমিক
Reminder—অনুস্মারক
Rent—কর, খাজনা, ভাড়া
Rent, consumer's—ভোগ কর
Rent, customary—মামুলী কর
Rent, deed of Guaranteed—প্রতিশ্রুত (সর্বনিম্ন) খাজনা (ভূমিকর)
Rent, economic—ঔপযোগিক কর
Rent, producer's—উৎপাদন কর
Rent service—চাকরাণ জমি প্রথা
Repeal—প্রত্যাহার
Report—বিবরণী
Republic—সাধারণতন্ত্র
Repudiation—অস্বীকার
Requisites—আবশ্যক বস্তুসমূহ
Reserve—সংরক্ষণ, মজুত
Reserve fund—মজুত তহবিল
Reserve, contingency—নৈমিত্তিক সঞ্চয়
Reserve price—ন্যূনতম মূল্য, খুচরা দর
Resident—বাসিন্দা
Resources, natural—প্রাকৃতিক সম্পদ
Residual—অবশিষ্ট
Revenue—রাজস্ব, আয়
Retail—খুচরা
Returns—উৎপন্ন, আদায়, আগম বিবরণী
Return, constant—সম-আগম
Returns, decreasing or diminishing—নিম্নগ (উন) উৎপাদন বা আয় (আগম)
Return, increasing—উর্ধ্বগ (ক্রমবর্ধমান) আয় বা উৎপাদন
Return, inward—বিক্রী ফেরৎ
Return, outward—খরিদ ফেরৎ
Revoke—সংহরণ
Rigging the market—চাকুরীতে বাজার চড়ানো
Rise and fall—উঠানামা, তেজীমন্দী
Risk—ঝুঁকি
Risk charges—ঝুঁকির দক্ষিণা
Risk, owners—মালিকের দায়িত্ব
Road cess—পথকর
Royalty—নজরানা, সেলামী

S

Sabotage—অন্তর্ঘাত
Sanction—মঞ্জুরী
Sag—মূল্যহ্রাস (হঠাৎ)
Salary—বেতন

Sale—বিক্রয়
Sale, bill of—কবালা
Sale certificate—বয়নামা
Salesman—বিক্রেতা
Sale, public—নীলাম
Sale ring—খরিদ্দার জোট (নীলামে)
Savings—সঞ্চয়, পুঁজি
Savings account—সঞ্চয়, আমানত
Scheduled bank—তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক
Scheme, integrated—পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা
Scope—পরিধি
Secret reserve—গুপ্ত মজুত তহবিল (উদ্বৃত্তপত্রে অনুল্লিখিত)
Secretariate—দপ্তরখানা, মহাকরণ
Security—জামিন, জামানত
Sectional balancing—বিভাগীয় উদ্বৃত্ত মিলন
Security, collateral—সমপর্যায়ের জামিন
Security deposit—জামানত জমা
Security, gilt-edged—স্বর্ণতুল্য জামিন
Security, marketable—অনুমোদিত বা বিক্রয়যোগ্য শেয়ার (দলিল)
Seigniorage—বানি, মুদ্রাশুল্ক
Self-sufficiency, economic—অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য
Selling at cost—পড়তা দরে বিক্রয়
Sericulture—রেশম কীট পালন
Service—সেবামূলক শ্রম
Set off—কাটাকাটি
Settled ryot—বন্দোবস্তী প্রজা

Settlement, quinquennial—পাঁচশালা বন্দোবস্ত
Share—শেয়ার, অংশ
Share certificate—শেয়ারের অভিজ্ঞানপত্র (সার্টিফিকেট)
Shareholder—শেয়ারের মালিক, অংশীদার
Signature, specimen—নমুনা স্বাক্ষর
Share market—শেয়ার বাজার
Share, ordinary—সাধারণ শেয়ার
Share, preference—পক্ষপাতমূলক (সর্বাগ্রে লভ্যাংশ দেয় ও পরিশোধনীয়) শেয়ার
Share transfer—শেয়ার হস্তান্তর
Shortage—অভাব
Sinking fund—কর্জপরিশোধক তহবিল
Sight, at—দর্শনী
Sight bill—দর্শনী হুণ্ডি
Skill formation—নৈপুণ্য গঠন
Slab system—পর্বীয় রীতি
Sliding scale—সহচারা মান, মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে কর বা শুল্কের হ্রাস বৃদ্ধি
Slump—অতি-মন্দা
Social contract—সামাজিক চুক্তি
Socialism—সমাজতন্ত্র
Sole agent—একমাত্র বিক্রেতা (আড়তদার)
Specialisation—বিশেষত্ব বিধান
Specific reserve—নির্দিষ্ট মজুত তহবিল
Speculation—জল্পনাকল্পনা, ফটকা
Speculative business—ঝুঁকি-দারী কারবার

Spurious demand—অমূলক চাহিদা
Stability of currency—মুদ্রার স্থায়িত্ব
Stale cheque—বাতিল চেক
Standard—মান, প্রমাণ
Standard coin—মান বা আদর্শ মুদ্রা
Standard of living—জীবনযাত্রার মান
Standard, single—একধাতু মান
Standardized—প্রমিত
State Trading—রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা
Statement, reconciliation—সঙ্গতিসূচক হিসাব
Statement, financial—আয়ব্যয় বিবরণী
Stationary—স্থির
Statistics—সংখ্যাতত্ত্ব, পরিসংখ্যান
Statute—লিখিত বিধান
Statutory Company—সংবিধিবদ্ধ (যৌথ) প্রতিষ্ঠান
Stenographer—লঘুলিপিক
Sterilisation of gold—স্বর্ণের বন্ধ্যাত্ব বিধান
Stock—কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদি, মজুত মাল
Stock exchange—শেয়ার বাজার
Stock in trade—বিক্রির মাল
Stock valuation—মজুত মালের হিসাব
Struggle for existence—জীবন সংগ্রাম
Strike—ধর্মঘট
Subject, reserved—সংরক্ষিত বিষয়
Subsidiary coin—আনুষঙ্গিণী মুদ্রা
Subsidy—সাহায্য (সরকারী), রাজবৃত্তি
Subsistence, means of—জীবন-ধারণের উপায়
Suffrage, adult—পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার
Sub-judice—বিচারাধীন
Sub-let—কোর্ফা বিলি
Subordinate—অধীন
Sundry creditors—বিবিধ পাওনাদার
Supply—যোগান
Supply, contraction of—যোগান সঙ্কোচন
Supply curve—যোগান রেখা
Supply, intensity of—যোগানের প্রবলতা
Surcharge—অতিরিক্ত কর, অধিভার
Surety—জামিন, প্রতিভূ
Surplus—উদ্বৃত্ত
Surplus, consumer's—ভোগোদ্বৃত্ত
Surplus, producer's—উৎপাদকের উদ্বৃত্ত
Surplus value—উদ্বৃত্ত মূল্য (আপেক্ষিক)
Survey—পরিমাপ, জরীপ
Suspense account—কাঁচা বা খসড়া হিসাব
Symbol—প্রতীক
Symmetry—প্রতিসাম্য
Syndicate—সঙ্ঘ (ব্যবসায়ী)

T

Tabulation—সংখ্যা শ্রেণীকরণ
Tariff wall—শুল্ক প্রাচীর

Tariff Board—শুল্ক নির্ধারক বোর্ড
Tariff reform—শুল্ক সংস্কার
Tax, betterment—উন্নয়ন কর
Tax-free—করমুক্ত
Tax, direct—প্রত্যক্ষ কর
Tax evasion—কর ফাঁকি
Tax, excess profit—অতিরিক্ত মুনাফা কর
Tax, graduated—ক্রমবর্ধমান কর
Taxation, Immunity from—কর অব্যাহতি
Tax, income—আয়কর
Tax, impact of—কর সংঘাত
Tax, indirect—পরোক্ষ কর
Tax, purchase—ক্রয়কর
Tax, progressive—আয়ানুপাতিক কর
Tax, proportionate—আনুপাতিক কর
Tax, regressive—ক্রমহ্রাসমান কর
Tax, sales—বিক্রয় কর
Tax, terminal—সীমান্ত (যাত্রার) কর
Tax wealth—সম্পদ কর
Taxable—কর নির্ধারণযোগ্য
Taxation, canons of—কর নির্ধারণের বিধানাবলী
Technical education—কারিগরী শিক্ষা
Tenancy—প্রজাস্বত্ব
Tenant—প্রজা
Tender—পণ্যক্রয়ার্থে বাজার যাচাই, মাল সরবরাহের প্রস্তাব
Tender, legal—চলৎসিক্কা, আইনসঙ্গত বা বিহিত মুদ্রা
Tender money—বায়না
Testimonial—অভিমত
Textile protection bill—বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণ বিল
Theory—তত্ত্ব
Tight market—টান বাজার
Tithe—দশমাংশ
Title—স্বত্ব
Title, abstract of—অধিকার প্রমাণ
Title, deed—অধিকার পত্র
Token coin—নিদর্শক মুদ্রা, হীনমুদ্রা
Toll—কর, তোলা
Tools—যন্ত্রপাতি
Total cost—মোট পড়তা
Trade, balance of—বাণিজ্যিক গতি, বাণিজ্য উদ্বৃত্ত
Trade bill—ব্যাপারী হুণ্ডি
Trade Commissioner—বাণিজ্য প্রতিনিধি
Trade cycle—ব্যবসায় চক্র
Trade depression—ব্যবসায় মন্দা
Trade discount—ব্যবসায়ের বাট্টা, দস্তুরী
Trade, distributive—খুচরা ব্যবসা
Trade, entrepot—পুনঃরপ্তানী-বাণিজ্য
Trade, external—বহির্বাণিজ্য
Trade, free—অবাধ বাণিজ্য
Trade, foreign—বৈদেশিক বাণিজ্য
Trade, home or internal—অন্তর্বাণিজ্য
Trade, inter-state—আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য
Trade mark—ব্যবসায় চিহ্ন
Trade overland—স্থলপথে বাণিজ্য

Trade preference—ব্যবসায়িক সুবিধা
Trade price—পাইকারী মূল্য
Trade report—বাণিজ্য বিবরণী
Trade, sea-borne—সামুদ্রিক বাণিজ্য
Trade, transit—চালানী কারবার (বৈদেশিক পণ্যবহন বাণিজ্য)
Trade treaty—বাণিজ্য সন্ধি
Trade Union Act—শ্রমিকসঙ্ঘ আইন
Trade Union movement—শ্রমিক সঙ্ঘ আন্দোলন
Trade wind—ব্যবসাবাণিজ্যের হাওয়া
Training, vocational—বৃত্তিমূলক শিক্ষা
Transaction—লেনদেন, কারবার
Transferable—হস্তান্তরযোগ্য
Transfer, entry—পাল্টা জমাখরচ
Transfer, telegraphic—(T.T.)—তারযোগে হুণ্ডি প্রেরণ, তার হুণ্ডি
Transit—মাল চালান
Transport system—যানবাহন ব্যবস্থা
Treasury—সরকারী কোষাগার, রাজকোষ, খাজাঞ্চিখানা
Treasury warrant—রাজকোষ নির্দেশ
Trial Balance—রেওয়া মিল
Triplicate bill—পরপৈট
Trust—ব্যবসায় সঙ্ঘ
Trustee—অছি
Turnover—হস্তান্তরের বা স্থানান্তরের হিসাব, উৎপাদন, মোট বিক্রয়

U

Ultimatum—চরমপত্র
Ultra Vires—অধিকার-বহির্ভূত, অবৈধ
Unanimous—সর্বসম্মত
Under-sell—অববিক্রয়
Under-tenant—কোর্ফা প্রজা
Under-supply—কম যোগান
Underwriter—অবলিখক বা ঝুঁকিগ্রহীতা
Underwriting—অবলেখন (কোন কোম্পানীর অবিক্রীত সমস্ত শেয়ার ক্রয়ের চুক্তি বা বীমাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া লিখিত টাকার দায়িত্ব স্বীকার)
Unit of production—উৎপাদনের মাত্রা
Unconditional—সর্তহীন
Unearned increment—অনুপার্জিত মুনাফা
Unemployment insurance—বেকারবীমা
Unfavourable exchange—প্রতিকূল বিনিময়
Uniform—সম
Unit—একক
Unlimited liability—অসীম দায়িত্ব
Unstable—অস্থির, অনিশ্চিত
Up—তেজী
Usance—দস্তুর
Usance bill—মুদ্দতি হুণ্ডি
Usuary—চোটা
Usufructuary—খাইখালাসী (ভোগস্বত্ব)
Usurer—কুসীদজীবী
Utility—উপযোগিতা

Utilitarianism—হিতবাদ
Utility curve—উপযোগিতা রেখা
Utility, derived—উদ্ভূত উপযোগিতা
Utility, margical—প্রান্তীয় উপযোগিতা

V

Valid—আইনসঙ্গত (প্রমাণিত)
Value, competitive-প্রতিযোগিতা মূলক মূল্য
Value in use—প্রয়োজনে দাম
Value in exchange—বিনিময়ে দাম
Value, gross—মোট মূল্য
Value, intrinsic—ধাতু মূল্য, নিহিত মূল্য
Value payable (V.P.)—মূল্য দেয়
Valuation, quinquennial—পঞ্চবার্ষিক দেনাপাওনা নির্ধারণ (বীমা কোম্পানীর)
Value, surplus—উদ্বৃত্ত মূল্য
Value, surrender—প্রত্যর্পণ মূল্য (বীমাপত্রের)
Variation—তারতম্য
Vendibility—বিক্রয় ক্ষমতা
Vendor—বিক্রেতা
Velocity of circulation—প্রচলন গতি
Verdict—রায়
Vested interest—কায়েমী স্বার্থ
Veto—নাকচ
Volume—আয়তন
Voucher—রসিদ
Verification—মিলান, সত্যতা প্রতিপাদন
Voyage—সমুদ্র যাত্রা

W

Wage system—মজুরী বিধি
Wages fund—ভৃতি ভাণ্ডার
Wages, piece—ফুরান মজুরী
Wage, real—বাস্তব বা আসল মজু
Wages, task—কার্যানুযায়ী মজুরী
Want, satiation of—আবশ্যক পণ্যের সংতৃপ্তি
Warehouse—ধর্মগোলা, গুদাম
Warehouse, bonded—শুল্ক-বাকী মালগুদা
Warrant—পরোয়ানা
Waste book—জাবেদা খাতা, কাঁচ বা খসড়া বহি
Wealth—সম্পদ
Wear and tear—ব্যবহারজনিত ক্ষ
Weighman—কয়াল
Whole life insurance policy—আজীবন বীমাপত্র
Wholesale dealer—পাইকারী বিক্রেতা
Winding up—কারবার গুটান
Work day—কাজের দিন
Work, ground—প্রাথমিক কাজ
Workmen's insurance—শ্রমিক বীমা
Workshop—কারখানা
Wrapper—মোড়ক, আচ্ছাদন

Y

Yard stick or yard wand—গজকাঠি, মাপকাঠি
Year-book—বর্ষপঞ্জী
Year ending—আখেরি, সালতামামী
Yeoman—জোতদার গৃহস্থ, মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী
Yield—উৎপাদন

Z

Zemindary system—জমিদারী প্রথা
Zone—অঞ্চল, মণ্ডল

পরিশিষ্ট

C. U. B. Com. Questions.

(Essays, Commercial Terms & Letters)

1943

1. Write an essay in Bengali on one of the following subjects:—

   (a) Rural reconstruction in India—its aims and methods; (*b*) The ideal of national self-sufficiency; (*c*) Instruments for the formation and expression of public opinion.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions:—

   (*a*) Working capital; (*b*) Liquidator; (*c*) Letter of hypothecation; (*d*) Overdraft from banks; (*e*) Account sales; (*f*) Bullion; (*g*) Demurrage; (*h*) Preference shares; (*i*) Drawback.

1944

1. Write an essay in Bengali on one of the following subjects:—

   (*a*) The impact of war on India's trade and industry; (*b*) The rise of prices in India—its causes and remedies; (*c*) The introduction of free and compulsory primary education in India.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions:—

   (*a*) Jute Futures Market; (*b*) "Ceiling" and "floor" prices; (*c*) Authorised capital; (*d*) Discounting of bills; (*e*) Demurrage; (*f*) Marine insurance; (*g*) Bill of lading; (*h*) Preference shares; (*i*) Surrender value.

1945

1. Write an essay in Bengali on one of the following subjects:—

   (*a*) State control of economic activities in India during the War; (*b*) Types of land tenure in British India; (*c*) Economic rehabilitation of Bengal.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions:—
   (*a*) Excess profits tax; (*b*) Letter of credit; (*c*) Profiteer; (*d*) Handicraft; (*e*) Inflation; (*f*) Overhead costs; (*g*) Consignment; (*h*) Liquidator; (*i*) Auctioneer.

1946

1. Write an essay in Bengali on any one of the following subjects:—
   (*a*) The recent food shortage in India—its causes and remedies; (*b*) Industrial labour in India; (*c*) The Indian Banking system; (*d*) Economic planning for Bengal.
2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions:—
   (*a*) Paid-up capital; (*b*) Death duty; (*c*) Endorsement; (*d*) Fixed deposit; (*e*) Negotiable instrument; (*f*) Freight; (*g*) Fire insurance; (*h*) Days of grace; (*i*) Bank charges.

1947

1. Write an essay in Bengali on any one of the following subjects:—
   (*a*) Currency inflation in India and its consequences; (*b*) Pressure of population in India; (*c*) The provision of finance for Indian industries.
2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions:—
   (*a*) Ad valorem duties; (*b*) Bonded warehouse; (*c*) Demurrage; (*d*) Piece wages; (*e*) Whole life insurance policy; (*f*) Certificate of origin; (*g*) Mortgage debenture; (*h*) Prospectus; (*i*) Consideration; (*j*) Debit note.

1948

1. Write an essay in Bengali on one of the following subjects:—
   (*a*) The Problem of Rehabilitation of Refugees; (*b*) The influence of social institutions on the economic life of the people; (*c*) Post-war planning of Indian Industries; (*d*) Food Production in India.
2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions:—
   (*a*) Trade union movement; (*b*) Foreign exchange; (*c*) Civil aviation; (*d*) Rural reconstruction; (*e*) Tex-

tile protection Bill; (*f*) Gold Standard Reserve; (*g*) Inflation and Deflation; (*h*) General Price level; (*i*) Home charges; (*j*) Balance of trade.

1949

1. Write an essay in Bengali on any one of the following:—

   (*a*) Sales Tax and its effect on the consumers; (*b*) God made man and man made the town; (*c*) Black marketing and the measures required to combat it; (*d*) Scientific inventions and their effect upon trade and commerce.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following:—

   (*a*) Annuity Fund; (*b*) Exchange rates; (*c*) Hire purchase; (*d*) Tariff Reform; (*e*) Excise duty; (*f*) Transport system of a country; (*g*) Nationalisation of industry; (*h*) Industrial tribunal; (*i*) Stock valuation; (*j*) Bill of lading.

1950

1. নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

   (ক) পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা কি উপায়ে াফল্যমণ্ডিত হইতে পারে ?

   (খ) বাস্তুহারাদের ভবিষ্যৎ ;

   (গ) দেশে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য কি উপায়ে উন্নতিলাভ করিতে র ?

2. নিম্নে প্রদত্ত ইংরাজী শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Broadcast, Embargo, Life annuity, Successive average, ›tection, Investment, Full employment, Subsidy, Fiscal ›y, Allocation.

৭1

1. নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

   (ক) পাকিস্তান ও ভারতের নূতন বাণিজ্যচুক্তি ;

   (খ) জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা ;

   (গ) মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর পণ্যমূল্যবৃদ্ধির প্রভাব।

2. নিম্নে প্রদত্ত ইংরাজী শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Credit; Money-market; Speculation; Price-level; Barter; Import-quota; Self-sufficiency; Purchasing power; Balance of payments; Index-number.

1952

1. নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) ভারতে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ;

(খ) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সরকারী নিয়ন্ত্রণ ;

(গ) বর্তমান পণ্যমূল্যহ্রাসের কারণ ও ভারতের আর্থিক অবস্থার উপর ইহার প্রতিক্রিয়া।

2. নিম্নে প্রদত্ত ইংরাজী শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Moratorium; Sinking fund; Face Value; Corporate Management; Labour Unions; Inheritance Taxes; Drawings Account; Overdraft; Restrictive endorsement; Unsecured Loans.

1953

1. নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) ঘাটতি ব্যয়ের (Deficit financing) সুবিধা ও বিপদ ;

(খ) পণ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা ;

(গ) জাতীয় উন্নয়নে সমবায়ের স্থান।

2. নিম্নলিখিত ইংরাজী শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Resources; Target; Development; Agricultural Economy; Land Policy; Community Development; Rehabilitation; Productivity; Capital Formation; Current Consumption.

1954

1. নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের প্রভাব ;

(খ) ভারতের বেকার সমস্যা ;

(গ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কিরূপ হওয়া উচিত।

2. নিম্নলিখিত ইংরাজী শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Labour Welfare; Industrial Housing; Employees' Provident Fund; Community Development; Workmen's Compensation; Broker; Death Duty; Paid-up Capital.

1955

1. নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

   (ক) পশ্চিমবঙ্গে জনশিক্ষা ;

   (খ) বাঙ্গালী কৃষিজীবীর সমস্যা ;

   (গ) বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক জীবন ও বাঙ্গালীর উৎসব।

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Audit, Betterment fee, Cheap money, Commodity taxation, Federal Finance, Financial Control, Multi-purpose River Schemes, Nationalisation.

3. তোমার কোন বিদেশী বন্ধুকে ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একখানি চিঠি লিখ।

1956

1. নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

   (ক) ভারতে মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ;

   (খ) পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীদের স্বার্থরক্ষা ;

   (গ) পল্লী-অঞ্চলের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ।

2. নিম্নলিখিত ইংরাজী শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Budgetary surplus, Capital expenditure, Cheap money policy, Contingency fund, Corporation tax, Deficit financing, Entertainment tax, Economic Rehabilitation.

3. কারখানা শিল্পের কার্যক্ষেত্রের সঙ্কোচ সাধন করিয়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার বিষয়ে তোমার মতামত কি সংক্ষেপে লিখ।

1957

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :—

   (ক) ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি : তাহার কারণ ও প্রতিকার ;

   (খ) নগর ও পল্লীর ব্যবধান অপসারণ ;

   (গ) পাট ও পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ।

2. নিম্নলিখিত ইংরাজী শব্দগুলির যে-কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Ad valorem duty, Bill at sight, Soft Currency, Fiduciary issue, Negotiable instrument, Reciprocal demand, Subsidiary coin, Underwriting.

৪. ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রেত ও সামর্থ্য জানাইয়া একটি পত্র রচনা কর।

1958

1. নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :—
   (ক) বিদেশে সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণের উপযোগিতা;
   (খ) মানুষ বনাম কল;
   (গ) পল্লী অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন;
   (ঘ) ব্যবসায়-ক্ষেত্রে শিল্পকলার স্থান।

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির বাংলা প্রতিশব্দ দাও :—

Contingency fund, Deficit financing, Excise duty, Octroi, Industrial tribunal, Gold standard, Hire purchase, Bill of lading, Bank rate, Dollar reserve.

3. রেলে তোমার যে মাল চালান আসিয়াছে তাহা ঠিকমত আসে নাই বলিয়া ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া রেলকর্তৃপক্ষের উদ্দেশে দরখাস্ত রচনা কর।

1959

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :—
   (ক) ইউ-এন্ ও;
   (খ) গ্রামদান আন্দোলন;
   (গ) বিজ্ঞানের উন্নতি ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ;
   (ঘ) শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী।

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির বাংলা প্রতিশব্দ দাও :—

Annuity fund, Bill of exchange, Ad valorem duty, Overdraft, Purchase tax, Tariff reform, Exchange rate, Soft currency, Wealth tax, Preferential duty.

3. কাস্টম হইতে মাল খালাস করিবার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ চাহিয়া একটি পত্র রচনা কর।